ISSN :: 2454–1508
DOI Prefix: 10.69655

IIFS Impact Factor: 4.5
IJIN Impact Factor: 8.5

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-২, সংখ্যা-২, নভেম্বর ২০২৫

সম্পাদক:
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক:
আজিজুল সেখ

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-২, *সংখ্যা*-২, *নভেম্বর*, ২০২৫

সম্পাদক:
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক:
আজিজুল সেখ

UTTAR SURI
Inheriting the spirit, inspiring the future

প্রকাশক:
উত্তরসুরি, শ্রীভূমি, অসম

ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5(IJIN)
Volume-II, Issue-II, November, 2025

Published by:
Dr. Bishwajit Bhattacharjee
Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: https://www.atmadeep.in/
Article Submission Link: https://www.uttarsuri.com/uttarsuri
Email: editor@atmadeep.in

Editor-in-Chief
Dr. Bishwajit Bhattacharjee

Associate Editor
Azizul Sekh

Type Setting:
Amrika Das Purkayastha
Soumili Dhar

Printed at:
Scholar Publications
Sribhumi, Assam, India, 788710

Cover Page:
Kajal Ganguli

Price: Rs. 600.00

© Uttarsuri

The views and contents of this Journal are solely of the authors. This Journal is being sold on the condition and understanding that its contents are merely for information and reference and that neither the author nor the publishers, Printers or Sellers of this Journal are engaged in rendering legal, accounting or other professional service.

The publishers believe that the contents of this Journal do not violate any existing copyright/intellectual property of others in any manner whatsoever. However, in the event the author has been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

Atmadeep, is a Bi-monthly electronic & Print journal of open Access Category. The Readers do not need to pay/register themselves to read and download the articles in the journal. However, it is only for scholarly/academic purpose that is non-commercial. Users while using excerpts from Atmadeep, must cite the author, content and the journal by including the link of the content. Individuals/ Companies/ Organizations intending to use contents from Atmadeep, for commercial purpose must contact the Editor-in-Chief.

Editorial Board

Advisor

Dr. Tapadhir Bhattacharjee
Former Vice-Chancellor, Assam University, Silchar, Assam
President, Uttarsuri, Sribhumi, Assam
Mo: +919435566494

Dr. Nirmal Kumar Sarkar
Former Associate Professor, Karimganj College, Sribhumi, Assam
Vice-President, Uttarsuri, Sribhumi, Assam
Mo: +919435375599

Editor-in-Chief

Dr. Bishwajit Bhattacharjee
Associate Professor, Karimganj College
Sribhumi, Assam, 788710
Mo: +919435750458, +917002548380
Email: bishwajit@karimganjcollege.ac.in

Associate Editor

Azizul Sekh
Research Scholar, Dept. of Bengali, Tripura University, Tripura
Mo: +919126261414
Email: azizul.bengali@tripurauniv.ac.in

Editorial Board Member:

Dr. Debasish Bhattacharjee
Professor & Head, Dept. of Bengali
Assam University, Silchar
Email: debashish.bhattacharya@aus.ac.in

Dr. Rupasree Debnath
Assistant Professor, Department of Bengali
Gauhati University, Assam, India
Email: rupasree@gauhati.ac.in

Dr. Malay Deb
Assistant Professor, Dept. of Bengali
Tripura University, Tripura, India
Email: malaydeb@tripurauniv.ac.in

Dr. Madhumita Sengupta
Asst. Professor, Dept. of Bengali
Arya Vidyapeeth College, Guwahati, Assam, India
Email: madhumita.sengupta@avcollege.ac.in

Dr. Debjani Bhowmick (Chakraborty)
Associate Professor, Dept. of Bengali,
Sripat Singh College, Murshidabad, West Bengal, India
Email: dbhowmick@sripatsinghcollege.edu.in

Romana Papri
Lecturer, Department of Pali and Buddhist Studies
University of Dhaka, Bangladesh
Email: romanapapri@du.ac.bd

Dr. Rajarshi Chakrabarty
Assistant Professor, Dept. of History
University of Burdwan, West Bengal, India
Email: rchakrabarty@hist.buruniv.ac.in

Dr. Mumit Al Rashid
Associate Professor and chairman
Department of Persian Language and Literature
University of Dhaka, Bangladesh
Email: mumitarashid@du.ac.bd

Dr. Barnali Bhowmick Ghosh
Associate Professor and HOD
Department of Bengali
Bir Bikram Memorial College, Agartala, Tripura

দ্বিতীয় পর্ব, প্রথম সংখ্যা, সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১। **সোমেন চন্দের নির্বাচিত গল্পে সাম্যবাদী ভাবধারার কথাবিশ্বে মানবজীবনের রেখাচিত্র**
ড. সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী, ১-৭

২। **বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে অন্ত্যজশ্রেণির সংগ্রাম**
ড. যতন সাহা, ৮-১৬

৩। **সাধারণ জীবন থেকে সাহিত্য-সৃজন: নবনীতা দেবসেনের নির্বাচিত ছোটগল্পের প্রেক্ষিত**
সরলা মাণ্ডি, ১৭-২৩

৪। **বিমল লামার 'নুন চা' উপন্যাস: লোকজ উপাদানের অন্বেষণ**
ড. বিকাশ নার্জিনারী, ২৪-২৯

৫। **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোট গল্পে নিম্নবর্গীয় চেতনা: এক বিশ্লেষণী পাঠ**
রাজর্ষি মোহান্ত, ৩০-৩৭

৬। **রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রতিবাদী নারী: এক বিশ্লেষণী পাঠ**
অপরাজিতা ভট্টাচার্য, ৩৮-৪৬

৭। **বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়': ভূগোলের চোখে**
সৌম্য ঘোষ, ৪৭-৫৩

৮। **শরদিন্দুর ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোর অন্তর্বর্তী সমাজচেতনা**
রাহুল দে, ৫৪-৬৪

৯। **মুহূর্তে বদলে যায় নারীর জীবন: মহাশ্বেতা দেবীর 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে' উপন্যাস**
অনসূয়া কুণ্ডু, ৬৫-৭১

১০। **সময়ের শিকল, নারীর আর্তনাদ: রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প**
সুপ্রিতা নাথ, ৭২-৭৮

১১। **শিবরাম চক্রবর্তীর রচনায় নারী চরিত্রের অবলোকন**
সুস্মিতা সাহা, ৭৯-৮৪

১২। **'সেই পাখি' উপন্যাসের কাহিনি ও শিল্পরূপ: লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ পর্যালোচনা**
অশোককুমার রায়, ৮৫-৯২

১৩। **পঞ্চাশের মন্বন্তর কালে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা ও বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিফলন**
সুজন সাহা, ৯৩-৯৭

নাট্যভাবনা

১৪। **চন্দন সেনের নির্বাচিত নাটকে প্রতিবাদী নারী চরিত্র**
জয়ন্তী রাজোয়াড়, ৯৮-১০২

কবিতা

১৫। **নারী চেতনার আলোকে মহাকালের নারী: প্রসঙ্গ মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা**
ড. রেজাউল ইসলাম, ১০৩-১১০

১৬। **'কৃত্তিবাসে'র আলোয় শঙ্খ ঘোষ: দেশ-কাল-সমাজ ও মানুষের সংবেদনশীল বয়ান**
শিরিন আক্তার, ১১১-১১৮

১৭। **বাংলা কাব্যগীতির ধারায় অতুলপ্রসাদ সেনের গজল**
মো: আফতাব উদ্দিন, ১১৯-১২৭

১৮। **স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী**
সুমিত পাল, রঞ্জনা ব্যানার্জি ও সমীররঞ্জন অধিকারী, ১২৮-১৩৭
১৯। **মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রচনায় প্রকৃতির স্বরূপ ও রূপবৈচিত্র্য**
হুমায়ুন কবির, ১৩৮-১৪৩

দর্শন ভাবনা

২০। **উপনিষদে বিশ্বসংস্কৃতি ভাবনা: একটি সমীক্ষা**
ড. স্বপন মাল, ১৪৪-১৫৪
২১। **স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন এবং পাশ্চাত্যে এর প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ**
ড. আনন্দ ঘোষ, ১৫৫-১৬০
২২। **জীবন জিজ্ঞাসা: ভারতীয় দর্শনের আলোকে একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ**
ড. মৈত্রী গোস্বামী, ১৬১-১৬৬
২৩। **দুঃখ ও দুঃখ মুক্তির উপায়: ধম্মপদের আলোকে একটি সমীক্ষা**
টোটন হাজরা, ১৬৭-১৭২

লোকসাহিত্য

২৪। **শ্রী অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে ছড়া ও আঞ্চলিক শব্দ**
অলোক চন্দ, ১৭৩-১৮৩
২৫। **বিখ্যাত কিছু ধাঁধা: একটি বিশ্বব্যাপী অন্বেষণের প্রয়াস**
অসিত মন্ডল, ১৮৪-১৮৯
২৬। **'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭): রূপকথা ও শাশ্বত, আখ্যান কৌশলের আধুনিক বুনন**
সমরজিৎ শর্মা, ১৯০-১৯৫

বিবিধ

২৭। **প্রসঙ্গ কলকাতা ৭১: চলচ্চিত্র ভাষার নবনিরীক্ষা**
ড. মোস্তাক আলি, ১৯৬-২০৩
২৮। **বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আধুনিকতার রূপায়ন**
মো: কয়েছ আহমেদ ও ড. কৃষ্ণা ভদ্র, ২০৪-২১৭
২৯। **সাদা-কালোর বাইরে: নন-বাইনারি পরিচয়ের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান**
বসুন্ধরা গাঙ্গুলি, ২১৮-২২৪
৩০। **বাড়ি থেকে পালিয়ে: স্রষ্টার দ্বন্দ্ব, সৃষ্টির দ্বন্দ্ব**
অগ্নিভ সান্যাল, ২২৫-২৩০
৩১। **ভেষজ চিকিৎসায় পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি গ্রাম কর্ণগড়ের একটি সমীক্ষা**
অনন্যা মুখার্জী, ২৩১-২৩৭
৩২। **ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জনমত গঠনে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের ভূমিকা**
শুভেন্দু বোস, ২৩৮-২৪৮
৩৩। **কাব্যসৌন্দর্যের আলোকে ঈশোপনিষদ**
মন্দিরা ডাঙ্গর, ২৪৯-২৫৫
৩৪। **সত্যজিৎ রায়ের গল্প: ভৌতিক ভাবনার রূপায়ণ**
সুরজিৎ সাহা, ২৫৬-২৬২

দ্বিতীয় পর্ব, দ্বিতীয় সংখ্যা
সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১। **সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'অর্ধেক আকাশ': বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান**
মহাদেব মণ্ডল ও লক্ষ্মীশ্রী ঠাকুর, ২৬৩-২৬৮

২। **কল্লোল লাহিড়ীর 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল': নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আখ্যান**
ড. আনিসুর রহমান, ২৬৯-২৭৪

৩। **নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প: দেশভাগ ও মানুষের স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান**
ড. আজিমুদ্দিন মণ্ডল, ২৭৫-২৮০

৪। **নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা'-র নির্বাচিত গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: একটি গবেষণামূলক অধ্যয়ন**
দীপশিখা দাস ও ড. মিতা চক্রবর্তী, ২৮১-২৮৯

৫। **ছোটগল্পকার জগদীশ গুপ্তের 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন' গল্পে নারীর করুণ জীবনালেখ্য: একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা**
প্রিয়তমা মজুমদার, ২৯০-২৯৫

৬। **স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক উপন্যাস 'ত্রয়ী': গঠনশৈলী, পাশ্চাত্যপ্রভাব ও সংগীতপ্রয়োগ**
পম্পি দে, ২৯৬-৩০২

৭। **সুবোধকুমার চক্রবর্তীর 'রম্যাণি বীক্ষ্য'- এ দক্ষিণভারতের প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা**
জয়িতা সুর, ৩০৩-৩০৯

৮। **সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পে সমাজ-দর্শন ভাবনা**
অরূপ কুমার পাল, ৩১০-৩১৬

৯। **বন্ধুত্বের নিরন্তর বন্ধন: রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ**
সন্দীপ ঘোষ, ৩১৭-৩২২

১০। **গল্পের মোড়কে অন্ত্যজশ্রেণির বাস্তব সংগ্রামের আখ্যান: প্রসঙ্গ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠির দেশ'**
অনুরাধা দাস, ৩২৩-৩২৮

১১। **উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে নারীর জীবনযাত্রা: প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'**
সুনন্দা ঘোষ, ৩২৯-৩৩৫

নাট্যভাবনা

১২। **শেখর দেবরায়ের মনসাকথা নাটক: নির্মাণ-বিনির্মাণ**
ড. প্রশান্ত দাস, ৩৩৬-৩৪১

কবিতা

১৩। **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় 'কবিতার' প্রসঙ্গ**
মিহির মজুমদার ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ৩৪২-৩৪৯

দর্শন ভাবনা

১৪। **জীবনের যাপন ও জড়বাদী ভাবনা: চার্বাক দর্শনের আলোকে একটি সমীক্ষা**
ড. মৈত্রী গোস্বামী, ৩৫০-৩৫৫

১৫। **শিক্ষা ভাবনায় দর্শন: একটি নৈতিক ও চিন্তাগত অন্বেষণ**
কাজী মাহফুজা হক, ৩৫৬-৩৬২

১৬। **মানবিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বসংস্কৃতি রক্ষার্থে সংস্কৃত-ভাষা: একটি সমীক্ষণ**
অভিজিৎ পণ্ডিত, ৩৬৩-৩৬৮

১৭। **হিন্দু ও ইসলামের ধর্মীয় শাস্ত্রে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দর্শন**
সান্তনা রানী সামন্ত ও আশাদুজ্জামান খান, ৩৬৯-৩৮২

লোকসাহিত্য

১৮। **লোকভাষ্যে বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন**
ড. মোঃ রাজিবুল ইসলাম, ৩৮৩-৩৯৩

১৯। **গোপভূমের ঐতিহ্যে আল্পনা গ্রাম লবন্ধার**
রুদ্রনীল চোংদার, ৩৯৪-৪০১

২০। **জাওয়া-করম উৎসব: সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য**
রঞ্জিত কুমার মাহাত, ৪০২-৪১১

বিবিধ

২১। ***যদুবংশ*: বিভ্রান্ত সময়ের যাপিত যৌবন**
ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী, ৪১২-৪২৪

২২। **পাতা থেকে পর্দায়: বাংলা সিনেমায় নারী চরিত্রের বিবর্তন**
ড. সোমা ব্যানার্জি ও অমৃতা চক্রবর্তী, ৪২৫-৪৩০

২৩। **সাবেকি ভূরাজনীতি: ভূরাজনীতির সাবেকি চিন্তাবিদ এবং তাদের তত্ত্বের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা**
সৌমেন মণ্ডল, ৪৩১-৪৪১

২৪। **জ্ঞান সাধনা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও প্রচার-প্রসারে উবায়দুল হক (রহ.)- এর ভূমিকা**
মোঃ কামাল উদ্দিন, ৪৪২-৪৪৯

২৫। **ব্রাত্য বসুর 'রুদ্ধসংগীত': প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বয়ান**
রবিউল সেখ, ৪৫০-৪৫৭

২৬। **ঔপনিবেশিক ও পরবর্তী ঔপনিবেশিক যুগে পুরুলিয়ার ইতিহাসে কুষ্ঠ ব্যাধি ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা: প্রসঙ্গ দ্য লেপ্রসি মিশন হাসপাতাল**
স্বাগতা রায়, ৪৫৮-৪৬৬

২৭। **প্রসঙ্গ ধর্ম: যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংলাপের আলোকে একটি সমীক্ষা**
পার্থসারথি অধিকারী, ৪৬৭-৪৭২

২৮। **সত্যজিৎ রায়ের কলমে বহির্জাগতিক প্রাণীর রূপায়ণ: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন**
সুরজিৎ সাহা, ৪৭৩-৪৭৮

Guidelines, Review Process & Publication Ethics, Page No: 479
Publication Charge, Page No: 481

সম্পাদকীয়

বাংলা গবেষণা পত্রিকা হিসেবে আত্মদীপ বর্তমানে একটি সম্মানজনক স্থান অধিকার করেছে, যার একমাত্র কৃতিত্ব লেখক, রিভিউয়ার এবং সম্পাদকমণ্ডলীর। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আত্মদীপ গবেষণা পত্রিকা হিসেবে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে, যা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। এই পথের সহযাত্রী হিসেবে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। বহু বিষয় গত সংখ্যাগুলিতে সংযোজিত হয়েছে যা বাংলা সাহিত্যের গবেষণাকে একটি নতুনা মাত্রা এনে দিয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আত্মদীপের এই পর্বের নির্বাচিত লেখাগুলোকে কথাসাহিত্য, নাট্যভাবনা, কবিতা, দর্শন, লোকসাহিত্য, বিবিধ ইত্যাদি নানারকম ভাগে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে। যারা বাংলা ভাষায় লিখছেন, গবেষণা করছেন তাদের ভাবনাগুলোকে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়াই এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।

আত্মদীপ পত্রিকা শুধু সাহিত্যকেন্দ্রিক নয়, বাংলা ভাষায়, যে কোন বিষয় নিয়ে লেখা গবেষণামূলক পত্রিকা। পত্রিকাটি অনলাইন এবং প্রিন্ট দুভাবেই প্রকাশিত হওয়ায় গবেষক এবং লেখকদের অনেকটা সাহায্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রতিটি প্রবন্ধে DOI (Digital Object Identifier) সংযুক্ত হওয়ায় প্রবন্ধগুলি আন্তর্জাতিক আর্কাইভ এবং যে কোনো গবেষককে প্রবন্ধের রেফারেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই সাহায্য হবে। তাছাড়া প্রতিটি প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক আর্কাইভে (https://archive.org/) সংরক্ষিত রয়েছে। আত্মদীপ জার্নালের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের ইন্ডেক্সিং রয়েছে এবং International Journal Indexing (www.ijindexing.com) এর দ্বারা প্রদত্ত Impact Factor ৮.৫।

আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি বাংলা ভাষায় এটি একটি অন্যতম জার্নাল যা সম্পূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে। যে কোনো প্রবন্ধ জমা দেওয়ার পর সেটিতে AI কিংবা Plagiarism আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করা হয় এবং তারপর রিভিউ এর জন্য পাঠানো হয়। রিভিউতে তা গ্রহণযোগ্য কিংবা রিভিউ রিপোর্ট অনুযায়ী প্রবন্ধ উপস্থাপিত হলেই তা প্রকাশ করা হয়।

ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে যারা এই সংখ্যায় লেখা দিয়েছেন এবং পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী, যারা আমাদের আহ্বানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আত্মদীপের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে **৩১শে** জানুয়ারি, ২০২৬।

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য
মুখ্য সম্পাদক
এবং সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, শ্রীভূমি, অসম।

আজিজুল সেখ
সহ-সম্পাদক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 263- 268
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.205

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘অর্ধেক আকাশ’: বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান

মহাদেব মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*
লক্ষ্মীশ্রী ঠাকুর, *সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 11.11.2025; Accepted: 12.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Suchitra Bhattacharya's *Ardhek Akash* is a powerful testimony to the life struggles and self-assertion of modern women. In the novel, the author shows that although society speaks of equal opportunities for women, in reality, they still face numerous obstacles. Whether in the family, workplace, or society at large, women constantly need to prove their worth. Yet, they are not mere victims but fighters. The women characters in the novel balance domestic responsibilities while simultaneously pursuing their dreams and identities. Bhattacharya illustrates that even educated and working women are compelled to confront rigid social values. Patriarchal attitudes continue to obstruct their progress. However, through these challenges, women are gradually establishing their position. They protest against injustice and move forward on the path of dignity and independence. *Ardhek Akash* is not only a portrayal of women's limitations but also a celebration of their indomitable strength and potential. Through this work, Bhattacharya makes it clear that women do not embody silence—they are indeed half the sky, and without their contribution, society cannot be complete. This message remains highly relevant today, as the questions of women's freedom and equality are still unsettled and incomplete.

Keywords: women's self-assertion, patriarchy, independence, women's position in society, struggle, identity, modern women

স্বাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০ খ্রিঃ ১০ই জানুয়ারি-২০১৫ খ্রিঃ ১ই মে)। তাই তাঁর প্রতিটি লেখায় স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা স্পষ্ট। আমরা তাঁর উপন্যাস পড়লেই দেখতে পাই নারী স্বাধীনতার একান্ত প্রয়াস। নাগরিক জীবনের সংসারের চিত্র তাঁর লেখায় সব থেকে বেশি করে ফুটে উঠেছে। নারী সংসারের গণ্ডিতে আর সীমাবদ্ধ নয়, সেই দৃষ্টান্তই লেখিকা তাঁর লেখায় সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে নারীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার এক দুর্নিবার চেষ্টা আমরা দেখতে পাই তাঁর রচনায়। মানুষের মনের ভাবনা এবং বাস্তবের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব লেখিকা রূপ দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। সংসার জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে নারী যখন পা বাড়িয়েছে বাইরের জগৎ-এ তখন নারীকে প্রতিমুহূর্তে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। শত বাঁধা অতিক্রম করে নারী তাঁর নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নারী আজও পারেনি সমাজে নিজের সম্মান সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। পুরুষের চোখ রাঙানীকে উপেক্ষা করে নারী পারেনি নিজেদের নতুন দিগন্তে পৌছে দিতে। নিজের ভালোবাসার টানে নারী নিজেই জড়িয়ে গেছে পুরুষের বাহুবন্ধে। নারীর এই বন্ধন মুক্তির চেষ্টাই লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে করে গেছেন। ঠিক এই রকমই একটি উপন্যাস ‘অর্ধেক

আকাশ' (জানুয়ারি-২০১২)। এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে এক চাকরিজীবী নারীর অন্তর্বেদনা। স্বামীর অনুগামী হওয়াই কি আজও স্ত্রীর ধর্ম? লেখিকা সেই চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'অর্ধেক আকাশ' উপন্যাসে। তুলে ধরেছেন নারী বিশ্বের অন্দর মহল ও বহির্মহলকে। লেখিকা বাণী বসুর কথায় উঠে আসে সেই নারী কথার প্রসঙ্গ—

> ''চাকুরে মেয়ে, শিল্পী মেয়ে, ঘরণী, গৃহিণী মেয়ে এরা সবাই কীভাবে এই কঠিন সময়ের মোকাবিলা করছে। এই সময়ের অর্থাৎ বিশ্বায়নের আশেপাশের সমাজ চিত্রের একটা ডকুমেন্টেশন তার লেখার থেকে পাওয়া যায়।''[১]

'অর্ধেক আকাশ' উপন্যাসের নায়িকা পারমিতা কলেজে পড়ায়, বিষয় রসায়ন। এটাই তার একমাত্র পরিচয় হতে পারত যদি সে কোনো পুরুষ হত। কিন্তু সে যখন নারী তাই তার উপর আরও অসংখ্য পরিচয় বহনের দায়ভার। কখনো সে কারো স্ত্রী, কখনো কারো মা, কখনো কারো মেয়ে, কখনো আবার কারো পুত্রবধূ। প্রতিটি পরিচয়েই তাকে সমান দায়িত্বশীল হতে হবে। নারীকে প্রতিটি পরিচয়েই সমান গুরুত্ব দিতে হয়, কিন্তু পুরুষরা খুব সহজেই তা এড়িয়ে চলতে পারে। এই উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি পারমিতার ছেলে তাতারের জন্মদিন। সেই অনুষ্ঠানে তাতারের পিতা রাজর্ষি উপস্থিত থাকতে পারছে না অফিসের কাজের জন্য। আগের জন্মদিন দুটিতেও ছিল না। এমনকি অন্নপ্রাশনটাও রবিবারে করা হয়েছিল রাজর্ষির সুবিধার্থে। কোনো দিনই রাজা তার অফিসের কাজ ছাড়া কোনো কাজে দায়িত্বশীল নয়। কিন্তু পারমিতা কলেজ অধ্যাপিকা হয়েও সমস্ত দিক সামলে চলছে হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও। পারমিতা তাই ভাবছে—

> ''ছেলের জন্মদিনে অফিসে ব্যস্ত থাকাটা বাবাকে মানায় এবং যত কাজই থাক মাকেই নিতে হয় ছুটিটা।''[২]

বাবা খুব সহজেই ছেলের জন্মদিনে অফিসে কাটাতে পারলেও মা পারেনি তার দায়িত্ব ভুলে কলেজে যেতে। নারীর কাছে আজও সংসার ধর্মই বড় সেকথাই যেন লেখিকা বলতে চেয়েছেন।

তাতারের জন্মদিনের পার্টির শেষ লগ্নে বাড়ি ফিরেছে রাজা। আত্মীয়-স্বজন ফিরে যাওয়ার পর কাজ সেরে পারমিতা বিছানায় এলে রাজা জানিয়েছে তার পদোন্নতির কথা। কোম্পানি তার কাজে খুশি হয়ে নতুন একটি কাজে বেঙ্গালোর পাঠাচ্ছে রাজাকে। পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে বেতনও বাড়ছে তার। তাই খুশিতে আত্মহারা রাজা। খবরটা শুনে পারমিতাও লাফিয়ে উঠেছে, জড়িয়ে ধরেছে রাজাকে। বলেছে—

> ''এ তো গ্র্যান্ড নিউজ! ইস, আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।''[৩]

কিন্তু রাজা যখন জানিয়েছে পার্মানেন্টলি তাকে বেঙ্গালোর চলে যেতে হচ্ছে তখন বোধোদয় হয়েছে পারমিতার। ক্ষণিকের মধ্যে বিষণ্ণতায় মন ভরে গেছে তার। কারন এক অজানা আতঙ্ক তাকে দগ্ধ করছে রাজা পুরোপুরি ভাবে বেঙ্গালোর চলে গেলে কি করবে পারমিতা! স্বামীর পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাময়িক সুখ এখন তার কাছে গভীর বেদনায় পরিণত। সে পারছে না স্বামীর এই সুযোগ নষ্ট করার কথা বলতে সেই সঙ্গে পারছে না রাজার পুরোপুরি ভাবে বেঙ্গালোর চলে যাওয়াটা মেনে নিতেও।

রাজার এই বেঙ্গালোর যাত্রাই পারমিতার জীবনে নিয়ে আসে এক গভীর সংকট। পারমিতা ব্যক্তিত্ব ও নারীত্বের টানাপোড়নে দগ্ধ হতে থাকে। রাজা বেঙ্গালোর যাত্রা করলে সবাই চেয়েছে পারোও তাকে অনুসরণ করে বেঙ্গালোর যাত্রা করুক। পারমিতার শাশুড়ি ফোন করে পারোর মাকে বলেছে তার ইচ্ছা অন্তত প্রথমবার পারো যেন রাজার সঙ্গে যায়। কিন্তু পারমিতা কিছুতেই নিজের চাকরি ছেড়ে স্বামীর অনুগামী হয়ে বেঙ্গালোর যেতে রাজি হয়নি। পারমিতার মা মেডিকেল লিভ নিয়ে রাজার সঙ্গে বেঙ্গালোর পাড়ি দিতে বললে সে জানায়—

> ''আর চাকরি করা ছেলেদের বুঝি ছুটি নেওয়ার কোন দায় নেই।''[৪]

সংসারের সমস্ত ক্ষেত্রে চাকরি করা ছেলেরা ছুটি নিয়ে সংসারের কাজে আত্ম নিয়োগ করে না। কিন্তু চাকরিজীবী মেয়েদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম ঠিক উল্টো। রাজার মা-বাবা দুজনে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ছেলের বউয়ের চাকরির টাকা তারা হাতে ছোঁয় না। হয়তো এটা তাদের সংস্কার। কিংবা মানে লাগে। তাই পারমিতা চাকরির টাকা দিয়ে নানা রকম জিনিস পত্রে সংসার সাজিয়েছে। ছেলেদের চাকরির টাকা মান বৃদ্ধি করে কিন্তু সে পুত্রবধূ বলে তার টাকা নিতে মানহানি হয়! এটাই কি সংসারের নিয়ম?

মেয়েদের আজও সব সময় স্বামীর নির্দেশিত পথেই চলতে হবে এটাই অলিখিত নিয়ম। তাইতো রাজার ভাই রানা তার প্রেমিকা রঞ্জাবতীকে দেখাতে পারোকে নিয়ে গেলে রাজা বারণ করে দিয়েছে রানার প্রেমিকা নিয়ে পারমিতাকে মতামত দিতে— ''তুমি এসবে একদম থাকবে না।''[৫] রানা তার বৌদিকেই নিজের প্রেমের সাক্ষী করে বাবা-মায়ের সঙ্গে একটা রফা করার কথা বললে পারো কিন্তু না করতে পারেনি। এদিকে রাজার নিষেধ অমান্য করাও তার অসম্ভব। পারো ভাবছে সে নিজে কি করবে না করবে তা কি রাজা বেঙ্গালোর বসে ঠিক করে দিবে। রঞ্জাবতীকে দেখে পারমিতারও তাদের সংসারের উপযোগী মনে হয়নি। রঞ্জার পোশাক পরিচ্ছেদ তার শ্বশুর-শাশুড়ি মেনে নিতে পারবে না, এমনকি রানাদের বাড়ির কাড়ি কাড়ি বাসন মাজাও যে রঞ্জার সম্ভব নয় তা পারমিতা জানে। তবুও আবার পারমিতা ভাবে— ''মেয়ে তো, সংসার করতে গেলে কী না পারে।''[৬] পারো নিজেও যখন বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত এমনকি এখনও যখন ছাত্রদের পড়ায় ল্যাবরেটরিতে প্র্যাক্টিকাল করায় সেই পারমিতা কি এই পারমিতা যে কিনা সংসারের জন্য সব করতে পারে।

পারমিতার বাবা অসুস্থ, মেয়ে হয়েও পারমিতা চেষ্টা করছে যথাসাধ্য। প্রতিদিন নিজের কলেজ সেরে বাবাকে দেখতে যায়। চিকিৎসারও প্রয়োজন মতো ব্যবস্থা করেছে সে নিজেই। চিকিৎসা খরচাও চালাচ্ছে নিজের হাতে। এই টাকাটা যেন পারমিতার মা সুমিতা দেবী খুশি হয়ে নিতে পারছে না। কিন্তু কেন? পারমিতা যদি ছেলে হত তাহলে কি বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতো না। তখন কি তার মা এমন সংকোচবোধ করতো। শুধু পারোর মা নয়, শাশুড়িও যে তার বাবার পিছনে এত ছোটা খুব ভালোভাবে নেয়নি তা তার প্রশংসার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত— ''পারমিতা একদম ছেলের মতো করছে।''[৭] মানসী দেবী চান না তার ছেলের বউ প্রতিদিন তার পিতার জন্য ছুটে যাক। তাই প্রশংসা করেই যেন মনে করিয়ে দিয়েছে— যে পারমিতা ছেলে নয় মেয়ে। তাই তার প্রতিদিন বাবাকে দেখতে যাবার কোন দরকার নেই। কিন্তু মানসির মা সাধনা দেবী কিন্তু মেয়ের একথা মেনে নিতে পারেনি। তাই প্রতিবাদ করে মানসীকে বলেছে, পারমিতা যোগ্য কাজ করেছে সে যদি এমনটা করতে না পারতো সেটা মানসীর নিজের সমস্যা কিংবা অক্ষমতা। মেয়েকে বলেছে— ''তা বলে আমার নাত বউয়ের গলায় একটা ভুলভাল সার্টিফিকেট ঝোলাস কেন? মুখে কেন আসে না, ও সন্তানের যোগ্য কাজই করছে।''[৮] সাধনা দেবী সারা জীবন নিজের স্বাধীন মত বাঁচতে চেয়েছে। কোন দিন কারো উপর নির্ভরশীল হতে চাননি, তা তার কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন—''নারীজন্ম তো খালি আছাড় খাওয়ার জন্যই রে। একটু সোজা হয়ে হাঁটতে গেলেই ধপাস।''[৯] সাধনা দেবীও চেয়েছিলেন স্বাধীন ভাবে বাঁচতে কিন্তু পারেননি। তাকেও তার স্বামী নিজের সত্ত্বা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাঁচতে দেননি। এরকমই হাজার হাজার মানসীরা তাদের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে স্বামীর চাহিদাকেই জীবনের পথ হিসাবে বেছে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে আজও বাধ্য হচ্ছে।

পারমিতা মেয়ে তাই তাকে অবহেলিত হতে হয় প্রতি পদে পদে। পারেনি, শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে দিয়ে পারমিতা যেমন গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে যেতে পারেনি। তেমনি নারী বলেই কলেজেও তাকে সব সময় কথা শুনতে হয়েছে। সবাই যেন ভাবে তার ক্ষমতা নেই একজন পুরুষের মত করে নিজের বিভাগ পরিচালনা করার। তাইতো আমরা রাখাল নাথকে বলতে শুনি— ''ডক্টর বিশ্বাস ঠিক আপনাকে গাইড করে করে ডিপার্টমেন্ট চালিয়ে নেবেন।''[১০] একথা পারমিতার আঁতে ঘা দিয়েছে। পারমিতা কি এতই অযোগ্য যে তাকে প্রতিপদে ডক্টর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে হবে। শুধু মেয়ে বলেই তাকে এই কথাটা বলতে পেরেছেন রাখাল বাবু। কলেজে অতিথি অধ্যাপক নির্বাচনেও পারমিতার পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাতারের অসুস্থতা কারণে পারমিতা একদিন মিটিং-এ উপস্থিত না থাকায় অধ্যক্ষ স্বপন বিশ্বাস কথা শুনিয়েছেন তাকে— ''তুমি তো সেদিন মিটিং-এ ছিলে না। ছেলের অসুখ না কী যেন অজুহাতে ওইদিন ডুব মারলে।''[১১] অনেক পুরুষ অধ্যাপক অনেক দিনই উপস্থিত থাকতে পারেন না। তাও কিন্তু তাদের পারমিতার মত জবাবদিহি করতে হয় না।

পারমিতা রাজার একাকীত্ব দূর করতে ছুটি পেয়ে বেঙ্গালোর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হয়েছে। চাকরি ছেড়ে পারমিতা পাকাপাকি ভাবে রাজার কাছে চলে যেতে না পারলেও যতটুকু সুযোগ সে পেয়েছে রাজার কাছে থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সেই অভাব পূরণের। তাই আমরা দেখি বেঙ্গালোর এসে পারো শুধু রাজার শারীরিক ও মানসিক চাহিদাই পূরণ করেনি, ঘর পরিস্কার থেকে রান্না সব কাজই করেছে স্বামীর জন্য। রাজা অফিসে গেলে পারো নিজে হাতে তিন রকমের মাছ, মুরগি, আনাজপাতি কিনে এনেছে। রান্না করেছে রাজার পছন্দের সব আইটেম। রাজাই বলেছে— ''এ

তো আমার মাস খানেকের খোরাক।''[১২] এত কিছু করার পরও কি রাজা বুঝেছে পারোকে? একটু পরেই সৌম্যের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে রাজা তার মনের লুকিয়ে রাখা গোপন কথা গুলি প্রকাশ করে ফেলে। ছেলের স্কুলে ভর্তি নিয়ে পারোকে তির্যক আক্রমণ করে বলে— ''আমার ইচ্ছের যখন ভ্যালুই নেই, তখন আমার মতামতেই বা কী আসে যায়?''[১৩] শুধু তাই নয় রাজা যে এতদিন পারোকে চাকরি ছেড়ে তার সঙ্গে বেঙ্গালোর এসে থাকতে বলেনি এটা একটা অভিনয় ছাড়া কিছু নয়, তাও প্রকাশিত হয়েছে। মাল খেয়ে ক্ষণিকের উত্তেজনায় রাজার মুখোশ খুলে পড়েছে। নেশাতুর স্বরে রাজা বলেছে—

> ''শি ইজ ভেরি অ্যাডামেন্ট। নিজে যা চায়, সেখান থেকে একচুল নড়বে না।.....কলেজ দেখায় আমায়? কলেজ? হুঁহ। ওই কলেজের মাইনেটা আমি ওকে হাতখরচা দিতে পারি।''[১৪]

রাজার কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে গেছে সৌম্য ও তার স্ত্রী তানিয়া। মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করেছে পারমিতার। রাজার কাছে শুধু টাকাটাই সব। পারমিতারও যে একটা জীবন আছে নিজস্বতা আছে সেটা বোঝার চেষ্টা করেনি রাজা। শুধু টাকার জন্য পারমিতা অধ্যাপনা করে না তার নিজের ব্যক্তিত্বটাই প্রধান সেটা রাজাও বুঝলো না। একটু পরেই রাজা ক্ষমাও চেয়েছে পারোর কাছে। জানিয়েছে স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেও সৌম্যের মত করে বাঁচতে চায়। একা একা থাকা আর তার সম্ভব নয়। রাজা বলে—

> ''...সৌম্যদেরই তো কী চমৎকার হ্যাপি ফ্যামিলি... একা আমিই শুধু...রাজার গলাটা ভেজা ভেজা শোনাল, আমারও কি ইচ্ছা করে না, বলো?''[১৫]

এই করুণ আর্তি অবহেলা করা পারমিতার পক্ষেও যেন অসম্ভব। রাজার কাছে এসে পারমিতা ভেবেছিল না এলে বুঝি মহামূল্য কিছু হারাত, আর ফেরার পথে ভাবছে— ''এলেও যে কত কী হারায়!''[১৬]

পুজোর ছুটিতে উটি ঘুরতে যাওয়ার জন্য রাজা পারোকে বলেছিল কিন্তু পারো একটি কোর্স করবে বলে যেতে রাজি হয়নি সে বড়দিনের ছুটিতে এই ভ্রমণটা করতে বললে রাজা তার কথা রাখেনি। পারো যেতে না পারলেও বাবা-মা, পুত্রকে নিয়েই রাজা উটি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানসী পারোর না যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তাই পারো যখন মানসী দেবীর হাতে বিমানের টিকিত দিতে এসেছে তখন মানসী দেবী পারোকে তীব্র আঘাত হেনে জানিয়েছে— ''তোমার গোঁ থেকে তুমি তাহলে নড়লে না।''[১৭] মানসী আরও বলেছে— ''চাকরির বাহানা দেখিয়ে মেয়ে মানুষের এই ধরণের একগুঁয়েমি শোভা পায় না।''[১৮] একথা শোনার পর সবার একান্ত ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে পারো আর পারছিল না নিজের ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখতে। মানসী দেবীর কথায় পারোর হৃদয়ে বর্ষার বারিধারা বইতে থাকে মুষলধারে। সংসার জিনিসটা বড় আজব জায়গা, এখানে কোন মেঘই চিরস্থায়ী হয় না। সেই নিয়মেই পারমিতা ও তার শাশুড়ির মান-অভিমানও এক সময় স্বাভাবিক হয়ে গেল। পুজোর ছুটিতে পারমিতাকে রেখেই সবাই বেঙ্গালোর চলে গেল উটি ভ্রমণের জন্য। পারমিতা একা পড়ে রইল নিজের পদোন্নতির জন্য একটি কোর্স করতে কলকাতায়। কিন্তু মাঝপথে পিতার মৃত্যুতে পারোর এই কোর্সটি করা সম্ভব হল না। রাজারাও উটি ভ্রমণ ত্যাগ করে কলকাতা ফিরে এল শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষে রাজা আবার ফিরে যাচ্ছে বেঙ্গালোর। এবার পারোর জীবনে প্রকৃত সংকটময়তার সময় উপস্থিত। এতদিন তাও পারোর পিতার অসুস্থতার কথা ভেবে সবাই পারমিতার কলকাতায় থাকাটা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পারোর পিতার মৃত্যুর পর তার মাও চায় না পারমিতা রাজাকে ছেড়ে কলকাতায় পড়ে থাকুক। পারমিতা মায়ের অস্বাভাবিক আচরণের কথা বললে রাজা জানায়— ''আমি দেখতে চাইছিলাম পরবর্তী বাহানাটা এবার কীভাবে শুরু হয়।''[১৯]

বিবাহ বার্ষিকীতে রাজা পারমিতার জন্য ফুল পাঠিয়েছে সঙ্গে ছোট বার্তা 'মিসিং ইউ'। এই ছোট্ট কথাটিই যেন পারোকে বেঙ্গালোর ডেকে পাঠানোর জন্য যথেষ্ট। এই 'মিসিং ইউ' এর উত্তর পারো সারাদিন দিতে পারেনি। দিন শেষে পারমিতা উত্তর পাঠিয়েছে একই সুরে 'মিসিং ইউ'। এই বার্তার উত্তরে রাজা ফোন করে পারোকে জানিয়েছে সত্যিই যদি সে রাজাকে মিস্ করে তাহলে কলকাতায় পড়ে আছে কেন? দুজনে একই কথা পাঠিয়েছিল কিন্তু রাজা কেন বুঝলো না পারো রাজাকে কাছে চাইছে। 'মিসিং ইউ' বার্তা দেখে পারোর মনে হয়েছিল রাজা তাকে ডাকছে কিন্তু একই শব্দ পাঠ করে রাজার মনে হল না কেন— ''পারমিতাও তাকে চাইছে কাছে? এবং মিসিং ইউয়ের সমাধান যেন পারমিতারই যাওয়া রাজার চলে আসা নয়?''[২০] পরস্পরের প্রতি একই আহ্বান ভিন্ন অর্থ তৈরী করছে। এটাই সমাজের নিয়ম। আজও তাই স্ত্রীকেই তার ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে হতে হচ্ছে স্বামীর অনুগামী। তবুও নারীরা পারে না

সম্পর্কের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে পারমিতাও শেষ পর্যন্ত পারেনি। তাই সে ভাবছে— ''ভালোবাসারও তো একটা সাজা আছে। সেটা পেতে হবে বই কী।''[২১] শেষ পর্যন্ত পারমিতাও নিজের ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করতে অক্ষম হয়েছে। তাই ভালোবাসার শাস্তি হিসাবে অর্ধেক আকাশটাকেই জীবনের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে।

কথাশেষ:

এই উপন্যাসে শুধু পারমিতা একা নয় প্রতিটি নারী চরিত্রকেই পুরুষের অনুগামী হয়ে চলতে বাধ্য হতে হয়েছে। রানার প্রেমিকা রঞ্জাবতী আধুনিকা জেনেও রানা তাকে ভালোবেসেছিল কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ আসতেই টার্মস দিয়েছে— ''আমি ফ্যামিলির সঙ্গে থাকব। ওকে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হবে।''[২২] রানা পারোকে একথা জানিয়েছে। রঞ্জাবতী রানার কথায় রাজি না হলে খুব সহজেই তাকে ভুলে গেছে রানা। আমরা দেখি রাজার দিদা বরের কথা অমান্য করে কলেজে পড়তে গিয়েছিল। স্বামীর কথা অমান্য করার শাস্তি তাকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে— ''পাঁচ বছরে তিন বার গর্ভধারণ করিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল সেই বর।''[২৩] পারমিতার কাজের মেয়ে সরস্বতী মাত্র পঁচিশ বছর বয়স। দুটি সন্তানের মা। স্বামী অকর্মা, মাতাল। যা কাজ করে তাও মদ, চোলাই আর মোবাইলেই শেষ হয়। দুই সন্তান ও স্বামীর মুখে খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব এই সরস্বতীরই। তবুও এই সরস্বতীকেও স্বামীর কথা মতই চলতে হয়। সেও পারে না সম্পর্কের বন্ধন ছিড়ে দিতে তাই সরস্বতী অপারেশন হতে চাইলে তার স্বামী জানায়—''ওতে নাকি মেয়ে মানুষের শরীরের ক্ষতি হয়। জোশ কমে যায়।''[২৪] স্বামীর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিণতি হিসাবে আরও একটি সন্তান এসেছে তার পেটে। পারোর বান্ধবীর দিদি এনাক্ষী বরের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েও আজ বরের চেয়ে ছোট ডাক্তার। সংসার ধর্ম পালন করতে গিয়ে বরের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে সে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে বরের অনুগামিতা মেনে নিয়েছে। তাই তাকে বলতে শুনি— ''বউয়ের হাইট বরের চেয়ে সর্বদা খানিকটা কম থাকে। সমান হয়ে গেলেই তো মুশকিল, তাই না?''[২৫] এই নিয়মকে মেনেই তার বড় ডাক্তার হয়ে ওঠা হয়নি। আমরা দেখি পারমিতার কলেজের অধ্যাপিকা শর্বরীকে। সে যখন স্কুল ছেড়ে কলেজের চাকরি পেয়ে কলেজে যোগ দিতে চেয়েছে, তখন তার স্বামী মেনে নিতে পারেনি। তাই শর্বরী যখন চাকরিতে যোগ দিয়ে বরকে বারাসাতে বাড়ি ভাড়া থাকতে বলেছে স্বাভাবিক ভাবেই তার স্বামী রাজি হয়নি। শর্বরীর কথায়— ''একেই স্কুল টিচারের অধ্যাপিকা বউ, তাতেই তার মান খোওয়া গেছে।''[২৬] তারপর আবার স্ত্রীর জন্য বাড়ি ভাড়া করে থাকবে এটা যেন কোন স্বামীর পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব না। শর্বরী মেয়েকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভাড়া থেকে কলেজ করেছে। কিন্তু স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেনি, সুখীও হতে পারেনি জীবনে।

এই উপন্যাসের প্রতিটি নারী চরিত্র তাদের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পড়েছে নারীত্বের সংকটে। সরস্বতী থেকে শুরু করে শর্বরী, রঞ্জা ও পারো সকলেই। প্রত্যেকটি নারীকে দেখি নিজের জীবনে অর্ধেকটা আকাশ নিয়ে বেঁচে থাকতে। পারমিতা একটি কলেজ অধ্যাপিকা হয়েও নিজের ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখতে পারেনি। স্বামীর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের জীবনে অর্ধেকটা আকাশই আপন করে নিয়েছে। আজও আমাদের সমাজ নারীদের প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারেনি, দিতে পারেনি কর্মজীবি নারীদের প্রকৃত সম্মান। লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যও নারীর নিজস্ব পরিসরের উপস্থাপনায় তিনি নারীর একাকীত্ব, যন্ত্রণার ছবি অঙ্কন করেছেন ঠিকই তবে পিতৃতন্ত্রের প্রতাপমুক্ত ভুবনকে তার হাতে তুলে দিতে পারেননি। সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তার তলদেশ অবধি গভীর অনুসন্ধান করেননি। সেই চিত্রই অর্ধেক আকাশ উপন্যাসে প্রতিভাত। এই উপন্যাস পড়ার পর হয়ত পাঠকদের কর্মজীবী নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতেও পারে। আর তা যদি সম্ভব হয় তবেই আমরা নারীবাদী না হয়ে মানবতাবাদী হয়ে উঠতে পারবো— এখানেই উপন্যাসটির সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১. সুচিত্রাকে মনে করে, কথানদী সুচিত্রা, পৃ. ৩৪।
২. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা। অর্ধেক আকাশ। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ-জানুয়ারি ২০১২, তৃতীয় মুদ্রণ-আগস্ট ২০১৪, পৃ. ১৩।
৩. তদেব, পৃ. ১৮।
৪. তদেব, পৃ. ১৯।

৫. তদেব, পৃ. ৬০।
৬. তদেব, পৃ. ৬৫।
৭. তদেব, পৃ. ৭১।
৮. তদেব, পৃ. ৭১।
৯. তদেব, পৃ. ৭৬।
১০. তদেব, পৃ. ৮৩।
১১. তদেব, পৃ. ৮৮।
১২. তদেব, পৃ. ১১৬।
১৩. তদেব, পৃ. ১১৯।
১৪. তদেব, পৃ. ১২০।
১৫. তদেব, পৃ. ১২১।
১৬. তদেব, পৃ. ১২১।
১৭. তদেব, পৃ. ১৩৪।
১৮. তদেব, পৃ. ১৩৫।
১৯. তদেব, পৃ. ১৫৯।
২০. তদেব, পৃ. ১৫৯।
২১. তদেব, পৃ. ১৬৭।
২২. তদেব, পৃ. ৯৮।
২৩. তদেব, পৃ. ৭৬।
২৪. তদেব, পৃ. ৭৮।
২৫. তদেব, পৃ. ১০১।
২৬. তদেব, পৃ. ১২৫।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। প্রথম প্রকাশ-১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, সপ্তম সংস্করণ- ১৯৮৪।
২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের প্রতিমা। প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল ১৯৭৪, পঞ্চম সংস্করণ-ফেব্রুয়ারী, ২০১৪।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, কুনাল (সম্পাদক)। কথানদী সুচিত্রা (সুচিত্রা স্মারক গ্রন্থ) । পত্রভারতী, জানুয়ারি, ২০১৬ ।
৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর। নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে। পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি, ২০০৭।
৫. রায়, বিকাশ ও রায়চৌধুরী, অর্পিতা বর্মন। বিপ্লব: সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কথাজগৎ। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, জুন, ২০১৮।
৬. ভট্টাচার্য, তপোধীর। উপন্যাসের বিনির্মাণ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দীপাবলি, ২০১০।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 269-274
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.230

কল্লোল লাহিড়ীর ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’: নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আখ্যান

ড. আনিসুর রহমান, *সহকারী অধ্যাপক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Kallol Lahiri has given a deep understanding of the relationship between the oppressor and the oppressed class[1]and the position of women in the Indian social system. Therefore, the narrative world of her novel has brought up the life of the people living in the inner circle of society[2], the complexity of time and the struggle of women in the patriarchal[3]social system. The novel 'Indubala Bhater Hotel' is not limited to the kitchen and food, the partition of 1947[4], the great liberation war of Bangladesh and the Naxalbari movement[5] in West Bengal have also been consciously highlighted in the narrative world of the novel under discussion. Along with this, the story of women's self-reliance[6]and struggle has emerged through the character of Indubala. The way she struggled for herself and her family despite thousands of adversities in society is a source of inspiration for women today.

Keywords: Oppressor and the oppressed Class, Inner circle of society, Patriarchal Society, The partition of 1947, Naxalbari movement, Women's self-reliance

বাংলা সাহিত্যের একজন অনালোকিত এবং অনালোচিত লেখক কল্লোল লাহিড়ী। ‘গোরা নকশাল’ (২০১৭), ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’ (২০২০), ‘নাইনটিন নাইনটি আ লাভ স্টোরি’ (২০২২), ‘ঘুমিয়ে পড়ার আগে’ (২০২৪) ইত্যাদি উপন্যাসের স্রষ্টা কল্লোল লাহিড়ী শোষক-শোষিত শ্রেণির সম্পর্ককে, ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থানকে মর্ম দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের কথনবিশ্বে সমাজের অন্তেবাসী মানুষের জীবন, সময়ের জটিলতা এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর আত্মসংগ্রামের কথা উঠে এসেছে। সমালোচক বলেছেন,

> “উপনিবেশোত্তর সমাজেও সৃষ্টি ও মনন যেসব বুদ্ধিজীবির নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাদের চিত্তবৃত্তি উপনিবেশিকৃত হলে অটুট থেকে যায় আধিপত্যপ্রবণ প্রতিবেদন গড়ে তোলার অভ্যাস। চতুর ও সচেতন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এবং বহু বিভাজিত সমাজের অন্তর্বৃত্ত দুর্বলতার সুযোগে যে কেন্দ্রীকৃত মহাসন্দর্ভ অজস্র গুল্মমূল ছড়িয়ে দিয়েছিল তাকে পরাভূত না করা পর্যন্ত উপনিবেশোত্তর সমাজে কোনো যথার্থ নতুন সংস্কৃতি, সাহিত্য কিংবা জীবনবোধের সূত্রপাত হতে পারে না। গড়ে উঠতে পারে না কোনো নতুন প্রতিবেদন।”[১]

কল্লোল লাহিড়ী যেন সেই নতুন জীবনবোধেরই স্রষ্টা। কেননা তাঁর কথনবিশ্বের অন্দরমহলে প্রবেশ করলেই বোঝা যায় যে, অন্তেবাসী মানুষ, শোষিত নারী কোনো করুণার পাত্র নয়, বরং তারা অসহায়তার মধ্যেও অদম্যভাবে বেঁচে থাকার বলিষ্ঠ প্রতীক। ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’ কল্লোল লাহিড়ীর সেই পরিচয় বহনকারী একটি জনপ্রিয় আখ্যান। শুধুমাত্র রান্নাঘর আর খাবারেই আটকে থাকেনি ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলনকেও সচেতনভাবে তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসের

প্রতিবেদনে। সেইসঙ্গে ইন্দুবালা চরিত্রের মাধ্যমে নারীর আত্মনির্ভরশীলতা এবং সংগ্রামের গল্প উঠে এসেছে। সমাজের হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি নিজের ও পরিবারের জন্য যেভাবে সংগ্রাম করেছেন, তা আজকের নারীদের জন্য এক অনুপ্রেরণার উৎস।

গ্রামকেন্দ্রিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান ছিল অন্তঃপুরে। সেই বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত নারী পুরুষ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাদের শেখানো বুলিকেই নারীরা তাদের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছে। এমনকি অনেক প্রাচীন শাস্ত্রে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, নারী সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। খুব দুঃখের বিষয় যে, সমাজপতিদের চোখে নারী ঊনমানব হিসেবেই পরিগণিত হয়ে এসেছে এতদিন। কিন্তু নারী আজ নিজের ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণে সকল ক্ষেত্রে নিজ-পরিচয় দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছেন। নারী আজ আর শুধু অন্তঃপুরের পরিচারিকা নন, তিনি সংসারের হাল ধরার সর্বময় কর্ত্রীও বটে। আমাদের আলোচ্য কল্লোল লাহিড়ীর 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল' উপন্যাসের আখ্যানের প্রতিবেদনেও ধরা আছে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে ভাষা আন্দোলনে শহিদ পরিবারের মেয়ে ইন্দুবালার আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি।

আমরা জানি, প্রত্যেক নারীজীবনের দুই পর্ব। প্রথম পর্ব অতিবাহিত হয় পিতা-মাতার সংসারে আর দ্বিতীয় পর্ব অতিবাহিত হয় স্বামী-সন্তানের সংসারে। যারা ভালো কপাল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন তারা দুই পর্বেই সুখী জীবন অতিবাহিত করেন, আর যাদের কপালপোড়া তাদের দুই পর্বই কাটে চোখের জল ফেলে। আমাদের ইন্দুবালা মন্দ ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল বলে তার জীবনের দুই পর্ব-ই কেটেছিল অশেষ দুঃখে। কিন্তু দুঃখে তিনি ভেঙে পড়েননি। শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে জীবনযুদ্ধে শামিল হয়েছেন। মানুষের মতো মানুষ করেছেন তিন সন্তানকে; সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছেন আরও অনেক মানুষকে।

আমরা ইন্দুবালার জীবনসমুদ্রে ডুব দিতে গিয়ে দেখি, ওপারের খুলনার কলাপোতার মেয়ে ইন্দুবালার বিবাহিত জীবন খুব একটা সুখের ছিল না। যে পাত্রের পরিচয় করানো হয়েছিল 'মাস্টার' বলে আদতে সেই রতনলাল মল্লিক ওরফে ইন্দুবালার স্বামী তাস, পাসা এবং জুয়া খেলার মাস্টার। প্রথম বউ মারা মারা যাবার এক বছরের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে বলে সব কিছু লুকিয়ে রেখেছিল শ্বশুরবাড়ি। তাই কোনো আয়োজনের ব্যবস্থা হয়নি শ্বশুরবাড়িতে। বাঙালি ঘরের বিয়েতে বধূবরণের যেসব আচার আছে তার একটাও অনুষ্ঠিত হতে দেখিনি আমরা ইন্দুবালার বিয়েতে,

> "কিন্তু এদিকে সত্যিই কোনো অনুষ্ঠান ছিল না। কোনো লোকজন আসেনি। সানাই বাজেনি। একটা ন্যাড়া বাড়ি দেখে বাবার শুধু চোখ উজিয়ে জল এসেছিল। বাড়ির বাইরে থেকে মেয়েকে বিদায় জানিয়ে ভাইয়ের হাত ধরে তক্ষুনি ফিরে গিয়েছিল দেশে।"[২]

কপোতাক্ষের গাঁয়ের মেয়ে যখন ভাগীরথীর পাড়ে এসে প্রথম পা দিল তখন কেউ শাঁখ বাজাল না। এমনকি কালো পাথরের থালায় দুধে আলতা মিশিয়ে কেউ পা ছোঁয়াতে বলল না। এমন বিবাহের আয়োজন দেখে ইন্দুবালারও ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে চলে যেতে গাঁয়ে। কিন্তু যেতে পারেনি। আসলে বাঁধা পড়েছিলেন নতুন সংসারে। নারীদেহলোভী স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা না থাকলেও শাশুড়ির প্রতি ছিল অগাধ নিষ্ঠা এবং ভক্তি। তাই এমন মন কেমনের দিনে ইন্দুবালা নিজেকে নিয়োজিত করেছিল শাশুড়ির সেবায়।

অন্যদিকে আস্তে আস্তে ইন্দুবালার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসে স্বামীর আসল চেহারা। বুঝতে পারে স্বামীর কাছে তার মূল্য অর্থ ও দেহের বিনিময়ে। আসলে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায়,

> "নারী একক একব্যক্তি হিসেবে, পৃথক একটি মানুষ হিসেবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনযাপন করবার আধিকার অর্জন করেনি। তার জন্ম কারো 'বংশরক্ষা' করেনা। নারীর জন্ম কোনো উপার্জনের উৎস নয়। নারী কেবল পুরুষের লালসা নিবারণ করবে এবং তাকে পুত্র সন্তান উপহার দেবে।"[৩]

তার স্বামী অষ্টপ্রহর ডুবে থাকত নেশায়। দোজবরে মাতাল এক পুরুষের সঙ্গ ইন্দুবালাকে অষ্টপ্রহর কষ্ট দিয়ে যেত। কেবল ফি রাতে দ্রুত সহবাস ছাড়া স্বামী সোহাগ কাকে বলে ইন্দুবালা তা জানতে পারেনি,

> "প্রথম রাতে তাই সোহাগ উঠেছিল তার দিক থেকে মাত্রা ছাড়া। ইন্দুবালা এত সবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। যখন ঘাড়ের ওপর ওই দশাসই চেহারা চেপে বসে একটু একটু করে কৌমার্য শুষে নিচ্ছিল তাঁর, তখন একেবারের জন্যেও মনিরুলকে মনে পড়েনি ইন্দুবালার। ব্যথায় চোখ বন্ধ

> করলে উঠোনের জোনাকি গুলোকে দেখতে পেয়েছিলেন স্পষ্ট। পুকুর পাড়ের কাঁচা মিঠের আম তার ডালপালা নেড়ে ফিসফিস করে বলেছিল "নিয়তি...ইন্দুবালা...নিয়তি...।"[৪]

যে পুরুষ স্ত্রীর অমতে নারীদেহ নিয়ে খেলা করে তার চরিত্র আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। আসলে মদের নেশা তার মানবিক বৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি হতে দেয়নি। রতনলালের জুয়া আর মদের নেশা ছিল আকাশছোঁয়া। স্বামীর মাতলামি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, ইন্দুবালা একে একে নিজের গয়না বিক্রি করে সংসার চালাতে গিয়ে নিজেকে অলংকারহীন করে ফেলেছিল। কিন্তু এমন জীবন ইন্দুবালা কোনোদিন চায়নি। আসলে নিয়তি তার সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই প্রতারণা করে গেছে। আর তাই তো দেখি, ইন্দুবালার বাল্যকালও খুব কষ্টের। পড়াশোনার ইচ্ছে থাকলেও মায়ের অমতের জন্য হাইস্কুলের গণ্ডি টপকাতে পারেনি ইন্দুবালা। মেয়েকে সুযোগ্য পাত্রের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত মা পালন করেন ব্রত আর বাবা মরিয়া হয়ে চিঠি লিখেন কলকাতায়,

> "ইন্দুবালা কলেজ যেতে চেয়েছিলেন। পড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোথা থেকে যে কী হলো! মনিরুলের সজল কালো চোখ দুটো বাঁধা থাকলো তাঁর অন্তরে। নক্সী কাঁথার মাঠের সাজুর মতো তাকে সব স্মৃতি উপড়ে নিয়ে চলে আসতে হলো এপারে। রূপাই থেকে গেল অনেক দিনের পুরোনো অতীত হয়ে।"[৫]

আমাদের সমাজে মানবিক সম্পর্কের চেয়ে ধর্মই বড়। ধর্মের বন্ধনে আমরা এমনভাবে বাঁধা পড়ে আছি যে, মানবিক সম্পর্কগুলোকে অত গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। আর তাইতো দেখি ভিন্ন ধর্মের মনিরুলের সঙ্গে ইন্দুবালার ভালোবাসার সম্পর্কও কোনো পরিণতি পায় না। ধর্মের কাছে মাথানত করে মানবিক সম্পর্ক,

> "এক মুসলমান ছেলের সাথে এক হিন্দু মেয়ের বিয়ে? এই গ্রামের কেউ হতে দেবে না। কোনোদিন না। ঠিক সেই সময়ে ঝোপ থেকে বুড়ো তক্ষকটা যেন বলে উঠছিল ঠিক ঠিক। এই নিস্তব্ধ রাত্রে পুকুরে জলের মধ্যে ঢেউ তুলে সেই কবে রিয়াজকে ভালোবাসতে গিয়ে মরে যাওয়া স্বর্ণলতা ভেসে উঠে বলেছিল "সাবধান ইন্দু...সাবধান...ওরা তোকে বাঁচতে দেবে না...।"[৬]

নিজের মনের রাগ-দুঃখ-অভিমান নিজের কাছেই রেখে দিয়ে ইন্দুবালা মল্লিক বাড়ির বউ হয়ে কলকাতায় চলে আসে। সেখানেও সে বড় একা। তাই কান্না পেলে সে মুখে রুমাল গুঁজে কান্না করেন। আর শাশুড়ি জল ভরা মেঘের দিকে তাকিয়ে ইন্দুবালার সংসারের মঙ্গল কামনা করেন।

মদের নেশা স্বামীর অকালে প্রাণ কেড়ে নিলে তিন সন্তান নিয়ে ইন্দুবালা বিধবা হন। স্বামীর জুয়া আর মদের নেশায় এতদিন যারা আট-কপাটি পর্যন্ত বিক্রি করার সায় দিয়েছিল আজ ইন্দুবালার বিপদের দিনে তাদের আর দেখা গেল না বড় একটা। আমরা জানি, বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র করার দাবি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়ে অসংখ্য মানুষ খান সেনাদের অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হয়। হাজার মায়ের কোল খালি হয়; ধর্ষিত হতে হয় অগুনতি নারীকে। আর সেই মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়েছিল আমাদের ইন্দুবালার পরিবারের আত্মীয়-স্বজনকেও। একদিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলনরত নিজ-পরিবার, আত্মীয়-স্বজনদের পাকিস্তানি খান সেনাদের হাতে মৃত্যুর ঘটনা অন্যদিকে স্বামী-শাশুড়িহীন সংসারে ইন্দুবালা বড় একা হয়ে পড়ে। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে ইন্দুবালা কাঁদেননি। আসলে কাঁদার মতো সময় ছিল তার, কিন্তু পরিস্থিতি ছিল না। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা যেদিন উড়ল সে দেশের মাটিতে, সেদিন এদেশের মাটিতে ইন্দুবালা ছেনু মিত্তির লেনের নীচের ঘরে উনুন ধরালেন। শুরু হল জীবনযুদ্ধের নতুন অধ্যায়। একদিকে পাওনাদারের দল অন্যদিকে ছেলে-মেয়েদের পেটের খিদের জ্বালা-এই উভয়মুখী সংকটে ইন্দুবালা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন ইন্দুবালার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন মাছ বিক্রেতা লছমী। তারই অনুপ্রেরণায় শুরু হল ইন্দুবালার ভাতের হোটেল,

> "লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে এক আনাও নেই যা দিয়ে তিনি তাঁর দোরে আসা লছমীকে মুড়ি কিনে খাওয়াতে পারেন। সাত-পাঁচ না ভেবে একটু কুণ্ঠা নিয়েই ইন্দুবালা লছমীর দেওয়া টাকাটা আঁচলে বাঁধলেন। উনুনে চাপালেন এক হাঁড়ি জল। ছোটো মেয়েকে দোতলার ঘরে ঘুম পাড়িয়ে এসে বড় ছেলে প্রদীপকে পাঠালেন সামনের মুদিখানার দোকানে। খিড়কির দরজা খুলে নিজে বাড়ির পেছনের বাগান থেকে নিয়ে এলেন সবে কচি পাতা আসা কুমড়ো শাক। গাছের পাকা লঙ্কা। শাশুড়ির

> আমলের পুরোনো ভারী শিলটা পাতলেন অনেক দিন পরে।...কয়লার আঁচে টগবগ আওয়াজে ফুটতে থাকলো কচি শাকগুলো। তার নরম পাতাগুলো।"[৭]

এই মহিলা যা-ই রান্না করে তা-ই যেন মুখে লেগে থাকে সারা জীবনের মতো। এভাবেই ইন্দুবালার হাতের সুস্বাদু রান্না খাওয়ার লোভে বাজারের সবাই এসে হাজির হয় তার নীচের ঘরে। এভাবেই আস্তে আস্তে নীচের ঘর হয়ে উঠল ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। একটা শহরে তিন ছেলেমেয়ে আর পুরোনো বাড়িতে নিজের শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ইন্দুবালা সমস্ত শোককে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে শুরু করে জীবনের একান্ত নিজস্ব লড়াই। আসলে কল্লোল লাহিড়ী বিশ্বাস করতেন যে,

> "ঈশ্বর, নারীকে যেমন শারীরিক শক্তিতে কিছু ঘাটতি, তেমন এক অপার সুধা, মূর্ছনা, মর্মবাণী, অফুরন্ত লোব্ররেণু, অধরা মাধুরী, আকুল পরান, আপ্লুত লাবণ্য দিয়েছেন। ...ঈশ্বর ইচ্ছে করে নারীর ছলায়, কলায়, মোহজাল, রং, রোশনাইয়ে এমন একটা প্রতিরোধ, যে মানুষ, ছিঁড়ে ঢুকতে পারে না। যাঁরা পারেন, তাঁরাই, ভুবনজয়ী। শুধু নারীকে মুঠো করতে পারলেই ভুবন নয়। নারীকে বুঝতে পারলেই, অমৃত। যাঁরা, যেসব মহাপুরুষ, দার্শনিক বলেছিলেন, নারী নরকের দ্বার, তাঁরা অসুস্থ।"[৮]

আর তাই তো আমরা দেখি যে, এই লড়াইয়ে তিনি মাঝপথে হাল ছেড়ে দেননি। তিন ছেলেমেয়েকে তিনি আগলে রেখেছিলেন কঠিন কঠোর শাসনে। কারণ তিনি জানতেন এই মল্লিক বাড়ির হাওয়া খারাপ। ছেলেমেয়েদের বিপথে যেতে বেশি সময় লাগবে না।

তাই তিনি তাদের নিজের বাড়িতেই পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন। একটু বড়ো হলে তাদের স্কুলে ভর্তি করেছেন। কিন্তু তিনি নিজের সব হারানোর শোক কখনও তাদের কাছে প্রকাশ করেনি। আর সন্তানেরাও তাদের মাকে কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি; দেখেছে শুধু মায়ের অমানুষিক পরিশ্রম এবং কর্তব্যপরায়ণ মাকে,

> "নিয়মিত ছেলেদের স্কুলে গিয়ে খোঁজখবর নিতেন ইন্দুবালা। ঠিক মতো পড়ছে কিনা।...স্কুলে ভর্তি করার অনেক আগেই বাড়িতে রেখেছিলেন পড়ানোর জন্য মাস্টার।"[৯]

এমনকি ছেলেমেয়েদের হাত ধরে শিখিয়েছেন হাতের কাজ-রান্নাবান্না, কাপড় কাচা, বাসন মাজা সবকিছু। জীবনের নানা চড়াই-উতরাই বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই ইন্দুবালাকে করে দিয়েছিল ক্ষতবিক্ষত। তাই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার সন্তানের ওপর এ বাড়ির পূর্বপুরুষের ছায়া কোনোদিন পড়তে দেবেন না। আর করেও দেখিয়েছেন। আদর-আহ্লাদে ছেলেমেয়েদের বড় করেননি ঠিকই কিন্তু তাদের প্রতি ভালোবাসা যে ছিল না এমনটা নয়,

> "ইন্দুবালার ভালোবাসা সেই ছোট্ট থেকে ছেলে মেয়েরা বুঝে গিয়েছিল অন্যরকম ভাবে। তাদের জন্য বড় বড় বয়ামে, কাচের শিশিতে, অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোয় ইন্দুবালা যত্ন করে কত কিছু যে খাবার করে রাখতেন। কোনটাতে নাড়ু, কোনটাতে মুড়ির মোয়া, চিড়ে ভাজা, কুচো নিমকি, গজা। আরও কত কী যে!"[১০]

ইন্দুবালা জানতেন একটাকে দাঁড় করাতে পারলে বাকিগুলো দাঁড়িয়ে যাবে সহজেই। আর হয়েছেও তাই।

ইন্দুবালার প্রত্যেক ছেলেমেয়ে আজ সেটেলমেন্ট। অন্যদিকে তিনিও শত বিপদকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজ-কর্মজগতে আপন প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। কালেক্টার অফিসের কেরানিকুল থেকে শুরু করে মেসবাড়ির ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ইন্দুবালার হাতের সুস্বাদু রান্না খাওয়ার জন্য পাগল,

> "যত খাটছিলেন ইন্দুবালা হোটেলকে নিয়ে, তত তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ছিল দিকে দিকে। এবেলার রান্না কোনদিন ওবেলা কাউকে খাওয়াননি তিনি। কোনো খাবার নষ্ট হতে দেননি কোনোদিন। বেঁচে যাওয়া খাবার কোথায় কোথায় যাবে তারও একটা নির্দিষ্ট ঠিকানা তৈরী করে ফেলেছিলেন। সেইসব মানুষগুলো আজও অনেক আশা নিয়ে বসে থাকে।"[১১]

আর ইন্দুবালাও ঠাকুরের আপ্ত বাক্য যা সারাজীবন মেনে চলেছেন, 'জীবে প্রেম'। হোটেল যবে থেকে শুরু হয়েছিল সেদিন থেকেই তিনি মানবসেবায় রত। প্রতিদিন প্রায় তিনশোজনের রান্না তিনি ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে একা হাতে করে গেছেন।

আমরা জানি, জল-স্থল অনুযায়ী মাছের-সবজির স্বাদ আলাদা হয়। মশলার পরিমাণের তারতম্য ঘটে। আর ইন্দুবালা সেটা জানতেন আরও ভালো করে। কেননা নারায়ণ সেবায় তিনি কোনো ত্রুটি রাখতে রাজি নন। নারায়ণ দু-মুঠো খেয়ে খুশি তো তিনিও খুশি,

> "কোথাকার কোন মাছ। কোন পুকুর, দিঘি, বিল সব ইন্দুবালার জানা চাই। না হলে রাঁধবেন কী করে? জল অনুযায়ী মাছের স্বাদ আলাদা হয় সবাই জানে সেটা। কিন্তু রান্না, সেটাও তো আলাদা হয়! শুধু কি তাই? কোথাকার বেগুন। কোথাকার লঙ্কা? কোথাকার ঢেঁড়শ জানা না থাকলে তাঁর রান্নায় মন বসে না। কুটনো কুটতে বসলে কড়াইতে ফোড়ন দিয়ে সেই ক্ষেতটাকেই যদি চোখের সামনে না দেখতে পান তাহলে রান্নায় মজা আসে না। স্বাদটাও।"[১২]

এভাবেই ইন্দুবালার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল বাসন্তীর গলদার, রিহান্দের রুই, বেলডাঙ্গার কাঁচা লঙ্কা, মেমারির কুমড়ো ইত্যাদির সঙ্গে। এসবের জন্য ছেনু মিত্তির লেনের ইন্দুবালা ভাতের হোটেলে ভিড় কোনোদিন কমে না একবেলার জন্যও,

> "শুধু যে মানুষটি আজ উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একজন শিল্পী। যিনি নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে উঠেছেন। তাঁর বুড়ো ডালপালাগুলো চারিদিক থেকে যেন শুষে নিচ্ছে তারুণ্যের আস্বাদ। যে স্বাদে রয়ে গেছে নতুন করে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা।"[১৩]

আর তাই তো সত্তর পেরিয়েও ইন্দুবালা ছেলেদের সংসারে নিজেকে থিতু করেনি। তিনি চাইলেই এই অমানুষিক পরিশ্রমের জগৎ ত্যাগ করে শেষ বয়সে ছেলেদের সংসারে সুখে দিন কাটাতে পারতেন। সন্তানরাও চেয়েছিল মা তাদের সংসারে এসে থাকুক। ইন্দুবালার বড়ো ছেলে প্রদীপ প্রথম চাকরি পেয়েই মাকে দিল্লিতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু না। আর কোনো ছেঁদো মায়ার বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে চাননি বলেই এই হোটেলের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রেখে নারায়ণের সেবা করে গেছেন। হোটেল যবে থেকে শুরু হয়েছিল সেই বছর পুজো থেকে বিজয়ার মিষ্টিও তৈরি করতে শুরু করেছিলেন ইন্দুবালা। ছেলেরা এসে ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে যেত সেসব আর তাদের পুজো উপলক্ষ্যে নতুন জামা কেনার, ঠাকুর দেখার ভালোবাসার গল্পের ভাগ দিয়ে যেত মাকে। কিন্তু ইন্দুবালার,

> "...কিছু ভাগ করার থাকে না। তিনি শুধু অফুরন্ত বিলিয়ে চলেন তাঁর স্মৃতি রান্নার এক পদ থেকে অন্য পদে। যারা বুঝতে পারে তারা একটু বেশি আনন্দ পায়। আর যারা খাবারের সাথে মজে থাকে তারা শুধু রসনায় মজা পায়। ভেতরের মানুষটার নয়।"[১৪]

আর অধিকাংশ মানুষ বলতে গেলে একমাত্র লছমী ছাড়া আর কেউ-ই ইন্দুবালাকে বুঝতে পারেনি। আর তাইতো ইন্দুবালার হাতের তৈরি কুমড়ো ফুলের বড়া, বিউলির ডাল, ছ্যাঁচড়া, আম তেল, মালপোয়া, চিংড়ির হলুদ গালা ঝোল, চন্দ্রপুলি, কচু বাটার রসনাই তৃপ্ত থেকেছে অধিকাংশ মানুষ। তার মনের কেউ হদিস পায়নি; এমনকি ছেলেরাও।

সবশেষে বলা যায় যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আধিপত্যবাদী পুরুষ কর্তৃত্বের চোখরাঙানিকে ইন্দুবালা নিজের জীবনের সঞ্জীবনী শক্তিতে পরিণত করে নারীজীবনের ধারাকে অন্য খাতে বইয়ে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি কখনই বিশ্বাস করতেন না যে, নারী সর্বদা পুরুষের আশ্রিত, পরাধীন। নারীর নিজস্ব কোনো প্রতিভা নেই, ঋষিত্ব নেই। তিনি বিশ্বাস করতেন অবমাননা-লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির দায়িত্ব নারীকে নিজেই নিতে হবে। তাইতো আমরা দেখি, ইন্দুবালা সামাজিক আর মানসিক চাপকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে অর্থাৎ তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া মর্যাদা না মেনে নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। নারীর স্বকীয়তায় বিশ্বাসী ইন্দুবালা আধুনিক নারীর মানসিক স্বাধীনতার অন্যতম নিদর্শন।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর। প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ১২৬।
২. লাহিড়ী, কল্লোল। ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। সুপ্রকাশ, ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৩৯।
৩. নাসরিন, তসলিমা। নির্বাচিত কলাম। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১৭।
৪. লাহিড়ী, কল্লোল। ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। সুপ্রকাশ, ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৪২।
৫. তদেব, পৃ. ৫০।

৬. তদেব, পৃ. ১৩০।
৭. তদেব, পৃ. ৯।
৮. চক্রবর্তী, কমল। সত্য-ব্রতী। অভিযান পাবলিশার্স, ১৪২৮, কলকাতা, পৃ. ৩৮।
৯. লাহিড়ী, কল্লোল। ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। সুপ্রকাশ, ২০২১, কলকাতা, পৃ. ১২১।
১০. তদেব, পৃ. ১২৪।
১১. তদেব, পৃ. ১৪১।
১২. তদেব, পৃ. ৯৪।
১৩. তদেব, পৃ. ৮৭।
১৪. তদেব, পৃ. ১৩৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর। প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ২০০৬।
২. লাহিড়ী, কল্লোল। ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। সুপ্রকাশ, কলকাতা, ২০২১।
৩. নাসরিন, তসলিমা। নির্বাচিত কলাম। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭।
৪. চক্রবর্তী, কমল। সত্য-ব্রতী। অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৮।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 275-280
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.206

নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প: দেশভাগ ও মানুষের স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান

ড. আজিমুদ্দিন মণ্ডল, *অতিথি অধ্যাপক, রানী ধন্য কুমারী কলেজ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Partition[1] devastated[2] the lives and livelihoods of the marginalized people[3] in society beyond measure. Independence[4] could not bring a new dawn for the uprooted. Contrary to the belief that freedom means the realization of all hopes, aspirations, and dreams, it instead brought clouds of despair in their lives. Those who had promised them a sweet life on the other side were the very ones whose hands committed atrocities[5], including the rape of the uprooted people's mothers, sisters and daughters. The stories of the pain and broken dreams caused by Partition have been brought to life by many renowned Bengali writers. Among them are Jyotirmoyee Devi (1894-1988), Ritwik Ghatak (1925-1976) and Debesh Roy (1936-2020). A glance at the narrative worlds of Jyotirmoyee Devi's 'Epar Ganga Opar Ganga', Ritwik Ghatak's 'Shfatikapatra' and Debesh Roy's 'Udvastu' stories reveal vivid images of the shattered dreams of the displaced people[6].

Keywords: Partition, Devastated, Marginalized people, Independence, Atrocities, Displaced people

দেশভাগ সমাজের অন্তেবাসী মানুষের জীবন-জীবিকাকে কতটা বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত করে তুলেছিল তার ইয়ত্তা নেই। দেশভাগের কারণে রাতারাতি লক্ষ লক্ষ মানুষ বাধ্য হয় আপন ভিটেমাটি ত্যাগ করে এক অজানা দেশে পাড়ি দিতে। ফলে বাস্তুচ্যুত হয়ে তারা আত্মিক সংকটের সম্মুখীন হয় এবং সেই সঙ্গে বদলে যায় তাদের সামাজিক পরিচয়। সমগ্র দেশবাসী-দেশনেতাদের চোখে তারা যেন হয়ে পড়ে এক ভিনগ্রহীর মানব। স্বাধীনতা মানেই সব আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের বাস্তবায়ন এমন ভাবনার বিপরীতে বরং তাদের জীবনে দেখা দেয় হতাশার মেঘ। স্বাধীনতা ছিন্নমূলদের জীবনে নিয়ে আসতে পারে না কোনো নতুন দিনের আলো। বরং যারা তাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল যে, ওপারে তোমাদের মধুর জীবন পড়ে আছে তাদেরই হাতে ধর্ষিত হতে হয় ছিন্নমূল মানবের মা-বোন ও বধূদের। সমালোচক যথার্থই বলেছেন,

> "ধর্মের ধুয়ো তুলে বাংলা ভাগ সম্পন্ন করে ক্ষমতার চাবি হাতে পেতেই খুলে গেল মুখোশ। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগ-কোনও পক্ষই আর লোক বিনিময়ের কথা উচ্চারণ করল না। তখন তাদের দেখে কে বলবে যে, ধর্ম নিয়ে সত্যি কোনও সমস্যা ছিল এবং স্বধর্মের মানুষের স্বার্থ রক্ষায় সত্যিই তারা চিন্তিত? শুধুমাত্র স্ব স্ব দেশে সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষিত হবে-এ রকম মৌখিক প্রতিশ্রুতি উভয় রাষ্ট্রের নেতাদের পক্ষ থেকে দেওয়া হল। সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের কাছে এ ভাবে স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে একটা প্রহসন ও পরিহাসে পরিণত করা হল।"[১]

এই সমস্ত কারণেই দেশভাগ সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের কাছে এক স্বপ্নভঙ্গের প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। দেশভাগজনিত কারণে ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনিকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের

অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিক। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮), ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) এবং দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০)।

জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮) বিশ শতকের একজন লেখিকা। তিনি নারীবাদী লেখিকা হিসেবেই আমাদের কাছে পরিচিত। 'ছায়াপথ' (১৯৩৪), 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' (১৯৪৮), 'মনের অগোচরে' (১৯৫২), 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' (১৯৬৮) প্রভৃতি উপন্যাসে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীর অন্তঃস্বরের অন্বেষণ করেছেন। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীরা যে আজন্মকাল ধরে শোষিত হয়ে আসছে সেই চিত্র তিনি সচক্ষে দেখেছেন। 'নারীর কথা' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

> "যাঁরা কখনও নিজের সামান্য অভাব ত্রুটির কথাটাও মুখে বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন, যাঁরা সমাজের উৎপীড়ন অত্যাচারকে বিধাতার আশীর্বাদের মতো মাথা পেতে নেন, নিজেদের মানসিক, শারীরিক কোনো কষ্টই গ্রাহ্য করেন না, তবু আপনাদেরই বাপ, আপনাদেরই কোলে করে মানুষ করা ভাই, পতিদেবতা (হোন বা না হোন) আপনাদেরই বুকের স্নেহধারা দিয়ে লালিত পুত্র সকলের কাছেই উৎপীড়িত হন না কি?"[২]

এই উৎপীড়িতদেরই অন্তঃস্বর তাঁর সাহিত্যের বিষয় হয়ে দেখা দেয়। তবে তিনি জানতেন যে, আমাদের সমাজব্যবস্থায় যে নারীরাই শুধু উৎপীড়িত তা নয়, পাশাপাশি সমাজের অন্তেবাসীরাও সমানভাবে উৎপীড়িত-শোষিত। তাদের কথাও তিনি সমানভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে।

ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) বিশ শতকের আরও একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক। নাটকের পাশাপাশি তিনি ছোটোগল্প রচনার ক্ষেত্রেও সিদ্ধহস্ত। ঋত্বিক ঘটকের জীবনদর্শন গভীরভাবে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকায় তাঁর সাহিত্যে নিপীড়িত-শোষিত মানুষের সংগ্রাম এবং তাদের প্রতি অবিচারকে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেছেন,

> "সব শিল্পই শেষে গিয়ে পৌঁছয় কবিতাতে। এবং সে কবিতা হয় মেহনতি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ঘামে ভেজা কবিতা। এ ছাড়া কোনো শিল্পের শেষ অবধি টেকার কোনো ব্যাপার থাকে না, কোনোদিন থাকেনি। বলতে দুঃখ হচ্ছে যে এই পোড়া বাংলা দেশে এইসব বহু পুরাতন কথা আজ আমাকেই আবার বলতে হচ্ছে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে-এই কথাগুলো আজ আবার বেশ চেঁচিয়ে বলা দরকার।"[৩]

শোষক শ্রেণির পক্ষ নিয়ে কথা বলা বিশ শতকের অন্যতম সাহিত্যিক হলেন ঋত্বিক ঘটক।

বিশ শতকের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০) অন্তেবাসী মানুষের অমানুষিক শ্রম ও শোষণের স্বরূপটিকে তাঁর কথাসাহিত্যের প্রতিবেদনে তুলে ধরেছেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই ভূমিহীন কৃষক, দিনমজুর এবং দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামীণ মানুষের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। স্বভাবতই ভূমিহীন মানুষের কথা, কৃষকের কথাই তাঁর কথাসাহিত্যের সম্বল হয়ে উঠতে দেখা যায়। সমালোচক বলেছেন,

> "...দেবেশ বিপুল অভিনিবেশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের গঞ্জগ্রাম ও তার ব্রাত্য জীবনকে প্রতীকায়িত করে তুলেছেন। হাটের চালাঘরগুলিকে ঘিরে-থাকা বহুমাত্রিক অন্ধকার তাই তাঁর আখ্যানে আলাদা গুরুত্ব পায়।"[৪]

যাদের শ্রমের ওপর আমাদের সমাজব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে তাদের চাপা পড়ে থাকা জীবনের কথাকেই কথাসাহিত্যের বিষয় করে তুলে ধরেছেন সাহিত্যিক দেবেশ রায়। সেইসঙ্গে আমাদের নির্বাচিত তিন সাহিত্যিকের কথনবিশ্বে চোখ রাখলেই দেখা মিলবে ছিন্নমূল মানুষের স্বপ্নভঙ্গের চিত্র।

প্রথমেই জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' গল্পের কথনবিশ্বে প্রবেশ করা যাক। দেশভাগ মানবজীবনকে কতটা অসহায় করে তুলেছিল তার বলিষ্ঠ উদাহরণ আলোচ্য গল্পটি। দেশভাগ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান শিখা তখনও পুরোপুরি নিভিয়ে যায়নি। একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মানুষ তখনও সম্প্রীতির ঊর্ধ্বে সাম্প্রদায়িকতাকে মনের মধ্যে লালনপালন করতে থাকে এবং ভিনধর্মের মানুষ দেখলেই তারা রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে বিন্দুমাত্র পিছপা হয় না। এহেন অবস্থায় যারা হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার চিন্তাভাবনায় মশগুল ছিল তারাও বাধ্য হয়

জন্মভূমি ত্যাগ করে অচেনা-অজানা কলকাতায় পাড়ি দিতে। ধনরত্ন নয়, নারীরা তাদের মান, পুরুষেরা তাদের জান বাঁচানোর তাগিদেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। এই বাস্তুত্যাগীদেরই স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনিকে কেন্দ্র করে আলোচ্য গল্পটি গড়ে উঠেছে।

সুদাম ঋষি ও তার স্ত্রী দুর্গা পঞ্চাশ-ষাট জনের একটি দলের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে দেশের মায়া ত্যাগ করে কলকাতার উদ্দেশে পাড়ি দেয় নিজেদের মান-প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা তাদের তাড়া করলেও তারা নিরুপায়। প্রাণ থাকলে আবার সবকিছু গড়ে নেওয়া যাবে মনের মধ্যে কেবলমাত্র এই স্বপ্নকেই বাঁচিয়ে রেখে এই অর্ধমৃত মানুষগুলি বর্ডারের কাছাকাছি এসে পৌঁছায়,

> "জানে দেশ গেছে। স্বজন নেই। মাটি নেই। ধন নেই। অর্থ নেই। নিঃসম্বল নিঃস্ব। তবু এক ধর্মের এক জাতের মানুষ তো আছে। শেয়াল কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেবে না। প্রাণ মান নিয়ে টানাটানি করবে না।"[৫]

এই দুঃসময়ে যেসব তথাকথিত দেশনেতারা এই নিঃসহায় মানুষগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন তারাও কোথায় যেন হারিয়ে যায়। অন্যদিকে চোরাচালানকারীরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক বিরাট অঙ্কের মুনাফা লুটতে ব্যস্ত থাকে। এহেন অবস্থায় এইসব বাস্তুত্যাগী মানুষগুলির দুর্ভোগের আর সীমা থাকে না। সীমান্তে পৌঁছে তারা জানতে পারে পাসপোর্টহীন মানুষ ওপারে যেতে পারবে না। যাদের সামর্থ্য ছিল তারা অনায়াসেই সীমানা ত্যাগ করে কলকাতায় পাড়ি জমায়। পড়ে থাকে শুধু সুদাম আর তার স্ত্রী দুর্গা। সুদামের স্ত্রী দুর্গা বিশ-বাইশ বছরের সুশ্রী একজন নারী, জাতে মুচি। সকলের চোখ পড়ে তার উপর। সুদাম মাত্র পাঁচটাকাকে সম্বল করে দেশ ছাড়ে। আর দালালের দল তাদের ওপারে নিয়ে যাওয়ার জন্য পঁচিশ টাকা চায়। কিন্তু এটা ছিল তাদের ছল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দুর্গাকে ভোগ করা।

দুর্গার দাদা কলকাতায় থাকে। সেখানে গেলে হয়তো কিছু টাকার ব্যবস্থা হতে পারে এই ভেবে সুদাম তার স্ত্রী দুর্গাকে বর্ডার লাগোয়া এক স্টেশনমাস্টারের কাছে রেখে চলে যায় কলকাতায়,

> "আমি যাবো আর আসবো। ওকে আপনার পোলাপান মনে করবেন। ও যা হয় ক'রে একটু ফুটিয়ে নেবে ওর "মায়ের" কাছে-আপনার বিবিসাহেবের কাছে। চিড়েমুড়ি খাবে। সঙ্গে আছে। দু-তিন দিন বই তো নয়। মা-জানের কাছে থাকবে।"[৬]

সুদামের দুর্দশা দেখে মাস্টারমশাই দুর্গাকে নিজের কাছে রেখে দেয়। আর দুর্বৃত্তরা এই সুযোগেই তো ছিল। এদিকে সুদাম দুইদিনের নাম করে কলকাতায় গেলেও দশদিনের মাথায়ও ফিরে আসতে পারে না। স্টেশনের কুলির দৌরাত্ম্য দিন দিন বাড়তেই থাকে। অবশেষে একুশ দিনের মাথায় সুদাম ফিরে আসে। ততদিনে সব শেষ। মাস্টারমশাই সত্য গোপন করে সুদামকে জানায় তার স্ত্রী দুর্গা জলে ডুবে মারা গেছে। কিন্তু সুদাম কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না এমন কথা। সে বারবার ফিরে আসে মাস্টারমশাইয়ের কাছে এবং বলে,

> "মা-জান, আমি মোছলমান হবো। তাহ'লেই তো ওরা আমাকে তারে ফিরে দিবে। তুমি তাদের তাই বলো গো। মোছলমানরা তো মোছলমানের বৌরে ঘরে রাখবে না। ফিরিয়ে দেবে। মা-জান, তুমি আমার মা, সাহেবেরে বুঝায়ে বলো। সে মরেনি। সে আমারে শিগগির আসবার জন্যি বলেছিল।"[৭]

কিন্তু তার এই কাতর অনুনয়-বিনয় এবং কলকাতা থেকে প্রাণ বাজি রেখে পঁচিশ টাকা নিয়ে আসা সবকিছুই বিফলে যায়। সে তার স্ত্রী দুর্গাকে আর ফিরে পায় না। আসলে,

> "নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, যুদ্ধ ও দেশভাগের আবশ্যিক শর্ত বলেই ধরা হয়। কারণ, নারী তো রাষ্ট্রসম্পদ। ধর্ষণের অত্যাচারের পরও যারা বেঁচে থাকে এবং বাধ্য হয় অবাঞ্ছিত গর্ভধারণে, সেই সংখ্যার হিসাব পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এছাড়াও গণনার বাইরে আছে সেই সব নারী, যারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।"[৮]

দুর্গাও হয়তো দুর্বৃত্তদের অত্যাচার-অনাচার সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয় আত্মহত্যা করতে। হারিয়ে যায় দুর্গা। সেইসঙ্গে হারিয়ে যায় সুদামের বাঁচার স্বপ্ন। এইভাবেই জ্যোতির্ময়ী দেবী দেশভাগজনিত কারণে এক হতদরিদ্র্য পরিবারের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনিকে তাঁর অমর সৃষ্টি 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' নামক ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন।

ঋত্বিক ঘটকের 'স্ফটিকপাত্র' এই ধারারই আর একটি ছোটোগল্প। দেশভাগের কারণে বাস্তুহারা শরণাগতদের রিফিউজি ক্যাম্পে যে সীমাহীন-অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল তারই মর্মন্তুদ কাহিনিকে কেন্দ্র করে আলোচ্য গল্পের কথনবিশ্ব গড়ে উঠেছে। দিল্লির কিছু দূরবর্তী এক রিফিউজি ক্যাম্পের চিত্র আলোচ্য গল্পে উঠে এসেছে। গল্পকার গল্পের শুরুতেই আমাদের জানিয়েছেন যে,

> "একটা মাঠের মধ্যে নতুন খাড়া-করা ছাউনি, বাস্তুহারাদের বস্তি। ঘর থেকে ঘরে সরে গিয়ে একই দৃশ্য দেখতে থাকলাম, জীবনধারণের প্রত্যেকটা জিনিশই মনে পড়ে তাদের অভাবের দরুণ। বীভৎস উলঙ্গ অভাব। নোংরা ছিন্ন কাপড়চোপড় আর কালিমাময় মুখচোখ। এই জানুয়ারি মাসে শীতে ঐ ছাউনিতে হিম আটকায় কতখানি, সেটা গবেষণার বিষয়।"[৯]

দেশভাগের যারা বলি তাদের করুণ চিত্র এর থেকে আর কী হতে পারে! অর্থলোভী-পিশাচরূপী দেশনেতারা বাস্তুত্যাগীদের দু-মুঠো দু-বেলা ঠিকমতো খাবারের ব্যবস্থা তো দূরের কথা, ন্যূনতম চিকিৎসারও যে ব্যবস্থা করতে পারেনি তা এই ক্যাম্পবাসীদের কাহিনিই প্রমাণ করে। তাই তো আমরা দেখি যে, দেশে যখন কলেরার প্রকোপ দেখা দেয় তখন অনেক ক্যাম্পবাসী দুধের শিশু বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। তেমনই এক সন্তানহারা মায়ের করুণ কাহিনি গল্পকার আমাদের শুনিয়েছেন। যে নারী দেশভাগজনিত কারণে শ্লীলতা আর পুত্র নিয়ে পঞ্চনদ অতিক্রম করে এদেশে পাড়ি দেয় সে নিজের বুকের সন্তানকে হারিয়েও একটি কম্বল নিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে যায়,

> "পুত্র এবং সে বোধহয় কাল রাত পর্যন্ত ঐ এক জিনিশেই শীত নিবারণ করেছে। কাজেই নিজের পরিচয় দিলে ও-কম্বল এবং কাপড় কলেরার বীজসংক্রান্ত বলে কেড়ে নিত ওরা।"[১০]

গল্পের চমক এখানেই লুক্কায়িত। পুত্রের শোকে শোকাকুল-বিহ্বল জননীর কাছেও জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায় একটি সাধারণ কম্বল। আসলে জীবন যখন কেবল অস্তিত্ব রক্ষার কঠোর সংগ্রামে পরিণত হয় তখন রক্তের সম্পর্কের চেয়ে বস্তুগত প্রয়োজন যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই বিষয়টিকে এখানে সুকৌশলে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। সেইসঙ্গে তুলে ধরেছেন বাস্তুত্যাগীদের বিপর্যয়ের চিত্রও।

গল্পের পরবর্তী অংশে দেখি আর এক হতাশার চিত্র। এক বৃদ্ধকে এই স্বপ্ন দেখিয়েই দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় যে, ওপারে গেলে তুমি তোমার জাতভাইদের ফিরে পাবে, সেসঙ্গে ফিরে পাবে তোমার সম্পত্তি। বৃদ্ধের সম্পত্তির তালিকায় ছিল একটি খাটিয়া, দুটো ভইস, একটা লাঙল, কাপড়, তেজসপত্র ইত্যাদি। তিনি এই তালিকা সরকারকে দেখাবেন এবং সরকার তাকে তার হৃত সম্পত্তি ফেরত দেবে। তাঁর এই বিশ্বাসের ভিত্তি হল

> "ওরা যে তাই বলল। বলল, ওখানে তোমার সব দেবে! হিন্দু ভাইদের দেশ।"[১১]

কিন্তু অচিরেই তার স্বপ্নভঙ্গ হয়। যে সরকার তাকে কথা দিয়েছিল সবকিছু ফিরে পাবার, স্বাধীন রাষ্ট্রে ফিরে সে আর সেই সরকারের দেখা পায় না। কথক তাকে জানায়,

> "তবে যে-ই বলুক, মিথ্যে স্তোক দিয়েছে! ও-জিনিশ এখানে আর তুমি পাবে না। ও-আশা ছেড়ে দাও। আর পণ্ডিতজির সঙ্গে দেখা করাই বৃথা, হয়তো দেখা না-ও হতে পারে।"[১২]

এই নির্মম সত্য বৃদ্ধের মনে গভীর আঘাত হানে। তিনি হুংকার দিয়ে বলেন,

> "দুশমনটা কে? ...কে দুশমন? একবার চিনতে পারলে তার টুটিটা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে একেবারে কাবার করে দিই!"[১৩]

বৃদ্ধের এই ক্রোধ একটি রাষ্ট্রের প্রতি তার চূড়ান্ত মোহভঙ্গ-স্বপ্নভঙ্গেরই নিদর্শন বলে আমরা মনে করি।

দেবেশ রায় তাঁর জনপ্রিয় 'উদ্বাস্তু' গল্পে শিকড়হারা মানবের যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরেছেন। গল্পটি শুরু হয়েছে এপার বাংলায় অবস্থিত সত্যব্রত লাহিড়ী, তার স্ত্রী অণিমা এবং একমাত্র সন্তান অঞ্জুর জীবনকাহিনিকে কেন্দ্র করে। সত্যব্রত লাহিড়ীর আদিনিবাস পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে ২৩০/এ/৬ হোল্ডিংস্থ মোকানে বাস করেন। এই হোল্ডিংয়ের জন্য 'দেয় মিউনিসিপ্যাল কর' গত বারো বৎসর যাবৎ তিনি দিয়ে আসছেন। কিন্তু সরকারের এক সিদ্ধাতেই তাদের ব্যক্তিগত এবং সাংসারিক জীবনে নেমে আসে চরম অন্ধকার। কেননা সরকার নানান সূত্র মারফত জানতে পারে যে, সত্যব্রত ও অণিমা বলে যারা বর্তমানে ভারতে বসবাস করছেন তারা আদতে ছদ্মনামধারী বহিরাগত

নয়তো অন্য কেউ যারা এমন নাম ধারণ করে অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছে। সরকার তদন্তের মাধ্যমে জানতে পারে যে,

> "মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র সত্যব্রত লাহিড়ী নামধেয় ব্যক্তি ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু পর বৎসরই তিনি-খুলনা যাবার পথে ট্রেনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে নিহত হন।"[১৪]

ফলে বর্তমানে জীবিত সত্যব্রত লাহিড়ী আসলে মৃত বা জাল সত্যব্রত। একই কথা প্রযোজ্য অণিমার ক্ষেত্রেও। যে সত্যব্রত লাহিড়ী ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০-এ জুলাই চব্বিশ পরগনা জেলার মুখেরা গ্রামের হেমচন্দ্র সান্যালের দ্বিতীয়া কন্যা অণিমা সান্যালকে হিন্দুশাস্ত্রমতে শালগ্রাম শিলা ও অগ্নিসাক্ষী রেখে বিবাহ করেন; মৃত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উভয়েই এই বিবাহে পৌরোহিত্য করেন; নথি ঘেঁটে সরকার জানতে পারে সেই অণিমা নাকি কুমকুম এবং এনামুল হকচৌধুরীর বিবাহিত স্ত্রী। এনামুলের সক্রিয় ইচ্ছায় এবং উৎসাহে শারীরিক ও মানসিক স্বস্তি ও শান্তির জন্য অণিমা ভারত ইউনিয়নে আসে। অতঃপর তার পিতা আবার বিবাহ দেন সত্যব্রতর সঙ্গে।

দেশজুড়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'খাঁটি ব্যক্তির সন্ধান' কর্মসূচি এমনই নানান জটিল সমস্যার উত্থাপন করেছিল এবং জেনেবুঝেই সরকার এই সমস্ত বাস্তুত্যাগীদের সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল। যদিও এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগের ফলে পরিবর্তিত বিশ্বে ফেরারি ও বেনামা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং তাদের আটক করা,

> "আমরা এক তথ্যসংগ্রহ অভিযানের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি যে পৃথিবীগ্রহে বর্তমানে বহু ফেবারি ও বেনামা ব্যক্তি আছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষ-পাকিস্তান, উত্তর ভিয়েৎনাম-দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া, পূর্ব জার্মানি-পশ্চিম জার্মানি ইত্যাদি দেশগুলিতে। ...বিশ্ববাসীকে অনুরোধ করছি তাঁরা যেন স্ব-স্ব আত্মপরিচয় নিয়ে নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দেন।"[১৫]

তা সত্ত্বেও আমার বলতে পারি যে, যারা দেশভাগের বলি তাদের ক্ষেত্রে এ সংবাদ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতই। যারা এক কাপড়েই জান ও মানকে সম্বল করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল তাদের কাছ থেকে যদি বারো বছর পর মৌলিক, আদি, অকৃত্রিম আত্মপরিচয়ের প্রমাণপত্র চাওয়া হয় তাহলে সেটা বিনা মেঘে বজ্রপাত নয় তো কী? দেশভাগ ও তৎপরবর্তী নানান রাজনৈতিক ছল-চাতুরির কারণে বাস্তুত্যাগীদের জীবন কতটা ভঙ্গুর হতে পারে তার প্রমাণ আলোচ্য গল্পটি। সত্যব্রত তার জীবদ্দশায় আপন পরিবার ও সমাজের কাছে জীবিত থেকেও মৃত হয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, যারা যুগ যুগ ধরে দারিদ্র্য-বঞ্চনার শিকার সেইসব অন্তেবাসী ছিন্নমূল মানুষের আত্মমর্যাদার চরম অবক্ষয় এবং তুচ্ছ অস্তিত্বের করুণ চিত্র তুলে ধরে ধরেছেন আলোচ্য তিন সাহিত্যিক। রাতারাতি একটি অখণ্ড ভূখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হাজার হাজার অন্তেবাসী মানুষের জীবনে চরম অনিশ্চয়তা নিয়ে এসেছিল; যেখানে জীবনের মৌলিক চাহিদাটুকুও ছিল অনিশ্চিত। ভিটে-মাটি, স্মৃতি ও শিকড় থেকে উৎখাত ছিন্নমূল মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ-স্বপ্নভঙ্গের বাস্তব চিত্রকে জ্যোতির্ময়ী দেবী, ঋত্বিক ঘটক এবং দেবেশ রায় আলোচ্য তিন গল্পে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. হীরা, আশিস (সম্পা.) । দেশভাগে নিম্নবর্ণ। গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ২৪।
২. দেবী, জ্যোতির্ময়ী। নারীর কথা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন, ৪র্থ খণ্ড। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৩২-১৩৩।
৩. ঘটক, ঋত্বিক। চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরও কিছু। নিউ এজ পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ২০।
৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর। আখ্যানের বহুস্বর। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৯২।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পা.) । এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, ভেদ-বিভেদ। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৪৫।

৬. তদেব, পৃ. ৪৭।
৭. তদেব, পৃ. ৫০।
৮. হীরা, আশিস (সম্পা.) । একাত্তরের বাংলাদেশ: নারীর অবস্থান, দেশভাগ ও নারী: ভাঙা দেশ নতুন গড়ন। গাঙচিল, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৭৬।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পা.) । স্ফটিকপাত্র, ভেদ-বিভেদ। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২৭১।
১০. তদেব, পৃ. ২৭২-২৭৩।
১১. তদেব, পৃ. ২৭৫।
১২. তদেব, পৃ. ২৭৫।
১৩. তদেব, পৃ. ২৭৫।
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পা.) । উদ্বাস্তু, ভেদ-বিভেদ। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৪২৬।
১৫. তদেব, পৃ. ৪২৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. হীরা, আশিস (সম্পা.) । দেশভাগে নিম্নবর্ণ। গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০।
২. দেবী, জ্যোতির্ময়ী। জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন, ৪র্থ খণ্ড। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৪।
৩. ঘটক ঋত্বিক। চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরও কিছু। নিউ এজ পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৭২।
৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর। আখ্যানের বহুস্বর। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৫।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পা.) । ভেদ-বিভেদ। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯২।
৬. হীরা, আশিস (সম্পা.) । দেশভাগ ও নারী: ভাঙা দেশ নতুন গড়ন। গাঙচিল, কলকাতা, ২০২১।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 281- 289
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.207

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘গল্পমালা’-র নির্বাচিত গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: একটি গবেষণামূলক অধ্যয়ন

দীপশিখা দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয় ও সহকারী অধ্যাপক, সন্দিকৈ বালিকা মহাবিদ্যালয়, আসাম, ভারত*

ড. মিতা চক্রবর্তী, *তত্ত্বাবধায়ক ও প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত*

Received: 07.10.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Narendranath Mitra stands out as one of the significant figures in twentieth century Bengali fiction, particularly for his psychological short stories. His narratives vividly portray the realities of middle and lower-class life in Bengal while delving into the depths of the human mind. The tradition of psychoanalytical storytelling initiated by Rabindranath Tagore found fuller expression in the works of both Kallol and non-Kallol writers, with Narendranath Mitra and his contemporaries carrying it forward. Mitra's stories often explore the intricacies of human emotions and behavior. In representing human desires, frustrations, joys, sorrows, love, hatred and conflict, he frequently employed psychoanalytic perspectives. While at times influenced by Freud's theories, Mitra often relied on his own rational and scientific outlook. Many stories from his collection 'Galpamala' remain memorable for their psychological depth. Through them, he probed the complex inner lives of his characters with remarkable precision. This paper seeks to undertake a detailed analysis of this psychological dimension in Mitra's writings, with particular attention to selected short stories where such approaches are most evident.

Keywords: Narendranath Mitra, psychoanalysis, Rabindranath Tagore, Kallol writers, non-Kallol contemporaries, short stories

নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে অসংখ্য ছোটোগল্প-উপন্যাস রচনা করে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। তবে নরেন্দ্রনাথের রচনশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর ছোটোগল্প। গল্পকার হিসেবে নরেন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য গল্পের বিষয়বস্তুর সাধারণত্ব। তবে সেই সাধারণের মধ্য থেকে অসাধারণত্বের উন্মোচনে, চেনা জগতের মধ্য থেকে অচেনা রহস্য উদ্‌ঘাটনে তিনি অসাধারণ। নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর বিপুল গল্পসম্ভারে মানবমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক রূপায়ণ এবং চরিত্রের অন্তর্জগতের রহস্য উন্মোচনে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

আধুনিক জীবনে মনস্তত্ত্ব এক বহুল আলোচিত বিষয়। মানুষের আচরণ, কার্যকলাপ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নই হল মনস্তত্ত্ব। অর্থাৎ বাইরের ঘটনা মানুষের মনোজগতে যে সমস্ত নিগূঢ় অনুভূতি জাগায়, যার ফলে মানুষের আচরণ নির্ধারিত হয়, তার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের নামই হল মনস্তত্ত্ব।মানবমনের অন্তর্জগৎ এবং চারপাশের বহির্জগতের মধ্যে রয়েছে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগসূত্র। মানুষের পাঁচ ইন্দ্রিয় এই যোগসূত্র স্থাপন করে। ফলে বহির্জগতের পরিবর্তন হলে অন্তর্জগতে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়; আবার অন্তর্জগতে আলোড়ন হলে বহির্জগতের আবহও

বদলে যায়। উনিশ শতকে জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ গুস্তাভ থিওডোর ফেকনার মনস্তত্ত্বকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে ওই শতকে মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে অস্ট্রিয় মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের দুটো বই 'The Interpretation of Dreams' এবং 'Psychopathology of Everyday Life' -এর ইংরেজি অনুবাদ যথাক্রমে ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হলে মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ জাগে। বস্তুত এই দুটি বই মানবমনস্তত্ত্ব বোঝার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থে মানুষের মনের তিনটি স্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন— চেতন, অবচেতন এবং অচেতন স্তর। চেতন মনের সংযোগ ঘটে জাগ্রত অবস্থায় মানুষের পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে। অবচেতন ও অচেতন মনের সংযোগ স্থাপিত হয় মানুষের সুপ্ত অন্তর্জগতের অর্থাৎ অতীত স্মৃতি ও জৈবিক প্রয়োজনসমূহের সঙ্গে। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত এই তত্ত্ব বিশ শতকের আধুনিক বিশ্বের চিন্তাজগতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তা পত্রপত্রিকা, চলচ্চিত্র, সাহিত্য প্রভৃতিতে প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

বাংলা কথাসাহিত্যে মনোবিশ্লেষণ-রীতির যথার্থ প্রয়োগ ঘটে বিশ শতকের গোড়া থেকেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' (১৯০১) এবং 'চোখের বালি' (১৯০৩)-তে মনঃসমীক্ষণের প্রথম সফল প্রয়োগ ঘটে। প্রথমটি ছোটোগল্প এবং দ্বিতীয়টি উপন্যাস। তবে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে বাঙালি কথাশিল্পীরা সচেতনভাবে গ্রহণ করেন আরও পরে। বিশ শতকের কুড়ির দশকে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল সাহিত্যিক ফ্রয়েড-নির্দেশিত মনস্তত্ত্বকে ছোটোগল্প-উপন্যাসে প্রয়োগ করতে তৎপর হন। শুরু হয় বাংলা মনোবিশ্লেষণমূলক কথাসাহিত্যের জয়যাত্রা। সেই সকল সাহিত্যসেবীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, জগদীশ গুপ্ত, মনীশ ঘটক, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ। এঁদের সমকালীন সময়ে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অকল্লোলীয় লেখকেরাও মনস্তত্ত্বপ্রধান কথাসাহিত্যের সম্ভার নিয়ে এলেন। তারপর কুড়ি শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে আরও একদল বাঙালি তরুণ লেখক মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্প-উপন্যাস রচনায় বিশেষ আগ্রহ দেখালেন। তাঁদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ বসু, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখেরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটোগল্পসমূহ মানবমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম উপাদানে পরিপূর্ণ। নরনারীর হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে তাদের অন্তর্জগৎ উন্মোচনে তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর গল্পে চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্ব ও মানসিক টানাপোড়েন নিখুঁত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুলো আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তবে পরিসরের সীমাবদ্ধতার জন্য এখানে 'গল্পমালা'-র প্রথম খণ্ড থেকে বেছে নেওয়া দুটি গল্প নিয়েই আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

উদ্দেশ্য: নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা'-র গল্পগুলো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অসাধারণ উদাহরণ। এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হল গল্পগুলোর আলোচনার মাধ্যমে লেখকের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ কুশলতার উপর আলোকপাত করা। সেই সঙ্গে চরিত্রের অন্তর্লোক অন্বেষণে সিদ্ধহস্ত গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাও এই আলোচনার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়।

গ্রন্থ পরিচয়: নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা' আট খণ্ডে বিভক্ত এক সুবিশাল গল্পসংকলন। প্রথম সংস্করণের ক্রম অনুযায়ী 'গল্পমালা'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং শেষ তথা অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০২০-এর এপ্রিল মাসে। প্রায় সাড়ে চারশোর কাছাকাছি গল্প নিয়ে এই সংকলনটি চব্বিশ বছর ধরে আনন্দ পাবলিশার্স নামক প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে।

পদ্ধতি: আলোচ্য গবেষণাপত্র রচনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা-পদ্ধতি মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে বর্ণনামূলক গবেষণা-পদ্ধতিরও আশ্রয় নেওয়া হবে। তথ্য সংগ্রহে আকরগ্রন্থকে প্রাথমিক উৎস এবং সহায়ক গ্রন্থসমূহকে গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ:

নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা ছোটোগল্পের মনস্তাত্ত্বিক ধারার অন্যতম বিশিষ্ট লেখক। সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ বলতে মূলত চরিত্রের অন্তর্জগতের অনুসন্ধানকেই বোঝায় এবং এই ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সৃষ্টিকে ঘিরে বিভিন্ন সমালোচক মূল্যবান মন্তব্য রেখেছেন। বিশিষ্ট সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—

> "দুর্জেয় মনের রহস্য উন্মোচনে তাঁর দৃষ্টি প্রখর। তিনি হৃদয়ের নিপুণ বিশ্লেষক, জীবনের জটিলতার রূপকার।"[১]

অন্যদিকে প্রখ্যাত সমালোচক সরোজমোহন মিত্র মন্তব্য করেছেন—

> "নরেন্দ্রনাথ প্রধানত মনের কারবারি। নানা ঘটনার পিছনে মানুষের মনে যে বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নরেন্দ্রনাথের গল্পে আছে তারই প্রাধান্য।"[২]

প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর চরিত্রগুলোর মানসিক জটিলতা ও অন্তর্লোক উদ্‌ঘাটনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য গবেষণাপত্রে 'গল্পমালা'-র প্রথম খণ্ড থেকে দুটি গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। গল্পগুলো হল 'যৌথ' ও 'রস'।

'যৌথ' গল্পটিতে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ এক ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছে। বৌদি মল্লিকার প্রতি স্বরূপের অনুচ্চারিত প্রেম এক বিশেষ মুহূর্তে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘ সাত বছর ধরে স্বরূপ পঙ্গু। দাদা অনুরূপের কথায় ভাইপোর জন্য নারকেল গাছ থেকে ডাব পাড়তে গিয়ে নিচে পড়ে যাওয়ায় তার দুটো পাকেই অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়। এই দুর্ঘটনার জন্য অনুরূপ নিজেকেই দায়ী করে। প্রথমাবস্থায় সে স্বরূপের বিয়ে দিতে, তাকে কাজ পাইয়ে দিতে, সাংসারিক বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করতে তৎপর ছিল। আসলে ভাইয়ের জীবনে যে বিশাল ক্ষতি তার দ্বারা ঘটেছে, এই সমস্ত আচরণের মাধ্যমে তা কিছুটা হলেও পূরণ করে সে নিজে অপরাধবোধের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। অনুরূপ নিজের কাঠের ব্যবসায় স্বরূপের শিল্পীপ্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছে। শিল্পী স্বরূপ তার দাদার নির্দেশে কাঠে নানা ধরনের কারুকার্য করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> "স্বার্থবুদ্ধি হয়তো পরোক্ষ কাজ করেছে, কারণ শিল্প বিষয়টা স্বরূপ যেমন বুঝত, অনুরূপ ততটা নয়। প্রত্যক্ষ ভাবে অসহায় ভাই এর প্রতি কারুণ্য মিশ্রিত ভালবাসা ও কিছুটা কৃতজ্ঞতা বোধ ও ছিল। কারণ তার ছেলের জন্যেই স্বরূপের এই অবস্থা।"[৩]

অনুরূপ স্ত্রী মল্লিকাকে স্বরূপের পরিচর্যায় নিযুক্ত করেছে। মল্লিকা যখন বিয়ে হয়ে তাদের বাড়িতে এসেছিল, তখন তার সঙ্গে কাটানো স্বরূপের সেই অতীত অনেক আনন্দময় ও প্রাণবন্ত ছিল। কিন্তু চার সন্তানের মা মল্লিকার শরীর এখন ভেঙে গেছে, প্রথম যৌবনের সৌন্দর্য আর নেই; সংসারের চাপে মেজাজও খিটখিটে হয়েছে। কিন্তু স্বরূপ মনে করার চেষ্টা করে মল্লিকা যেন আগের মতোই আছে। সে যেন জোর করে পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। গল্পকার এখানে স্বরূপের মনোজগৎ সম্বন্ধে হদিস দিচ্ছেন—

> "স্বরূপের ব্যবহারে কোথাও যেন একটু মোহ আছে।"[৪]

একদিন মল্লিকা নিজের সৌন্দর্যক্ষয়ের উপলব্ধিতে স্বরূপের সামনে সংকুচিত হয়ে পড়ল। স্বরূপকে খাবার পরিবেশন করতে গিয়ে তার মনে হল স্বরূপ যেন তার দিকে সেভাবে তাকিয়ে নেই। এখানে গল্পকার মনোবিশ্লেষণ করেছেন—

> "মোহ তার চোখ থেকে খ'সে পড়ে গেছে আর মল্লিকার দেহ থেকে সৌন্দর্য আর যৌবন। মল্লিকার মনে হল স্বরূপের মোহই যেন এতদিন সেই সৌন্দর্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।"[৫]

এখানে মল্লিকার মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। মল্লিকা তার সৌন্দর্যের প্রশংসা স্বামীর কাছে আশা করেনি, তাই তার সৌন্দর্যহানিতে স্বামীর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কেও সে চিন্তিত নয়। কিন্তু দেওরের চোখে তার প্রতি মুগ্ধতা, তার সৌন্দর্যহানিতে সেই মুগ্ধতার অবসান— নিজের সৌন্দর্যকে ঘিরে স্বরূপের মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মল্লিকার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ স্বরূপের মনেই শুধু বউদিকে কেন্দ্র করে দুর্বলতা ছিল না, মল্লিকার মনেও স্বরূপকে নিয়ে দুর্বলতা ছিল।

দাদা ও বউদির যত্নে ও সাহচর্যে স্বরূপ পায়ের অভাবের কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু দিন বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও বদলায়। স্বরূপের মনে এবার জেগে উঠেছে ভাইপো ও দাদার জন্য পা হারানোর ক্ষোভ। অনুরূপের চলার ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে স্বরূপের নিজের গতিহীনতাজনিত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এদিকে মল্লিকার শিশুসন্তানের চিৎকার-চেঁচামেচিতে তার একেক সময় অসহ্য লাগে। সে বিরক্তি প্রকাশ করলে মল্লিকা সক্রোধে বলে ওঠে—

> "…. কি করব ভাই, মেরে তো আর ফেলতে পারি না।"[৬]

স্বরূপ উপলব্ধি করে, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কিছু বললে মল্লিকা রাগ করে ফেলে। এখানে এক মায়ের মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। স্বরূপের মনে হয়—

> "তাকে যদি ভালোবাসতে হয়, শুধু তার নিজের দোষত্রুটিগুলিকেই নয়, তার সন্তানদের দোষ ত্রুটি সুদ্ধ ভালোবাসতে হবে।"[৭]

স্বরূপের এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তার মনোজগৎ উদ্‌ঘাটিত। যে মল্লিকার সঙ্গে সে একসময়ে সুন্দর মুহূর্তগুলো কাটিয়েছে, সেই মল্লিকা আজ তার সঙ্গে কখনও কখনও রুক্ষ ব্যবহার করে। সে বুঝতে পারে, আগের মল্লিকাকে পেতে হলে তার সন্তানদের দোষত্রুটি সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে হবে। স্বরূপের দেখাশোনার ভার মল্লিকার উপর অর্পিত হলেও দাদা-বউদির অসুবিধার কথা ভেবে সে বউদিকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু বেশিক্ষণ সে অনুরূপের সঙ্গে মল্লিকাকে থাকতে দিত না। হয়তো বা জল খাওয়ার অছিলায় সে মল্লিকাকে ডেকে পাঠাত। এখানে স্বরূপের মানসিক টানাপোড়েন প্রকাশিত। বিবেকের প্রভাবে সে বউদিকে দাদার কাছে যেতে বলত, কিন্তু মন মল্লিকার সান্নিধ্য-কামনায় তাকে আবার ডেকে নিত। মল্লিকা স্বরূপের মনোবাঞ্ছা বুঝতে পেরে জল না নিয়ে এসেই জিজ্ঞেস করত স্বরূপের সত্যি কি খুব তৃষ্ণা পেয়েছে? স্বরূপ উত্তরে বলত—

> "হ্যাঁ, কিন্তু জলেই এ যাত্রা মেটাতে হবে।"[৮]

স্বরূপের এই উক্তির মধ্য দিয়ে তার অন্তরশায়িত ভাব বেরিয়ে পড়েছে। এই জীবনে তার পক্ষে মল্লিকাকে সঙ্গিনী হিসেবে পাওয়া সম্ভব নয়, তার ভালোবাসার তৃষ্ণা অপূর্ণই থেকে যাবে; ফলে আপাতত জল পান করেই তৃষ্ণা মেটাতে হবে। দ্ব্যর্থপূর্ণ ভাষায় স্বরূপের আঁতের কথা বেরিয়ে এসেছে। তবে এগুলো সবই পুরনো কথা। এখন সময়ের পরিবর্তনের ফলে মল্লিকার সাংসারিক ব্যস্ততা তাকে স্বরূপের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। অনুরূপও তার ব্যবসায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শুধু স্বরূপই রয়ে গেছে এক জায়গায়। তার জীবনে নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আজকাল মাঝেমধ্যে তার মনে নানা কথা উঁকি দেয়, যার দ্বারা তার মনোগহনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজকাল দাদা-বউদির প্রতি তার মনে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পরিবর্তে রাগ ও বঞ্চনার দুঃখ বড়ো হয়ে ওঠে। এখানে গল্পকার তার মনের হদিস দিয়েছেন—

> "…. একটি মেয়েও কি পাওয়া গেল না স্বরূপের জন্যে? — মনে হয় অনুরূপ আর মল্লিকা ইচ্ছা ক'রে তাকে ঠকিয়েছে। কেবল সোহাগ আদর ক'রে ভুলিয়ে রেখেছে, পাছে স্বরূপের নিজের সন্তান এসে সম্পত্তির অংশীদার হয়।"[৯]

একদিকে যেমন অনুরূপ ও মল্লিকার প্রতি স্বরূপের মনে আন্দোলন চলতে থাকে, তেমনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিজস্ব একটি সংসারের জন্য তার মন আলোড়িত হয়ে ওঠে।

একদিন স্বরূপ বায়নার একটা কাজ যথাসময়ে শেষ করতে না পারার ফলে অনুরূপ কর্তৃক তিরস্কৃত হল। তখন স্বরূপও প্রত্যুত্তরে তার সমস্ত ক্ষোভ উগরে দিল—

> "…. কাজ না ক'রে কি মাগনা খাই তোমার সংসারে? খুব খাটিয়ে নিয়েছ, আর কেন? এত আমি করব কার জন্যে? কে আছে আমার সংসারে?"[১০]

ভাইয়ের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত জবাবে আহত অনুরূপ এবার মল্লিকাকে বারণ করে দিল স্বরূপের ঘরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু মল্লিকা স্বামীর নিষেধকে অগ্রাহ্য করে স্বরূপের কাছে গিয়ে হাল্কা ভঙ্গিতে বলল, স্বরূপের ঝগড়া করতে হয় মল্লিকার সঙ্গে করুক। এবার মল্লিকার কথার প্রতিক্রিয়ায় স্বরূপের মনের গভীরে জমে থাকা রাগ ও ঘৃণা তার দৃষ্টিতে ও বক্র হাসিতে ফুটে উঠল—

"মল্লিকা কি ভেবেছে এমনি ছদ্ম সোহাগে আজীবন তাকে ভুলিয়ে রাখবে?"[১১]

মল্লিকা যেন স্বরূপের মনের কথা বুঝতে পেরেছে, তাই তার আচরণ তীরের মতো তার বুকে গিয়ে বিঁধেছে। মল্লিকার সেই সময়ের মানসিক স্থিতি সম্পর্কে গল্পকার বলছেন—

"আরো কত দিনই তো স্বরূপ এমন রাগ ক'রে তার সঙ্গে কথা বলেনি, কিন্তু এমন ব্যথা তো কোনোদিন পায়নি মল্লিকা।"[১২]

স্বরূপের ব্যবহারে অনুরূপ আহত হয়েছিল সত্য, কিন্তু মল্লিকার আঘাত গভীরতর ছিল। এদিকে অনুরূপের মনে আবার করে অনুশোচনা জাগল এই ভেবে যে সে তার কাজকর্মের ব্যস্ততায় স্বরূপের দিকে আলাদা করে নজর দিতে পারেনি। সে ঠিক করল, আবার নতুন উদ্যমে তাকে তার ভাইয়ের বিয়ের চেষ্টায় নামতে হবে। অন্যদিকে স্বরূপ নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সে একটি মূর্তি নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে খোদাই করে চলেছে। আগে স্বরূপ নিজের জায়গায় বসেই হই-হুল্লোড় করত, তার হাসিতে ও উল্লাসে সমস্ত বাড়ি চঞ্চল হয়ে উঠত। কিন্তু আজকাল স্বরূপ কম কথা বলে, মল্লিকাকে ডাকাডাকি কম করে। যদিও মল্লিকা আগের মতোই গৃহকর্ম করে, অনুরূপের কাঠের ব্যবসা আগের মতোই চলতে থাকে, কিন্তু স্বরূপের নিরানন্দে সমস্ত সংসার যেন নিরানন্দময় হয়ে উঠেছে। কিছুদিন পর স্বরূপ হঠাৎ জ্বর ও ডবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। মৃত্যু আসন্ন দেখে স্বরূপ দাদাকে তার অসম্পূর্ণ মূর্তিটা সম্পূর্ণ করতে বলল। অনুরূপেরও স্বরূপের মতো শিল্পীর হাত। ফলে স্বরূপের মৃত্যুর পর তার শেষ অনুরোধ রাখতে পাটের চট দিয়ে ঢাকা সেই মূর্তিটাকে বের করে আনা হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কৃত হল যে মূর্তিটা মল্লিকার। গল্পের শেষাংশ থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"চেনা কঠিন নয়। মল্লিকারই আবক্ষ প্রতিকৃতি। এখনকার ভাঙাচোরা ক্ষ'য়ে-যাওয়া মল্লিকার নয়, দশ বৎসর আগের সেই যৌবনোচ্ছলা সপ্তদশী মল্লিকা আবার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে যেন।"[১৩]

স্বরূপ তার শিল্পীসত্তাকে কাজে লাগিয়ে তার নীরব প্রেমকে রূপ দিয়েছে এই মূর্তির মধ্য দিয়ে। সে চেয়েছিল নিজের হৃদয়ের মাধুর্য মিশিয়ে সপ্তদশী মল্লিকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে। আসলে প্রথম যৌবনের মল্লিকাকে স্বরূপ কখনও ভুলতে পারেনি, তাকেই সে মনের মধ্যে সযত্নে লালন করেছে। এদিকে নিজের প্রতিকৃতি দেখে মল্লিকা লজ্জায় হতবাক আর অনুরূপ ক্ষুব্ধ। স্বরূপের মুগ্ধতা মল্লিকার কাছে অজানা ছিল না; বরং সেটার উপলব্ধিতে তার মধ্যে স্বরূপের প্রতি দুর্বলতা তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে স্বরূপের গোপন প্রেমের এমন আকস্মিক প্রকাশ অনুরূপের কাছে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি বিশাল এক আঘাত ছিল। 'যৌথ' গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র তিন নরনারীর মানসিক উত্থান-পতন ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে মনস্তত্ত্ববিদসুলভ দক্ষতায় তাদের মনঃসমীক্ষণ করেছেন। এই গল্পটি সম্পর্কে বিখ্যাত সাহিত্যকার তপোধীর ভট্টাচার্য মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করেছেন—

"সম্পর্কের আলো-আঁধার, রহস্যঘেরা কুয়াশা ও নিরুচ্চার সৌন্দর্যের বিষন্নতা: সমস্তই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর লেখক-জীবনের সূচনা-পর্যায়ের এই গল্পকৃতিতে।"[১৪]

'রস' গল্পেও তিন নরনারীর মনোজগতের অপার রহস্য উদ্‌ঘাটনে নরেন্দ্রনাথ মিত্র অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবক বিপত্নীক মোতালেফ রাজেক মৃধার তিরিশ বছর বয়সী বিধবা স্ত্রী সাধারণ চেহারার মাজুখাতুনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। এই বিবাহপ্রস্তাবের নেপথ্যে কাজ করেছে মোতালেফের স্বার্থপর মানসিকতা। মোতালেফের পছন্দ এলেম শেখের আঠারো-উনিশ বছরের সুন্দরী মেয়ে ফুলবানুকে। অন্যদিকে ফুলবানুও মোতালেফকে পছন্দ করে। কিন্তু এলেম শেখের একটাই দাবি, তার সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে হলে দেনমোহরের টাকা হিসেবে পাঁচকুড়ি দিতে হবে মোতালেফকে। ফলে সে তার গূঢ় অভিসন্ধি কার্যকর করতে মাজুখাতুনকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আসলে মোতালেফ ছিল রসের কারবারি, খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে এ অঞ্চলে তার জুড়ি নেই। আর মাজুখাতুন ছিল রস পাটালি গুড়ে পরিণত করতে দক্ষ। একজন পাকা গাছি, আরেকজন পাকা কারিগর। ফলে মোতালেফের অভিপ্রায় ছিল মাজুখাতুনের তৈরি করা পাটালি গুড় বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে দেনমোহরের টাকাটা জোগাড় করে নেওয়ার। কিন্তু মোতালেফের গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাজুখাতুন একেবারে অজ্ঞ ছিল। তার কাছে মোতালেফের প্রস্তাব যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত ছিল। প্রথমে সে রাজি হয়নি; কিন্তু মোতালেফের মন পরীক্ষা করতে জিজ্ঞেস করেছে দেশে কি তরুণী মেয়ের অভাব হয়েছে নাকি যে সে তার কাছে এসেছে। মোতালেফ তা বুঝতে পেরে প্রেমের অভিনয় করে বলেছে, মাজুখাতুন একেবারে আলাদা, তার সঙ্গে অন্য মেয়ের তুলনা হয় না।

মোতালেফের মধুর কথা মাজুখাতুনের মনকে ছুঁয়ে যায়। এর আগে পাড়ার পুরুষেরা যে এমন প্রস্তাব দেয়নি, তা নয়; কিন্তু মোতালেফকে সে অস্বীকার করতে পারে না। তার মানসিক অবস্থা গল্পকারের লেখনীতে ফুটে উঠেছে—

> "অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলি মনের ভিতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল।... পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খুবসুরৎ মুখও কারোও নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।"[১৫]

এখানে একদিকে যেমন মাজুখাতুনের অতৃপ্ত যৌন মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তেমনি মোতালেফের প্রতি তার সদ্য জাগ্রত প্রেমের আভাসও ফুটে উঠেছে। বিয়ের পর মাজুখাতুন ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। মোতালেফ গ্রামের বিভিন্ন খেজুর গাছ থেকে রস নামিয়ে আনে। আর মাজুখাতুন উঠোনে উনান কেটে তার উপর বড়ো বড়ো জালা বসিয়ে রস জ্বাল দেয় ও গুড় তৈরি করে। মাজুখাতুনের সারাদিন ধরে বিশ্রামের অবসর নেই, কিন্তু তার ক্লান্তিও নেই। সে যেহেতু মনের মতো স্বামী ও কাজ পেয়েছে, তাই তার কোনো কষ্টই গায়ে লাগে না। মাজুখাতুনের হাতের গুণে সেবার তাদের গুড় চড়া দামে বিক্রি হয় বাজারে। এমনাবস্থায় যেখানে মোতালেফের সুখে বিবাহিত জীবন কাটানোর কথা, সেখানে তার মনের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে তার গূঢ় অভিসন্ধি কার্যকর করার তাগিদ।

মোতালেফ গুড় বানাবার দক্ষ কারিগর মাজুখাতুনকে ব্যবহার করে পর্যাপ্ত টাকা জমিয়ে ফেলে। তারপর একদিন কিছু পাটালি গুড়, গুড়ের রস এবং পাঁচটি দশ টাকার নোট নিয়ে সে এলেম শেখের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং ফুলবানুকে বিয়ে করার জন্য অগ্রিম টাকা দেয়। এলেম শেখ কোনো বিবাহিত ব্যক্তির কাছে মেয়েকে দিতে আপত্তি জানালে মোতালেফ বিবেকহীনের মতোই বলে ওঠে—

> "গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজুখাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।"[১৬]

এখানে মোতালেফের মনোগহনে লুকিয়ে থাকা গোপন অভিসন্ধি, তার স্বার্থপর চরিত্র বের হয়ে পড়েছে। পর্যাপ্ত টাকা হাতে এলেই সে মাজুখাতুনকে তালাক দিয়ে বিয়ে করবে তার আকাঙ্ক্ষার ধন ফুলবানুকে। এদিকে ফুলবানুও মোতালেফের কাছে অভিমান করে বসে মাজুখাতুনকে বিয়ে করার জন্য। এর উত্তরে মোতালেফ যা বলে তাতে তার কার্যসিদ্ধির জন্য মাজুখাতুনকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের গোপন পরিকল্পনা উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে—

> "ঘরে কেউ না থাকলে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি ক'রে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কি ক'রে।"[১৭]

অবশেষে দুই মাস পর গুড় বিক্রি করে আরও পঞ্চাশ টাকা জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দিয়ে দিল। অজুহাত হিসেবে সে সকলকে বলল, মাজুখাতুনের স্বভাবচরিত্র খারাপ। আহত মাজুখাতুন মোতালেফকে তিরস্কার করে বলে উঠল, তার চেহারাই শুধু সুন্দর, অন্তর নয়; তার মনে যে এত ছলচাতুরী ছিল তা সে বুঝতে পারেনি। মাজুখাতুনের উক্তিতে মোতালেফের শঠতা, স্বার্থপরতা, ষড়যন্ত্র সবই ধরা পড়েছে। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "মাজু খাতুন মোতালেফ এর উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক মাত্র; সে স্ত্রীর শ্রম ও শরীর দখল করেছে। তার দিক থেকে সম্পর্কের কোনো গ্রন্থি তৈরি হয়নি।"[১৮]

মোতালেফ যথাসময়ে ফুলবানুকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসে। আর মাজুখাতুনের আশ্রয় হয় প্রাক্তন স্বামী মৃত রাজেকের ঘর। মোতালেফের আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু মাজুখাতুনের দিনের বেলায় গৃহকর্মের ব্যস্ততায় সময় কাটলেও রাতের অবসর সময় আর কাটতে চায় না। সে মোতালেফের অভাব গভীরভাবে অনুভব করে। মাজুখাতুনের যৌন ও নিঃসঙ্গতার মনস্তত্ত্বের দিকে লেখক ইঙ্গিত করেছেন—

> "... দিন যদিবা কাটে, রাত কাটে না।"[১৯]

মোতালেফের বিশ্বাসঘাতকতা তার কাছে আর গোপন থাকে না। মাজুখাতুনের মানসিক স্থিতি অনুধাবন করতে পেরে রাজেকের দাদা ওয়াহেদের ঘটকালিতে প্রৌঢ় মাঝি নাদির শেখের সঙ্গে তার পুনর্বার বিয়ে হয়ে যায়। মাজুখাতুনের বিয়ের খবর শুনে মোতালেফের মনে হল আপদ গেছে। এদিকে রূপমুগ্ধ মোতালেফ ফুলবানুকে সুখে সোহাগে ভরিয়ে দেয়। কিন্তু পরের বার শীতে তার হুঁশ হয়, ফুলবানু রস তৈরিতে অপারগ। সে অন্য বারের মতোই

গাছে চড়ে রস নামিয়ে আনে, কিন্তু ফুলবানুর অপটু হাতে উত্তম গুড় তৈরি হয় না। মোতালেফ স্ত্রীর উদ্দেশে রুক্ষস্বরে বলে ওঠে—

> "কেমনতরো মাইয়ামানুষ তুমি, এত কইরা কইয়া দেই, বুঝাইলে বোঝ না।"[২০]

ফুলবানুর গুড় বানানোয় অক্ষমতা মোতালেফকে অস্থির ও বিরক্ত করে তোলে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি বাড়ে। তার পেশার কাছে তার রূপমুগ্ধতা পরাজিত হয়। এদিকে পুরনো খদ্দেররা মোতালেফের কাছে এসে অভিযোগ করে, তার এবারের গুড়ে গতবারের মতো স্বাদ নেই। গতবারের গুড়ের স্বাদ যেন জিহ্বায় লেগে আছে। গল্পকার এখানে মোতালেফের মনোবিশ্লেষণ করেছেন—

> "বুকের ভিতর পুড়ে যায় মোতালেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মত এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে।"[২১]

সে এর কারণ ভালো করে জানে। তাই রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে সে ফুলবানুকে রস জ্বাল দেওয়ার কৌশলটা বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ফুলবানু তাতে বিরক্ত হয়। এবার হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে যায় মাজুখাতুনের কথা। আগের বার রাতে শুয়ে শুয়ে সে মাজুখাতুনের সঙ্গে রস ও গুড় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে। মোতালেফের মনে মাজুখাতুনের অভাববোধ জেগে ওঠে যা গল্পকার সযত্নে তুলে ধরেছেন—

> "মাজুখাতুন এমন ক'রে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।"[২২]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চরমে ওঠে যখন একদিন মোতালেফ আবিষ্কার করে ফুলবানুর অসাবধানতার জন্য উনানে বসানো জালার মধ্যে রস পুড়ে গেছে। ফুলবানু তখন স্নান সেরে কেশবিন্যাস করছিল। তা দেখে মোতালেফ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে কঞ্চি দিয়ে ফুলবানুর সর্বাঙ্গে প্রহার করতে লাগল। এলেম শেখ খবর পেয়ে আসে, জামাতাকে শাসায়, মেয়েকেও গালমন্দ করে। কিন্তু ফুলবানু পিতার কাছে অনুরোধ জানায় তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যে ফুলবানু সাগ্রহে ও সানন্দে মোতালেফের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়েছিল, মোতালেফের ঘরে যার সুখ-সোহাগের সীমা ছিল না, সেই ফুলবানু স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণের জন্য আর এখানে থাকতে চাইল না। এখানে ফুলবানুর মনস্তত্ত্বের দিকটি সুপরিস্ফুট। কিন্তু পিতার কথায় তাকে স্বামীগৃহেই থেকে যেতে হল। মোতালেফও ফুলবানুর সঙ্গে আপোস করে নিল। কিন্তু দুজনের মধ্যেকার মনের সম্পর্ক যেন ভেঙে গেল। দুজনেই যেন দুজনের সঙ্গে অভিনয় করতে লাগল। তাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, মুগ্ধতা, প্রশ্রয় সবকিছুই যেন তলানিতে এসে ঠেকেছে। গল্পকার মোতালেফ ও ফুলবানুর ভদ্রতার মুখোশের পেছনে তাদের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন—

> "কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরন আলাদা, ধ্বনি আলাদা; তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো।"[২৩]

এদিকে রসের মরশুম প্রায় শেষ হয়ে আসে। ভোরবেলায় গাছে উঠে সে রসভর্তি বড়ো বড়ো হাঁড়ি নামিয়ে আনে, কিন্তু তার গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না। মোতালেফ জানে তার পরিশ্রমে কোনো খামতি নেই, বরং যা খামতি আছে ফুলবানুর হাতেই। মোতালেফ এবার অনুভব করে মাজুখাতুনের যোগ্যতা। সুন্দরী ফুলবানুর প্রতি দুর্বার আকর্ষণেই মোতালেফ গুণবতী মাজুখাতুনকে অমর্যাদা করেছে। সে উপলব্ধি করতে পেরেছে, শুধু রূপ দিয়ে ঘর চলে না, গুণের দ্বারাই সংসারের মঙ্গলসাধন হয়। ফলে মাজুখাতুনের যথার্থ মূল্য অনুধাবনে তার মধ্যে এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। সেইসঙ্গে তার গুড়ের সুখ্যাতি নষ্ট হওয়ায় ও আর্থিক ক্ষতিসাধনে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। গল্পকার যথাযথভাবে মোতালেফের এই সময়ের মনঃসমীক্ষণ করেছেন—

> "ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাঁকাটির মত খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। … রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।"[২৪]

নাদির শেখের সঙ্গে একদিন হাটে দেখা হলে মোতালেফ জোর করে তার ঘরের জন্য গুড় দিয়ে পাঠায়। প্রবঞ্চক প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে গুড় নিয়ে আসার জন্য মাজুখাতুন নাদিরের উপর ক্রুদ্ধ হয়। কয়েকদিন পর একদিন

মোতালেফ দুই হাঁড়ি রস নিয়ে একেবারে নাদির শেখের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই মাজুখাতুন তীব্র বাক্যবাণের দ্বারা পরোক্ষে তাকে আঘাত করল। কিন্তু মোতালেফের মনে তার অভিঘাত এসে লাগল না। বরং সে মাজুখাতুনের ধিক্কারবাণীর মধ্যে অনুভব করল এক অপরিসীম মাধুর্য। মোতালেফ মাজুখাতুনের সেই সময়কার মনোজগতের স্বরূপ ঠিকই ধরতে পেরেছে—

> "... মনে হচ্ছিল ... মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।"[২৫]

শেষোক্ত বাক্যে ব্যঞ্জনা প্রয়োগে মাজুখাতুনের মানসিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ মোতালেফের কাছ থেকে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহ্য করার পরও তার প্রতি মাজুখাতুনের অন্তরের ভালোবাসা একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। মোতালেফ এবার তার এখানে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। সে খেজুরের রস নিয়ে এসেছে এই আশায় যে মাজুখাতুন যদি তার সুযোগ্য হাতের ছোঁয়ায় সেই রসের দ্বারা গুড় বানায়, তবে সে তা হাটে বিক্রি করে আগের বারের মতোই নাম কিনবে। গতবার মাজুখাতুন থাকায় তার খ্যাতি ও আয়ে যেন জোয়ার এসেছিল। কিন্তু এবার ফুলবানুর অক্ষমতায় তার সুনাম ও রোজগার দুটোতেই ভাটা পড়েছে। আসলে মোতালেফের কাছে তার পেশাই তার নেশা। সেই পেশা যখন অন্যের অকর্মণ্যতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হল, সেটা সে মেনে নিতে পারেনি। নিজের সেই ব্যর্থতার দুঃখ ও গ্লানিতে তার চোখে জল চলে এল। বাঁখারির বেড়ার আড়ালে দাঁড়ানো মাজুখাতুনের চোখ দুটিও ছল ছল করে উঠল। মোতালেফ সেদিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। একে তো মাজুখাতুনের ভালোবাসার মানুষটি সামনে রয়েছে, মনের দুঃখ প্রকাশ করছে, সর্বোপরি তার প্রতিভার কদর করছে— মাজুখাতুনের চোখের জলের নেপথ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তার মনোজগতের কিছু ভাব। সবশেষে হুঁকো হাতে নিয়ে বসে থাকা মোতালেফকে যখন নাদির শেখ জিজ্ঞেস করেছে কল্কের আগুন নিভে গেছে নাকি, তখন মোতালেফ উত্তরে বলেছে, হুঁকোতে তামাক নেভেনি। এই ব্যঞ্জনা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে লেখক গল্পের একেবারে শেষে মোতালেফ ও মাজুখাতুনের অন্তররহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিলেন— কারো অন্তরেই ভালোবাসার আগুন নিভে যায়নি। 'রস' গল্পে মোতালেফ, মাজুখাতুন ও ফুলবানুর মনোজগতের নানা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বাইরের মোড়ক এবং ভিতরের অসারতা গল্পের স্তরে স্তরে ফুটে উঠেছে। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য বলছেন—

> "নরেন্দ্রনাথ যথার্থই সম্পর্কতত্ত্বের সংবেদনশীল কারিগর।"[২৬]

মানুষের শঠতা, স্বার্থপরতা, লোভ, ভোগ, রূপজ আকর্ষণ, প্রেম, ত্যাগ, প্রত্যাখ্যান, বিমুখতা— মনোগহনের এই সমস্ত প্রবৃত্তি ও অনুভূতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই গল্পের তিনটি চরিত্রে এবং সূক্ষ্মভাবে তাদের মনোবিশ্লেষণ করেছেন।

উপসংহার:

আধুনিক ছোটোগল্পে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বাংলা কথাসাহিত্যের বিশ শতকীয় ধারা চরিত্রের বহিরঙ্গ বর্ণনার সীমা অতিক্রম করে তাদের অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব অন্বেষণে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্তিত এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ধারা কল্লোল যুগ পার হয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও তাঁর সমসাময়িকদের রচনায় পূর্ণতা লাভ করেছে। তবে কল্লোল যুগ থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে মনস্তত্ত্ব বিষয়ক ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রতি লেখকদের প্রবণতা দেখা যায় বেশি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখায় যেমন ফ্রয়েডকে অনুসরণ করা হয়েছে, তেমনি তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর 'গল্পমালা' সংকলনের বিভিন্ন গল্পেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। আলোচ্য গবেষণাপত্র মূলত এই দিকটিকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। 'গল্পমালা' সংকলনের দুটি নির্বাচিত গল্প 'যৌথ' ও 'রস' অবলম্বনে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মনোবিশ্লেষণের রীতির সফল প্রয়োগ এই পত্রে দেখানো হয়েছে। গল্পগুলোতে চিত্রিত অনুরূপ, স্বরূপ, মল্লিকা, মোতালেফ, মাজুখাতুন ও ফুলবানু চরিত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখকের মনোবিশ্লেষণধর্মী কৌশলের প্রগাঢ়তাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্রচিত্রণে তিনি মনোবিকলনতত্ত্বকে সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করেছেন এবং চরিত্রের গোপন মানসিক প্রবাহকে উন্মোচিত করতে পেরেছেন। বস্তুত লেখক চরিত্রের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ উদ্‌ঘাটনে সিদ্ধহস্ত। এভাবেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছোটোগল্পকার হিসেবে তাঁর সার্থকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, কলকাতা, পৃ. ৩৭৪।
২. মিত্র, সরোজমোহন। বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প। প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ২৭৬।
৩. চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ। বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ। প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ৪১৯-৪২০।
৪. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। গল্পমালা ১। আনন্দ, ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ১৩।
৫. তদেব, পৃ. ১৬।
৬. তদেব, পৃ. ১৩।
৭. তদেব, পৃ. ১৩।
৮. তদেব, পৃ. ১৫।
৯. তদেব, পৃ. ১৫।
১০. তদেব, পৃ. ১৫।
১১. তদেব, পৃ. ১৫।
১২. তদেব, পৃ. ১৬।
১৩. তদেব, পৃ. ১৮।
১৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (পূর্বার্ধ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ২৮০।
১৫. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। গল্পমালা ১। আনন্দ, ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ৬৯।
১৬. তদেব, পৃ. ৭০।
১৭. তদেব পৃ. ৭০।
১৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (পূর্বার্ধ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ২৭৬।
১৯. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। গল্পমালা ১। আনন্দ, ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ৭১।
২০. তদেব, পৃ. ৭৪।
২১. তদেব, পৃ. ৭৪।
২২. তদেব, পৃ. ৭৪।
২৩. তদেব, পৃ. ৭৫।
২৪. তদেব, পৃ. ৭৫-৭৬।
২৫. তদেব, পৃ. ৭৭।
২৬. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (পূর্বার্ধ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ২৭৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। গল্পমালা ১। আনন্দ, ১৯৮৬, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চট্টোপাধ্যায়, সতাচরণ। বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ। প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০০৭, কলকাতা।
২. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (পূর্বার্ধ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, কলকাতা।
৩. মিত্র, সরোজমোহন। বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প। প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১১, কলকাতা।
৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, কলকাতা।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 290- 295
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.208

ছোটগল্পকার জগদীশ গুপ্তের ‘চন্দ্র-সূর্য যতোদিন’ গল্পে নারীর করুণ জীবনালেখ্য: একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

প্রিয়তমা মজুমদার, *স্বাধীন গবেষক, লংকা (হোজাই), আসাম, ভারত*

Received: 20.09.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Every person living in society survives through his own view point, meditation, thinking and deep self-esteem. These meditative ideas and feelings are shaking from the human being. This debut is made as a poet in the literary world, some as a novelist or story teller. There come the authors, environmental situation, justice, love, events and various simple and complex stories.

Jagadish Gupta (1886-1957) made his poet in the next Bengali fiction, but later he got a permanent seat as a prominent short storyteller. He expressed a unique creation of his deep life in his literary work. In the middle of the twentieth century, Jagadish Gupta was very exceptional than other storytellers. Because in his story there is no mention of natural beauty or any romantic event or character. He is a very destiny writer. In his composition comes the sharp images of the dark complexity of the human mind. The human characters in his story are seen in selfishness, sexuality, greed, hatred and scientific mindset. He has shown to the reader society of Bengal that the greed, sexuality, selfishness of human being takes people and how tragic it can be. Author Jagadish Gupta has shown a finger in the eyes of the society through his literary work, the tragic scene of the pain of the woman’s mind. He is a man even though he seems to have seen and felt very closely. This is a remarkable description in his short story. The craft of his kind of tragic scenario gives the reader to the heart. These topics by author Jagadish Gupta led the Bengali short story to a new direction.

Keywords: Jagadish Gupta, woman, society, problems, mental agony, dark complexity of the mind.

(এক)

সমাজ সংস্কারের বাহনই হল সাহিত্য। সাহিত্য আমাদের আলোর দিশা দেখিয়ে দেয়। এই আলো চিরন্তন। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী এবং বর্তমান আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য উজ্জ্বল শিখরে দাঁড়িয়ে আছে সাহিত্যিকদের রচনার শিল্প ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে। যেখানে বাংলা সাহিত্যিকরা তাদের উপন্যাস নাটক ও গল্পের মধ্য দিয়ে সমাজের বৈচিত্র্যতাকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। এই বিচিত্রতার মধ্যে উঠে আসে সামাজিক পরিবেশ, পরিস্থিতি, সমস্যা, দ্বন্দ্ব, প্রেম, স্নেহ, আকর্ষণ, ন্যায়-অন্যায়, শাসক ও শোষক শ্রেণী, দারিদ্রতা, নারীর মানসিক কষ্ট ও নানা চরিত্রের টানা পোড়েন। বাংলার পাঠক সমাজ এই সমস্ত কিছুর বিষয় বিশ্লেষণের সঙ্গে গভীর ভাবে পরিচিত।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোট গল্পকার রবীন্দ্রনাথের গল্পে দেখা গেছে গ্রাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং রহস্যলোকের অতিপ্রাকৃতভাবের (নিশীথে) প্রতিচ্ছবি। কিন্তু রবীন্দ্র পরবর্তী লেখক বা গল্পকার হয়ে উঠেছে অনেকটা স্বতন্ত্র। তাঁদের গল্পগুলো নিজস্ব মহিমায় মহিমান্বিত। যেখানে কেবল মানুষের বহির বর্ণনা নয়, বর্ণিত হইয়েছে চরিত্রের অন্তরের মর্মান্তিক যন্ত্রণার বিশ্লেষণ। এমনই একজন লেখক বাংলা ছোট গল্পে নতুন সৃষ্টির আলোকে ওঠে এসেছেন জগদীশ গুপ্ত। তাঁর গল্পে প্রেম ভালবাসার কোন রোমান্টিক বর্ণনা নেই। আছে সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের ভিতরের প্রতিচ্ছবি। তাঁর গল্পে উঠে আসে নারী চরিত্রের মনস্তাত্বিকতা,অবমাননা ও অবহেলিত রূপের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর 'চন্দ্র সূর্য যতোদিন' গল্পটি। এই গল্পের সামাজিকতা নারী মনের অন্ধকার জটিলতা, চরিত্রের মানসিক কষ্টের আলোচনাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু।

(দুই)

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের আগমন ঘটে পুরাতন ভাব-ভাবনা ও রীতিনীতিকে পরিত্যাজ্য করে এক নতুন বিষয়-ভাবনার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের গল্প কিংবা তাঁর সমকালীন কোনো গল্পকারের রচনার প্রভাব তাঁর গল্পে পাওয়া দুর্লভ। তিনি নতুন চিত্র চেতনার মধ্য দিয়ে তাঁর গল্পগুলোকে পাঠক মহলে পরিবেশন করেছেন। তাঁর গল্পে মানব জীবনের হিংস্র নির্মম (পয়োমূখম্) ও যৌন অপরাধের (কলঙ্কিত সম্পর্ক) ছবি এঁকেছেন। কখন তিনি হয়ে উঠেছেন নিয়তিবাদী লেখক। তাঁর গল্পের ঘটনা নিয়তির ওপর নির্ভরশীল। (দিবসের শেষে)। সাহিত্য সমালোচনায় জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষের তুলনামূলক আলোচনা করে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,

> "এই তিন গল্প লেখকই প্রত্যক্ষের আড়ালে জীবনের যে জটিলতা, রহস্যময়তা, স্ববিরোধিতাকে জানতে চেয়েছিলেন। গল্পকার হিসেবে তাঁরা চরিত্রের প্রতিপক্ষপাতশূন্য, আবেগ বিষয়ে নিরবিকার, শিল্পীহিসেবে নিরাসক্ত (ডিট্যাচড) পরিবেশ সচেতন, বিজ্ঞানবুদ্ধি- সচেতন। ..... তিনজনই কুচক্রী অন্ধ নিয়তির লীলা ও 'শয়তানি শক্তি' সম্পর্কে অবহিত, মানবজীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন, নিরমহ, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণে আগ্রহী। আবার অমিলও আছে। জগদীশ গুপ্ত তিক্ত, নৈরাশ্যবাদী জীবনকে আগা গোড়া নির্মম দৃষ্টিতে দেখেছেন।"[১]

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস হোক, কাব্য-কবিতা, গল্প কিংবা নাটকই হোক সমস্ত কিছুতেই একটা দীর্ঘ প্রেক্ষাপট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নারী। নারীকে দিয়েই শুরু নারীকে দিয়েই শেষ (বিষবৃক্ষ)। তবে যুগের বা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকদের হাতে গড়ে ওঠা নারীরাও পরিবর্তন হতে শুরু করল। তাদের মন মানসিকতায় সাহিত্যিকরা নতুন রূপ দিতে শুরু করল। তাই বাংলা সাহিত্যে নারীর মনস্তাত্বিক দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়। বাংলা সাহিত্যের আনাচে-কানাচে নারীর মানসিক দ্বন্দ্ব, দুঃখ প্রতিফলিত হয়ে এসেছে। তারা দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায় না। দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায়ও নেই। নারী মনের অন্তর দ্বন্দ্বের আঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আছে জগদীশ গুপ্তের 'চন্দ্র সূর্য যতোদিন' গল্পটি।

(তিন)

'চন্দ্র সূর্য যতোদিন' অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য যতদিন আছে সংসারে স্ত্রীলোকের হাসি-কান্না, দুঃখ-যন্ত্রণাও ঠিক ততোদিন থাকবে। তাদের দুঃখের দিকে নজর দেওয়া পরিবারের বিশেষ করে স্বামীর তেমন প্রয়োজনবোধ হয় না। সেই দিকে দেখার কোনো অবসর নেই। এই গল্পের প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র হল ক্ষণপ্রভা। লেখক জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন, ক্ষণপ্রভা তার সংসারে ক্ষণকালের জন্যই সুখী হয়েছিল। ক্ষণকালের জন্যই স্বামীকে জীবনের সর্বস্ব সত্য বলে জেনেছিল। কেননা বিবাহের পর স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পরক্ষণেই তার জীবনের আলোয় অন্ধকার নেমে আসে স্বামীর সম্পত্তির প্রলোভনে দ্বিতীয় বিবাহের মধ্য দিয়ে। স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ নারীর জীবনে বজ্রাঘাতের মতো পড়ে। কিন্তু তারা নিরুপায়, কোনো ভাবে তারা জীবনের সূতো ছিড়ে যাওয়াকে আটকাতে পারে না। এই গল্পেও ঠিক তাই হয়েছে। কেননা সংসারে স্ত্রীলোক বড় অবহেলিত, তারা অসহায়। এই প্রসঙ্গে নারীবাদী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন—

> "যখন আমার খুব কম বয়স তখন থেকে দেখতাম পারিবারিক জীবনে...আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের কথাই বলছি ... ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশি তফাৎ। মেয়েরা যেন

> কিছুই নয়, আর ছেলেরাই পরম মানিক, এই রকম ব্যাপার। ...সব জায়গাতেই দেখতাম পুরুষদের প্রবল প্রতাপ। ... অল্পবয়সী মেয়েদের বিশেষ করে বৌদের জীবন ছিল দুঃখের নিরুপায়ের, যেগুলো মনকে দারুণ অস্থির করত।"[২]

জগদীশ গুপ্তের এই গল্পের ক্ষণপ্রভা চরিত্রটিও তার ব্যাতিক্রম নয়। ক্ষণপ্রভাও নিরুপায়। সে নিজে গিয়ে স্বামীকে মুখ ফুটে বলতে পারছে না যে তার দ্বিতীয় বিবাহ ক্ষণপ্রভার ভিতরের সমস্তকিছুকে উজার করে দিচ্ছে। স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীর সম্পদ, এর অংশীদার কেউ হয়ে উঠবে তা কোনো স্ত্রীই মেনে নিতে পারে না। বিষবৃক্ষের সূর্যমুখীও মেনে নিতে পারে নি। একই গৃহে স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীর উপস্থিতি সহ্য করা যায় না। সূর্যমুখী পারে নি। সে গৃহ ত্যাগ করেছে। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের গল্পে একটা চমক অপেক্ষা করছে। যেটা পাঠকের কাছে অপ্রত্যাশিত। এটা তার গল্পের বিশেষত্ব। ক্ষণপ্রভার ভিতরের অন্ধকার জটিলতাই তাকে তিল তিল করে প্রতিদিন ক্ষত-বিক্ষত করছে, যখন তারই ছোটবোন প্রফুল্ল সতীন হয়ে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজেরই ছোটবোন একদিন সতীনের সম্পর্কে দাঁড়াবে এটা তার কল্পনার অতীত ছিল। সংসার দু-টুকরো হয়ে যাবে এটাও কল্পনার অতীত ছিল।

আর পাঁচটা মেয়ের মতো ক্ষণপ্রভার চিন্তা-ধারণা এরকম ছিল যে সে ভাবছে স্ত্রীলোকের সংসারে মেরুদণ্ড বুঝি তাদের বয়সে কিংবা যৌবনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এই যৌবনের দিকেই বুঝি পুরুষের লোভ। সে দেখছে তার বয়স ১৯ পার হয়েগেছে। তার পাশাপাশি একটি সন্তানের জননীও হয়েগেছে। অর্থাৎ সে এখন বুড়ি। লোকসমাজের এই ভ্রান্ত ধারণা কুড়ি মানে বুড়ি তাকে ক্ষত-বিক্ষত করছে মনে মনে। জগদীশ গুপ্তের বর্ণনায়—

> "ক্ষণপ্রভা মনে-মনে স্বামীর দিকে চায়— আবার মনে-মনে নিজের দিকে চায়— মনে-মনে যাচাই করে তার বয়স আছে কি গেছে...একবার মনে হয়, গেছে; একবার মনে হয়, যেন আছে— তার বুকের ভিতর সন্দেহ জাগিয়া একটা পিণ্ডের মতো দুলিতে থাকে... কান্না-হাসির দীপক মল্লার চলিতে থাকে।"[৩]

ক্ষণপ্রভা চেয়ে দেখছে প্রফুল্লের যৌবনের যেন ইয়ত্তা নেই। ১৫ বছর বয়সী যুবতীর রূপ যৌবনের প্রথম পর্যায়ে জ্বল জ্বল করছে। ক্ষণপ্রভা লক্ষ্য করেছে দুই বউয়ের তুলনায় পাড়া প্রতিবেশীর কাছে প্রফুল্লই জয়ী হয়েছে। ক্ষণপ্রভা সহ্য করতে পারল না মনে মনে ব্যথিত হয়ে ভাবছে এমনও একটা দিন সে পার করে এসেছে যখন তার স্বামী তার দিকে মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে থাকত। তার কল্পনা লেখকের ভাষায়—

> "মুগ্ধ নেত্রে স্বামী এই দেহখানার দিকেও তো একদিন চাহিয়া থাকিতেন— পুলকে তখন শির শির করিয়া সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগিত।... সেদিন গত কি বিদ্যমান সে সংবাদটা তার মর্মস্থলে কোনোদিন পৌঁছিতো কিনা কে জানে; পৌঁছলেও সে কি আকার লইয়া আসিত তাহা অনুমান করাও সুকঠিন; কিন্তু বড় কষ্টের কথা এই যে, না-থাকার সে নিদারুণ সংবাদটা আজ যে মহাসমারোহ সহকারে তার সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া এমন অকস্মাৎ তার অন্তঃ স্থলে আনিয়া দিলো সে তাহারই বোন!"[৪]

(চার)

ক্ষণপ্রভা মনে মনে তার স্বামী দীনতারণের শয্যাংশের কথা ভাবে সেখানে স্বপ্ন, জাগরণ, হর্ষ, তৃপ্তি স্মৃতিগুলো ছিল খুবই মধুর। কিন্তু আজ সেই মাধুর্যে ঘৃণা প্রবেশ করেছে। স্বামীর শয্যাংশটি স্ত্রীর চিরন্তন স্থানের দখলকারী কেউ হতে পারে না এতদিন ক্ষণপ্রভা এটাই জেনে এসেছে। বিশ্বাস করেছে। সেই ভালবাসার ফল স্বরূপ শিশু সন্তানের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু ভালোবাসা, বিশ্বাস কি এখানেই সমাপ্ত যে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হল শুধুমাত্র সম্পত্তির লোভে। মনে মনে আত্মঘাতকের মতো মরতে থাকে। ক্ষণপ্রভা তার স্বামীর শয্যাংশটি নিজের ইচ্ছেই ছেড়ে দেয়নি। লৌকিকতায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। বরঞ্চ বলা যায় সামাজিক নিয়মই ছাড়তে বাধ্য করেছে। সেই স্থানের মাধুর্যতা মনে করে ক্ষণপ্রভা লজ্জিত হয় এটি গ্রহণ করেছে তারই ছোট বোন!

কিন্তু ক্ষণপ্রভার এই গভীর মনস্তাত্বিক দ্বন্দ্ব, কষ্ট প্রফুল্ল কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। যদিও শাশুড়ি সুভদ্রার চোখে কিছুটা ধরা পড়ে কিন্তু সেখানে কোনো প্রতিকার হয় না। প্রতিকার করার মতো সময় তখন অতিক্রম হয়ে গেছে। এখানে দীনতারণ তার স্বাধীন মতো চলছে সমাজের আর পাঁচটি পুরুষদের মতো। দ্বিতীয় বিবাহে প্রথম স্ত্রীর দুঃখ, মর্মান্তিক ভাবনার দিকে গুরুত্ব দেওয়ার মতো কোনো আগ্রহ তার চরিত্রে প্রকাশ পায় না। তার কাছে দ্বিতীয় বিবাহ

তেমন কোন গুরুতর অপরাধের মধ্যে পড়ে না। অন্য দিকে ক্ষণপ্রভা তার মাতৃত্ববোধটাকে শেষ অবলম্বন হিসেবে বাঁচিয়ে রেখে স্বামী দীনতারণের পিতৃসত্ত্বা কতটা জেগে আছে তার পরীক্ষা করার জন্য ছেলে অংকুরকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিত তার কাছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দীনতারণ ছেলেকে ফেরত পাঠিয়ে দিত। ছেলেকে একবার কোলে নেওয়ার সময় তার নেই। অথচ সামান্য জ্বরে ভুগী প্রফুল্লকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখতে আসে অজস্র কাজের ব্যাস্ততার মাঝেও। এখানে দীণতারণের পিতৃসত্তার হনন হয় এবং রূপ, যৌনতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়।

একটু একটু করে ক্ষণপ্রভার মনের অন্ধকার বেড়ে চলে। যখন প্রফুল্ল সলজ্জায় তার দিদিকে এসে বলে 'তুমি আজ ওপরে শুয়ো। ওর ছেলে চায়।' ঠিক এই ভয়টাই পেয়েছিল ক্ষণপ্রভা। এই ভয় তাকে তিল তিল করে মারছে। কোনদিন তার পায়ের নীচের শেষ জমিটুকু চলে যাবে। স্বামীর যেই স্থানে একদিন ক্ষণপ্রভা ছিল সেখানে আজ অন্য কেউ এত সহজে প্রবেশ করে নিল! ক্ষণপ্রভার কাছে পুরো পৃথিবীটাই সেই মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করে তার কাছে সন্তান কামনা করছে। ক্ষণপ্রভার বেদনা দায়ক অনুভূতি—

> "যেন প্রফুল্ল বুকে দাঁত বসাইয়া তাহার দেহের রক্ত শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত এক নিমেষেই চুষিয়া শুষিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেছে এমনি বিবর্ণ পাংশু মুখে ক্ষণপ্রভা সম্মুখের দিকে চাহিয়া কেবল শূন্যকেই দেখিতে লাগিল।"[৫]

তাহলে কি এতদিন সে এক মিথ্যে জগতের আশ্রয়ে ছিল। স্বামীর অন্তর্জগতে তার জন্য যে ভালবাসা ছিল, যে অনুভূতি, আকর্ষণ এই সমস্ত কিছুই কি ভুল, সব মিথ্যে। সে গুলো কি কোনো কালেও সত্য ছিল না! —

> "ক্ষণপ্রভার মনে হইতে লাগিলো, তাহার জীবন মিথ্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রীতি সব মিথ্যা— সর্বোপরি, সন্তান-ধারণও মিথ্যা—"[৬]

পরম্পরাগতভাবে এই গল্পেও ক্ষণপ্রভা পুরুষের পদতলে পিষে গিয়েছে। বেঁচে থাকার কোনো শিকড় পাচ্ছে না, যেটাকে আঁকড়ে ধরবে। ক্ষণপ্রভার চরিত্রের মনস্তাত্তিক কষ্ট, দুঃখের বর্ণনায় জগদীশ গুপ্ত প্রশংসনীয়। নারী চরিত্রের এই টানাপোড়েন এই গল্পের মাধুর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই অনুভূতি জগদীশ গুপ্ত পাঠক চিত্তেও জাগিয়ে তুলেছেন। ক্ষণপ্রভার মনের ভয়, দুর্বলতা, দ্বন্দ্ব, মানসিক কষ্ট গুলো ঠিক এইভাবে প্রকাশ পায়—

> "ক্ষণপ্রভার মনে হইলো তার চতুর্দিকে অন্ধকার ঘিরিয়া আসি আছে ... স্নিগ্ধ সুবিস্তৃত অন্ধকার নহে ... সে অন্ধকার সঙ্কীর্ণ, কাঁটার মতো চোখে বেঁধে। ... সেই অন্ধকারে কেন্দ্রে সে ... চারিদিকে যাহার বিচরণ করিতেছে তাহারা যেন এ পৃথিবীর মানুষ নয় ...তারা এমনই বিকৃত, বীভৎস।"[৭]

(পাঁচ)

এই গল্পে ক্ষণপ্রভা চরিত্রের আর একটি দিক লক্ষ্য করা যায়, তার চরিত্রে কোনো ঈর্ষা বা হিংসা ভাব নেই। নেই কোনো উগ্রতার ছায়া। মুখ ফুটে কোন প্রতিবাদও সে করে নি। সে কেবল ভিতরে ভিতরে কষ্ট পেয়ে গেছে। ছোট বোন তার সতীনের স্থান দখল করলেও সরল বোনের প্রতি তার ভালোবাসা ও মমতাই দেখা যায়। পরম্পরাগত ভাবে সতীনভাবনায় তার মন বিষাক্ত হয়ে যায় নি। ক্ষণপ্রভার মনের গভীরতা, তার দুঃখ, কান্না সরল প্রফুল্ল কোনোভাবেই বুঝতে পারে না। এই সম্পর্কের গভীরতা ১৫ বছরের প্রফুল্ল অনুভব করতে পারে না। প্রফুল্ল স্বামি দীনতারণের মনোরঞ্জনের জন্য সাজে, টিপ পড়ে, চুল বাঁধে। প্রফুল্লর এই অভিলাস টুকু দেখে ক্ষণপ্রভা মনে মনে ভাবছে— এই অভিলাস একদিন মিথ্যে হয়ে যাবে। প্রফুল্লও একটা মিথ্যেকে জীবনের বড় সত্য ভেবে তারই মতো ভুল করছে। একটা মিথ্যে স্বপ্নপুরি তৈরী করছে। একদিন ক্ষণপ্রভাও এই স্বপ্নপুরী তৈরী করেছিল। কিন্তু আজ তা নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। ক্ষণপ্রভার গভীর আত্মউপলব্ধিরই ছবি বারংবার আমাদের সম্মুখে উঠে আসে এইভাবে—

> "প্রফুল্লর প্রসাধনের দিকে নিঃস্পৃহ চক্ষে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে ক্ষণপ্রভার মনে হইল, ইহার অদৃষ্টও তো তাহারই মতো; উর্ণনাভের তন্তুকেই এ-ও প্রেমের বন্ধন বলিয়া ভুল করিতেছে; ভুগের কেবলি বর্ধিষ্ণু ক্ষুধার মুখে আহার তুলিয়া দিয়া এ-ও... চরিতার্থতার কিছু বাকি রহিল না। কিন্তু যেদিন আত্মার ক্ষুধার দাবি মিটাইবার দিন আসিবে— কোনো কথা কানে ভুলিতে চাহিবে না—

> তখনই মায়াবীর এই স্বপ্নপুরীর চিহ্নও রহিবে না ... দেখিতে হইবে, সব শূন্য; ... বৃথাই সে অগ্নিতে ঘৃত ঢালিতেছে ...।"[৮]

ক্ষণপ্রভা ছোট বোন প্রফুল্লের প্রতি মমতায় ভরে উঠে, তাকে স্পর্শ করে চুম্বন করে, ভাবে এই কোন পথে এই দুই নারী ভাসতে চলছে। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এই সম্পর্কের অবনতি। ক্ষণপ্রভার এই মানসিক দ্বন্দ্বের বর্ণনা গোটা নারী সমাজের কঠিন সত্যকে উজ্জ্বল ভাবে সকলের সম্মুখে তুলে ধরেছেন—

> "হঠাৎ সে হাত বাড়াইয়া প্রফুল্লের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করে; ভাবে, 'কোথায় চলছি আমরা। এ কেন আমার সঙ্গিনী হ'লো!' ... ভাবিতে-ভাবিতে মন তার চিন্তার জটিল গহনের অপার অন্ধকারে হারাইয়া যায়; একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিবার মতো সামর্থ্য সজীবতা তার প্রাণের থাকে না।"[৯]

(ছয়)

গল্পের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় ক্ষণপ্রভার মানসিক যন্ত্রণা সীমা পার করে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। দীর্ঘ ব্যবধানের পর যখন স্বামী দীনতারণ তার দিকে দৃষ্টিপাত করে, পুরোনো শয্যায় আসে, শিশুকে দেখে আর বলে— "খুব রোগা হয়ে গেছো দেখছি। খোকাকেও তো রোগা-রোগা দেখছি।"[১০] লেখক জগদীশ গুপ্ত এর চমৎকার বর্ণনা দিয়ে বলছেন,

> "বহুদিনের পর স্ত্রী, পুত্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় দীনতারণের এই উৎকণ্ঠা পৃথিবীর সূচ্যগ্র ভূমিও স্পর্শ করিল না— হাওয়ায় ভাসিয়া নিঃশেষে বাহির হইয়া গেলো।"[১১]

স্বামীকে পুনরায় এই শয্যায় দেখবে এই প্রত্যাশাই ছেড়ে দিয়েছিল ক্ষণপ্রভা। অথচ এমনও একদিন ছিল যেদিন এই শয্যায় তারা এক আত্মার বন্ধনে বেঁধেছিল। সুখের ঢেউ উঠেছিল সেদিন। কিন্তু আজ সে শূন্য। তাই এই মুহূর্তে স্বামীকে দেখে সর্বাঙ্গ শরীর যেন তার ঘৃণায় ভরে গেছে। চোখের সামনে স্বামী নয় একটা শরীর দাঁড়িয়ে আছে। একটা কেবল মাংস পিন্ড। যার মধ্যে কোনো প্রাণ নেই। সেই চরিত্র যেমন কদর্য তেমনই লোলপ। এই সম্পর্কের পতন এতটাই তীব্র ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে ক্ষণপ্রভা তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সে উন্মাদ, কিন্তু মাতৃত্বটা ঠিক বজায় রেখেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি যে এই গল্পে জগদীশ গুপ্ত প্রধান নারী চরিত্রের অদৃষ্ট জীবন যন্ত্রণারই আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। সামাজিক অন্যায়-অত্যাচারে চেয়েও চরিত্রের অদৃষ্ট রচনাই দুঃময়তার কারণ বলে তাঁর গল্পে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে জগদীশ গুপ্তের রচনায় নৈপুণ্যতা প্রকাশ পায়। তাঁর রচনাশৈলীর নৈপুণ্যতা সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন—

> "মানুষের জীবনের অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয় দৈব-নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে; মনে হয় জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার একপ্রান্তে একটা অন্ধকারের কোণ আছে সেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার।"[১২]

উক্ত মন্তব্য জগদীশ গুপ্তের 'চন্দ্র সূর্য যতোদিন' গল্পটির রচনাশৈলীকে চিরন্তন করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোট গল্পের একশ কুড়ি বছর। ১৮৯১-২০১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৮২, পৃ. ৪২৩।
২. দেবী, আশাপূর্ণা। আর এক আশাপূর্ণা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লা:, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ: বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ১৭।
৩. রায়চৌধুরী, সুবীর সম্পাদনা। জগদীশ গুপ্তর গল্প। ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, প্রথম মুদ্রণ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়, পৃ. ৩৬।
৪. তদেব, পৃ. ৩৭-৩৮।
৫. তদেব, পৃ. ৪৭।
৬. তদেব, পৃ. ৪৭।

৭. তদেব, পৃ. ৪৭।
৮. তদেব, পৃ. ৪৮।
৯. তদেব, পৃ. ৪৯।
১০. তদেব, পৃ. ৪৯।
১১. তদেব, পৃ. ৪৯।
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। (খ্রিস্টীয় দশম- বিংশ শতাব্দী) প্রকাশক: মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- ১৯৬৬, অতিরিক্ত সংযোজন, পৃ. ৩।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 296-302
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.209

স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক উপন্যাস ‘ত্রয়ী’: গঠনশৈলী, পাশ্চাত্যপ্রভাব ও সংগীতপ্রয়োগ

পম্পি দে, *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত*

Received: 14.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the article under discussion, we will try to analyze the structure, Western influence and application of music of the trilogy of novels of the prominent Bengali writer Swarnakumari Devi. Where we will try to analyze the excellence of the structure, the prominence of Western influence and the skill of application of music in the trilogy of novels Bichitra, Swapnabani and Milan-ratri. The writing skills and conscious mentality of the nineteenth-century writer Swarnakumari Devi are reflected in her works, which play a significant role even in the present. Since the scope of our discussion is limited, we will try to shed light on the contribution of the writer to Bengali literature by discussing some of the notable features of Swarnakumari Devi's trilogy of novels.

Keywords: Swarnakumari Devi, Trilogy of Novels, Western Influence, Musical Aesthetics, Narrative Structure

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনায় স্বর্ণকুমারী দেবী বিশিষ্টতম। এর প্রধানতম কারণ তিনিই প্রথম কৃতি লেখিকা যিনি সবিশেষ আন্তর্জাতিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করেন। কালের করালগ্রাস যেন এই প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বের বিস্মরণ না ঘটায় সেইজন্য স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পর্কে সমগ্র বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীর অবগত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

স্বর্ণকুমারী দেবীর বিচিত্র রচনাকর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে দেখা যায়- তিনি উপন্যাস লিখেছিলেন মোট এগারটি। ছোটগল্প সংকলন প্রকাশ করেন দুটি, বিজ্ঞান-প্রবন্ধ সংকলন একটি, একটি গীতিনাট্য ও একটি বিবিধ কথার সংকলন, গাথা একটি, পুস্তিকা(সখিসমিতি)একটি, দুটি কাব্যনাট্য, একটি ‘কবিতা ও গান’, দুটি প্রহসন, দুটি নাটক, একটি গীতিনাটক (সম্মিলিত রচনা) । এছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছেন। এছাড়াও তিনি সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন তাই সম্পাদকীয় রচনা এবং নতুন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহদান- সবই তিনি সারাজীবন ধরে করেছেন।

তবে আলোচনার সীমিত পরিসরকে মাথায় রেখে আমরা আমাদের বিষয়- স্বর্ণকুমারী দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসের গঠনশৈলী, পাশ্চাত্যপ্রভাব এবং সংগীতপ্রয়োগ ইত্যাদি দিকগুলির যথাসম্ভব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

ত্রয়ী উপন্যাস- বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলন-রাত্রি; পম্পরের সঙ্গে যোগ এবং ধারাবাহিকতা আছে বলেই উক্ত উপন্যাস তিনটিকে ত্রয়ী (Trio) অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। উপন্যাস তিনটির প্রকাশকাল সম্বন্ধে ‘সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা’র অন্তর্গত স্বর্ণকুমারী দেবী নামক গ্রন্থ থেকে উক্ত উপন্যাস তিনটির প্রকাশকাল নিম্নরূপ-

বিচিত্রা- ১ বৈশাখ ১৩২৭, ৭ মে ১৯২০, পৃঃ ১৫৭।
স্বপ্নবাণী- জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, ২৪ অক্টোবর ১৯২১, পৃঃ ১৭২।
মিলনরাত্রি- জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ইং ১৯২৫, পৃঃ ২৮৫।[১]

বিচিত্রায় কাহিনির যাত্রারম্ভ, স্বপ্নবাণী ক্রমবিকাশ আর মিলনরাত্রিতে তার অবসান ঘটে। এই ত্রয়ী উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে মফসসলের প্রাসাদপুরে রাজাবাহাদুর অতুলেশ্বর ও তাঁর কন্যা জ্যোতির্ময়ী।

ত্রয়ী উপন্যাসের গঠনশৈলী- উনিশ শতকের ঔপন্যাসিকগণ কাহিনি গ্রন্থণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যদিও এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বই সর্বাধিক। তবে বঙ্কিমানুসারী হয়েও ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী কাহিনি কিংবা প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রে দক্ষতাপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন; এব্যাপারে নীচে আলোচিত ত্রয়ী উপন্যাসগুলি তার সাক্ষ্য বহন করে।

ত্রয়ী উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত তবে প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র শীর্ষ নাম রয়েছে- বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলনরাত্রি। গঠনপ্রণালীর দিক থেকে খণ্ড তিনটি পরস্পর সংযুক্ত তাই একত্রে 'ত্রয়ী' উপন্যাসরূপে অভিহিত। আয়তনের দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ 'স্বপ্নবাণী' এবং সর্ববৃহৎ 'মিলন-রাত্রি'; প্রথম খণ্ড 'বিচিত্রা'য় ১৮টি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ড 'স্বপ্নবাণী'তে ১৭টি পরিচ্ছেদ এবং তৃতীয় তথা শেষ 'মিলন-রাত্রি'তে 'অন্তিম কাহিনী'সহ ৩৮টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য মফস্সলের প্রাসাদপুরের পটভূমিতে রাজাবাহাদুর অতুলেশ্বর ও তাঁর কন্যা জ্যোতির্ময়ীকে কেন্দ্র করে 'বিচিত্রা'য় দেশোদ্ধারের অঙ্কুর সৃষ্টি হয়েছে, 'স্বপ্নবাণী'তে সেই অঙ্কুর ক্রমবিকশিত হয়েছে ও তারসঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজকন্যা জ্যোতির্ময়ীর ব্যক্তিপ্রেম ব্যাকুলতা এবং 'মিলন-রাত্রি'তে দেশোদ্ধারের ব্যাকুলতা চরম পরিণতি লাভ করেছে।

'ত্রয়ী' উপন্যাসের গঠনপ্রক্রিয়া বিবরণমূলক; মূলত রোমান্টিক ও সমাজ সচেতনতাবিশিষ্ট কাহিনি; যেখানে স্থান পেয়েছে প্রধানত স্বদেশানুরাগ, নারীমুক্তি ও সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এছাড়াও আবেগপ্রবণতা, চরিত্র-কেন্দ্রিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 'ত্রয়ী'র অন্যতম প্রধান বিষয়।

'ত্রয়ী'তে বর্ণিত প্রেম (রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ী-শরৎকুমার এবং রাজা অতুলেশ্বর-হাসি) ও রোমান্টিক অনুভূতি (প্রধানত রাজা অতুলেশ্বর, রাজকন্যা জ্যোতির্ময়ী এবং শরৎকুমার, অনাদি প্রভৃতি বীরত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের প্রকাশ) মূখ্য স্থান গ্রহণ করেছে। তবে রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর স্বদেশপ্রেমের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটানো 'ত্রয়ী'র বিশিষ্ট তথা প্রধান অংশ।

এছাড়াও 'ত্রয়ী'র স্থানগত ও কালগত উভয় ঐক্যই রক্ষিত হয়েছে সুন্দরভাবে। স্থানের দিক থেকে উপন্যাসের সূচনা ঘটেছে কলকাতায় কিন্তু উপন্যাসের মূল কাহিনির সূত্রপাত হয়েছে প্রাসাদপুরে। কাহিনির প্রয়োজনে কলকাতা, বিষাদপুর প্রভৃতি স্থানের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে ঠিকই তবে মূল কাহিনির ক্রমবিকাশ ও পরিণতি সূচিত হয়েছে মফস্সলের প্রাসাদপুরেই।

অপরদিকে কালের বিচারে উপন্যাসের মূল কাহিনির কেন্দ্রিয় চরিত্রের জন্ম থেকে শৈশবকাল ও তারপর কৈশোরকালপ্রাপ্ত হওয়ার অনুষঙ্গটি নির্দেশিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের সচেতন মানসিকতার জন্যই উপন্যাসের সূচনার পাশাপাশি পরিসমাপ্তির পূর্বেও বিষয়টি উপেক্ষিত হয়নি। তাই ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন-

> *"মাস ভাদ্র; ভাদ্রের চতুর্দ্দশ দিবসে জ্যোতির্ময়ী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, -সে দিন, জন্মাষ্টমী ছিল; কিন্তু এবার তাহার কিছু পূর্ব্বেই তিথি প্রতিপদে জ্যোতির্ময়ী উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিলেন।"* [২]

এছাড়াও রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর পাশাপাশি অন্যান্য সকল চরিত্রের কালানুগত বিবর্তন উপন্যাসটির বাস্তবতামূলক সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে। উল্লেখযোগ্য কালের ব্যবধান প্রসঙ্গে রাজা অতুলেশ্বরের আড়াই বছর গৃহবন্দী থাকার ঘটনার উল্লেখ থাকলেও উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনার ক্রমবিকাশ ও সংগতি যথাযথভাবে উপন্যাসটির কালগত ঐক্য রক্ষা করেছে।

'ত্রয়ী'র অন্যতম গঠন বৈশিষ্ট্য হল স্বপ্নদৃশ্যের অবতারণা। ঘটনার পূর্বাভাস দ্বারা কাহিনির ক্রমবিকাশ ঘটেছে- রাজকুমারীর স্বপ্নে সাম্যমৈত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিচিত্রার আবির্ভাব তার সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়াও মূল কাহিনির সঙ্গে সংযোগ রেখে হাসি ও তার পরিবারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটিতে উপস্থাপিত হয়েছে একটি উপকাহিনি; যেখানে শহর (বিশেষত কলকাতা) জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। হাসি ও তার পরিবারের কাহিনিটি উপকাহিনি হলেও মূল

কাহিনির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এছাড়াও রাজা অতুলেশ্বরের বংশের সনাতন ধনুক সম্পর্কিত উপকাহিনিটিও উপন্যাসের কাহিনির গুরুত্ব আরোপে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সর্বোপরি, ঔপন্যাসিকের 'বিচিত্রা; স্বপ্নবাণী; মিলন-রাত্রি' উপন্যাস তিনটি রোমান্টিক, সমাজ-সচেতন এবং দেশাত্মবোধক ভাবনার এক অসাধারণ সংমিশ্রণ; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সংমিশ্রণ এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বলা বাহুল্য, তৎকালীন সময়ের উত্তাল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে এরূপ সুসংহত প্লট নির্মাণ ঔপন্যাসিকের দক্ষতাপূর্ণ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক।

ত্রয়ী উপন্যাসে পাশ্চাত্যপ্রভাব- আলোচ্য উপন্যাসগুলি উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে রচিত। সেসময় বঙ্গদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্য সৃজনের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। সমালোচকের ভাষায়-

> *"উনিশ শতকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাঙালীর মানসিক ভূগোলের যে পরিবর্তন অনিবার্য হয়েছিল, তার সূত্রেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ও সম্ভোগের সুবর্ণ সুযোগ এসেছে, এবং তার মধ্যদিয়ে বাঙালীর সৃজনশীল প্রতিভা পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে বাঙ্‌লা উপন্যাস রচনায় আগ্রহী হয়েছে।"*[৩]

উল্লেখযোগ্য স্বর্ণকুমারী দেবী ইংরাজি সাহিত্যে ছিলেন পারদর্শী আর তৎকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতিও ছিল ইংরাজিয়ানার প্রভাবযুক্ত। এরফলে সমাজ সচেতন ঔপন্যাসিক সেসময়ের পাশ্চাত্য ভাবধারা বঙ্গদেশে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বাস্তবিক চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। নীচে আলোচিত ত্রয়ী উপন্যাস তার যথার্থ নিদর্শন।

'ত্রয়ী' উপন্যাসে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া, কুসংস্কার ও প্রথাগত চিন্তাভাবনার পরিবর্তে যুক্তি-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে নারীদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া নারীর মেধা ও বুদ্ধির প্রকাশ ঘটিয়ে তাদের শক্তি তথা ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তারফলে সার্বিক মঙ্গল সূচিত হওয়া পাশ্চাত্য লিঙ্গ সমতার ধারণার বহিঃপ্রকাশ যা উপন্যাসে মিসেস্ ক্লাউডেনের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে-

> *"আপনাদের স্ত্রীজাতি যখন শক্তিময়ী হয়ে উঠবে, লোকশিক্ষায় সমাজ যখন প্রবল হয়ে উঠবে, তখনই কি আপনাদের জাতীয় যোগ্যতা প্রকৃত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে না?"*[৪]

উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্রেও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব উপেক্ষিত হয়নি, রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ী যেরূপ দেশীয় সংস্কৃতিকে ভালোবাসেন ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষার আধুনিক ভাবাদর্শকেও সানন্দে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ীর পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের নারীর আত্ম-বিকাশকে গুরুত্ব প্রদান করে নারীর অসহায় অবস্থার পরিবর্তে এক নতুন ভাবাদর্শকে তুলে প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় মিসেস্ ক্লাউডেনের বক্তব্যের মাধ্যমে-

> *"শিক্ষাতে মেয়েদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয় না, তাদের কার্য্য-পরিসর কেবল বাড়ে, তাদের স্নেহ-মমতা ঘরের সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে ছোটে। তোমার জ্যোতির্ময়ী আমার এই কথারই দৃষ্টান্ত।"*[৫]

এরূপ ধারণা তৎকালীন বঙ্গসমাজে বিরল ছিল কিন্তু আলোচিত উপন্যাস তিনটিতে ঔপন্যাসিকের ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে নারী শিক্ষার বিস্তৃতি ও সামাজিক নিয়ম-কানুন পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়াও কলকাতার রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সমাজ-বিপ্লবের তরঙ্গে নারী চরিত্রের গঠন ইত্যাদি প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভূমিকা রয়েছে; যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা অতুলেশ্বর ও শরৎকুমারের আধুনিক মানসিকতার প্রতিফলনের মাধ্যমে। এছাড়াও বিজনকুমারের চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গি দ্বারা পাশ্চাত্য ভাবধারার বহিরঙ্গ অনুকরণের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়; আর তাই বিজনকুমার রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে ইংরেজি কবিতার লাইন আবৃত্তি করেছে-

> *"Eain, would I climb, / but that I fear to fall"* - [৬]

তৎকালীন সময়ে মেয়েরাও যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল তার নিদর্শনও ঔপন্যাসিক হাসির ইংরেজি সাহিত্যানুরাগের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাই হাসি নিজের আবেগ প্রকাশকালে রাজা আর্থারের ছবির সঙ্গে রাজা

অতুলেশ্বরের চেহারার সাদৃশ্য খুঁজে পায় এবং রাজা আর্থারের উদ্দেশ্যে টেনিসনের নামক 'Idylls of the King' কাব্যগ্রন্থে উল্লেখিত কবিতার লাইনগুলি পড়ে-

> "But who can gaze upon the sun in / heaven! / He is all fault who hath no fault at / all- / For who loves me must have a touch / of earth- / The low sun makes the colour-"[৭]

উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্রেও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব উপেক্ষিত হয়নি, রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ী যেরূপ দেশীয় সংস্কৃতিকে ভালোবাসেন ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষার আধুনিক ভাবাদর্শকেও সানন্দে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ীর পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

তাছাড়াও ঔপন্যাসিক বাংলা শব্দের মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করেছেন, এমনকি ইংরেজি বাক্যেরও ব্যবহার করেছেন উপন্যাসে। বলা বাহুল্য, সেসময় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সাহিত্য রচনায় ইংরেজি শব্দ তথা ভাষার প্রয়োগ করা বাস্তবমুখী প্রতিফলনেরই সাক্ষ্য বহন করে।

উল্লেখযোগ্য ক্লাউডেন সাহেব ও তাঁর পত্নীর চিন্তাধারার যুক্তিসহ সমর্থন রয়েছে উপন্যাসে কিন্তু সবক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুকরণ করাকে ঔপন্যাসিক সমর্থন করতে পারেননি; তাই উপন্যাসে অনাদি যখন হিংসা তথা রক্তপাতের মাধ্যমে ফ্রান্সের দাসত্বমুক্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরে তখন ঔপন্যাসিকের লেখনীতে জ্যোতির্ময়ীর তীব্র প্রতিবাদ ঘোষিত হয়-

> *"সে দৃষ্টান্ত আমাদের আদর্শ হ'তে পারে না। সেই ভীম বীভৎস নিষ্ঠুরতা মনে করলেও কষ্টে-আতঙ্কে দেহের রক্ত জল হয়ে যায় আত্মা করুণায় বিগলিত আর্দ্র হয়ে ওঠে। ও রকম বিজাতীয় অনুকরণের কথা ভুলেও মনে এনো না ভাই। আমাদের বলীয়ান্ হ'তে হবে ধর্ম্মের বলে, নৈতিক বলে। দৈহিক বলের সার্থকতা সেইখানেই, যেখানে এই শক্তি আধ্যাত্মিক বলের সহায়স্বরূপ। ইংরাজকে 'মারা-কাটা' দূরে থাক, বিপন্ন হ'লে তাদেরও রক্ষা করতে হবে আমাদের।"*[৮]

তাই দেখা যায় ঔপন্যাসিক বিদেশী জাতির গুণের উৎকর্ষকে গ্রহণীয় মনে করলেও বিদেশী অনুকরণে পীড়ন-নীতি, অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষেত্রে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

> *"অনুকরণাতিশয্যের কুফল সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন বলে তাঁর উপন্যাসে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সুন্দর পরিণাম লক্ষিত হয়। আবার পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার এই সহজ স্বীকরণের মধ্যে তাঁর মানসিক ঔদার্যের পরিচয়ও প্রচ্ছন্ন।"*[৯]

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর রচনার মাধ্যমে উনিশ শতকের শেষভাগের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও সামাজিক বিবর্তনের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন, সেখানে প্রাধান্য পেয়েছিল যুক্তি এবং মানবতাবাদ। তাই রচনার উৎকর্ষ সাধনে স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনায় পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতিফলন নির্দ্বিধায় সার্থকতা অর্জন করেছে।

ত্রয়ী উপন্যাসে সংগীতপ্রয়োগ- সংগীত সাহিত্যের বিষয়বস্তু, চরিত্র এবং আখ্যানের গভীরতা প্রকাশে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। সংগীত সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এমন একটি মাধ্যম যা খুব সহজেই মানুষের মনকে স্পর্শ করে। স্বর্ণকুমারী দেবী নিজে গান লিখতেন তথা একজন সংগীতজ্ঞ ছিলেন একথা সর্বজনবিদিত। এক্ষেত্রে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য

> *"রবীন্দ্রনাথের মতো নিয়মিত না হলেও অনেক সময়ই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে গান রচনা করেছেন স্বর্ণকুমারীও।"*[১০]

এছাড়াও লেখিকার সংগীত চর্চা সম্পর্কে অন্যান্য সমালোচকও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। ফলত একজন সংগীতানুরাগী হওয়ার দরুণ তাঁর রচনায় সংগীতের প্রভাব থাকা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। গানের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলির অন্তর্জগৎকে গভীর ও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ত্রয়ীর গানগুলি এক্ষেত্রে যথার্থ নিদর্শন।

সংগীতের মাধ্যমে এই তিনটি উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ, চরিত্রের মানসিক অবস্থা (প্রেম, বিরহ, আনন্দ, বেদনা) এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির বর্ণনা এবং কাহিনির গভীরতা সূচিত হতে দেখা যায়। নিম্নে প্রদর্শিত দৃষ্টান্তগুলি তার সাক্ষ্য বহন করে। যেমন-

'ত্রয়ী'র 'বিচিত্রা'য় প্রথমেই দেখা যায় সদা হাস্যময়ী হাসির অব্যক্ত মনের কথা প্রকাশিত হয়েছে সংগীতের মাধ্যমে। তাই শরৎকুমারের বিদায়কালে একাকী মনের অব্যক্ত ভাব প্রকাশ করতে হাসি গেয়েছে-

"মনে রইল ও সই মনের বেদনা! / প্রবাসে যখন যায় গো সে- / তারে বলি বলি আর বলা হোল না!" [১১]

এরপর জ্যোতির্ময়ীর শিশুকৃষ্ণ বেশকে উদ্দেশ্যে করে হরিরামের গাওয়া গান-

"নাচে আমার গোপালমণি দেখবি যদি আয়, - / তার-পীতধরা মোহনচূড়া, নূপুরের বাজে পায়।" [১২]

সংগীতের উৎকর্ষ সাধনে ঔপন্যাসিক যাত্রাগানেরও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন-

১) *"আমরা মোদের রাজারেই জানি; / সূর্য্য-চন্দ্রের না ধারি ধার যমকে না মানি।"* [১৩]

২) *"শ্রীবৃন্দাবনে-ও গো শ্রীবৃন্দাবনে- / ধরা দিল আমার শশী রাধিকার সনে।"* [১৪]

৩) *"প্রেমের বন্যা উথলে যখন ওঠে গো মনে- / আঁধারের বাঁধ আপনি যায় টুটে-"* [১৫]

এরপর জ্যোতির্ময়ীর উদ্যোগে পরিচালিত ব্যায়াম-সমিতির পরীক্ষা উৎসবের সূচনা হয় গেরুয়াবস্ত্রসজ্জিত ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণবেশী বালকদের গানের মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকের সচেতন মানসিকতার দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বিচিত্রা'র ইতি হওয়ার পূর্বে উপন্যাসের মূল বিষয় 'সাম্যমৈত্রীর অধীশ্বরী দেবী বিচিত্রা'র বন্দনা-গীতিও রয়েছে; যেখানে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে-

"প্রণাম করি, তোমায় প্রণাম করি, - / দেবি বিচিত্রা, জননী, মিত্রা, / নিখিলকালে বাহ সাম্য তরী, -প্রণাম করি।" [১৬]

তাই উপন্যাসে ব্যবহৃত গানগুলি চরিত্রের মানসিক অবস্থা এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে রচিত একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

এরপর 'স্বপ্নবাণী' উপন্যাসে উপস্থাপিত গানগুলির মাধ্যমে সেসময়ের উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজের নারী-পুরুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম, আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়। নীচে তুলে ধরা গানগুলি তার তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন, যেমন- উপন্যাসের সূচনায় রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর স্বরিচিত গাওয়া গান-

"মনটি ওরে, ভাল ক'রে / ভাসতে শেখো ভাসতে শেখো; / সাঁৎরে উঠতে হবে কূলে / এই কথাটি মনে রেখো।" [১৭]

এরপর হাসির গাওয়া গান-

"আহা মরি মরি আজি জোয়ারে লেগেছে ঢল! / ওরে স্রোত তরী মোর চল বেগে ছুটে চল্।" [১৮]

তারপর হাসির অনুরোধে রাজা অতুলেশ্বরের কণ্ঠেও শোনা যায় গান, আবার রাজার অনুরোধে হাসিও পুনরায় গান গেয়েছে। উপন্যাসে চরিত্রগুলির মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতি সবকিছুই গানের মাধ্যমে খুব সহজভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

উল্লেখযোগ্য রাজা অতুলেশ্বরের কণ্ঠে যে গানগুলি রয়েছে তা 'রাজা' চরিত্রটির মানসিকতা প্রকাশে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। 'মূলতান রাগিণী'তে গাওয়া রাজার গানটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য-

"বড় একেলা গো বড় একেলা! / দুপুর সন্ধ্যা সকালা"- [১৯]

রাজার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনার চিত্র ফুটে উঠেছে উপরিউক্ত গানটির মাধ্যমে। এরপর রাজা অতুলেশ্বরের স্বরচিত একটি গান, যা রাজকুমারীর মনের গভীরে বিশেষ স্থান দখল করেছে তা দেশানুরাগের স্পর্শে রঞ্জিত তাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

"বড় সাধ, বড় আশা, বড় আকিঞ্চন / পরাতে, জননি, তোরে রত্ন-আভরণ!" [২০]

পরিশেষে 'ত্রয়ী'র শেষ উপন্যাস 'মিলন-রাত্রি'তে দেখা যায় দেশোদ্ধারের জন্য ব্যাকুলতা, যা প্রধান চরিত্রগুলিকে বিকশিত করেছে। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের রচনায় 'সংগীত সংযোজন' শৈলীটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে উপন্যাসটির প্রধান চরিত্রগুলির মানসিকতা প্রকাশে। নীচে তার কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হল-

বঙ্গ-বিভাগের পরিণতিস্বরূপ সেসময় দেশের শাসননীতির বিরুদ্ধে যে অশান্ত তথা চাঞ্চল্যপূর্ণ পরিস্থির সৃষ্টি হয়েছিল তার নিদর্শন রয়েছে উক্ত উপন্যাসে; যেখানে দেখা যায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করতে সমগ্র বাংলার নেতৃগণ

একত্রিত হয় প্রাসাদপুরে এবং মিছিল ও সভার আয়োজন করা হয়। মিছিল এবং সভায় দেশ মাতৃকার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় একের পর এক দেশাত্মবোধক গান, যেখানে শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-

> *"বন্দে মাতরম্ ব'লে, - / আয় রে ভাই দলে দলে! / হই রে আগুয়ান, যায় যা'বে যা'ক প্রাণ, - / মায়ের কাজে আত্মদান, কর্‌ব সবাই কুতূহলে।"* [২১]

এরপর কন্‌ফারেন্সে রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর স্বরচিত গান আরম্ভ হয়-

> *"কেমন ক'রে বলব তোরে ভালবাসি কত, / মা গো ভালবাসি কত!"* [২২]

কন্‌ফারেন্সে গাওয়া দ্বিতীয় গানটিও দেশাত্মবোধক সুরেই রঞ্জিত-

> *"ভাই রে চিরদিন কি শিশুর মত রবে? / পল্‌তে ঝিনুক ফেলে দিয়ে চুমুক ধর্‌বে কবে- / ও ভাই চুমুক ধর্‌বে কবে?"* [২৩]

উল্লেখযোগ্য দেশানুরাগে রঞ্জিত চরিত্রগুলি তাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশকালেও মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে গান; যেমন রাজা হাসির সম্মুখে নিজেকে উন্মুক্ত করে গেয়েছেন-

> *"ভেসেছি স্রোতের টানে / কূলে কি অকূলে কে জানে? / তরঙ্গ-ছন্দে কুহক আনন্দে / মনতরী চলে বেগে বাধা না মানে।"* [২৪]

এরপর রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর তাৎপর্যমণ্ডিত গানটিও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

> *"ভিখারীর শূন্য ঝোলা, -রইল তোলা / হলো না-পারে যাওয়া"* [২৫]

কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায় আরও অনেক গান। উপন্যাস পরিণতিতে পৌঁছানোর পূর্বে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বন্দনাগীতিরও বহুল প্রয়োগ উপন্যাসটির সার্বিক মূল্যায়নে পূর্ণতা দান করেছে। যেমন নীচে তুলে ধরা গানটির মাধ্যমে রাজা অতুলেশ্বর ও রাজকুমারীর করুণাময়ী ঈশ্বরের প্রতি করুণ আকুতি প্রকাশ পেয়েছে-

> *"বহুক ঝটিকা ঝড়, কাঁপায়ে চেতনজড় / ভবের তরঙ্গে যেন না বিচলে এ হৃদয়। / ধরিয়া চরণ যাঁর বিচরি এ পারাবার / পুণ্য শক্তিমান তিনি পরম মঙ্গলময়! / দয়া কর-দয়া কর-দয়া কর দয়াময়!"* [২৬]

এছাড়াও রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক স্তোত্রগানেরও উল্লেখ করেছেন-

> *"তুঁহি একমেবাদ্বিতীয়ং সত্য সুন্দর শিব! / দেহ করুণা-কর করুণা বিভো! / তুমি, অরূপ অপরূপ, সচ্চিদানন্দরূপ! / তব প্রেমরূপে ভরা-নিখিল ভব।"* [২৭]

এরপর দেখা যায় গানের মাধ্যমেই পিতাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার সুযোগ পেয়ে রাজকুমারী ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেছেন।

এমনকি উপন্যাসের পরিসমাপ্তিকালে রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ী ইহলোক ত্যাগ করার প্রাক্‌মুহূর্তেও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেশ-মঙ্গল-ব্রত ধারণের ইংগিত দিয়ে সহাস্যে পূর্ণ কণ্ঠে সুস্পষ্ট উচ্চারণে গান গেয়েছেন-

> *"অসতো মা সদ্গময়-তমসো মা জ্যোতির্গময়- / মৃত্যোর্মামৃতং গময়"-* [২৮]

সার্বিক বিচারে তাই বলা যায়, উপন্যাসের মূল কাহিনির পুর্ণাঙ্গ আস্বাদন লাভ করতে সংগীতের প্রয়োগ উপন্যাসের একটি অপরিহার্য উপাদান। এক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীর কৃতিত্ব নির্দ্বিধায় সার্থকতা লাভ করেছে।

বলা বাহুল্য আলোচিত ত্রয়ী উপন্যাসের গঠনশৈলী, পাশ্চাত্যপ্রভাব ও সংগীতপ্রয়োগ ইত্যাদি প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ দ্বারা সহজেই উপলব্ধ হয় যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিক সব্যসাচীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সমালোচকের ভাষায়-

> *"স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশোনা, এরূপ রচনা, সহৃদয়তা, এরূপ লেখার ভঙ্গি, বঙ্গদেশ বলিয়া নয়, অপর সভ্যতার দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।"* [২৯]

তথ্যসূত্র:

১. শাশমল, পশুপতি। স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য। বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৭৮, পৃ. ২৫৯।
২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, সম্পাদনা। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৯, বৈশাখ ১৪১৬, পৃ. ১১৪২।
৩. হাসান, ড. বদরুল। উনিশ শতক: নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস। জগৎমাতা পাবলিশার্স, ১৯৯০, পৃ. ৩৮।

৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, সম্পাদনা। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১১।
৫. তদেব, পৃ. ৯১৩।
৬. তদেব, পৃ. ৯১৯।
৭. তদেব, পৃ. ১১১৭।
৮. তদেব, পৃ. ৯৪৫।
৯. শাশমল, পশুপতি। স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫ ।
১০. ঘোষ, সুদক্ষিণা। স্বর্ণকুমারী দেবী (সাহিত্য অকাদেমি) । প্রথম প্রকাশ ২০০১, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ৯।
১১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, সম্পাদনা। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮১।
১২. তদেব, পৃ. ৮৯১।
১৩. তদেব, পৃ. ৯০০।
১৪. তদেব, পৃ. ৯০১।
১৫. তদেব, পৃ. ৯০১।
১৬. তদেব, পৃ. ৯৪০।
১৭. তদেব, পৃ. ৯৪৪।
১৮. তদেব, পৃ. ৯৮৪।
১৯. তদেব, পৃ. ১০০৮।
২০. তদেব, পৃ. ১০০৯।
২১. তদেব, পৃ. ১০১৮।
২২. তদেব, পৃ. ১০২২।
২৩. তদেব, পৃ. ১০২৩।
২৪. তদেব, পৃ. ১০৬৬।
২৫. তদেব, পৃ. ১০৬৭।
২৬. তদেব, পৃ. ১১২৫।
২৭. তদেব, পৃ. ১১২৯।
২৮. তদেব, পৃ. ১১৫৮।
২৯. পাল, সোমা। স্বর্ণকুমারী জীবন ও সাহিত্য। প্রবন্ধ-হীরেন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা ছোটগল্প সমীক্ষা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ স্বাধীনতা দিবস, ১৪১১, পৃ. ২৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, সম্পাদনা। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৯, বৈশাখ ১৪১৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (নবম খণ্ড) । মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০০৫-০৬।
২. হাসান, ড. বদরুল। উনিশ শতক: নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস। জগৎমাতা পাবলিশার্স, ১৯৯০।
৩. ঘোষ, সুদক্ষিণা। স্বর্ণকুমারী দেবী (সাহিত্য অকাদেমি) । প্রথম প্রকাশ ২০০১, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৩।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা ৭৩, নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ ইং ১৯৯২।
৫. শাশমল, পশুপতি। স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য। বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৭৮।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 303- 309
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.210

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর ‘রম্যাণি বীক্ষ্য’- এ দক্ষিণভারতের প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা

জয়িতা সুর, *গবেষক, সোনা দেবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঘাটশিলা, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 17.11.2025; Accepted: 23.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Subodh Kumar Chakrvarti, an eminent twentieth-century Bengali writer, was a remarkable and distinctive figure in the field of travel literature. His Rabindra Puraskar–winning twenty-four-part travel narrative *Ramyani Beekshya* stands out for its rich blend of observation, culture, and aesthetics. The title of the work is derived from a renowned verse of Kalidasa's *Abhijnana Shakuntalam*: "*Ramyani Beekshya Madhuraamshcha Nishamya Shabdaan,*" meaning "to behold the beautiful." In keeping with this idea, the text reflects the author's refined experience of perceiving beauty through sight, sound, thought, and imagination. Across its twenty-four episodes, the book presents vivid descriptions of people, landscapes, and events encountered in the course of travel. Chakraborty's sensitive nature-awareness, combined with his reflections on religion, history, society, and culture, enriches each narrative. His sharp observational skill and unique style illuminate various regional settings and their deeper significance. A notable feature of *Ramyani Beekshya* is the author's sustained interest in Indian regional languages and literatures. As a literature-lover and a naturally inquisitive traveler, Chakraborty often introduces discussions on the linguistic and literary heritage of the places he visits. The present article focuses on four chapters of the book dealing with South Indian travels—Andhra, Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka. It examines Chakraborty's portrayal of the four major South Indian languages and their rich literary traditions. Through this study, the analysis highlights how *Ramyani Beekshya* not only documents travel experiences but also offers valuable insights into India's diverse linguistic and cultural history.

Keywords: Regional language, literature, poetry, drama, fiction, literary movements, periodicals, optimism in literary practice

মানুষের চিন্তা, অনুভব ও ইচ্ছের অন্যতম প্রকাশমাধ্যম ভাষা। ভাষার অন্যতম পরিশীলিত শৈল্পিক প্রকাশরূপ সাহিত্য। শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে সাহিত্য মানব জীবনচর্যার গুরত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে, সাক্ষী হয়ে থেকেছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের; মানবিক অনুভূতির। সেই সূত্রেই উপন্যাস রসসিক্ত ভ্রমণ কাহিনি ‘রম্যাণি বীক্ষ্য’-এর বিবিধ পর্বে ভারতবর্ষ ও তার বাইরের বিভিন্ন প্রদেশের ভ্রমণপথের বিভিন্ন মুহূর্তে উঠে এসেছে সাহিত্য প্রসঙ্গ, যার একটি বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যচর্চা। সচেতন, কৌতুহলী ও জীবনরসিক লেখক

সুবোধকুমার চক্রবর্তী সুনিপুণ দক্ষতায় এই বিষয়টিকে আকর্ষণীয়ভাবে 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এর কাহিনি বর্ণনায় অন্তরীভূত করেছেন।

'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এর কেরল পর্বে মালায়ালাম সাহিত্যের কবি উল্লুর এস. পরমেশ্বর আইয়ার কর্তৃক প্রচলিত এক মতের মাধ্যমে সাহিত্যপথের কৌতূহলী পাঠক জানতে পারে, বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে প্রচলিত দ্রাবিড় ভাষা পড়মতামিল থেকে দক্ষিণভারতের চারটি ভাষা তেলুগু, তামিল, মালায়ালাম ও কানাড়ীর উৎপত্তি হয়। 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এর অন্ধ্র, তামিল, কেরল ও কর্ণাট পর্বের ভ্রমণপথে কবি আইয়ার কথিত, পড়মতামিল জাত সেই চারটি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা কৌতূহলী পাঠকের সামনে বিন্দুতে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সাহিত্যসিন্ধুর উপস্থাপনা করেছে। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় দ্রাবিড়-ভারতীয় চারটি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য।

তেলুগু সাহিত্য:

দক্ষিণভারতের প্রধান চারটি ভাষার মধ্যে অন্যতম তেলুগু ভাষার সাহিত্য প্রসঙ্গ উঠে এসেছে 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এর অন্ধ্র পর্বে। এই পর্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ওয়ালটেয়ার থেকে মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে ট্রেনযাত্রায়, তেলুগু সাহিত্যের সূত্রধার হয়ে কাহিনিতে প্রবেশ ঘটে কথক গোপালের ভ্রমণপথের সহপথিক তেলুগু সাহিত্যে স্নাতক, স্কুল শিক্ষক, তেলুগুভাষী রাজলুর। রাজলুর মনোজ্ঞ আলোচনায় তেলুগু সাহিত্যের অজানা অধ্যায় এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তেলুগু সাহিত্যের সম্পর্ক বাঙালি পাঠকের সামনে আলোকিত হয়।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রে জাতীয় জীবনের নবজাগরণ হয়। পাশাপাশি ঊনবিংশ শতকের বঙ্গদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির নবজাগরণ অন্ধ্রের তেলুগু সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলেছিল। সেই প্রভাবে তেলুগু সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল কন্দুকুরি বীরেসলিঙ্গম পণ্ডুলু ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তারপর মৌলিক নাটক, উপন্যাস, আত্মজীবনী, নিবন্ধের পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি তেলুগু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। বিবর্তনের পথে শান্তিনিকেতনের ছাত্র, রবীন্দ্রসান্নিধ্যে ও রবীন্দ্র ভাবনায় প্রভাবিত রায়প্রলু সুব্বারাওয়ের হাত ধরে তেলুগু সাহিত্যে রাবীন্দ্রিক ধারা সঞ্চারের মধ্য দিয়ে এই প্রাদেশিক সাহিত্যে আধুনিকতার সঞ্চার হয়।

সাহিত্যে আধুনিকতার বার্তা বহনের পথে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রে 'সাহিতি সমিতি' নামে সাহিত্যগোষ্ঠীর জন্ম হয়। কবি তাল্লাবাড়ুর শিবশঙ্কর শাস্ত্রীর নেতৃত্বে এই গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাদী তথাপি সংস্কারমুক্ত সাহিত্যিকবৃন্দ 'সাহিতি ভারতী' সহ বিবিধ সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে তাঁদের লেখনীর প্রকাশ ঘটিয়ে আধুনিক তেলুগু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কবিসম্রাট বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ, 'উর্বশী-প্রবাসমু'র কবি দেবুলপল্লী কৃষ্ণশাস্ত্রী, পুত্তাপার্তি নারায়ণাচার্যলু, ভেঙ্কট সুব্বারাও-এর নাম উল্লেখযোগ্য। কবি শ্রীরঙ্গম শ্রীনিবাস রাও (শ্রী শ্রী) সমসাময়িক কাব্যজগতে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব সঞ্চার করেন। তাঁর খ্যাতি অন্ধ্রের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল। কবি ভেঙ্কট সুব্বারাও সাধারণ মানুষের জন্য সহজ ভাষায় কাব্যরচনা করেছেন। রাজলুর বক্তব্য অনুযায়ী অন্ধ্রের কবিরাই পরবর্তীতে কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

তেলুগু সাহিত্য সংক্রান্ত এই আলোচনায় কাব্যসাহিত্যের পাশাপাশি নাট্যসাহিত্যের কথাও উঠে এসেছে।অন্ধ্রে সাহিত্যজাগৃতির অন্যতম মাধ্যম ছিল নাটক। সূচনা পর্বে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে নাটক রচিত হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনতিপূর্বে মৌলিক নাটক রচনা শুরু হয়। কন্দুকুরি বীরেসলিঙ্গম পণ্ডুলুর বিবিধ সাহিত্য রচনা প্রসঙ্গে মৌলিক নাটকের কথা এসেছিল। তাঁর রচিত তেলুগু সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক 'রাজশেখর চরিত্রমু'। বাল্যবিবাহের মত জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যা ও তার কুফলকে কেন্দ্র করে গুরজাডা আপ্পা রাও সহজ ভঙ্গিতে তেলুগু ভাষায় মৌলিক নাটক 'কন্যাশুল্কম' রচনা করেন। গুডিপাটি ভেঙ্কটচলম পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে নাটক লিখেছেন। একই অনুসঙ্গে সাহিত্যরসিক সমাজে সমাদৃত নাট্যকার এ.ভেঙ্কটেশ্বর রাওয়ের নামও আলোচিত হয়েছে।

কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের পরে সাহিত্যালোচনায় কথাসাহিত্য প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনতিপূর্বেই গিভুগু ভেঙ্কট রামমূর্তি পণ্ডুলু তাঁর মনোগ্রাহী গদ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ তেলুগুভাষার স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দাবী করেছিলেন। সেই ধারাতেই জাতীয়তাবোধের ধারা তেলুগু সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। প্রথম মৌলিক তেলুগু ঔপন্যাসিক চিলকমতি লক্ষ্মী নরসিংহম তাঁর উপন্যাস, নাটক ও কবিতার মধ্য দিয়ে পাঠকদের মনে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'রামচন্দ্র বিজয়ম'। একাধারে কবিসম্রাট ও তেলুগু উপন্যাসের জনক

বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের উপন্যাস 'বেয়্যিপডগলু' তেলেগু সাহিত্যের অনন্য সম্পদ। এই সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের স্রষ্টা উন্নব লক্ষ্মীনারায়ণের লেখনীতে সমসাময়িক সমাজ জীবনের নিরাশা ও যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। অন্ধ্রের 'জেমস জয়েস' বুচ্চিবাবু (শিবরাজু ভেঙ্কট সুব্বারাও)-এর কথাসাহিত্যে মানুষের জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'চিভারাকু মিগিলেদি'। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের অনুবাদক হিসাবে প্রখ্যাত শিবরাম শাস্ত্রী তেলুগু কথাসাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প রচয়িতা। অন্যদিকে অন্ধ্রের 'মোপাসাঁ' গুডিপাটি ভেঙ্কটচলম বিখ্যাত কাব্যিক ভাষায় গল্প লেখার জন্য। তাঁর লেখা দুটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল, 'ময়দানম', 'স্ত্রী'।
তেলুগু সাহিত্য আলোচনার অন্তিম পর্যায়ে, অন্ধ্রের প্রগতিশীল লেখকবৃন্দের 'অভ্যুদয় রচয়িতল সঙ্ঘমু' নামক লেখক তৈরির প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রাজলুর একটি মন্তব্য সর্বকালের সাহিত্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে ধরা দিয়েছে,

> "পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের তুষারমণ্ডিত চূড়া দেখা যায় না। তা দেখতে হলে দূরে যেতেই হবে। আজকের সাহিত্যের সঠিক সমালোচনা করবেন আগামীকালের সমালোচক।"[১]

তামিল সাহিত্য:

তামিল পর্বের ২৯ তম অধ্যায়ে তাঞ্জোর স্টেশনের রেস্তোরাঁয় কফি পানের অবকাশে চিদম্বরম আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের ছাত্র, পেশায় উকিল, তামিল সুব্রহ্মণ্য 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এর কথক গোপালের সাহিত্যজিজ্ঞাসু মনের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন। সেই আলাপচারিতা সূত্রে জানা যায়, তামিল ভাষার সঠিক জন্ম সময় জানা না গেলেও দক্ষিণ ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে তামিল বর্ণমালা ও তামিল ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কবি ভাল্লুভার রচিত পবিত্র শ্লোক কবিতা 'তিরুক্কুরল', আনুমানিক পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন সন্ন্যাসী ইলাঙ্গো আদিগালের লেখা 'সিলরা পতিকারম' ('শিলাপ্পাতিকরম'), কবি চক্রবর্তী কাম্বান রচিত 'কাম্বারামায়ণ' ('রামবতারম') ইত্যাদি পৌরাণিক যুগের তামিল ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন। ইউ. ভি. স্বামীনাথ আইয়ার এই সাহিত্যিক নিদর্শনগুলির আবিষ্কার ও প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

আধুনিক তামিল সাহিত্যের জনক তামিলনাড়ুর জাতীয় কবি,দার্শনিক চিন্নাস্বামী সুব্রহ্মণ্য ভারতী এই সাহিত্যে আলোড়ন এনেছিলেন। দেশপ্রেমিক ভারতী, পরাধীন ভারতীয়দের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সমসাময়িক সময়ে তাঁর আন্দোলন তামিলসাহিত্যে নবজোয়ার এনেছিল। ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীঅরবিন্দের পন্ডিচেরিতে প্রথম পদার্পণের সময় এই দেশপ্রেমিক কবি সেখানে স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের সাথে মিলিত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আয়োজনের কথা ভেবেছিলেন। ক্ষণজন্মা এই মানুষটির জন্মদিন তামিলনাড়ুর জাতীয় উৎসব হিসাবে পালিত হয়। তাঁর লেখা একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'পাঞ্চালী শপথম', 'কান্নান পাট্টু', 'কুইল পাট্টু', 'বিনায়গর নানমানি মালাই' ইত্যাদি। দুঃশাসনের রক্তে বেণিবন্ধনের প্রাচীন কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'পাঞ্চালী শপথম' তামিল সাহিত্যরসিককে আবেগাপ্লুত করে। তামিল কাব্য প্রসঙ্গে জানা যায় সংগীত, ধর্ম ও কল্পনা বিলাসের জন্য জনপ্রিয় মাদ্রাজের রাজকবি পদ্মভূষণ ভেঙ্কটরামা রামলিঙ্গম পিল্লেই-এর কথা। তাঁর লিখিত পংক্তি তামিল সাহিত্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক। তাঁর সমসাময়িক কবি দেশকবিনায়কম পিল্লেই ধ্রুপদী রুচির ভাবনায় শক্তিশালী ছিলেন। তিনি তামিল সাহিত্যের প্রথম শিশু সাহিত্যিক। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শন 'মালারাম মালাইয়াম', 'আসিয়া জ্যোতি' ইত্যাদি। আধুনিক যুগের অন্যান্য তামিল কবিরা হলেন ভারতী দাসন, কম্ব দাসন, কোথমঙ্গলম সুব্ব প্রমুখ।

তামিল সাহিত্যক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ পরিসর রয়েছে। বিবিধ ভাষার ধর্মগ্রন্থ, ধ্রুপদী ও আধুনিক রচনার অনুবাদে এই সাহিত্য সমৃদ্ধ। 'কাম্বারামায়ণ' বাল্মীকির মূল রামায়ণের থেকেও সাহিত্যগুণে উৎকৃষ্ট। সুব্রহ্মণ্য ভারতী পতঞ্জলির যোগসূত্র এবং শ্রীমদ্ভগবতগীতার তামিল অনুবাদ করেছিলেন। কথাসাহিত্যের প্রথমদিকের লেখকদের মধ্যে 'কমলম্বল চরিত্রম'- এর লেখক রাজম আইয়ারের কথা জানা যায়। গোপালের তামিল কথাসাহিত্যপ্রীতি প্রসঙ্গে আলোচ্য পরিসরে উঠে আসে আধুনিক তামিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী 'কল্কি' ছদ্মনামে পরিচিত শতাধিক ছোটগল্প ও উপন্যাসের স্রষ্টা সাহিত্যিক রামস্বামী কৃষ্ণমূর্তির কথা। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাব ও বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প পাঠকের মনে নির্মল হাস্যরসের সঞ্চার করে। এছাড়া

অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রোমান্টিক উপন্যাস লেখক কুপ্পুস্বামী মুদালিয়র, 'গোবিন্দন' ও 'চন্দ্রকণ্ঠ'-এর মতো প্রসিদ্ধ চরিত্রস্রষ্টা জে. আর. রঙ্গরাজু, মনস্তাত্ত্বিক কথাসাহিত্যিক ও প্রথম সাহিত্যপত্রিকার (তামিল) সম্পাদিকা শ্রীমতি ভাই. মু. কোথাইনায়কি আম্মাল, নির্যাতিত জনগণের মুখপাত্র শঙ্কররাম এবং রিয়ালিজম টেকনিকে শ্রেষ্ঠ এস. ভি. ভি-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ ব্যতীত করুণানিধি, আন্না থুবাই, রামাইয়া, বালকৃষ্ণন, মহাদেবন প্রমুখও নিজস্ব প্রতিভার গুণে তামিল কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে এই আলোচনায় উঠে এসেছেন।

তামিলসাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনার অন্তিম পর্যায়ে তামিল সাহিত্যচর্চায় সাহিত্যপত্রের উল্লেখযোগ্য অবস্থানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে আর. মহাদেবন সম্পাদিত 'আনন্দ বিকটন' ও কল্কি (কৃষ্ণমূর্তি) এবং টি. সদাশিব সম্পাদিত 'কল্কি' নামাঙ্কিত অতি জনপ্রিয় দুটি সাহিত্যপত্রের পাশাপাশি প্রায় পাঁচশত তামিল সাময়িক পত্রের কথা জানা যায়। সাথে সুব্রহ্মণ্যের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জানা যায় যে, তামিল সংবাদপত্রে কেবলমাত্র সংবাদ বা বিজ্ঞাপন নয়; প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসও প্রকাশিত হয়, যা একাধারে পাঠকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে।

মালায়ালাম সাহিত্য:

কেরল পর্বের ২৪ তম অধ্যায়ে কোট্টায়াম থেকে এর্নকুলমের পথে ট্রেনে গোপালের আলাপ হয়েছিল নারায়ণ পিল্লাইয়ের সাথে। সেই আলাপচারিতা 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এর পাঠকদের সামনে মালায়ালাম সাহিত্য বিষয়ে অনেকখানি আলোকপাত করে। মালায়ালাম সাহিত্য মূলত মণিপ্রবাল শৈলিতে অর্থাৎ সংস্কৃত ও মালায়ালামের মিশ্রণে লেখা। যদিও মূল মালায়ালাম ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের কোন যোগসূত্র ছিলনা, মূলত নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দভান্ডার মালায়ালাম ব্যাকরণের মিশ্রণে মালাবার অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে এই কাব্যসাহিত্য সংস্কৃত ভাব, ভাষা ও ছন্দে রচিত হলেও চারশত বছর ধরে মালায়ালামের নিজস্ব প্রাচীন গান পত্তুর সঙ্গে এই ধারার মিশ্রণ ঘটে ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে সাহিত্যক্ষেত্রে এই মিশ্রণ স্থায়ী হয়। চতুর্দশ শতকে রচিত 'লিলাতিলকম' নামক গ্রন্থ থেকে মণিপ্রবাল শৈলি বিষয়ে জানা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি রামানুজন ইজহুত্তাসনের রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে সেই ভাষার সার্থক রূপ প্রথম প্রকাশ পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়। এই যুগের প্রথম কবি, মহাকবি কুমারণ আসান। তিনি একাধারে একজন দার্শনিক এবং সমাজ সংস্কারক ছিলেন। সমকালের সমাজ ও মানব জীবন তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর কবিতার অনুবাদে পাঠক সমৃদ্ধ হয়েছে। যেমন, মিহির সেন অনুদিত 'ঝরা ফুল' কুমারণ আসানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই অনুষঙ্গে আলোচিত হয়েছে 'ঝরা ফুল'-এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য,

> "পৃথিবীতে আমাদের পরিণতি ও এমনি ঝরা ফুলের মতন। ক্ষণিকের জন্য হলেও পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠতে হবে।...মানুষের সঙ্গে মানুষের একমাত্র সম্পর্ক হল প্রেম। প্রেমের থেকেই জন্ম হয়েছে এই পৃথিবীর। প্রেমই এর প্রেরণা, প্রেমই এর লক্ষ্য, প্রেমই জীবন।"[২]

পরবর্তী যুগে মালাবারের কবিসম্রাট ভাল্লাথোল নারায়ণ মেনন পৌরাণিক রীতিনীতি ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তে আধুনিক সমাজের সামাজিক বৈষম্য, নির্যাতিত মানুষের মুক্তির আকুতিকে সহজ ও বলিষ্ঠ ভাষায় কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত করে মালাবারের প্রতি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'গুরু চিত্রম'। কাব্যরচনার পাশাপাশি কেরালায় সংস্কৃতির প্রসারে সংস্কৃতিমনস্ক এই ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক এবং কথাকলি চর্চার জন্য কেরালা কলামণ্ডলম প্রতিষ্ঠা করেন। কথাকলির প্রসারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। পরবর্তী যুগের মালয়ালী কবিদের মধ্যে ধ্রুপদী কবি উল্লুর. এস. পরমেশ্বর আইয়ার, কেশবন নাইয়ার, জি. শঙ্কর কুরুপ, কে এম পাণিক্কর এবং কৃষ্ণ পিল্লাইয়ের নাম উল্লেখ্য।

আলোচ্য অধ্যায়ে মালায়ালম সাহিত্যের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রটিও উঠে এসেছে। মালায়ালম সাহিত্যক্ষেত্রে সংস্কৃত, বাংলা ও বেশ কিছু বিদেশী ভাষার নাটকের অনুবাদ হয়েছে। কবি ভাল্লাথোল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর সংস্কৃত নাট্যকার ভাসের নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত মৌলিক নাটকের অভাব ছিল। কবি ভাল্লাথোলের শিষ্য কে.এম. পাণিক্কর ধ্রুপদী ও আধুনিক কাব্যরীতির মিশ্রণে এই সাহিত্যে মৌলিক নাটক রচনা শুরু করেন।

নারায়ণ পিল্লাই এবং কথক গোপালের মনোগ্রাহী আলাপচারিতায় মালায়ালাম গদ্যসাহিত্য ক্ষেত্রটিও পাঠককে সমৃদ্ধ করেছে। নাট্যচর্চার মত এই প্রাদেশিক গদ্যসাহিত্য ক্ষেত্রটিতেও অনুবাদ চর্চার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বাঙালি উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের উপন্যাস মালায়ালাম ভাষাতে অনুদিত হয়েছে। পরবর্তীতে টি. এন. আপ্পু, চান্দু মেনন, টি. কে. রামন, এ. এন. পড়ুভাল, রামবর্মা আপ্পন থম্পূরণ, কৃষ্ণণ আইয়ার, সি. ভি.রমন প্রমুখ ঔপন্যাসিক তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে এই সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কেরলের নবজাগরণের অগ্রদূত চান্দু মেননের লেখা এই সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'ইন্দুলেখা'। উপন্যাসের পাশাপাশি গদ্যসাহিত্য ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের অনুবাদ শুরু থেকেই মালয়ালী সাহিত্যে জনপ্রিয়। মানবতাবাদী ছোটগল্পকার পদ্মশ্রী ভাইকম মুহাম্মদ বসীরের গল্পে আছে মালাবারের মুসলমানদের কথা, ঠিক তেমনি সমাজসংস্কারক ও লেখিকা পার্বতী অন্তর্জানমের (পার্বতী নেনমেনিমঙ্গলাম) লেখায় রয়েছে অসূর্যম্পশ্যা নারীর রূপ। শ্রীমতি সরস্বতী আম্মার গল্পে নারীমুক্তির জয়গাথা। কারুর নীলকণ্ঠ পিল্লাই একজন রোমান্টিক ভাবনা প্রকাশে উজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র লেখক। ছোটগল্প প্রসঙ্গে কথোপকথনে উঠে এসেছে 'জীবাঠ সাহিত্য গোষ্ঠী'র কথা। এই গোষ্ঠীর তরুণ লেখকবৃন্দ সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকে পরিবর্তন আনতে চাইলেও তাঁদের লেখায় কখনো কখনো ঐতিহ্যের মর্যাদার পরিবর্তে শ্রেণিবিদ্বেষ, মনোবিচারের ক্ষেত্রে মনোবিকার এবং আরো কিছু উচ্ছৃংখলতা দেখা দেওয়ায় সাহিত্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে তাঁদের কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গি ও যুগচেতনা সাহিত্যের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করার আশা তৈরি করে। এঁদের মধ্যে শিবশঙ্কর পিল্লাই, পি. কেশবদেব, এস. কে. পট্টেকাট প্রমুখ নাম উল্লেখযোগ্য। পিল্লাইয়ের লেখায় যেমন আছে অন্তর্দৃষ্টি ও সমাজচেতনা তেমনি পট্টেকাট নিপীড়িত জনগণকে দেখেছেন সহানুভূতির চোখে। একাধিক সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত কেশবদেব ছিলেন প্রগতিশীল মালায়ালাম সাহিত্যের অন্যতম অগ্রদূত।

মালায়ালম সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম লিখেছিলেন গোবিন্দ পিল্লাই। পরবর্তীতে নারায়ণ পাণিক্কর চারখণ্ডে এই সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। মালায়ালম সাহিত্যের প্রবন্ধের ইতিহাস অনুবাদ বা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত সমৃদ্ধ না হলেও এই ভাষা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। যেমন, সমালোচনা সাহিত্য এবং রম্যরচনার ক্ষেত্রটি ধীরে ধীরে নিজের স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করছে। সমালোচনার সাহিত্য ক্ষেত্রে বালকৃষ্ণ পিল্লাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। সব মিলিয়ে মালয়ালম ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিচ্ছে।

কানাড়ী সাহিত্য:

কর্ণাট পর্বের ২৩ তম অধ্যায়ে রেলের এনকোয়ারি অফিসারের সহযোগিতায় গোপালের আলাপ হয়েছিল জার্নালিস্ট মিস্টার কৃষ্ণরাও-এর সাথে। সেই আলাপচারিতা পাঠককে কানাড়ী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সমৃদ্ধ করে তোলে। কালো মাটির দেশ কর নাড়ু। ভাষাগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারই নাম কর্ণাট বা কর্ণাটক সেখানকারী সরকারি ভাষা কন্নড়। নবম শতাব্দী থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত এই সাহিত্যটি জৈন, বীরশৈব ও রোম্যান্টিক যুগ প্রভাবকে আত্মস্থ করে নিজের ধারা অক্ষুন্ন রেখেছে। হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর ধ্বংসের পরবর্তীতে মুসলিম ও মারাঠী অধ্যুষিত এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে কানাড়ী ভাষার সমাদর লুপ্ত হওয়ার পর ভাষাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। মহিসুরের মহারাজারা প্রায় আড়াইশো বছর ধরে এই ভাষা প্রসারের চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ তাঁদেরই কৃতিত্ব। এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে কানাড়ী সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়। আধুনিক সময়ে কর্ণাটক বিদ্যাবর্ধক সংঘ সাহিত্যের বিকাশে এগিয়ে আসে। তাদের প্রথম সাহিত্যপত্র 'বাগভূষণ' কানাড়ী সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপরই ধীরে ধীরে এই প্রাদেশিক সাহিত্যে অগ্রগতি সাধিত হয়।

মালায়ালাম সাহিত্যের মতোই কানাড়ী গদ্যসাহিত্যও প্রথমদিকে অনুবাদচর্চায় সমৃদ্ধ ছিল। বাংলা, মারাঠি, সংস্কৃত ও ইংরেজি উপন্যাস এই ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস কানাড়ী সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। মৌলিক উপন্যাস ধারায় প্রথমেই যাঁর কথা জানা যায় তিনি ঔপন্যাসিক গলগনাথ (ভেঙ্কটেশ তিরাকো কুলকার্ণি)। তাঁর লেখা দুটি মৌলিক উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠে এসেছে। প্রথমটি বিজয়নগর প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পটভূমিতে লেখা 'মাধব করুণাবিলাস' এবং দ্বিতীয়টি একটি সামাজিক উপন্যাস 'কেরূর ইন্দিরা'। একই অনুসঙ্গে এম. এস. পুটন্না, কে. ভি. পুট্টপ্পা, কোটা শিবরাম

করন্থ, আর. ভি. জাগীরদার, বাসবরাজ কট্টিমনি, আর. এস. মুগলি, মিরজী আন্নারাও, বিনায়ক কৃষ্ণ গোকাক, এ. এন. কৃষ্ণরাও প্রমুখ উল্লেখযোগ্য লেখকের অবদানকে স্মরণ করা হয়েছে; যাঁরা ইতিহাস এবং সামাজিক পটভূমি সহ বিভিন্ন বিষয়কে তাঁদের কাহিনিতে তুলে ধরেছেন। জ্ঞানপীঠ সম্মানে ভূষিত সাহিত্যিক করন্থকে ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ 'আধুনিক ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ' বলে চিহ্নিত করেছেন। সাহিত্যিক গোকাক জ্ঞানপীঠ ও পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। একই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় শ্রীনিবাস ছদ্মনামে খ্যাত, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত মাস্তি ভেঙ্কটেশ্বর আয়েঙ্গারের কথা। তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ লেখনীর মধ্য দিয়ে তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প ও কাব্যসাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কোনো কোনো লেখকের লেখায় অবাস্তবতা ও অশ্লীলতা থাকলেও সবমিলিয়ে কানাড়ী উপন্যাস সাহিত্যের ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি ঘটেছে। পাশাপাশি ছোটগল্পের জগতে কেরূর বাসুদেবাচার্য, পঞ্জে মঙ্গেশ রাও, শ্রীনিবাস, জি. পি. রাজরত্নম, আনন্দ কন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। 'ভ্রমর' ছদ্মনামে খ্যাত সাহিত্যিক জি. পি. রাজরত্নম শিশুদের জন্য কলম ধরেছিলেন। আনন্দ কন্দ তাঁর লেখা প্রেমের গল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। কর্নাটকের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সাহিত্যচর্চার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যেমন বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীরাজাগোপালাচারী, কে. এম মুন্সী, আর. আর. দিবাকর প্রমুখ সাহিত্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে রঙ্গনাথ রামচন্দ্র দিবাকর একজন দক্ষ লেখক। তিনি তাঁর কারাজীবনের স্মৃতিকথা, উপনিষদ ও প্রাচীন কবিদের আলোচনাকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। উপন্যাস এবং ছোটগল্পের পাশাপাশি জীবনীসাহিত্য এবং রম্যরচনাও কানাড়ী গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নারায়ণ কস্তুরি প্রণীত সত্য সাঁই বাবার জীবনী 'সত্যম শিবম সুন্দরম' কানাড়ী জীবনী সাহিত্যের একটি মূল্যবান নিদর্শন।

কানাড়ী সাহিত্যে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে নাট্যচর্চা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিকদের অধিকাংশই নাট্যচর্চার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অকালপ্রয়াত নাট্যকার টি. পি. কৈলাসম নাট্যসাহিত্যে নিজের অবদানের জন্য 'কর্ণাটকের ইবসেন' নামে খ্যাতিলাভ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে আর. ভি. জাগীরদার, কোটা শিবনাথ করন্থ, সমসা (এ. এন, স্বামী ভেঙ্কটাদ্রি আইয়ার), বি. এম. শ্রীকণ্ঠিয়া প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার জাগীরদার তাঁর নাটকে চরিত্র সৃজন, সংলাপ রচনা ও কৌতুকরসের সঞ্চারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'সমসা' ছদ্মনামে খ্যাত ঐতিহাসিক নাট্যকার এ. এন, স্বামী ভেঙ্কটাদ্রি আইয়ার নাট্যজগতের কাছে 'কানাড়ী নাট্যসাহিত্যের শেক্সপিয়র'। নাট্যকার বি. এম. শ্রীকণ্ঠিয়ার গ্রিক ট্র্যাজেডি ধারায় লিখিত নাটক 'অশ্বত্থামান' কানাড়ী নাট্যসাহিত্যের একটি মাইল ফলক।

কানাড়ী সাহিত্য সংক্রান্ত এই আলাপচারিতায় গোপালের পথপ্রদর্শক সাংবাদিক কৃষ্ণরাও-এর কাব্যকবিতা বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তাই এই আলাপচারিতায় কাব্য-কবিতা সংক্রান্ত আলোচনা ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। সেই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় উঠে এসেছে পদ্মশ্রী ও জ্ঞানপীঠ সম্মানে সম্মানিত কবি দত্তাত্রেয় রামচন্দ্র বেন্দ্রের কথা। ছদ্মনামে (অম্বিকাতনয় দত্ত) খ্যাত এই কবিকে কানাড়ী কাব্যজগতে মালয়ালি কবি ভাল্লাথোলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সহজ কথ্যভাষায় জাগতিক প্রেম থেকে গভীর সামাজিক চেতনা- সবটাই ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে। প্রতীকী শব্দের ব্যবহারেও তিনি অনন্য। 'কৃষ্ণকুমারী', 'সখীগীতা', 'মেঘদূত' ইত্যাদি তাঁর রচিত কাব্যসংকলন গ্রন্থ। এই আলোচনাতেই উঠে এসেছে শিশু সাহিত্যিক, নবোদয় সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম সাহিত্যিক 'কবিশিষ্য' পঞ্জে মঙ্গেশ রাওয়ের প্রসঙ্গ। তিনি শিশুদের জন্য একাধিক ছড়া লিখেছিলেন এবং অনুবাদ করেছিলেন। আলোচনায় মনে হচ্ছিল, নৈর্ব্যক্তিক সাংবাদিক কৃষ্ণরাও অতীত বা ভবিষ্যতে নয় বর্তমানে বাঁচেন। তাই সমকালীন সমাজ এবং সময়ের নৈরাশ্যে কানাড়ী সাহিত্যের সমকালীন অগ্রগতি নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবুও শেষ পর্যন্ত এই আলাপচারিতার শেষে আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর শব্দে,

> "পৃথিবীর কোন দেশ আজ কোন আশা করতে পারছে না।... শুধু সাহিত্যে নয়, সমাজেরও এই অবস্থা। সাহিত্য তো সমাজেরই ছবি। সমাজের গোড়া মাটিতে শক্ত হবার পরেই সবুজ পাতায় সাহিত্য হবে মঞ্জরিত।"[৩]

এভাবেই 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এ দ্রাবিড়ভারতের ভ্রমণপথে অন্ধ্র, তামিল, কেরল, কর্ণাট পর্বে লেখক তাঁর সুনিপুণ বর্ণনশৈলিতে, সহজ-সরল আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে তেলুগু, তামিল, মালায়ালাম ও কানাড়ী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অজানা অধ্যায়ে আলোকপাত করে পাঠককে সমৃদ্ধ করেছে। জ্ঞানান্বেষীর কাছে ভ্রমণপথের এই মূল্যবান উপরি পাওনা নিঃসন্দেহে এক মনোগ্রাহী অভিজ্ঞান।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, সুবোধকুমার। রম্যাণি বীক্ষ্য। অন্ধ্র পর্ব। দশম সংস্করণ। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, বইমেলা ২০০৪, পৃ. ৮৭।

২. চক্রবর্তী, সুবোধকুমার। রম্যাণি বীক্ষ্য। কেরল পর্ব। পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা: লি:, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ফাল্গুন ১৩৯৩, পৃ. ২২০।

৩. চক্রবর্তী, শ্রীসুবোধকুমার। রম্যাণি বীক্ষ্য। কর্ণাট পর্ব। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: মহালয়া ১৩৬৭, পৃ. ২৩৬।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 310- 316
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.211

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পে সমাজ-দর্শন ভাবনা

অরূপ কুমার পাল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Literature is the mirror of society. It reflects the lifestyle, problems, aspirations, customs, values and beliefs of social people where social philosophy discusses the structure, functions, and changes of society. Social philosophy helps to understand the deeper aspects of society through literature. Literature written at a particular time reflects the social, economic and political conditions of the society at that time. Social philosophy analyzes those reflections and portrays a holistic picture of the society of that time. Literature and social philosophy are closely related to each other. Society and philosophy have had a profound impact on Bengali short stories. From the late 19th century to the early 20th century short stories have shed light on social and moral issues. The works of writers like Rabindranath Tagore, Sarat Chandra Chattopadhaya, Bibhutibhushan Bandhyopadhaya and others are particularly noteworthy in this genre. In their stories, they highlight the prevailing customs, superstitions, class discrimination, and the relationship between men and women. In the 20th century, the short story genre developed further and included politics, identity crises, existentialism and a variety of complex themes. Writers like Manik Bandhyopadhaya, Tarashankar Bandhyopadhaya, Adwaitya Mallabarman have portrayed political and social unrest, famine, partition and the struggle for human survival in their writings. Santosh Kumar Ghosh's short stories are influenced by the post 1930's period. Therefore, the social, political and economic problems of the post 1930's period can be observed in his works. His short stories deal with the civil unrest following World War II, partition, financial hardship, job crisis, prostitution, landlord-tenant relationships, Love, extramarital affairs, live-in relationships, psychological conflicts and the decline of morals are among the themes that emerge in his stories. Here, we have placed fifty of his short stories at the center of our discussion.

Keywords: Santosh Kumar Ghosh, Short stories, Society and Philosophy, Civic Issues of period, Relationships

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আর্থিক অনটন। যার জেরে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে শুরু করে কাজ হারানো এমনকি দাম্পত্য জীবনেও তার প্রভাব পড়েছিল। সন্তোষকুমারের ‘কানাকড়ি’ গল্পে পারিবারিক দাম্পত্য জীবনের মূল্যবোধের বিচ্ছেদের মূলে রয়েছে আর্থিক অনটন। সামান্য চাকুরিজীবী মন্মথের চাকরি চলে যাওয়ার পর পরিবারে আর্থিক সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। চাকরি চলে যাওয়ার পর কাজের সন্ধান করলে মন্মথকে দরখাস্ত নিয়ে আসতে বলেন বড়বাবু। চাকরি গেলেও স্বামীর প্রতি ভরসা

অটুট ছিল স্ত্রী সাবিত্রীর। বড়বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার জন্য পোশাক-পরিচ্ছেদ ঠিক রাখতে হবে। তাই বিয়ের আংটি খুলে সাবিত্রী মন্মথের হাতে দিয়ে বলেছিল, ''কাল একজোড়া জুতো কিনবে তুমি।''[১] কোন পরিস্থিতি তৈরি হলে বিয়ের আংটি স্ত্রী খুলে বিক্রির জন্য স্বামীর হাতে তুলে দেয় তা সহজেই আমরা বুঝতে পারি।

'পনেরো টাকার বউ' গল্পে কোম্পানির সেলস্ অর্গানাইজার গৌরাঙ্গ মণিমালাকে বিয়ে করে। তাদের একটি সন্তান হয়। সুখের সংসার অসুখী হয়ে পড়ে গৌরাঙ্গের চাকরি চলে যাওয়ায়। এখানে দেখা যায় অর্থ উর্পাজনের জন্য মণিমালাকে থিয়েটার নামতে বলে স্বামী। যার ফলে স্বামীর প্রতি স্ত্রী মণিমালার বিশ্বাসের ভীত টাল খায়। পরবর্তীতে দেখা যায় টাকাপয়সার অভাবের জেরে ভাড়া বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে চলে আসতে হয় তাদের। যেখানে বাড়ি ভাড়ার মূল্যের উপর নির্ভর করে বস্তির বউদের নামকরণ করা হয়েছে।

পরিবারের কর্তার আকস্মিক মৃত্যু হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনে যে আর্থিক বিপর্যয় নেমে আসে। আর সেই সংকট থেকে মুক্তি পেতে চরিত্রের স্খলনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। 'জোড় বিজোড়' গল্পে এমনই চিত্র ধরা পড়েছে। গল্পে সুসানের বাবা রিচার্ড ওয়েক এক রেল দুর্ঘটনায় মারা যান। সুসানের মা আর্থিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। আর্থিক সংস্থানের জন্য বাড়ির ভাড়াটিয়া স্যামুয়েলের সঙ্গে সুসানকে ঘনিষ্ঠ হতে বলতে দ্বিধা করেন না সুসানের মা। এখানে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমস্যার জেরে পেশাগত বদলও লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ নিশিকান্ত চক্রবর্তীকে পেট বাঁচাতে যজমানী ব্যবসা ছেড়ে শ্রমিক হতে হয়। 'দ্বিজ' গল্পে এমনই চিত্র ধরা পড়েছে সন্তোষকুমারের লেখনীতে। বস্তি আর মহিমপুর ক্যাম্পের শ্রমিকদের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পাই নিশিকান্ত, গড়ে উঠে সুসম্পর্ক। নিশিকান্তের মন গভীরে নাড়া দিয়ে বলে উঠে,

> ''মনের মধ্যে যে উঁচু নিচু বোধটুকু তখনও ছিল, বার কয়েক কেঁপে কেঁপে যেন সমতল হয়ে গেল। অদৃষ্ট নিশিকান্ত চক্রবর্তীর খোরাক এই অন্ত্যজ মানুষ গুলোর সঙ্গে একই শানকিতে বেড়েছে, আলাদা পংঙতিতে বিড়ম্বনা আর কেন।''[২]

আর্থিক সমস্যা জাতপাতের ভেদাভেদ ভুলে একই করে দিয়েছে সব শ্রেণির মানুষকে।

দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে গ্রামের দুই বোনকে নিজেদের ইচ্ছে মত কাজ করতে বাধ্য করে শহুরে বাবুরা। 'হোলি' গল্পে দুই বোন রেখা ও লেখার সঙ্গে এমনই আচরণ করে বিজনবাবু, পরিমলবাবু এবং রবিদা নামের তিন চরিত্র। আর্থিক বৈষম্যের শিকার হয় দুই বোন। উল্টে দুই বোনকে অপবাদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি শহুরে বাবুরা। এমনকি রেখার উপর মানসিক অত্যাচারও করেছে রবিদা। রেখার করুণ আর্তনাদ রবিদার কাছে ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসুস্থ মায়ের জন্য হাতে করে সন্দেশ নিয়ে যাওয়ার সময় রেখাকে চোর অপবাদ দেয় রবিদা এবং সপাটে গালে চড় বসায়। আবার দেখা যায়, রেখা গান গাওয়ার অক্ষমতার কথা জানালে রবিদা চিমটি কেটে রেখাকে দিয়ে ফের গান গাইয়েছেন এবং রবিদার মনে এক নিষ্ঠুর আনন্দ প্রকাশিত পেয়েছে। নৃশংস আচরণের মধ্যেও রেখার চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করে রবিদা বলে,

> ''ওসব মেয়ে কি টাইপের, জানতে আমার বাকি নেই, সব কুত্তির দাওয়াই জানি।''[৩]

অর্থাভাব কিভাবে মানুষের মনকে ছোট করে দেয় তার প্রমাণ হল 'ছোট কথা' গল্পটি। সরসিজ তার প্রাক্তন প্রেমিকা উষাকে স্বামী পরিমলের চিকিৎসার জন্য একশো টাকা দিতে চাইলে উষার মা সরসিজের কাছে টাকার জন্য হাত পাতে। স্বার্থান্ধ মায়ের পাশাপাশি গল্পে অন্য আরেকটি চিত্র দেখা দিয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির রাতে ফুটপাথবাসী এক ভিখিরি মেয়ে তার পরনের কাপড় খুলে তার বাচ্চাকে জড়িয়ে দিচ্ছে। বৈপরীত্য দুটি ছবি গল্পকার শিল্পসম্মত ভাবে গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। আসলে দারিদ্র্য মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ করে দেয় তেমনই রূপ প্রকাশ করতে চেয়েছেন গল্পকার।

'নকল' গল্পে বাড়ির কাজের মেয়ে সুখী সদ্য বিবাহিতা শীলা দিদিমণির নতুন রূপ দেখে মুগ্ধ। সুখী তারপর শীলা দিদিমণির মত নকল করতে থাকে। গল্পের শেষে সুখী বলে উঠে, ''দিদিমণির মতো সত্যিই কি আর আমরা হতে পারি! বড় জোর সাজতে পারি।''[৪] এই গল্পে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ছবি স্পষ্ট। দারিদ্র্য সুখীর মতো নারীদের ইচ্ছার

কোনো দাম দেয় না। তাই সুখী শশধরের দেওয়া টাকা ছুঁড়েও ফেলে দিতে পারে না। তার ইচ্ছা মেটাতে গিয়ে তাকে ধার করতে হয়েছে এবং সেই ধার মেটাবার জনাই অপমানিত বোধ করেও সুখী সেই টাকা ফেলে দিতে পারেনি।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে সংসারের হাল ধরতে বাধ্য হয়েই স্ত্রীকে পতিতা বৃত্তিতে নামতে হয়। 'কানাকড়ি' গল্পে নিজের চাকরি খুইয়ে মন্মথ স্ত্রীকে বিপথে যাওয়ার কথা জেনেও নিষেধ করতে পারেনি। মনের গভীরে সন্দেহ রেখেই মন্মথ একমুঠো ভাত মুখে নিয়ে সাবিত্রীকে বলে উঠে, ''তুমি বেশি মেশামেশি কোরো না। নিজে ঠিক থাকলেই হল। তোমাকে চিনি তো, খারাপ কিছু তোমার কাছে ঘেঁষতে পারে না।''[৫] একথা শুনে অবশ্য সাবিত্রীর মন ভরে গেল তার প্রতি স্বামীর ভরসা দেখে। গল্পে মল্লিকার হাত ধরেই সাবিত্রী দেহ-ব্যবসায় নামে। শশাঙ্কের পাশে বসে সিনেমা দেখলেও সাবিত্রী মন সায় দেয়নি।

'গিল্টি' গল্পে প্রেমিক সলিলের প্রস্তাবে প্রেমিকা সীতা দু'জনে মিলে শুরু করে দেহ ব্যবসা। এই ব্যবসাতে দু'জন দু'জনকে ঠকাতে চায়। ধরা পড়লে সীতা বলে আগরওয়ালার দেওয়ার ইয়ারিং গিল্টি, আর সলিল বলে আগরওয়ালার দেওয়া টাকা জাল। অর্থনৈতিক বিপর্যয় দুটি মানুষের মধ্যে রচনা করেছিল অবিশ্বাস! আর্থিক সংকট মানুষের মূল্যবোধকে কতখানি বিনষ্ট করেছিল গল্পটি তার অন্যতম নিদর্শন।

আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে প্রতুল চৌধুরীর মত ভোগবাদী লোক মানুষের জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছে, তাদের দেহে দিচ্ছে মারণ রোগ। বংশের একের পর এক সবাইকে তাদের করাল থাবা দিয়ে গ্রাস করছে। 'বিষকণ্ঠ' গল্পে দেখা যায় দেহ ব্যবসা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সুহাসের মধ্যে প্রতিবাদী সত্ত্বা জেগে উঠে। ভয়ঙ্কর ধ্বংসের হাত থেকে পরিবারের সকলকে রক্ষা করার অনুরোধ করে শুভেন্দুর হাত চেপে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, ''আপনাকে সেরে উঠতেই হবে শুভেন্দুবাবু, আমাদের সবাইকে সারিয়ে তুলতে হবে।''[৬]

পরিস্থিতির চাপে পড়ে সুরমাকে নিতে হয় হোটেলের কাজ। শুধু কাজই নয় হোটেলের অতিথিদের শয্যাসঙ্গিনীও হতে বাধ্য করেছিল সুরমাকে। হোটেলে আগত পুরুষদের কেউ কেউ সুরমার শরীর উপভোগ করার পর প্রতিশ্রুতি দেয় পরে এসে তাকে নিয়ে যাবে, তাকে এই কারাগার থেকে মুক্ত করবে। শেষ পর্যন্ত সুরমার কাছে সব প্রতিশ্রুতিই ঠুনকো হয়ে দাঁড়ায়। 'যাদুঘর' গল্পে সমাজের নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়ের দিকটি প্রস্ফুটিত হয়। এখানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের ছায়া লক্ষ্য করা যায়।

আর্থিক অনটনের জেরে 'কানাকড়ি' গল্পে যেমন পতিতা বৃত্তিতে নামতে হয়েছিল স্ত্রী সাবিত্রীকে তেমনি উল্টো চিত্রও দেখা যাচ্ছে 'ঘর' গল্পে। এখানে গল্পের নায়িকা কৃষ্ণকুন্তলা দেহ ব্যবসায় পরিচিত হওয়া জলধরের সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল। এমনকি অনিচ্ছা সত্ত্বেও জলধরের জীবিকা-সঙ্গিনী হয়েছিল কৃষ্ণকুন্তলা। এক একটি মেয়েকে কমিশনের বিনিময়ে পিছল পথে ঠেলে দিয়েছে কৃষ্ণকুন্তলা। তার মন আত্মগ্লানিতে ভরে গিয়েছে। নিজের ঘর বাঁধতে গিয়ে সে বহুজনের ঘর গড়ার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। তারপর দেখা যায় জলধরের আশ্বাসে টাল খায়। একদিন কৃষ্ণকুন্তলা জানতে পারে জলধরের স্ত্রী রয়েছে। তখন কৃষ্ণকুন্তলার উপলব্ধি,

> ''জলধরের জীবিকা সঙ্গিনীই থাকতে হবে বরাবর। জীবনসঙ্গিনী কোনওদিন হতে পারব না। সারাজীবন শুধু কদর্য বৃত্তির কদন্নে ভুরিভোজন।''[৭]

'শনি' গল্পের প্রেক্ষাপটে রয়েছে নিষিদ্ধ পল্লীর পতিতা মাতঙ্গের কথা। মাতঙ্গ স্বপ্ন দেখে ছোট বাড়িতে যেখানে সন্ধ্যাবেলায় শাঁখ বাজবে, ধূপ সুরভি ঠাকুর ঘরে স্নিগ্ধতা এনে দেবে। মাতঙ্গের যৌবন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পরের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ নেয়। নিজের গৃহিনী হওয়ার স্বপ্ন সে মেয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করতে চাই। মেয়ে যমুনাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য মাতঙ্গ নিয়ে আসে 'সমাজ সংস্কারক' অফিসে। সমাজ সংস্কারক অফিসে সম্পাদক গিরিজাবাবুর কথা মত প্রকৃত পরিচয় গোপন করে জনৈক বিপত্নীক ডাক্তার নরেশের সঙ্গে যমুনার বিয়ে হয়।

পরিবারে আর্থিক অনটন। তা থেকে সহজেই মুক্তি পেতে দেহ ব্যবসার পথ খুঁজে নেওয়া হয়। কিন্তু অর্থই শেষ কথা বলে না। শেষ কথা বলে মন। আর সেই মনের মধ্যে শুরু হয় নিজের মনের দ্বন্দ্ব। যে দ্বন্দ্ব থেকে তৈরি হয় সম্পর্কের টানাপোড়েন। যা কিনা বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক বা পরকীয়া হিসেবেই চিহ্নিত সমাজে। আপাত দৃষ্টিতে খুব সহজ মন হলেও এর পেছনে থাকে নানান ধরনের সূক্ষ সূক্ষ বিষয়। সমাজের চোখে সুন্দর দাম্পত্য জীবনের মনের গহনে চলতে থাকে এরকমই নানাবিধ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব নিকেষ।

'প্রথম' গল্পে আপাতদৃষ্টিতে সন্তানহীনতা থেকে মুক্তির আস্বাদ মনে হলেও বাস্তবিক সমাজে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের অবক্ষয়ের দিকটিও ফুটে উঠেছে। গল্পে দময়ন্তীর স্বামী দুঁদে ক্রিমিনাল উকিল লালচাঁদ গুপ্ত। লালচাঁদবাবু যৌন সম্পর্কে অক্ষম ছিলেন। তাদের বাড়িতে এসে হাজির হয় লালচাঁদবাবুর দূর সম্পর্কের উনিশ-কুড়ি বছরের ভাগ্নে রতনলাল। রতনলালের প্রতি সন্তানের মত ভালোবাসার জন্ম নেয় দময়ন্তীর হৃদয়ে। কিশোর রতনলাল মাতৃহৃদয়ের সেই ভালোবাসাকে উপলব্ধি করতে না পেরে মামীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে দময়ন্তী রতনলালকে অনেক বুঝিয়েও ঠিক করতে পারেনি। মামীকে ভোগ করতে উদ্যত হয় রতনলাল। কিন্তু দময়ন্তী তাতে বাধা দিলে আত্মহত্যার হুমকি দেয় রতনলাল। নিজের সন্তান ভাবা রতনলালকে হারানোর ভয়ে দময়ন্তী শেষমেষ নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে রতনলালের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং রতনের সঙ্গে পালিয়ে যায় দময়ন্তী। আবার মন থেকে রতনলালের ঔরসজাত সন্তানকে মেনে নিতে পারেনি দময়ন্তী। সন্তান লাভের আকাঙ্খায় রতনলালকে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল দময়ন্তী। এখানে মাতৃহৃদয়ের এক গভীর ও জটিল দিক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় ফুটে উঠেছে রতনলাল ও দময়ন্তীর সম্পর্কের মধ্যে।

খ্যাতি যে বিড়ম্বনা তৈরি করে এবং মানসিকতা বদলে দেয়, তার প্রমাণ 'শরিক' গল্পটি। গল্পের নায়ক সুধাময় মিত্র সাহিত্যিক হিসেবে সুনাম অর্জন করলেও বিবাহিত জীবনে তিনি ছিলেন অস্থিরময়। সুধাময় মিত্রের বাড়িতে স্ত্রী উমা ও তিন সন্তান। কিন্তু যখন কলকাতায় এক স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে উমার খুড়তুতো বোন নীলিমা বাড়িতে আসে তখন থেকে সুধাময় নীলিমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার যখন সাহিত্যিক সুধাময় নিজেকে সিনেমার রঙিন রাজ্যে পাড়ি দেয় তখন তার জীবনে এসে পড়ে অভিনেত্রী অলকা। একাধিক মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরে পরিবারে তৈরি হয় অশান্তি।

সমাজ-পরিবারে পারস্পরিক সম্পর্ক গুলো যেন চীনে মাটির মতই ভঙ্গুর! সন্তোষকুমার 'চীনেমাটি' গল্পে এমনই চিত্র অঙ্কণ করেছেন। মূল্যবোধ যে চীনে মাটির মত ভঙ্গুর তা দেখানো হয়েছে গল্পের প্রধান চরিত্র কুঞ্জর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলি প্রতি মুহূর্তে যেন বদলে যাচ্ছে। যেখানে কোন মিল খুঁজে পাচ্ছে না কুঞ্জ। কুঞ্জ যে বকুলকে দিদির মত দেখতো। স্বামীর আদেশে সে যখন অন্যের অঙ্কশায়িনী হয় বকুলের পবিত্রতা মূর্তি এক লহমায় ভেঙে যায় কুঞ্জের কাছে। মেম সাহেব ইন্দ্রানীর স্বাধীনতা কুঞ্জকে নারীকে নতুন ভাবে চিনতে শিখিয়েছিল। বকুল দি-কে সে দেখেছে স্বামীর দাসী রূপে। স্বামীর সমস্ত কথা অন্যায় হলেও মেনে নিয়েছে। শশীও কুঞ্জকে জানিয়েছে এতে বকুল দি-র কোন দোষ নেই। শশীর মতে,

> ''স্বামীর ইচ্ছেয় তো ইস্ত্রির ইচ্ছে। স্বামীর ভালোই তো ইস্ত্রির ভালো। তার আবার আলাদা সুখ কী? আলাদা ইজ্জত কী?''[৮]

'করুণ শঙ্খের মতো' গল্পে নন্দিতা স্বামী বিরামের সঙ্গে সহবাসে তৃপ্ত নয়। সহবাসের চরম মুহূর্তে বিরাম একপ্রকার কষ্ট, যন্ত্রণা অনুভব করত। নন্দিতার শরীরের সমস্ত কিছু পেলেও, কি যেন সে পায় না। তাই যন্ত্রণায় ছটফট করে। নন্দিতাকে অনুপম অফিসে একান্ত সচিব করে নেয়, সেদিন থেকে নন্দিতা বিরামের থেকে দূরে সরে আসে। তারপর হঠাৎ চাকরি খুইয়ে যাওয়া বিরামকে ডিভোর্স দেয় নন্দিতা। কিন্তু অনুপমের সঙ্গে সহবাসের চরম মুহূর্তেও ক্ষত বিক্ষত হয় নন্দিতা। নন্দিতার রোগা কব্জিতে পুরোনো একজোড়া শাঁখা যেন তার পাপবোধের সাক্ষী।

'হয় না' গল্পে সন্দেহের বাতাবারণ আরতি ও সরোজের সম্পর্কের চিড় ধরায়। সরোজের দিদি আরতির গ্রামের এক লোকের কাছ থেকে জানতে পারে এদেশে আসার সময় আরতি লাঞ্ছিতা হয়। দু'মাস পরে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে আসে আরতি। একথা জানতে পেরে সরোজ তাকে বিয়ে করতে রাজি হয় না। কিন্তু দু'দিন পর ভুল বুঝতে পেরে সরোজ আরতির কাছে এসে সে ক্ষমা চায়। যদিও আরতি সিদ্ধান্ত নিমরাজি হয়। আরতি উপলব্ধি করেছে সরোজের ভালোবাসা প্রকৃত ভালোবাসা নয়, যদি তা হত তবে সব কিছু সত্যি জেনেও সে আরতিকে অস্বীকার করতে পারত না। সরোজের মানসিকতাকে বুঝতে পেরেই আরতি জানিয়েছে,

> ''সরোজ, তুমি সব মিথ্যে জেনেই এসেছ। সব সত্যি জেনেও তো আসতে পারোনি।''[৯]

দেশ ভাগের পর ছিন্নমূল হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। গ্রাম থেকে বা পূর্ববঙ্গ থেকে অনেকে চলে আসেন শহর কলকাতায়। কিন্তু থাকবে কোথায়? এ প্রশ্নটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল তাঁদের মনে। এমন সময়

কলকাতায় ভাড়া বাড়ির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাই। 'পনেরো টাকার বউ', 'নাতিশীতোষ্ণ', 'সেই রাত্রি' গল্প গুলিতে শহরের ভাড়াটিয়াদের জীবনচর্যা প্রতিফলিত হয়েছে।

তৎকালীন সময়ে পরকীয়া, পতিতা বৃত্তি শুধু নয় সমাজে 'লিভ-ইন'ও চালু ছিল। বিবাহিত নয় কিন্তু দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ একসঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করেন। এহেন সম্পর্ককে বর্তমানে 'লিভ-ইন' বলে অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সন্তোষকুমার উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে এরকম জীবনযাত্রার হদিশ দিয়েছেন তাঁর 'কোনও অসতীর কথা' গল্পে।

ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থায় প্রেমেও যে প্রতারণা ঘটবে তা যেন স্বাভাবিক। আর সেই প্রসঙ্গও উঠে এসেছে সন্তোষকুমারের 'জোড় বিজোড়', 'সমীকরণ', 'যাদুঘর', 'তীর্থের কাক' প্রভৃতি গল্পগুলিতে। এখানে প্রেম সম্পর্কিত ধারণা ব্যথিত করে গল্পের চরিত্র গুলিকে। প্রেমিকার শ্রম ও শরীরকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করার ঘটনা পাঠক মানসকে তীব্র কশাঘাত করে।

জীবন-সম্পর্ক শুধু নয় তৎকালীন সময়ে জ্বলন্ত সমস্যা হল দেশ ভাগ। যা কিনা চোখ এড়ায়নি গল্পকারের। কারণ গল্পকার সন্তোষকুমারের আদি বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে। তিনি পড়াশুনার সূত্রে কলকাতায় চলে আসেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশ ভাগের যন্ত্রণা মানুষের জীবনে কি প্রভাব ফেলতে পারে তা তিনি একাধিক গল্পে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। ভিটেমাটি ছাড়া হওয়ার ঘটনায় মানুষের পেশাও বদল হয়ে যায় তার প্রমাণ 'দ্বিজ' গল্পটি। পূর্ববঙ্গের নিশিকান্ত চক্রবর্তী ছিল যজমানী ব্যবসা। দেশ ভাগের ফলে স্ত্রী নয়নতারাকে নিয়ে সে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। আশ্রয় নেয় ক্যাম্পে। পূর্ব পুরুষের ব্যবসা ধরে রাখার চেষ্টা করেও না পেয়েও শেষে কাজ নেয় সুশীতল বিড়ি ফ্যাক্টরিতে বিড়ি বাঁধার কাজ। প্রথমে সে ইতস্তত করলেও ক্রমশ মানিয়ে নেয় নিজেকে। তবে ক্যাম্পের সবার কাছে সে লুকিয়ে রাখে। ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষার জন্য তাঁর স্ত্রী ক্যাম্পের সবাইকে বলেছিল যে, তার স্বামী এক জমিদার বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করার কাজ পেয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে অন্য শ্রমিকদের গড়ে উঠে নিশিকান্তের সুসম্পর্ক।

দেশ ভাগের প্রভাব পড়েছিল শুধু ব্যবসা নয় চাকরিতেও। 'গিল্টি' গল্পে যায় দেশভাগের পর সলিলের স্টিমার কোম্পানির চাকরি হারায়। ঘরে ছোট ভাই, বিধবা বোন, তার ছেলেকে নিয়ে আবার হাজির হয়। বিধবা বোনকে ছেলে সহ সে পাঠিয়ে দেয় দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে। আর টিবি রোগাক্রান্ত ভাইকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। নিজের মুখে ঠিক মত অন্ন জুটে না। তারপর হাজির হয় একদা প্রেমিকা সীতা। সে তার কাছে আসে কাজের জন্য। সীতার পরিবারে আছে একদা স্কুল মাস্টার বাবা, মা, তিন বোন- মানা, কান্না, আন্না। দেশভাগের পর সীতার বাবার চাকরি থাকে না। তারা চলে আসে বস্তিতে। পরিবারের মুখে অন্ন দেওয়ার জন্য দায়িত্ব নেয় সীতা। সেই জন্য সে আসে একদা প্রেমিক সলিলের কাছে। একদা প্রেমিক সলিল একদা প্রেমিক তার সীতাকে যে প্রস্তাব দেয় তাতে সে প্রথমে রাজি না হলেও পরে রাজি হয়। তারা দু'জনে মিলে দেহ ব্যবসা শুরু করে।

আসতে আসতে শহর কলকাতার মানুষের নাগরিক যন্ত্রণাও তাঁর গল্পে পরিস্ফুটিত হতে থাকে। শুধু জীবন-সম্পর্কের টোনাপোড়েন নয় নাগরিক জীবনের ছোট ছোট যন্ত্রণা যা খালি চোখে পরিলক্ষিত হয় না, তা তিনি 'সমীকরণ','ঈশ্বরের মৃত্যু', 'নাতিশীতোষ্ণ' গল্প গুলিতে সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। 'ঈশ্বরের মৃত্যু' গল্পে মনসিজ রায়কে সবাই শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত, ভয় করত এমনকি ঈশ্বর তুল্য মনে করে ঘরে ঘরে তার ছবি টাঙিয়ে রাখত। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে সবাই জানতে পারে সেই মুখোশের আড়ালে সে ছিল জুয়াচোর, বিকৃতমনা, গুপ্তহত্যাকারী, স্বার্থান্বেষী। যার ফলে গল্পে সুব্রতদের মত সকলের মনসিজ রায় সম্পর্কে চিন্তাধারণা পাল্টে যায়। মৃণালিনীকে মনসিজ চিরকুমারী করে রেখেছিল নিজের রক্ষিতার প্রয়োজন মেটানোর জন্য। অথচ মৃণালিনী ছিল মনসিজের আত্মীয়া। মৃণালিণীর জন্য একমাত্র কাঁদছে তার ভালোবাসার পাত্র বাঘা কুকুর টাইগার। গল্পে মনসিজ রায়ের নৈতিক অবক্ষয়মূলক রূপটি দেখানো হয়েছে।

যখন সমাজে বেঁচে থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তখন নীতি-নৈতিক, মূল্যবোধ, অবক্ষয় সবকিছুই যেন ঠুনকো হয়ে যায়! 'পর্দা', 'দ্বিজ', 'ঈশ্বরের মৃত্যু','দক্ষিণের জানালা', 'সেই রাত্রি', 'কুসুমাদপি', 'বিষ', 'পরমাঁয়ু','সাধ' প্রভৃতি গল্পে অবক্ষয়িত সমাজকে দেখা যায়। 'পর্দা' গল্পে ভাড়াটে পরিবারের মেয়ে রুনি। বাড়ির দরজা ভেঙে গেলে লজ্জায় ঠিক থাকতে পারে না। পাশের ক্লাব থেকে ছেলেরা, বাড়িওয়ালার ছেলে নির্মল নিলর্জ্জের

মত তাকে দেখে। সাহস করে রুনি তাদের বলতে গেলে তারা সহাস্যে ফেটে পড়ে। নির্মলকে সে খারাপ চোখে দেখে। সেই নির্মলই পরে গোপনে তার সঙ্গে দেখা করে, বাড়ির দরজা সারিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সে রুনির কাছাকাছি আসে এবং তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কেবলমাত্র বিশ্বাস করে রুনি প্রতিদিন নির্মলের ক্রমবর্ধমান সাহসকে প্রশয় দেয়। তার বিনিময়ে সে পায় একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। নির্মলকে বিশ্বাস করা ছাড়া তার উপায় নেই। তাই সে খাঁচার ময়নাকে বলে,

> ''তুই তো আমাদের ঘরের হাল জানিস, আমার বয়স কত তাও জানিস, আমাদের উপায় বা কী? বিশ্বাস না করেও এতদিন তো জিতিনি, না হয় একবার বিশ্বাস করেই ঠকি?''[১০]

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক অনটন এবং সেই কারণে নীতিবোধের অবক্ষয় গল্পটিতে ধরা পড়েছে। অবক্ষয়ের যুগে আশার আলো দেখায় 'সেই রাত্রি' গল্পটি। যেখানে অর্থনৈতিক সমস্যা পরিবারের অন্য সবাইকে স্বার্থপর করে তুললেও একমাত্র মায়ার মধ্যে মূল্যবোধ বজায় ছিল। অর্থাৎ শেষের পরেও যে সূচনা রয়েছে তা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায় সাধারণ মানুষকে, সন্তোষকুমার তাঁর ছোটগল্প গুলিতে সেই চিত্র অঙ্কণ করেছেন।

সন্তোষকুমারের সমস্ত গল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে মানসিক দ্বন্দ্ব বা মনস্তত্ত্ব বিষয়টি। কারণ মনকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি চলতে পারে না। ব্যক্তি পরিচালিত হয় তার মনের দ্বারা। তাই প্রতিটি গল্পে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা গুলিকে সুন্দর ভাবে মনের গভীরে ডুব দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন সাংবাদিকের চোখ দিয়ে। নিজে সাংবাদিক হওয়ায় প্রতিদিন সমাজে ঘটে যাওয়া নানা ধরণের বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকতেন খবরের কাগজ সম্পাদনার জন্য। 'স্ত্রৈণ','তীর্থের কাক', 'সহমরণ', 'দুই কাননের পাখি', 'প্রতিদ্বন্দ্বী','ছায়াঘর', 'সম্রাজ্ঞী' প্রভৃতি গল্পে মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন গল্পকার। 'কিশোরীর মন' গল্পটিতে কিশোরীর মনে নানা ভাবনা জেগে ওঠে তার দিদির শ্মশান যাত্রার প্রাক্কালে। তার মধ্যে দেখা দেয় যুগপৎ 'কুচিন্তা আর কান্না'। বেঁচে থাকার তীব্র লিপ্সা ধরা পড়ে বিষাদময় এ পরিস্থিতিতেও। কখনও কিশোরীটি ভাবে দিদির দামী শাড়ির কথা, এবার যা তারই হবে। কখনও আবার দিদির দুল জোড়া ও বাবার ইন্সিওরেন্সের টাকার কথা চিন্তা করে সে বলে, ''দিদি মরেছে তাই আমি বেঁচে যাব, আমার-আমার এবার বিয়ে হবে।''[১১] এই গল্পে কিশোরীর আত্মকথন থেকে তার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব চিন্তা মনে আসার জন্য কিশোরীটি নিজেকে ধিক্কার দিলেও মন থেকে সেগুলোকে তাড়াতে সে পারিনি। একথা শুধু কিশোরীটির ক্ষেত্রে নয় প্রায় সব মানুষের ক্ষেত্রে যেন প্রযোজ্য বলে মনে হয়। এখানে মনের অন্তরালে ঘটে চলা নানা ঘটনাকে গল্পে মনোবিদের মতন করে স্থান দিয়েছেন সন্তোষকুমার।

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্প গুলিতে সমাজের বিভিন্ন দিক যেমন— সামাজিক কাঠামো, শ্রেণী বৈষম্য, মানুষের জীবনযাত্রা, নাগরিক যন্ত্রণা, মূল্যবোধ এবং নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পগুলোতে সমাজের প্রতি লেখকের গভীর পর্যবেক্ষণ এবং সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি সংবেদনশীলতার রূপ বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। ছোটগল্পের মাধ্যমে সমাজের প্রতিচ্ছবি এবং লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন সমাজ-দর্শন পাঠকদের জানতে এবং নিজেদের ভাবনা চিন্তা করতে উৎসাহিত করে।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ১৩।

২. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ২৫।

৩. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ৬২৬।

৪. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮। পৃ. ১২৯।

৫. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ৬।

৬. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ৪৭২।
৭. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ২৬৬।
৮. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ১৬০।
৯. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ৬৯৯।
১০. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ৬১৯।
১১. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮। পৃ. ৮৬।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 317- 322
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.212

বন্ধুত্বের নিরন্তর বন্ধন: রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ

সন্দীপ ঘোষ, *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the novel Chaturanga, friendship is not merely a matter of personal feeling; it is the driving force behind the structure of the story, the development of the characters, and the progression of ideological conflict. The relationship between Sachish and Sribilash is the central axis of the novel—where friendship rests on mutual trust, sincerity, and the ability to withstand the tests of time. Despite sharp differences in their worldviews, habits, and even social positions, their bond does not break; rather, these very differences make the relationship more complex and profound.

Sachish's spiritual inclination, philosophical temperament, and detachment from society stand in contrast to Sribilash's practical thinking, social entanglements, and personal emotions. This opposition between the two creates a dynamic tension within the novel. Yet, that tension never shakes the foundation of their relationship; instead, it guides their decisions, transformations, and self-reflection.

The research paper suggests that human bonds are more lasting and effective than ideology, religious thought, or political philosophy. Thus, to understand the narrative of Chaturanga, friendship itself becomes the key—binding together the novel's philosophy, conflicts, and character evolution into a single thread.

Keywords: Friendship Dynamics, Narrative Structure, Human Relationships, Character Development, Ideological Conflict

'বন্ধু' শব্দটি সাধারণত 'সখা', 'মিত্র', 'সুহৃদ ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'বন্ধু' শব্দটি মানব জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের প্রতীক। এটি এমন একটি সম্পর্ক, যা রক্তের বন্ধনে গাঁথা না হলেও হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে গড়ে ওঠে। সমাজে মাতা, পিতা কিংবা ভাই-বোনের সম্পর্ক জন্মসূত্রে নির্ধারিত হলেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে জীবন পরিক্রমায়, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও হৃদয়ের সংযোগের মাধ্যমে। এ সম্পর্কের মধ্যে কোনো জৈবিক বা রক্তগত বাঁধন নেই, তবে মানসিক ও আবেগিক স্তরে এটি অত্যন্ত দৃঢ় ও গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ জন্মলগ্ন থেকে রক্তসম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে— মাতা, পিতা, ভাই, বোন ইত্যাদি সম্পর্ক স্বাভাবিক ও পূর্বনির্ধারিত। কিন্তু বন্ধুত্ব একটি অর্জিত সম্পর্ক। কোনো শিশুর জন্মের সাথে সাথে তার বন্ধু তৈরি হয় না। বরং শৈশব, কৈশোর বা তার পরবর্তী সময়ে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষদের সঙ্গে মনের মিল, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহানুভূতির ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাই এই সম্পর্কের মৌলিক ভিত্তি হলো হৃদয়গত মিল ও আস্থা। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বন্ধুত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমলিঙ্গের মধ্যে বেশি গড়ে ওঠে। অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে পুরুষ কিংবা

নারীর সঙ্গে নারীর বন্ধুত্ব সমাজে অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা যায়। নারী-পুরুষের মধ্যেও গভীর ও সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তবে সাহিত্যে তার নিদর্শন খুবই কম।

মানবসমাজে সম্পর্কের গুরুত্ব কোনো সাম্প্রতিক বাস্তবতা নয়; প্রাচীনকাল থেকেই এটি মানুষের সামাজিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে এসেছে। ইতিহাসের প্রাচীন পর্বে আমরা দেখি, আদিম মানুষ ছিল বনবাসী, তাদের জীবনযাপন ছিল মূলত ফলমূল সংগ্রহনির্ভর। ভয় ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। প্রকৃতির রহস্যময় শক্তি, ভয়ঙ্কর জন্তুর আক্রমণ কিংবা অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের মনে সৃষ্টি করত আতঙ্কের ছায়া। বাঁচার স্বাভাবিক তাগিদ থেকেই তারা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে, একা থাকা বিপজ্জনক; নিরাপত্তার জন্য দরকার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই হিংস্র জন্তু কিংবা প্রাকৃতিক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে শুরু হয় দলবদ্ধ হয়ে থাকার চেষ্টা। এই উদ্যোগই মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম একত্র থাকা বা বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপন করে। বেঁচে থাকার স্বার্থে গড়ে ওঠা এই প্রাচীন মৈত্রী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-অগ্রগতির ধারা বেয়ে নানা নতুন রূপ ধারণ করে। যখন মানুষ বন্য পরিবেশ থেকে ক্রমে উন্নত জীবনযাত্রার পথে পা বাড়ায়, তখন এই সম্পর্ক শুধু নিরাপত্তার জন্য নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

বাস্তব জীবনে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে এই সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের সবার জীবনেই অন্তত একজন বন্ধু বা সখা থাকে, আর এই 'বন্ধু' শব্দটির সঙ্গে আমাদের আবেগের যোগ গভীর। যেমন বাস্তব জীবনে বন্ধুত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, তেমনি সাহিত্যেও এই সম্পর্কের উপস্থিতি চিরন্তন সত্য হয়ে রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যায় লেখকেরা এই সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি তারা বন্ধুত্বের আবেগ, বাস্তবতা এবং মানবিকতা— সবকিছুকেই শিল্পিত রূপ দিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাবকাল থেকেই বন্ধুত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। বিশেষ করে পুরুষ বন্ধুত্বকে বেশি চিত্রিত করা হয়েছে। দুই নারীর মধ্যে বন্ধুত্বের চিত্র তুলনামূলকভাবে কম, আর পুরুষ-নারীর বন্ধুত্বও খুব বেশি দেখা যায়নি। তবে পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব বাংলা উপন্যাসে বেশি দেখা যায়। উনিশ শতকের স্বর্ণকুমারী দেবী, রাজকৃষ্ণ রায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাধানাথ মিত্র, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের উপন্যাসে বন্ধুত্বের প্রাথমিক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের লেখায় বন্ধুত্বের বহুমাত্রিক প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

আমার আলোচ্য বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বন্ধুত্ব। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনের বন্ধু সংসর্গকেও সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন। আত্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের জগৎ ছিল বিস্তৃত। 'নর্মাল স্কুলে' পড়াকালীন তিনি অক্ষয়কুমার মৈত্র, হরিশচন্দ্র হালদার প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সখ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। 'রবিজীবনী' থেকে জানা যায় অক্ষয়কুমার মৈত্র তাঁকে ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহ শিখিয়েছিলেন। সেখানে হরিশচন্দ্র হালদারের কথা পাই। তাছাড়া প্রবোধচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথাও পাই। স্কুল-জীবনে তিনি লোকেন্দ্র পালিতের মতো অন্তরঙ্গ সুহৃদও পেয়েছিলেন। তাছাড়াও প্রিয়নাথ সেন, সতীশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, জগদীশচন্দ্র বোস, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দেশীয় বন্ধু হিসেবে তাঁর জীবনে উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি উইলিয়াম রোটেনস্টাইন, উইলিয়াম পিয়র্সন, এডওয়ার্ড টমসন, ওকাকুরা, প্রমুখ বিদেশী বন্ধুরাও তাঁর সখ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের যেমন অনেক বন্ধুর সংসর্গ তিনি পেয়েছেন একইভাবে সাহিত্যে বিশেষ করে উপন্যাসে তিনি বন্ধু বা বন্ধুত্ব সম্পর্কটির রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন।

'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' থেকে শুরু করে যদি আমরা তার শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত দেখি, তবে দেখা যাবে তাতে বিষয় ও বিভিন্ন সম্পর্কের বৈচিত্র্যের সমাহার। সেখানে তিনি বারবার বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিলেন সচেতন মন নিয়েই। তাঁর উপন্যাসে বন্ধুদের মধ্যে স্বভাবগত বা প্রকৃতিগত বৈপরীত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু বৈপরীত্যের মাঝেই তাদের সম্পর্কের ক্রমবিস্তার। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে বন্ধুদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখে সম্পর্কের বীজটিকে যথার্থভাবে পরিশীলিত করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নায়ক এবং সহনায়ক পরস্পর বন্ধু। তিনি সম্পর্কটিকে কাহিনিতে বেশি জায়গা করে দিয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা প্রভৃতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ

করার অবকাশ পাওয়া যায়। গৌণ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এটা সম্ভব হত না। নায়ক এবং সহনায়কদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ আসলে দুটি উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে চেয়েছিলেন, এক সম্পর্কটির পরিপূর্ণ বিস্তারসাধন আর দুই, নায়ক এবং সহনায়কের মধ্যে চিন্তাগত বা আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা করা। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে যা স্পষ্ট লক্ষ করা গেছে।

বিষয় বা পাত্র-পাত্রীর চিন্তাধারা এবং আত্মকথন রীতির সাহায্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পূর্বের উপন্যাসের তুলনায় অনেকটা আলাদা করে ১৯১৫ সালে রচনা করেছেন 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। উপন্যাসে দেখা গেছে শচীশ, শ্রীবিলাস এবং দামিনীর মধ্যে প্রেম আর বন্ধুত্বের প্রাধান্য। অবশ্য শুরুতেই আর একটি সম্পর্কের প্রাবল্য আছে তা হল স্নেহ-বাৎসল্যের সম্পর্ক। যা গড়ে উঠেছে শচীশ ও তার জ্যাঠামশায় জগমোহন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ উপন্যাসে নায়ক শচীশের জীবনে ঘুরেফিরে বিভিন্ন সম্পর্কের প্রবেশ ঘটেছে।

তার পারিবারিক তথা আত্মিক সম্পর্ক তার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে। আবার শ্রীবিলাসের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং দামিনীর প্রতি টান প্রভৃতি নানা সামাজিক সম্পর্কে বাঁধা তার জীবন। শেষ মুহূর্তে দুই বন্ধু শচীশ ও শ্রীবিলাসের মাঝে দামিনীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসকে সাজিয়েছেন।

এখানে বন্ধুত্বের নিঃশর্ত ভালোবাসা, বির্তক, মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোনো কিছুই বাদ নেই। উপন্যাসে শচীশ এবং শ্রীবিলাসের বন্ধুত্ব এসেছে কলেজ জীবন থেকে। কলেজ জীবন থেকে শুরু হয়ে তাদের বন্ধুত্ব বিভিন্ন টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষদিন পর্যন্ত বজায় থেকেছে। কাহিনিতে শচীশ এবং শ্রীবিলাসের বয়স প্রায় সমান। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শচীশ ও শ্রীবিলাসের বন্ধুত্বের কাহিনি বর্ণনা করলেও, সেখানে শচীশের পারিবারিক জীবনের পরিচয় আছে, শ্রীবিলাসের পারিবারিক জীবনের পরিচয় নেই। এটা রবীন্দ্র-উপন্যাসে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ সহনায়কদের বংশ-পরিচয়কে তুলে ধরেন না। তবে বন্ধুত্বের সম্পর্কটিকে চালিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাহায্য নেন সহনায়কদের। চতুরঙ্গেও দেখা গেছে একই দৃশ্য। সেখানে কাহিনির নায়ক শচীশ একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিচল থেকেছে। যাত্রা করেছে এক বৃহৎ সত্যের দিকে। আর শ্রীবিলাস সহনায়ক হয়ে বন্ধুত্বের সূত্রটিকে প্রথম থেকে শেষ অবধি ধরে রেখে কাহিনিতে বন্ধুত্বের রূপরেখা নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় জন্মের পর থেকেই শচীশের উপরে সবথেকে বেশি প্রভাব তার জ্যাঠামশাই জগমোহনের। জগমোহন ছিল শিক্ষিত এবং নাস্তিক মানুষ। শচীশও জীবনের প্রথম দিকে তার জ্যাঠামশায় জগমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত এক নাস্তিক। তখনও শ্রীবিলাস শচীশের কাছাকাছি আসেনি। কলেজ জীবন থেকে শচীশের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সূত্রপাত। শচীশের জ্বলন্ত চোখ, গায়ের রং এবং তার অন্তরাত্মাকে দেখে শ্রীবিলাস তাকে সহজেই ভালোবেসে ফেলে–

> "শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক- তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙ্গুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখতে পাইলাম; তাই এক মুহূর্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।"[১]

নাস্তিক এবং সোনার বেনে পরিবারের জেনেও শেষ পর্যন্ত শচীশের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হল শ্রীবিলাসের। কাহিনিতে দেখা গেছে এই নাস্তিকতাকে কেন্দ্র করে শ্রীবিলাসকে বন্ধু শচীশের পক্ষ নিয়ে অনেকের সঙ্গে ঝগড়া করতে। তারপর একসময় জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু হয়েছে অর্থাৎ শচীশের যে পারিবারিক আশ্রয়, তার বিনাশ ঘটেছে। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু শচীশকে ভীষণভাবে বেদনাহত করে। শচীশ হঠাৎ করে দুই বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যায়–

> "এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায়, জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতেই পারিলাম না।"[২]

শ্রীবিলাস বন্ধুর অনেক খোঁজ খবর করেও কোনো সন্ধান পাননি। একসময় শ্রীবিলাস খোঁজ পেল যে তার সেই নাস্তিক বন্ধু শচীশ লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মেতে উঠেছে। এরপর থেকেই শচীশ ও শ্রীবিলাসের বন্ধুত্বটি কাহিনিতে পূর্ণমাত্রায় গতিশীল হয়েছে। নাস্তিক শচীশ আস্তিক হওয়ার সাথে সাথে যেভাবে শচীশ লীলানন্দ স্বামীর সেবা করেছে তাতে শ্রীবিলাস আঘাত পেয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসও বন্ধু শচীশের সংসর্গে থাকার জন্য তাদের সাথে যুক্ত হয়ে লীলানন্দ স্বামীর ভক্ত হয়ে তার সেবা করেছে-

> "শচীশকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না; শচীশের টানে এই দলের স্রোতে আমিও গ্রাম হইতে গ্রামে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।"[৩]

এখানেই বন্ধুত্বের এক চরম পর্যায়ের চিত্র আমরা দেখতে পাই। শুধুমাত্র বন্ধু শচীশের সংসর্গে থাকার জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করে শ্রীবিলাস লীলানন্দ স্বামীর ভক্ত হয়েছে, তার সেবা করেছে।

এরপর উপন্যাসে দুই বন্ধু এবং তার মাঝে এক নারী অর্থাৎ দামিনীর আবির্ভাব হয়েছে। এই নিয়ে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। লীলানন্দ স্বামীর দলে শচীশ এবং শ্রীবিলাসের বন্ধুত্ব পুনরায় জোড়া লেগেছে। শ্রীবিলাস বন্ধুর নাস্তিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। এরপর দুই বন্ধু মিলে রসের সাধনায় মত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই রস সাধনাও তাদের বেশিদিন সুখ দিতে পারে না। এই সাধনার মধ্যে দামিনীর আবির্ভাব তাদের চিত্তে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বিধবা দামিনী শচীশের প্রতি আকর্ষিত হয় কিন্তু শচীশ তার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে-

> "শচীশ কেবল শোভাই দেখিল দামিনীকে দেখিল না।"[৪]

অন্যদিকে শচীশ এবং দামিনীর অভিমানের মাঝে এসে দাঁড়ালো শ্রীবিলাস। দামিনী একের পর এক দাবি রাখতে শুরু করল শ্রীবিলাসের কাছে। কখনও বেজিকে দুধ খাইয়ে দেওয়া, কখনো বই এনে দেওয়া ইত্যাদি। ধীরে ধীরে কখন শ্রীবিলাস শচীশ এবং লীলানন্দ স্বামীর থেকে দূরে সরে গিয়ে দামিনীর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সে বুঝতেই পারেনি। শচীশও এই কারণে তার বন্ধুকে তীব্রভাবে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করেনি বা দামিনীর সঙ্গে সহজ মেলামেশায় তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। তাই শ্রীবিলাসকে একজায়গায় বলতে দেখা যায়- "আমার দামিনী।"[৫]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শচীশের অনুরোধে দামিনী যখন আবার তাদের সাথে সাধনায় যোগ দিয়েছে তখন শ্রীবিলাসের নিজেকে সঙ্গীহীন মনে হয়েছে-

> "আমি বেকার ও সঙ্গীহীন হইয়া পড়াতে পুনশ্চ গুরুজীর দরবারে পূর্বের মতো ভর্তি হইলাম, যদিচ সেখানকার সমস্ত কথাবার্তা গানবাজনা আমার কাছে একেবারে বিশ্রী রকমের বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল।"[৬]

অর্থাৎ দামিনীর আকর্ষণ ছিল শচীশের প্রতি। অন্যদিকে শ্রীবিলাসের আকর্ষণ ছিল ছিল দামিনীর প্রতি। তাই দামিনী শচীশের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করলে শ্রীবিলাশের ঈর্ষা হয়েছে-

> "শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাব কেন!"[৭]

তবে এ নিয়ে তাদের মধ্যে বড়সড় বিরোধের জন্ম নেয়নি কখনও। বরং ঘটনাক্রমে শচীশ দামিনীকে তার থেকে দূরে যেতে বললে শ্রীবিলাস আবার দামিনীর সঙ্গ পেয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে-

> "যদি আমার মত মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে"[৮]

তাই সবশেষে দেখা গেছে শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু এটাও দেখা গেল বন্ধুত্বের টানে এই বিয়ের পূর্বে শ্রীবিলাস শচীশকে কলকাতায় এনেছে তাদের বিয়ে সম্প্রদান করার জন্য এবং শচীশও তার বাড়িটা ভোগ করার জন্য দিয়ে দেয় শ্রীবিলাস ও দামিনীকে।

অর্থাৎ উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসের সঙ্গে শচীশের বন্ধুত্ব কিন্তু বজায় থেকে যায়। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কাহিনি এই বিষয়ের উপর গড়ে উঠেছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই উপন্যাসের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্কের তীব্রতা তেমন কোথায়? এক বন্ধুর উপর এক বন্ধুর পারস্পরিক প্রভাবও বা তেমন কোথায়? 'গোরা' বা 'চোখের বালি'তে যে বন্ধুত্ব দেখা গেছে, সেই রকম বন্ধুত্ব তো এখানে দেখা যাচ্ছে না। শচীশের সঙ্গে শ্রীবিলাসের কলেজে পরিচয় হয়েছে, বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে, তারপর একে অপরের সঙ্গী হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দামিনীকে নিয়ে তাদের কিছুটা টানাপোড়েন এবং তারপরে শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ। এই কাহিনির মধ্যে বন্ধু সম্পর্কের প্রবাহ থাকলেও, বন্ধুত্বের প্রভাব তেমন কোথায়? কিন্তু ভালোভাবে যদি দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে এখানে বন্ধুত্বের প্রভাব হয়ত অত তীব্র নয়, তবুও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার সচল উপস্থিতি ঘটেছে। এখানেই এই উপন্যাসটির বন্ধুত্বের সম্পর্কটি অন্য উপন্যাসের বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলির থেকে আলাদা। শচীশ ও শ্রীবিলাস পরস্পর বন্ধু। উপন্যাসের কাহিনি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তাদের সম্পর্কের বর্ণনা আছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রভাবকে ততখানি তুলে ধরেননি, সম্পর্কেই জিইয়ে রেখেছেন। বাস্তব জীবনে কোনো সম্পর্কে অনেক সময় যে পারস্পরিক প্রভাবের চেয়ে আকর্ষণ মুখ্য

হয়ে দেখা দেয়। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শচীশ-শ্রীবিলাস সম্পর্কে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কাহিনিতে শচীশ-শ্রীবিলাস সম্পর্কে পারস্পরিক প্রভাব বা কার্যকারিতা কম, কিন্তু আকর্ষণ আছে। শ্রীবিলাসের দিক দিয়ে যা প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীবিলাস শচীশের দৈহিক আকর্ষণে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। মাঝে সাময়িক যোগাযোগ ছিন্ন হলেও পরে আবার বন্ধুর আকর্ষণেই লীলানন্দ স্বামীর দলে যোগদান করেছে। তারপরে আর উভয়ের সম্পর্কে যোগাযোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। কাহিনির শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুত্বের আকর্ষণ বা বন্ধু সংসর্গকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বন্ধুত্ব করতে করতে দুই বন্ধু তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সফল হয়েছে। শচীশ যাত্রা করেছে সীমা থেকে অসীমের দিকে। আর শ্রীবিলাসও লাভ করেছে তার কাঙ্ক্ষিত দামিনীকে। কাহিনিতে দামিনীকে নিয়ে শচীশ এবং শ্রীবিলাসের সম্পর্কে সংঘাতের একটি অবকাশ অবশ্য ছিল। তবে এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ একটু ভিন্নপথে হেঁটেছেন। কাহিনিতে শচীশের প্রতি দামিনীর অনুরাগ ছিল, অন্যদিকে শচীশের মধ্যে সামান্য হলেও ছিল দামিনী প্রীতি। শ্রীবিলাসও মনে মনে দামিনীকে ভালোবেসে ফেলে। এছাড়া শচীশের সঙ্গে শ্রীবিলাসের মতবিরোধও আছে। গোরার মত রবীন্দ্রনাথ শচীশকে তার্কিক রূপে তৈরি করেছেন। সুতরাং দুই বন্ধুর মতের মিল বা ভাবনাগত একতা না থাকায় এবং পাশাপাশি দুই বন্ধু মিলে একই মেয়ের উপর অনুরক্ত হওয়ায়, বন্ধুত্বে ঘনিয়ে আসতে পারত সংকট। কিন্তু তা হয়নি। এই রকম ভাব দিয়েই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের বন্ধুত্ব তৈরি। তাই বৃহৎ কোনো প্রভাব না থাকলেও বন্ধুত্বের আকর্ষণ এখানে মুখ্য হওয়ায় শ্রীবিলাস এবং শচীশের সম্পর্কের মধ্যে দামিনী বড় সংকট সৃষ্টি করতে পারেনি। হৃদয়ের গভীরতা বা আকর্ষণের প্রবাহে পারস্পরিক বন্ধুত্বের যোগসূত্রটি উপন্যাসে চিত্রিত। তবে শ্রীবিলাস ও শচীশের সম্পর্কে পারস্পরিক একটা পরোক্ষ প্রভাব যেন লক্ষ্য করা যায়। শচীশ দামিনীকে ত্যাগ করে শ্রীবিলাসের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি তৈরি করে বৃহৎ সত্যকে উপলব্ধি করেছে। যাত্রা করতে পেরেছে সীমা থেকে অসীমের দিকে। এই বন্ধু প্রভাবকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কৌশলে চিত্রায়িত করেছেন। শচীশ কিন্তু শ্রীবিলাস বা দামিনী কাউকেও বলছে না পরস্পরকে বিয়ে করতে। শুধু বুঝতে পেরে পটভূমি তৈরি করে দিচ্ছে। আবার শ্রীবিলাস যখন দামিনীকে বিয়ে করার সংকল্প করে, তখন শচীশকে দেখা যায় আনন্দে ভেসে যেতে। শচীশ ও শ্রীবিলাস সম্পর্কের এই গভীরতা 'চতুরঙ্গে'র বন্ধুত্বের প্রধান বিশেষত্ব। এবং শেষে দেখা যায় এই সম্পর্কটিই কাহিনিতে একমাত্র স্থায়ী হয়েছে।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীশ অপেক্ষা শ্রীবিলাসকেই বন্ধুরূপে কাহিনিতে সক্রিয় বলে মনে হবে এবং পাশাপাশি শ্রীবিলাসের মধ্যে হৃদয়ের গভীরতাও বেশি দেখা গেছে। শ্রীবিলাস কিছু না ভেবে শুধু বন্ধুত্বের টানেই শচীশের সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছে। মানুষ যে কখনও কখনও অর্থ, ধন-দৌলত বা প্রতিপত্তি এই সব অপেক্ষা বন্ধন বা সম্পর্ককে বেশি প্রাধান্য দেয়, শ্রীবিলাস তার প্রমাণ। সে সব কিছু ত্যাগ করে শচীশের সঙ্গ দিয়েছে। আর লেখক এক্ষেত্রে উপন্যাসে অবলম্বন রূপে নিয়েছেন বন্ধুত্ব সম্পর্ককে। তাই বলে শ্রীবিলাস বন্ধু রূপে একেবারে পুরোপুরি আদর্শ বা ত্রুটিশূন্য নয়। দামিনীর আবির্ভাবে শ্রীবিলাসের মনে শচীশের প্রতি এক ঈর্ষার জন্ম দেয়। এতে মনে হতে পারে শ্রীবিলাস কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর। তবে এই সামান্য ঈর্ষাভাব প্রদর্শনে শ্রীবিলাস চরিত্রকে স্বার্থপর বা ঈর্ষাতাড়িত চরিত্র বলা যাবে না। সে জীবনে অনেক কিছু করতে পারত, শুধু বন্ধু সংসর্গের আকুলতার কারণে তা করেনি। সে যখন দেখছে শচীশকে দামিনী ভালোবাসলেও শচীশ সেই ভালোবাসার কোনো দাম দিচ্ছে না, অথচ দামিনী তার ভালোবাসাকে বুঝতে পারছে না বা চাইছে না, তখনই সে শচীশের প্রতি ঈর্ষাভাব পোষণ করেছে, অন্য কোনোভাবে করেনি। তাই সামান্য একটু ঈর্ষাভাবেই শ্রীবিলাসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না। সর্বোপরি এটি কাহিনিতে শেষ পর্যন্ত স্থায়ীও হয়নি। তবু সাময়িক ঈর্ষাভাব প্রদর্শনে শ্রীবিলাস চরিত্রে একটা প্রশ্নচিহ্ন এসেই যায়। 'চতুরঙ্গে' দামিনীর প্রতি শ্রীবিলাসের আকর্ষণ বা শচীশের প্রতি দামিনীর আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করা গেছে। তবে ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনি বলা যায় না। শ্রীবিলাস দামিনীকে লাভ করেছে, কিন্তু সেখানে কোনো জোর প্রতিষ্ঠা বা ছিনিয়ে নেবার দৃষ্টান্ত নেই। শচীশ যখন দামিনীর প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছে, তখনই ছিন্ন দামিনীকে জীবনে স্থিরতা দেওয়ার জন্য শ্রীবিলাস তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে, বলপূর্বক বা জোর করে নয়। শচীশ এই উপন্যাসের নায়ক, আর শ্রীবিলাস সহনায়ক। রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বন্ধুত্ব চালনার ভার দিয়েছেন সহনায়ক শ্রীবিলাসের উপর। শচীশ দামিনীকে ত্যাগ করে সীমা থেকে অসীমের পথে যাত্রা করেছে। তার পরেই দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের পরিণয়ের পটভূমি তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে শ্রীবিলাস চরিত্রের স্বার্থপরতার কোনো গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং শচীশ বা শ্রীবিলাস, কেউ কাউকে ছেড়ে যেতে পারছে না বা ছাড়ার চেষ্টা করছে না। উপন্যাসে এটাই উভয়ের বন্ধুসত্তার বিশেষত্ব।

কাহিনির শেষেও রবীন্দ্রনাথ শ্রীবিলাসের জীবন থেকে দামিনীকে অকস্মাৎ সরিয়ে নিয়ে শ্রীবিলাসকে একা করে দিয়েছেন। তাই শেষ পর্যন্ত লক্ষ করা যায় শ্রীবিলাসের পারিবারিক জীবনের কোনো বন্ধন নেই। শচীশের যা ছিল, সবই শেষ হয়ে গেছে। দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের যাও বা একটি সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তাকেও লেখক নষ্ট করে দেন। একমাত্র বন্ধুত্বকেই তিনি উপসংহারে স্থায়িত্ব দিয়েছেন। শচীশ এবং শ্রীবিলাসের জীবনে শুধু একটি সম্পর্কের অস্তিত্বকেই উপন্যাসের শেষ অব্দি জিইয়ে রেখেছেন, সেটা হল বন্ধুত্ব।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চতুরঙ্গ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩২২, কলকাতা, পৃ. ১।
২। তদেব, পৃ. ৩৩।
৩। তদেব, পৃ. ৪০।
৪। তদেব, পৃ. ৪৮।
৫। তদেব, পৃ. ৮৪।
৬। তদেব, পৃ. ৭৮।
৭। তদেব, পৃ. ৯৪।
৮। তদেব, পৃ. ১০৪।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 323- 328
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.213

গল্পের মোড়কে অন্ত্যজশ্রেণির বাস্তব সংগ্রামের আখ্যান: প্রসঙ্গ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘কয়লাকুঠির দেশ’

অনুরাধা দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত*

Received: 22.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Within the vast landscape of Bengali literature, stories focusing on the working class, especially labourers occupy a significant and unique space. Various storytellers and novelists have brought the lives of these marginalised communities into the forefront of literature through their writings. Among them, Shailajananda Mukhopadhyay is a pioneering and foremost figure. In his collection of stories, he powerfully depicted the horrific plight and deeply miserable lives of coal mine workers, which were full of suffering, hardship and exploitation. By focusing on their narratives, he not only brought their stories to light but also initiated the trend of regionalism in Bengali literature, essentially becoming the first author to discover and focus on the coal belt region. When he wrote this coalfield stories, he didn’t solely emphasize the poverty of the workers. Concurrently, he skilfully portrayed the sexually- driven instincts and their carnal appetites that existed among the coal mine labourers. Through his narratives, he successfully reflected a specific region and the lifestyle of its inhabitants to the reading public. Furthermore, he painted a realistic picture of the owner-labourer relationship prevalent in the mining areas.

Keywords: Coal mine worker, Hardship, Poverty, Regionalism, Exploitation, Sexually-driven instinct, Bengali short stories

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের এক অপচয়িত প্রতিভা। বহুপ্রসবী তাঁর রচনা। তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে কয়লাকুঠির ‘মুনিষ’, বস্তির অবক্ষয়িত সমাজ, নিতান্ত নিম্নবিত্ত লোক। এদের নিয়ে শৈলজানন্দের বেশি সংখ্যায় লেখা রয়েছে। দরিদ্র লাঞ্ছিত মানুষের চরম যন্ত্রণা ও বঞ্চনা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন, কারণ নিজের বাল্য-শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি ছিল দারিদ্রতায় ক্লিষ্ট। যৌবনের নববিবাহিত দিনগুলি কেটেছে নিদারুণ অর্থকষ্টে। তিনি তাঁর দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন কখনো কেলিয়ার সামান্যতম চাকরিতে, কখনো ধোপাবস্তিতে, কখনো বন্ধুদের মেসে নিঃস্ব অবস্থায়। বেঁচে থাকার অন্বেষণে তিনি অবলম্বন করেছিলেন নানা বৃত্তি। কখনো কয়লাকুঠির চাকরি, কখনো বা কুমারডুবির লোহার কারখানার কাজ। কোনো কাজই তাঁকে সুখের সন্ধান দিতে পারেনি, কিন্তু বেঁচে থাকার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন দেখা শিখিয়েছে তাঁকে কয়লাকুঠির জীবন।

অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে মানুষের জীবনে যে ধরনের প্রবৃত্তি মাথাচারা দিয়ে ওঠে বা মানুষকে কোন পথে চালিত করে সে সম্পর্কে শৈলজানন্দের সত্য ধারণা তথা অনুভব ছিল বলেই তিনি অনায়াসে তাঁর লেখনীতে সেইসব মানুষের কথাগুলোকে তুলে ধরতে পেরেছেন। এইসব রচনার জন্য তাঁকে কখনো কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি কারণ তিনি নিজেই এই বাস্তব ভূমিতে বিচরণ করেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতে-

"শৈলজাবাবুর পাত্র-পাত্রী অত্যন্ত গরীব গৃহস্থ, মেষ-শাবকের দল, কুলী, মুটে-মজুর, বস্তির অধিবাসী কিম্বা বাঁকুড়া বীরভূম জেলার গ্রামবাসী।" [১]

রাঢ় অঞ্চলের ভূপ্রকৃতিতে বেড়ে উঠেছেন শৈলজানন্দ। কয়লাখনির অঞ্চলের জনজীবন, তাদের আচার-আচরণ, ধর্ম-সংস্কার সংস্কৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর মনের যোগ। সেই মনের দেখাকে সম্বল করেই তিনি তাদের চিত্র এঁকেছেন তাঁর লেখনীতে এবং তাদের জীবন্ত করে রেখে গেছেন গল্পের মধ্য দিয়ে।

বাঙালি পাঠকের কাছে এর আগে পর্যন্ত কয়লাকুঠির মানুষের জীবনকাহিনি, তাদের বঞ্চনার কথা এতটা প্রখরভাবে ধরা দেয়নি। শৈলজানন্দই প্রথম তাঁর লেখনীতে এদের বঞ্চিত জীবনভাষ্য অনুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন। বলা যায় তিনি যেন তাদের কথাগুলো বলার জন্যই সাহিত্যে পদার্পণ করেছেন। শৈলজানন্দের লেখায় যে একটি বিশেষ ভূখণ্ডের অন্তেবাসীদের কথা উঠে এসেছে এই বিষয়ে তাঁরই সমকালীন লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন-

"তারাশঙ্কর আমাদের সাহিত্যে যে জন্য স্মরণীয় তা হচ্ছে বাংলার আঞ্চলিক জীবনের ব্যাপক চিত্রন। সাহিত্যের এ বিভাগের পথিকৃত কিন্তু তিনি নন, তাঁর আবির্ভাবের অনেক আগেই এই আঞ্চলিক সাহিত্যের সূচনা হয়েছে শৈলজানন্দের সৃষ্টিতে... শৈলজানন্দ শুরু করেছিলেন কিন্তু তাঁর কাজ তার যথোচিত পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন তারাশঙ্কর।"[২]

'দিনমজুর' গল্পসংকলনের ভূমিকায় লেখক নিজেই বলেছেন-

"সাঁওতালদের লইয়াই আমি আমার সাহিত্যিক জীবনের যাত্রা শুরু করি এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমার সাঁওতালি গল্পগুলি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।" [৩]

মাত্র ২২ বছর বয়সে 'কয়লাকুঠি' গল্প রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের জগতে পদার্পণ করেন শৈলজানন্দ। গল্পটিতে তিনি কয়লাকুঠির সামগ্রিক একটি দিক তথা পরিবেশ তুলে ধরেছেন। আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র বাউড়ি সম্প্রদায়ের নানকু ও বিলাসি। গল্পটিতে বিলাসির সুতীব্র প্রেমের খিদে ও তার করুণ পরিণতি গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পে দেখি বিলাসি তার স্ত্রী নানকুকে ভীষণ ভালোবাসে, কিন্তু তার স্বামী অন্য স্ত্রীতে আসক্ত। সে অপর স্ত্রী মাইনুকে তার মন দিয়ে দেয়। এমনকি সেই স্ত্রীকে নিয়ে অন্য কয়লাকুঠিতে কাজ করতে চলে যায় সে। স্বামী অন্য স্ত্রীর সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে বিলাসিও রমনা নামে অন্য পুরুষের সঙ্গে থাকতে শুরু করে, দৈহিক সম্পর্কেও লিপ্ত হয়। কয়লা কুঠির শ্রমিকদের কাছে শারীরিক সম্পর্ক শুধু তৃষ্ণা মেটানোর মাধ্যম। বিলাসি রমণাকে তার শরীর দিলেও মনের এক কোণে এখনও সে নানকুকে ভালোবাসে। এভাবে কিছুদিন কাটার পর হঠাৎ করে সে একদিন জানতে পারে মাইনু মারা গেছে এবং নানকু ফিরে এসেছে। এতে তার মনে নানকুর প্রতি সুপ্ত প্রেম আবার জাগ্রত হয়। সে নানকুর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। খুশিতে আত্মহারা বিলাসি পরমুহূর্তেই জানতে পারে যে নানকু কয়লাখনিগর্ভে চাপা পড়ে মারা গেছে। ব্যথিত হৃদয়ে সে মদ্যপান করে এবং রমণাকে নিয়ে কয়লা খনিতে যায়। রমণা ইঞ্জিন চালিয়ে নীচে নামতে থাকে, হঠাৎ গাড়ি আটকে গেলে বিলাসি ভাবে সে হয়তো পৌঁছে গেছে এই ভেবে সে নামতে গিয়ে ৫০ ফুট নিচে একটি মৃতদেহের উপর গিয়ে পড়ে। সে দেহটি ছুঁয়ে বুঝতে পারে যে এই দেহটি নানকুর। সে মৃতদেহ নিয়ে বিলাপ করতে থাকে এমন সময় একটি বড় কয়লার চাংড়া পড়ে দুজনেই সমাধিস্থ হয় অপরদিকে রমনা উপরে বিলাসির অপেক্ষা করতে থাকে। এভাবেই চরিত্রের বেদনাঘন পরিণতিতে সমাপ্তি ঘটে 'কয়লাকুঠি' গল্পটির।

কয়লাখনির পরিবার নিয়ে রচিত অপর একটি গল্প 'মা'। এই গল্পটিতে সর্দার দুখন ও তার ভাইয়ের মেয়ে পরীর জীবনের অসহায় দিকটি ফুটে উঠেছে। কয়লাখনিতে খনিচাপা পড়ে মারা যাওয়া স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং এতে খনির মালিক তথা ম্যানেজারের কিছু যায় আসে না। শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা অসহায়তা কখনো মালিকদের ছুঁতে পারেনা। তাই দেখি গল্পে যখন দুখনের ভাই ও ভাইয়ের পুত্র খনি গর্ভে পড়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়ে, তখন মালিকের নিকটস্থ হলে খালি হাতেই ফিরে আসতে হয়, মেলেনি মরণোত্তর কোন আর্থিক সাহায্য। কয়লাখনির জন্য শ্রমিকেরা তাদের জীবন ও যৌবন সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েও সুখের মুখ দেখতে পারেনা। মনে হয় যেন শোষণ হওয়ার জন্যই তাদের জীবন ও জন্ম। এই শোষণের যন্ত্রণা তিলে তিলে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং বেছে নেয় তারা আত্মহননের পথ যেমনটা দুখন বেছে নিয়েছিল, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি। ভাইয়ের একমাত্র মেয়ে পরীকে রেখেই দুখন মারা যায়। পরীর জীবনের স্বচ্ছতা নিরাপত্তা ও দুখনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হয়ে উঠে। টুরীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও লামার ছেলে টুরী কামনার তাড়নায় পরীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। ঘৃণায় অসহায় পরী জীবন থেকে নিস্তার পেতে

চেয়েছে, কিন্তু সে আত্মহত্যা করতে পারেনি তার গর্ভে থাকা সন্তানের কথা ভেবে। তাকে ঘৃণ্য কয়লাখনির পরিবেশের মধ্যে বাঁচতে হল।এই গল্পে মাতৃহৃদয়ের যে উপলব্ধি যে আবেগ তা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত।

'মরণবরণ' গল্পে ধরা পড়েছে বৃদ্ধ কয়লাখনির শ্রমিকের অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত জীবনের আখ্যান। কয়লাখনির এক শ্রমিক বৃদ্ধ ভটুল। বৃদ্ধ বয়সে সে এক তরুণীকে বিবাহ করে এবং সে অফুরান ভালোবাসে তার স্ত্রীকে কিন্তু উদ্বিগ্ন যৌবনা রুকিকে যৌন সুখ দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধ ভটুলের নেই। যৌবনে ভরপুর রুকি স্বামী থেকে সেই আনন্দ না পেয়ে সে গোপনে সাহেবের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং একটি পুত্র সন্তানের ও জন্ম দেয়। ভটুল এই সন্তানকে নিজের ঔরসজাত সন্তান ভেবে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বড়ো করতে থাকে, কিন্তু যেদিন সেই সত্যটি প্রকাশ পায় সেদিন ভটুল নিজেকে আর সংযত করে রাখতে পারে না। সহজ সরল ভটুল অবশেষে কয়লাখাদে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহননের পথটি বেছে নেয়। ভটুলের আত্মহত্যাতে রুকির বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তাকে দুঃখিত দেখা যায় যখন সাহেবের অন্যত্র বদলি হয়ে যায়। সে দুঃখিত মনে সাহেবকে বলে- *"আমাদের কোথায় রেখে যাবি সাহেব- আমরাও যাব।"* [৪] কিন্তু এতে সাহেবের মন বিগলিত হয় না। সাহেব রুকিকে ছেলেকে রসগোল্লা খাওয়ানোর জন্য দুটো টাকা দিয়ে মোটর চালিয়ে সেই স্থান ছেড়ে চলে যায়। আসলে এই গল্পের মুখ্য উপজীব্য বিষয় হচ্ছে কয়লাখনির মানুষের সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের জায়গাটি, তাঁদের মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, তাঁরা মুক্ত ও স্বাধীন। তাদের এই মুক্ততাই তাদের বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এমনকি তখন তাদের কাছে আত্মহননের পথটাই সহজ বলে মনে হয়। যা ভটুলের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শৈলজানন্দের 'নারীর মন' গল্পটিও উল্লেখযোগ্য। এই গল্পের প্রধান চরিত্র ভুলি। গল্পটি ভুলি, তার বোন টুরণী আর তার স্বামী পীরুকে কেন্দ্র করে ত্রিকোণ প্রেমের ছাঁচে লেখা। পীরু ভুলির বোন টুরণীর প্রতি আসক্ত। ভুলি এ ব্যাপারে সোচ্চার হলে স্বামীর হাতে তাকে কিল-চর-ঘুসি খেতে হয়। একবার যাত্রার আসরে ভুলি তার স্বামীকে টুরণীর সাথে বসে থাকতে দেখলে সে রেগে তেঁতে উঠে, সে টুরণীর চুল ধরে বাইরে নিয়ে এসে প্রহার করতে থাকে। কিন্তু পীরু রেগে গিয়ে ভুলিকে মারতে শুরু করে এমনকি সকলের সামনে বন্ধ্যা বলতেও দ্বিধাবোধ করে না। অপমানিত হয়ে ভুলি কয়লার ধাওয়ায় ফিরে যায়, সেখানে গিয়ে সে কিভাবে স্বামীকে জব্দ করবে সেই কথাই ভাবতে থাকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে তার পুরনো প্রেমিকের কথা। প্রতিশোধলিপ্সু ভুলি তার পুরনো প্রেমিক ভোলাকে গিয়ে বলে যদি সে পীরুকে তার গায়ের জোরে হারাতে পারে তবে সে তার সঙ্গে 'শাঙ্গা' করবে। পুরনো প্রেমিক ভোলা ভুলিকে পাওয়ার আশায় একদিন কাজ থেকে আসার পথে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত পীরুকে আক্রমণ করে। গায়ের জোরে জেতা তো দূরের কথা, পীরুর কাছে অতি সহজে হার মানে ভোলা। এতে ভুলি দুঃখিত হলেও মনে মনে স্বামীর পৌরুষে গর্ববোধ করে। কিন্তু স্বামীকে শাস্তি দিতে সে ব্যর্থ হয়। যখন ভুলি আর কোনোভাবেই স্বামীকে জব্দ করতে পারল না তখন সে আসামের চা বাগানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আসামযাত্রী কুলির সঙ্গে টুরণীর যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভুলি বোনের বদলে চলে যেতে চায়। আসাম যাওয়ার জন্য সে ট্রেনে চড়ে বসলেও অন্তরের বিরহ বেদনা তাকে আষ্টেপিষ্টে ঘিরে ফেলে। তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তার দুচোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরতে থাকে-

> *"ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভুলির চোখ দুইটা এতক্ষণে ছল ছল করিয়া আসিল। দূরে পলাশ বনের ভিতর দিয়া টুরণী ছুটিতে স্টেশনের দিকে আসিতেছিল। ভগিনীকে একবার প্রাণ ভরিয়ে দেখিয়া লইয়া, ভুলি জানালার পাশে সরিয়া বসিল।"* [৫]

ভুলির চোখের জল দেখে পাশের মেয়েটি ভুলিকে কাঁদছিল কেন বলে জিজ্ঞাসা করলে ভুলি অতি সহজে মিথ্যে হাসি হেসে মেয়েটিকে বলে *'ধ্যুৎ কাঁদব কেনো লো'*।

এই গল্পটির চরিত্রগুলো কয়লাকুঠির হলেও এই ঘটনা ও পরিণতি সর্ববিদ্যমান। নারীর মনের এমন রূপান্তর সব দেশে কালে প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে। নারীমনের ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মান অভিমান, এবং সবশেষে স্নেহের দিকটিও আলোচ্য গল্পে যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে। শৈলজানন্দের গল্পগুলির মধ্যে চরিত্রের প্রতিবাদ মুখর হওয়ার একটা জায়গা ছিল কিন্তু শৈলজানন্দ এদের প্রতিবাদী করে তোলেননি বরং শ্রমজীবী মানুষের চরম দারিদ্র্য এবং এর সঙ্গে তাদের অনাবৃত জৈবিক প্রবৃত্তিকে মুখ্য করে তুলেছেন। 'ঝুমরু' গল্প দেখি বর্ষা দিনের শ্রমিকদের সমস্যার ছবি। বর্ষাকালে কাজের জন্য সবারই ছাতার প্রয়োজন কিন্তু তারা ছাতা কিনতে অসমর্থ। তাই তারা শিয়াড়ি পাতা দিয়ে ছাতা তৈরি করে ছাতার অভাব পরিপূর্ণ করতে চায়। তারা শিয়াড়ি পাতা আনার জন্য ম্যানেজারের কাছে ছুটি চাইলে তিনি

তাদের দাবি মানতে সম্মত হোননা, বরং তাদের রবিবার বন্ধ দিনে পাতা সংগ্রহ করতে বলেন। কর্মচারীরা এই কথায় কোনো প্রতিবাদ করেনা বরং নতমস্তকে তা স্বীকার করে নেয়। এখানে চাইলে শৈলজানন্দ তাদের প্রতিবাদের দিকটাও তুলে ধরতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তাদের অধিকারবোধ অপেক্ষা প্রাত্যহিক জীবন যন্ত্রণা এবং কামতাড়িত জীবনের নানা সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

শৈলজানন্দ পাঠকের সামনে কয়লাখনির শ্রমিক ও কর্মচারীদের শোষণের যে চিত্র তা তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কয়লাখনির সাহেবেরা মজুরদের মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, তাদের মৃত্যু সাহেবদেরকে একটুও ভাবুক করে তুলে না। 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পটিতে শৈলজানন্দ কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিকদের শোষণের কদর্য চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পে দেখা যায়, খনির ম্যানেজার জেমস্ সাহেব মুনাফার লোভে শ্রমিকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও দ্বিতীয়বার চিন্তা করেন না। তার কাছে শ্রমিকদের জীবন শুধুমাত্র এক শ্রমিক রূপেই। ম্যানেজারদের এই উন্মাদ আকাঙ্খার বলি হয় সাধারণ শ্রমিকেরা। এই গল্পে দেখি রেজিংবাবু চঞ্চলের নির্দেশে কয়লা খাদে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে মৃত্যু হয় টুইলা নামের এক শ্রমিকের। খনির অতলে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় সে কিন্তু তার মৃত্যুতে জেমস্ সাহেবের মুনাফা লোভের নেশা বিন্দুমাত্র টলতে দেখা যায় না বরং তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে জানান- *'কুছ পরোয়া নেই।'* কারণ এমন মৃত্যু কয়লাখনিতে অহরহ ঘটে থাকে। সাহেব এই সমস্ত কথায় কর্ণপাত করে মুনাফা লাভে বাধাপ্রাপ্ত হতে চায়না। উপরন্তু তিনি যেন-তেন প্রকারে রেজিং বাড়াতে ব্যস্ত হয়ে যান। টুইলার মৃত্যুর পর টুইলার বউকে স্বামীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিতে নারাজ ম্যানেজার জেমস্। খনির রেজিংবাবু ম্যানেজারের কাছে টুইলার মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের দাবি জানালে ম্যানেজার তার উপর রেগে গিয়ে বলেন– *'Damn Your Tuila.'* এই কথা শুনে রেজিংবাবুর মনঃক্ষুন্ন হয়ে যায়। কয়লা খাদের অন্ধকারে বসে চঞ্চলবাবু যখন এ সমস্ত কথাই ভাবছিলেন তখন টুইলার বউ সোহাগী তাকে তার স্বামী ভেবে জড়িয়ে ধরে। এই ঘটনা জেমস্ সাহেবের নজর এড়িয়ে যায়নি, তিনি এরজন্য চঞ্চল বাবুকে বরখাস্ত করেন চাকরি থেকে। যেহেতু ম্যানেজার সোহাগীকে তার স্বামীর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ রূপে কোনো অর্থই দেয়নি তাই চঞ্চল বাবু যাওয়ার আগে তার শেষ মাইনেটুকু সোহাগীকে দিয়ে অন্যত্র চলে যান। চঞ্চল বাবু ফিরে যাওয়ার সময় দুঃখিত মর্মাহত হয়ে ভাবতে থাকেন-

> *"হে ভগবান! দাসত্বের পায়ে নিজের মনুষ্যত্বটুকু বিসর্জন দিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, আমাকে সে পাপের শাস্তি দিতে তুমি কুণ্ঠিত হইও না।"*[৬]

'জোহানের বিয়া' গল্পটিও কয়লাখনির পটভূমিকে আশ্রয় করে রচিত। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সুখী। এই নারী চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে গল্পকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নারীর আপাত নির্দয় বুকে লুকিয়ে থাকা বেদনার চিত্র তুলে ধরেছেন। ভরপুর যৌবনা সুখীকে পরিস্থিতির চাপে পড়ে খোঁড়া জোহানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। কিন্তু শারীরিকভাবে অসমর্থ জোহান উচ্ছলা সুখীর কামবাসনার তৃষ্ণা নিবারণ করতে অসমর্থ। তাই সুখী জোহানকে অবজ্ঞা করে চলে এমনকি তাকে স্বামীর দরজাটুকুও দিতে নারাজ। সে তার জীবনে স্বামী জোহানের উপস্থিতিকেও স্বীকার করতে চায় না। ঘটনাক্রমে জোহানের অপমৃত্যু ঘটলে সুখী তার হৃদয়ে থাকা জোহানের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করতে পারে। তার সুপ্ত ভালোবাসার কথা ভেবে সে দুঃখিত হয়ে পড়ে এভাবেই এই করুন পরিণতির মধ্য দিয়ে গল্পটির পরিসমাপ্তি হয়। এই গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক কয়লাখনি অঞ্চলের লোকেদের সারল্যময় ভালোবাসা ও বেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

এরকম নানা ছোটগল্প রচনার মধ্যে দিয়ে শৈলজানন্দ বাংলা সাহিত্যের আঞ্চলিকতার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। তাঁর এজাতীয় গল্পের প্রশংসা করে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন-

> *"শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০) বাঙলা কথাসাহিত্যে তাঁর কয়লাকুঠির গল্প দিয়ে একটা নতুন হাওয়া এনে দিয়েছেন। কয়লার খনি, তার কুলি-মজুর, সাঁওতাল নর-নারী, নিচুতলার মানুষদের বিচিত্র সমাবেশ – বাউরি-হাড়ি-ডোম, খনি জীবনের পরিবেশের মধ্যে এই অকিঞ্চন মানুষদের অনালোকিত দিনযাপন, একে অবলম্বন করে শৈলজানন্দ যেসব গল্প লিখেছেন, উপাদানের নতুনত্বের কারণেই শুধু নয়, সহানুভূতির বিস্তারের কারণেও এই গল্পগুলি সেদিন অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবং কালক্রমে এইভাবে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে যাকে আধুনিক বলতে বাধা নেই।"*[৭]

শৈলজানন্দের সার্বিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন-

> *"নিঃস্ব, রিক্ত বঞ্চিত জনতার তিনি প্রথম প্রতিনিধি। বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন বস্তু নতুন ভাষা এনেছেন। হাতির দাঁতের মিনার চড়া ছেড়ে যিনি প্রথম নেমে এসেছেন ধূলিম্লান মৃত্তিকার সমতলে।"*[৮]

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে অনুধাবন করলে দেখা যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের আদি-অন্ত জুড়ে রয়েছে কয়লাখনি অধ্যুষিত অঞ্চলের শ্রমিকদের সরল ও সীমাবদ্ধ জীবনের প্রকাশ। দরদীপ্রাণ ও স্রষ্টার মানসিকতা ও দৃষ্টি নিয়ে তিনি প্রবেশ করেছেন কয়লাখনির জগতে, বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাদের জীবনযাত্রা, সেখানকার রোদ-বৃষ্টির, হাসি-কান্নার গল্প। তিনি অশিক্ষিত শ্রমজীবী লোকদের জীবন সংগ্রামকে তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন। গল্পকার শ্রমজীবী লোকদের প্রাত্যহিক জীবনকে সাহিত্যে প্রাণবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন তাঁর গল্প রচনার স্বতন্ত্র শৈলীর মধ্য দিয়ে।

বিশিষ্ট সমালোচক গোপিকানাথ রায় চৌধুরী শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি সম্পর্কীয় গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার সূচনা করেছে বলে জানিয়েছেন-

> *"কয়লাকুঠির গল্পগুলি বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠক সমাজের একঘেয়ে প্রথাবদ্ধ জীবনে এক অনুস্বাদিত মুক্তির সুখ স্পর্শ বহন করে আনল। এক সজীব সতেজ জীবনরসের অফুরন্ত স্রোত প্রবাহিত করে দিল বাংলা কথাসাহিত্যে। কয়লাখনির অতল থেকে লেখক তুলে আনলেন দীপ্ত প্রাণের হীরক খন্ড। রানীগঞ্জ ধানবাদ অঞ্চলের কয়লাকুঠির অধিবাসী সাঁওতাল, বাউরি, কুলি কামিনদের সুস্থ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আদিম জীবনের নিঃসংকোচ প্রেম ঈর্ষা আত্মত্যাগ ও অকুণ্ঠ স্থূল উদ্দমতার বলিষ্ঠ সরল কাহিনী বাঙালি পাঠকদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ অভিভূত করে দিল। বস্তুত শৈলজানন্দ কয়লাকুঠি অঞ্চলের গল্পের মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের আঞ্চলিক (Regional) বা স্থানীয় রঙ (Local colour) বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয়ে উঠল।"*[৯]

তাঁর পূর্বে বিশ্বসাহিত্যে কয়লাকুঠি নিয়ে সাহিত্য রচনা হলেও তাঁদের হতদরিদ্র জীবনচর্চার অভিজ্ঞতা আশ্চর্যভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে শৈলজানন্দের হাতেই, তাঁর গল্প চমৎকৃত করে তুলেছে বাংলা সাহিত্যকে।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃ. ১০।
২. মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পাদনা)। বাংলা ছোটগল্প: পর্ব পর্বান্তর। পৃ. ১১৬।
৩. পাল, রবিন। কল্লোলিত ছোটগল্প। পৃ. ১২৭।
৪. তদেব, পৃ. ১৩০।
৫. মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পাদনা)। বাংলা ছোটগল্প: পর্ব পর্বান্তর। পৃ. ১২০।
৬. পাল, রবিন। কল্লোলিত ছোটগল্প। পৃ. ১২৮।
৭. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা। তদেব, পৃ. ২১৩।
৮. পাল, রবিন। কল্লোলিত ছোটগল্প। পৃ. ২২৭।
৯. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য। তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৭, পৃ. ২২৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ। কয়লাকুঠির দেশ। কলিকাতা বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৫, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পাদনা)। বাংলা ছোটগল্প: পর্ব পর্বান্তর। প্রকাশক, অজিত কুমার জানা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯।

২. পাল, রবিন। কল্লোলিত ছোটগল্প। কলেজ স্ট্রিট, ৮৬ এ, কলকাতা -৭৩, বইমেলা ২০০৯।
৩. বন্দোপাধ্যায়, সরোজ। বিপন্ন রোম্যান্টিক শৈলজানন্দ। দেশ, ২৯ এপ্রিল ২০০৯।
৪. চৌধুরী, নন্দ। শিল্প, শিল্পশ্রমিক ও বাংলা সাহিত্য। একুশ শতক পত্রিকা, মাসিক, পঞ্চদশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রকাশ-২০২০।
৫. দে, গোপীনাথ। আকাশের নিচে মাটির গভীরে: প্রসঙ্গ কয়লাখনি। যুবমানস, শারদসংখ্যা, ২০০০।
৬. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯।
৭. লাহিড়ী, সৌমিত্র। শ্রমজীবী মানুষের গল্প। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা-৭৩।
৮. চৌধুরী, ভাস্কর। ছোটগল্পের অন্দরমহল। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা ০৯।
৯. চৌধুরী, ভূদেব। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭।
১০. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা। দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগষ্ট ২০০৯, কলকাতা।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 329- 335
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.231

উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে নারীর জীবনযাত্রা: প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘কঙ্কাবতী’

সুনন্দা ঘোষ, *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 15.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The 19th century is considered the dawn of a new era. This century marked a turning point for women, who began to emerge from the darkness of ignorance and find the light of knowledge. The 19th century can also be termed a transitional period, as it was marked by both darkness and the emergence of modern thought. Women were victims of societal norms and customs, restricted by rules that governed their lives from birth to death. They were confined to the household and barred from participating in the outside world. Against this backdrop, Trailokyanath Mukhopadhyay created female characters in his works, depicting the struggles of women in society. In his novels and stories, such as "Kankabati", "Damru Charit", "Lallu", and "Birbala", he portrayed the image of oppressed women. Specifically, in "Kankabati", he highlighted the problems faced by women in the 19th century. Through Kankabati's character, Trailokyanath depicted the progress of women's education, the impact of child marriage on women's lives, the sufferings of widows, and the practice of Sati. He exposed the societal norms and customs that were the root cause of women's suffering. Society imposed strict rules and customs, dictating that women were the key to all good and evil. Women's education was seen as a threat to societal stability, and they were denied the right to education. Only men had access to education, while women were confined to their homes. Trailokyanath Mukhopadhyay's works shed light on the plight of women in a patriarchal society, trapped in a web of societal norms and customs. This discussion will explore how he portrayed the struggles of women in "Kankabati".

Keywords: Women’s Education, Social Customs and Oppression, 19th-Century Bengal, Patriarchal Society, Child Marriage

আমরা জানি সাহিত্যে রয়েছে সমাজের প্রতিফলন। এই প্রতিফলনের কোনো সীমা নেই। সমাজ যত এগিয়ে যাচ্ছে, যতবার যতরকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে, সাহিত্যে তার সবকিছুই ওঠে আসছে। সমাজের দুটি স্তম্ভ— নারী ও পুরুষ। এই দুই স্তম্ভের জীবনযাত্রার দোলাচলতা সাহিত্যের অন্যতম অংশ। বিশেষ করে নারীর জীবনযাত্রা। কারণ— উনিশ শতকে নারীর জীবনযাত্রা সহজ ছিল না। পুরুষ ও নারী সমকক্ষ তো ছিলই না, উল্টো পুরুষের শাসনে নারীকে চারদেয়ালের ভিতর আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। এমন প্রতিকূলতা থেকে উদ্ধার পেতে নারীর সময় লেগেছে অনেক। নারীর জীবন অনেকটা নদীর মতো, প্রতিটি বাঁক একটি করে আধুনিকতা উপহার দিয়েছে নারীকে। জীবনের প্রতিটি বাঁকে নানা রঙ দেখতে দেখতে গিয়েছে নারী ও পেরেছে কিছুটা শেকল-মুক্ত হতে। সাহিত্যের প্রতিটি শতক জুড়ে রয়েছে নারীদের জীবনযাত্রা, সংগ্রাম ও মুক্তির ছাপ। আমরা এখানে আলোচনা করব উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘কঙ্কাবতী’ উপন্যাস। এই শতকে নারী প্রায় আবদ্ধ-জীব। পরিবার কিংবা সংসারের চার-

দেওয়ালের মধ্যেই ছিল নারীর বড় হয়ে ওঠার গল্প, তার কর্মজীবন ও সবটুকু। জীবনের শুরু ও শেষ বাড়ির গণ্ডির মাঝেই। যেখানে বাইরের শিক্ষা, উন্নত জীবনধারার আলো প্রবেশ নিষেধ। কারণ— আলোর আধিকার একমাত্র পুরুষদের। অন্যদিকে সংসার রক্ষা, স্বামী-সন্তান প্রতিপালন ছিল নারীর ধর্ম। খুব কম বয়সে নিজস্ব চাহিদা, বোধ জন্মাবার পুর্বেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। ফলে নিজের রুচির উপর নির্ভর করে জীবন না কাটিয়ে স্বামীর সংসারে অন্যের হুকুমের দাসী হয়ে জীবন কাটাতে হতো। এমনকি কম বয়সে বয়স্ক লোকের সঙ্গে বিবাহ-পাশে আবদ্ধ হওয়ায়, অচিরে বৈধব্য ধারন করে নারী ভবিষ্যৎ কালবৈশাখীর অন্ধকারে ডুবে যেতো। এমনই এক বিস্ময়কর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করা উনিশ শতকের নারী জীবনকে এঁকেছেন ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর কঙ্কাবতীতে।

'কঙ্কাবতী' আলোচনায় আমরা প্রথম দিকে রাখবো নারী শিক্ষার দিকটি। নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে জীবনে উন্নতির একমাত্র ধাপ শিক্ষা। তবে সমাজ শিক্ষা গ্রহনের স্বীকৃতি দিয়েছিল পুরুষদের। নারীর প্রবেশ এই জায়গায় ছিল একদম নিষেধ। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, নারী শিক্ষার বা শিক্ষামূলক উন্নতির গোঁড়ার কথা কেমন ছিল তা নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতে শিক্ষিত নারীর অভাব ছিল না। লক্ষণসেনের স্ত্রী, চৈতন্য যুগে সুভদ্রা দেবী, হেমলতা দেবী, উনিশ শতকের সূচনায় আনন্দময়ী দেবী প্রমুখ ছিলেন বিদ্যাবতী নারীদের তালিকায়, যদিও এই তালিকা আরো বড়। ধনী ঘরের, অভিজাত শ্রেনির মেয়েরা শিক্ষা গ্রহন করতে পারলেও, গ্রামের তৃণমূল স্তরের বিরাট অংশের নারীরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। পড়াশোনা করলে মেয়েরা উশৃঙ্খল হয়ে উঠবে, বিধবা হবে এমন উদ্ভট ধারনাগুলো নারীদের পায়ে শেকল পড়িয়ে রাখতো। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর 'কঙ্কাবতী'-তে দেখিয়েছেন— তনু রায় তার ছোটো মেয়ে কঙ্কাবতীকে লেখাপড়ার দিকে এগিয়ে দিতে চায় নি। তার মতে—

"স্ত্রীলোকের আবার লেখাপড়া কেন? লেখাপড়া শিখিয়া আর কাজ নাই"[১]

বলা-বাহুল্য তনু রায় কঙ্কাবতীকে শিক্ষার দিকে এগিয়ে না দেওয়ার অন্যতম কারন ছিল সমাজ চাহিদার অভাব। নারী শিক্ষালাভ করে সমাজের উপকারে আসবে, এমন ভাবনা সেসময়ে কল্পনার অতীত ছিল। কচি বয়সে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দায় সারা-ই ছিল তনু রায়ের লক্ষ্য। যদিও কন্যা দানের মাধ্যমে পাত্র পক্ষ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নেওয়ার লালসার কমতি ছিল না। তবুও বলা যায়— তনু রায় উনিশ শতকের সমস্ত মধ্যবিত্ত পিতার প্রতিনিধি, যাদের মতে নারী শিক্ষা একটি অবান্তর ভাবনা।

রূপকথার আদলে একটি ব্যাঙের মুখ থেকে সমসাময়িক সমাজমানসে স্ত্রী-শিক্ষার ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। ব্যাঙ বলছে—

"ওগো তুমি যে মেয়েটি ভালো গো! ওগো লেখাপড়া শিখিয়া তুমি যে মদ্দামেয়েমানুষ হও নি গো"[২]

অর্থাৎ ব্যাঙের ধারনা কঙ্কাবতী শান্ত, লক্ষ্মীমন্ত হতে পেরেছে পড়াশোনা করেনি বলেই। নইলে মদ্দামানুষ হতে তাকে কেউ আটকাতে পারতো না। নারী নম্র, লজ্জাশীলা, ধীর হবে এমনটাই সমাজ প্রত্যাশা করে। শিক্ষা নারীকে এই গণ্ডিমুক্ত করবে ভয়ে সমাজ নারীকে চার-দেওালের বাইরে বেরতেই দেয় নি। ব্যাঙের এমন বিবেচনা তৎকালীন রক্ষণশীল মানসিকতারই প্রকাশ।

খেতু কঙ্কাবতীকে লেখাপড়া শিখিয়ে কলকাতার আচরণে দীক্ষিত করতে চায়। সে কলকাতা থেকে বই এনে কঙ্কাবতীকে পরাতে চাইলে, কঙ্কাবতীর মা স্বয়ং তাতে সোজাসুজি বাঁধা না দিলেও একবাক্যে উৎসাহ প্রকাশ করে নি। তার ভাষ্য—

"আমাদের পাড়া গাঁ তাই, এখানে অসব নাই"[৩]

স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন শহরে কিছুটা ছড়িয়ে গেলেও, গ্রামে চলত পুরনো ভাবধারা। সেই ধারাকে ভেঙে নতুনকে বরণ করা সহজ ছিল না। কারণ ছিল সমাজে মেয়েদের পথ দেখানোর জন্য উপযুক্ত গৃহশিক্ষিকার অভাব ও পরিবারের লোকেদের নেওয়া যত্নের ত্রুটি। মেয়েদের শিক্ষার থেকে তাদের পাত্রে সমর্পণ করাটিই সেই সময়ের সমাজব্যবস্থার নিয়ম ও লক্ষ্য ছিল। উনিশ শতকের মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টিকে নিয়ে তাদের বাবা-মায়েরা কতটা উদাসীন ছিল তা 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করতে পারি—

> "বাপ মায় লেখাপড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন যে ঘরের কার্য্য কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘরকন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্ম্ম দেয়াথোয়া শিখিলেই শ্বশুরবাড়ি সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছু কহেন না"[৪]

নারীর শিক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি যা 'সর্বশুভঙ্করী' পত্রিকায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে—

> "প্রথম। শিক্ষা কর্ম্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তির আবশ্যক স্ত্রী জাতির তাহা নাই সুতরাং কন্যা সন্তানেরা শিখিতে পারে না।
>
> দ্বিতীয়। স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখন নাই, এবং শাস্ত্রেও প্রতিষিদ্ধ আছে; অতএব লোকাচার বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ ব্যাপার কদাচ অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে না।
>
> তৃতীয়। স্ত্রী লোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতি বিয়োগ দুঃখের ভাজন হইয়া চিরকাল কষ্টে জীবন যাপন করিবেক অতএব এতাদৃশ দৃষ্টদোষদূষিত বিষয় জানিয়া শুনিয়া পিতামাতা কেমন করিয়া প্রাণ সমান স্ব সন্তানকে এই দারুণ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন"[৫]

স্ত্রী-শিক্ষার পাশাপাশি আমরা নারীর বাল্যবিবাহকেও নারীর অন্ধকার ভবিষ্যতের কারণ হিসেবে দাঁড় করাতে পারি। কারন বাল্যবিবাহ নারী শিক্ষা অন্তরায়ের অন্যতম কারন। বাল্যবিবাহের জন্যই সংসার প্রতিপালন করতে গিয়ে অল্প বয়সেই সংসার জালে আবদ্ধ হয়ে যেতো বা আবদ্ধ করানো হতো। যে সমাজে বিয়ে ছিল মেয়েদের একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে শিক্ষার স্থান বহুদূরে হওয়াই স্বাভাবিক। তনু রায় তার প্রথম দুই কন্যাকে কম বয়সে বয়স্ক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। এরপর কঙ্কাবতীর ক্ষেত্রেও একই কাজ করতে গেলে কঙ্কাবতীর মা বুড়ো বরের হাতে ছোটো মেয়েকে সমর্পন করতে রাজী হয় নি। ঈশ্বরের কাছে তার একমাত্র প্রার্থনা—

> "হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে ঠাকুর! যেন আমার কঙ্কাবতীর বরটি মনের মতন হয়"[৬]

বড় দুই মেয়ের বৈধব্য যন্ত্রণা তার কাছে মা হয়ে অসহনীয় ঠেকেছিল। তাই কঙ্কাবতীর ভাগ্য যাতে না পুড়ে, সেজন্যে ঈশ্বরের কাছে তার কাতর আর্তনাদ। এই আর্তনাদ বাল্যবিবাহের বিফলতার প্রতীক।

সমাজ চলে তার নিজের স্রোতে। নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমাজের পুরুষের পক্ষে মর্যাদায় আঘাত হানার সমান ছিল। বিবাহ যোগ্য কন্যা কিংবা পরিবারের অন্যান্য স্ত্রীলোকের মতামতকে সঙ্গে রেখে সে-সময়ের পুরুষ সমাজ চলত না। ফলে দেখা যায়— কঙ্কাবতীর মায়ের সমর্থন না থাকা সত্তেও তনু রায় গ্রামের বুড়ো জমিদারের সঙ্গে ছোটো মেয়ের বিয়ের পাকা কথা দেয়। এদিকে বুড়োর গলায় বরমালা দিতে হবে ভেবে আহার, নিদ্রা ত্যাগ করে জ্বরে মর-মর অবস্থা হয় কঙ্কাবতীর। এই প্রসঙ্গে খেতুর মার উক্তি—

> "কঙ্কাবতীর যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, কঙ্কাবতী আর অধিক দিন বাঁচিবে না"[৭]

তনু রায় এমন অবস্থাতেও মেয়েকে পাত্রস্থ করতে প্রস্তুত। নইলে জমিদারের থেকে পাওয়া মোটা অঙ্কের টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে। তনু রায়ের এমন উদ্যোগ গোয়ালিনীর কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না। গোয়ালিনী তনু রায়ের উপর রেগে যায়। কিন্তু তার এই ক্ষোভ সে প্রকাশ্যে আনে নি। উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের কোনো সিদ্ধান্তে নারীরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাতে পারতো না। গোয়ালিনীর মতো সামান্য কর্মজীবি নারীদের পক্ষে তা আরও সম্ভব ছিল না। তাই মনে মনে গোয়ালিনী তনু রায়ের উপর ক্ষোভ উগড়ে বলে—

> "বাছা রে আমার! জনার্দন চৌধুরীকে এই সোনার বাছা বেচিতে চায়! পোড়ারমুখো বাপ! রও এইবার দেখা হইলে হয়! গালি দিয়া ভূত ছাড়াইব"[৮]

নিজের পিতার উপর গোয়ালিনীর এমন রাগ দেখে কঙ্কাবতী পিতার সমর্থন নিয়ে নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ হিসেবে পরিবারের অর্থনৈতিক দৈন্যতার দিকে ইঙ্গিত করে বলে—

> "না মাসী, বাবাকে গালি দিও না! জান তো মাসী? বাবা দুঃখী মানুষ! ঘরে অনেকগুলি খাইতে। আমাকে না বেচিলে, বাবা, সংসার প্রতিপালন কি করিয়া করিবেন?"[৯]

কঙ্কাবতীর মুখে 'বেচিলে' শব্দটি তৎকালীন মেয়ের সামাজিক অবস্থার করুণ পরিণতির দিকটিকেই প্রকাশ করে। নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা বা নিজের ইচ্ছার কথা ভেবে, পরিবারের অর্থনৈতিক সাহায্যের কথা ভেবে কঙ্কাবতী নিজের

বিরুদ্ধে গিয়ে বুড়ো জনার্দনের গলায় মালা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার লক্ষ্য একটি— তার পরিবার যাতে দারিদ্রে না থাকে। যদিও তনু রায়ের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি করুণ নয়। স্বভাবের বশবর্তী হয়েই তার টাকার লোভ ও কৃপনতা।

ঘটনাচক্রে তনু রায়ের সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিয়ে ভেঙে যায়। বিয়ে ভেঙে যাওয়া মেয়েকে তৎকালীন সমাজ ভালো চোখে নিতো না। পরবর্তীতে মেয়েটিকে পাত্রস্থ করা কঠিন হয়ে পড়তো। তার একটি-ই ভয়—

> "এমন রাজা হেন পাত্রের সহিত তোমার বিবাহ স্থির করিলাম। তোমার কপালে সুখ নাই, তা আমি কি করিব? জনার্দন চৌধুরীকে কত বুঝাইয়া বলিলাম, কিন্তু তিনি আর বিবাহ করিবেন না। এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি? পঞ্চাশ টাকা দিয়াও কেহ এখন ইহাকে বিবাহ করিতে চায় না"[১০]

কৃপন তনু রায়, যে তার নিজের মেয়েদের বিবাহ নামক ব্যবসার রসদ হিসেবে ব্যবহার করে টাকা কামাতে চায়, সে-ই তনু রায় সমাজের চোখ থেকে রক্ষা পেতে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করে কঙ্কাবতীর বিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু পাত্র পাওয়া কষ্টকর। তনু রায়ের চিন্তা—

> "এত বড় মেয়ে হইল, এখন ও মেয়ে লইয়া আমি করি কি? সুপাত্র ছাড়িয়া কুপাত্র মিলাও দুর্ঘট হইল"[১১]

ফলে কুলটা মেয়েকে ঘাড় থেকে নামাতে, কিংবা বলা যায় বেশি টাকার লোভে চতুষ্পদ প্রাণী বাঘের সঙ্গেই সুন্দরী কঙ্কাবতীর বিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় সে। তনু রায়ের মতে অধিক ধন-সম্পত্তির মালিক হলেই সুপাত্র হওয়া যায়। তাই একান্ত ধনের লোভে পড়েই বাঘের সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিয়ে ঠিক করে বসে তনু রায়। কোন প্রাণীকূলে তনু রায় তাকে পাত্রস্ত করবে কঙ্কাবতী তা জানত না। ফলে সুপাত্রের আশা করা তার কাছে বিলাসিতা মাত্র। অর্থাৎ লোভ, সম্মানহানির ভয়, পণ ইত্যাদি চাপাকলে মেয়েদের জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, উনিশ শতক যার পোক্ত দলিল।

নারীকে বাল্যবিবাহ নামক অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে ১৮৭৩ সালে ঢাকাতে 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' স্থাপিত হয়। 'বিদ্যোৎসাহিনী'-তে বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ে বলা হয়েছে—

> "বাল্যকালে বিবাহ হইলে হৃতবীর্যও হইতে হয়। তাহার প্রমাণ অস্মদ্দেশীয় লোকেরা প্রায়ই অন্যদেশীয় লোক হইতে দুর্ব্বল হইয়া থাকে সুতরাং দুর্ব্বল হইলে ইহারা যে কোন কালে স্বাধীন হইবে তাহার প্রত্যাশা করা বৃথা। এই বাল্যবিবাহ এদেশের দরিদ্রতার এক প্রধান কারণ"[১২]

বাল্যকালে বয়স্ক পাত্রে বিয়ে হওয়ায় অসময়ে বৈধব্য উনিশ শতকের মেয়েদের জীবনকে গ্রাস করে ফেলত। পিতার পর একমাত্র আশ্রয় স্বামীর মৃত্যুতে মেয়েদের সহ্য করতে হতো বৈধব্য যন্ত্রণা। পরিবারের বোঝা হয়ে ও কঠিন বৈধব্য পালন করে দিন কাটাতে হতো তাদের। বাল্যকালে খেলাধূলা করার বয়সে মেয়েদের এমন দুর্দশার কারণ হিসেবে লেখক ত্রৈলোক্যনাথ 'কঙ্কাবতি'-তে উল্লেখ করেছেন—

> "জামাতাদিগের বয়স কিছু অধিক পাকিয়াছিল। কারণ, বিবাহের পর, বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে, দুইটি কন্যাই বিধবা হয়।"[১৩]

বিধবা হওয়ার এই কারণ শুধু কঙ্কাবতীর বড় দুই দিদির নয়, উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় প্রায় প্রতেক মেয়েদের কাছে অভিশাপ স্বরূপ ছিল। বিধবা হওয়ার পর বাপের বাড়িতেও মেয়েদের সম্মানের চোখে দেখা হতো না। কঙ্কাবতীর দুই দিদি বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে এলে তনু রায়ের একমাত্র ছেলে তা ভালো চোখে দেখে নি। দুই দিদির দৈনন্দিন খাবার তার কাছে 'অন্নধ্বংস' বলে হতো। অথচ কঙ্কাবতীর দুই দিদি একাদশীর দিন বিন্দুমাত্র জল স্পর্শ করতে পারতো না। কঙ্কাবতীর মায়ের দুঃখের সঙ্গে জানায়—

> "গ্রীষ্মকালে একাদশীর দিন, মেয়ে দুইটির যখন মুখ শুকাইয়া যায়, যখন একটু জলের জন্য বাছাদের প্রাণ টা টা করে, বল দেখি দিদি! মায়ের প্রাণ তখন কিরূপ হয়? পোড়া নিয়ম! যে এই নিয়ম করিয়াছে, তাকে যদি একবার দেখিতে পাই, তো ঝ্যাঁটা-পেটা করি।"[১৪]

যে সমাজে নারীদের হাজার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হয়, সেখানে বিধবাদের জীবন কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। স্বামীর মৃত্যুতে আজীবন সেই পরিবারের মঙ্গল কামনায় জীবন কাটাতে হয়। বিধবাদের জীবন যেভাবে সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ হয়ে জড়রূপ নিয়েছিল, তা থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের বিরুদ্ধাচারণ করা সমকালে নারীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে উনিশ শতকে বিধবারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাত ধরে নতুন আশার আলো

দেখে। নারীদের বিধব্য যাতনা থেকে মুক্তি দিতে বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। 'কঙ্কাবতী'-তে তনু রায়ের স্ত্রী বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় তার দুই বিধবা মেয়ের জীবন পুনরায় ছন্দে ফিরিয়ে আনার স্বপ্নে বুক বেঁধেছে ও ঠাকুরকে সিন্নি ভোগ দেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে।

১৮৫৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে সমাজে। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ সালের মধ্যে মোট ৬০ জন বিধবা নারীকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়েছেন তিনি। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজের বিধবা নারীদের নিয়ে প্রকাশ করা চিন্তাধারার কিছু অংশ—

> "দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন, কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য নির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে, এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভঙ্করী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবে।
>
> পরিশেষে সর্ব্বসাধারনের নিকট বিনয়বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া এবং বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহার আদ্যোপান্ত বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়া দেখুন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা।"[১৫]

সময়ে সময়ে নারীর আশ্রয় বদল হয়। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্রের আশ্রয়ে নারী পালিতা হয় বলে সমাজ মনে গাঁথা। সঠিক সময়ে এই বদল না হলেই চিন্তার কারন। বাল্যকালে বিবাহ, বিশেষ করে স্বামীর বয়স যেখানে বার্ধক্যের কোঠায়, তখন অকালে বৈধব্য বা সহমরণের যাতনা নারীকে ভোগ করতে হতো। সুতরাং নারীর শিক্ষা, বাল্যবিবাহ ও সহমরণ একই সুতোয় গাঁথা। বাংলায় সতীদাহের প্রচলন দেখা যায় প্রায় দ্বাদশ শতক থেকে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে, এর নিদর্শন রয়েছে ভুরি ভুরি। সহমরণের মাধ্যমে বংশের পরলোকের যাত্রা মসৃণ ও বংশের পুণ্য হয় বলে ধরা হতো। যে বংশের নারী সতী হয়, সেই বংশের মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ নিশ্চিত হয় এমন বিশ্বাস সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছুটতো। সতী হতে বয়সের কোনো বাঁধা ছিল না। যেকোনো বয়সের নারী স্বামীর মৃত্যুতে সতী হতে পারতো। যে সতী হতো সেই নারী সমাজের চোখে দেবী হয়ে উঠতো।

'কঙ্কাবতী'-তে ত্রৈলোক্যনাথ সহমরণের ছবি এঁকেছেন উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখেই। সতীত্বের প্রমাণ দিতে, সতীত্বকে আমরণ ধরে রাখতে ও সতী হয়ে বৈধব্য থেকে মুক্তি পেতে, স্বামীহীন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে একাধিক নারী সহমরণের পথ বেছে নিতো। এই উপন্যাসে আমরা দেখি, কঙ্কাবতী খেতুর চিতায় উঠে সতী হতে চায়। কঙ্কাবতীর উক্তি—

> "এক্ষণে আমি পতিদেহের সহিত আমার এই জড় দেহ ভস্ম করিব। সে নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, আপনারা সেই সমস্ত উপকরণের আয়জন করুন"[১৬]

কঙ্কাবতীর এমন সিদ্ধান্তের অলক্ষে রয়েছে সমাজের বেঁধে দেওয়া নিয়ম। যে কঙ্কাবতী মাছেদের রানী হওয়ার ক্ষমতা রাখে। যে যুগে সাধারণ নারীর সামান্য সম্মানটুকু জুটতো না, সে যুগে কঙ্কাবতীর রানী হওয়ার দৃশ্যটি তাকে প্রাপ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অথচ অন্যদিকে কঙ্কাবতী সমাজের অভ্যাসকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজের সহমরণে যেতে চাওয়া ইচ্ছের মধ্য দিয়ে। সহমরণে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারীকে যে পরিমাণ সামাজিক চাপ সহ্য করতে হয় নাকেশ্বরী প্রেত্নির কথায় তা স্পষ্ট—

> "না হইলে পতিকুল পিতৃকুল, মাতৃকুল সকল কুল ঘোর কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবে। সে কলঙ্কিনী একেবারেই পতিত হইবে। তাহার সহিত যিনি আচার ব্যবহার করিবেন, তিনিও পতিত হইবেন"[১৭]

অবশেষে সতীর সাজে সেজে কঙ্কাবতী চিতায় আরোহন করে। দাম্পত্যের কল্যাণে কঙ্কাবতীর শরীরের যাবতীয় অলংকার, হাতের ভাঙ্গা চুড়ি চিতার পাশ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যায় নারীরা। সতীর সিঁদুর নিয়ে যায় সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে। কঙ্কাবতীর সহমরণের বিষয়টি বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী সকলের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠে। করন সচরাচর সহমরণ সমাজে দেখা যায় না। ত্রৈলোক্যনাথ সহমরণের বর্ননায় বলছেন—

> "বাদ্যকর দিকের ঢাক ঢোলের কোলাহলে সকলের কর্নে তালি লাগিল। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আকাশ প্রমান হইয়া অগ্নিশিখা উঠিল। কঙ্কাবতী অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। অতি সুখনিদ্রা। অতি শান্তিদায়িনী নিদ্রা"[১৮]

উনিশ শতককে অন্যান্য শতক থেকে কিছুটা ভিন্ন বলতে পারি আমরা। কারণ এই শতকেই সমাজের বুকে এক সামাজিক ভুমিকম্পের তৈরি হয়। এতে কিছু আচার, কুসংস্কার যেমন তলিয়ে যায়, তেমনি আধুনিকতার স্পর্শে নতুন চিন্তাধারার উদয় হয় সমাজে। বলাবাহুল্য এমন শুভ চিন্তার অধিকাংশই নারী কেন্দ্রিক। নানা সমাজ সংস্কারমূলক কাজের পাশাপাশি নানা সাহিত্যও রচিত হয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনার সুরে। এই অন্যায় দুই রকম। মুক্তির আদর্শে দীক্ষিত লোকদের কাছে পুরনো নিয়মকে অব্যাহত রেখে গণ্ডি বেঁধে দেওয়া অন্যায়। আরেকদিকে সমাজের অধিকাংশ রক্ষনশীল মানুষের কাছে অধুনিক চিন্তায় সমাজের নিয়ম পাল্টে ফেলা অন্যায়। তবে সাহিত্যিকরা প্রথম শ্রেণীর। যারা আধুনিকতাকে সমর্থন করে মুক্তির, বিশেষ করে নারীমুক্তির আশাবাদী। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই মুক্তিকামী দলের অন্যতম। তিনি তাঁর সাহিত্যে সমকালে মেয়েদের বন্ধনকে দেখিয়ে তার থেকে মুক্তির ছবিও এঁকেছেন। তাই যে কঙ্কাবতী তার পরিবার থেকে সম্মান, ভরসা পায় নি, সে মাছেদের কাছে, গোয়ালিনীর কাছে বিশেষ হয়ে উঠেছে। কঙ্কাবতী উনিশ শতকের নারীদের প্রতীক, যাদের জীবন মসৃণ ছিল না। যাদের ভালোলাগার প্রতি সমাজ ও পুরুষের কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। পিতার সম্পত্তি থেকে বাদ, শিক্ষা থেকে বাদ, নানা সামাজিক উন্নতি থেকে বাদ পড়তে পড়তে যাদের একপ্রকার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

মেয়েদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে আধুনিক মানসিকতার একদল লোক রক্ষণশীল গোঁড়াদের বিরুদ্ধে গিয়ে নারী-আন্দোলনে নামে। শিক্ষার আলোদান, বাল্যবিবাহ, সহমরণ থেকে মুক্তি দিতে তারা বদ্ধপরিকর হয়। নারীরাও যে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের সার্বিক উন্নতিতে যোগ হতে পারে, তা প্রমান করতে নারীদের এগিয়ে আসার সাহস যোগায় তারা। খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা এখানে উল্লেখযোগ্য। তারা নারীদের শিক্ষায় উন্নত করতে, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী পদক্ষেপ নেয়। অন্যদিকে সমাজ সংস্কারকদের হাত ধরে ১৮৭২ সালে নারীশিক্ষার অন্তরায় বাল্যবিবাহ রোধ করতে নতুন আইন চালু হয়। যেখানে ছেলেদের বয়স আঠেরো ও মেয়েদের বয়স কম মরে চোদ্দ হিসেবে ধার্য হয়। এমন আইন, সমাজের বুক থেকে বাল্যবিবাহ রোধ করতে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল। ফলে নারীরা শিক্ষা গ্রহনেও সময় পেয়েছিল, যা নারীর জীবনে আশার আলো।

নারীমুক্তির কিছু আদর্শ পদক্ষেপ সমকালের সাময়িক পত্রে প্রকাশ পায়। যা সমাজকে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়। যেমন--

১৮৭৭/১/১৪ 'সাধারণী' পত্রিকায় প্রকাশ পায়—

> "এবার সিন্ডিকেট অনুগ্রহ করিয়া শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু নাম্মী একটি দেশীয় খ্রীষ্টান রমণীকে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষা দিতে অনুমতি প্রদান করেন। চন্দ্রমুখী দ্বিতীয় শ্রেনীতে উত্তীর্ন হইয়াছেন। ইতি ইংরেজি, পারস্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ও বীজগণিতে পরীক্ষা দেন"[১৯]

'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকা, আশ্বিন, ১২৮২—

> "অতি প্রাচীন সময় হইতে আমাদের স্ত্রী লোকেরা চিকিৎসাবিদ্যা শিখিয়া আসিতেছেন। আমাদের পিতামহী ও মাতামহীরা আজিপর্যন্ত আবশ্যক হইলে আমাদিগকে ঔষধপত্র দেন। এখনকার স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পূর্ব্বকালীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় গৃহিণী হউন, এই আমাদের প্রার্থনা"[২০]

স্ত্রী-দের কিংবা নারীদের শিক্ষা হাতের কাছে এলেও সংসারে একজন গৃহিণীর চাহিদা থেকেই যায়। তাই ঘরের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগৎ সামলানোর দ্বায়িত্ব নারীর হাতে ধীরে ধীরে আসতে থাকে। এভাবে নারীর সাদামাটা জীবন আধুনিকতার হালকা স্পর্শে নতুন দিগন্তের দিকে বাঁক নেয়।

তথ্যসূত্র:

১. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ৩২।
২. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ১১৮।
৩. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ৩২।
৪. বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ(সম্পা)। উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি। পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা- ২০০।
৫. ঘোষ, বিনয় (সম্পা)। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (তৃতীয় খণ্ড)। বীক্ষণ, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬০ খ্রি., পৃষ্ঠা- ৫৪২।
৬. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ১৬।
৭. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ৫৭।
৮. সাহা, নির্মলকুমার (প্রকাশক)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ৭২
৯. সাহা, নির্মলকুমার (প্রকাশক)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ৭২
১০. সাহা, নির্মলকুমার (প্রকাশক)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ৭৯
১১. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ৮০।
১২. বসু, স্বপন (সম্পা)। বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস। পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা- ২৭৮।
১৩. সাহা, নির্মলকুমার (প্রকাশক)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ১৫।
১৪. সাহা, নির্মলকুমার (প্রকাশক)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ২৬।
১৫. বসু, স্বপন (সম্পা)। বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস। পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা- ১৩০।
১৬. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ১১৫।
১৭. সাহা, নির্মলকুমার (প্রকাশক)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ১৫৬।
১৮. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ১৫৯।
১৯. বসু, স্বপন(সম্পা)। সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি নারী। বুকস স্পেস, পৃষ্ঠা- ২৯৯।
২০. বসু, স্বপন(সম্পা)। সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি নারী। বুকস স্পেস, পৃষ্ঠা- ২৯৯।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকরগ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, সুদেব (সম্পা)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী। কামিনী প্রকাশালয়, পঞ্চম সংস্করন-২০১৫, ডিসেম্বর।
২. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী' (১ম ও ২য় খণ্ড), সাহিত্যম্।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ঘোষ, বিনয় (সম্পা)। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (তৃতীয় খণ্ড)। বীক্ষণ (কলকাতা), প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬০ খ্রি.।
২.বসু, স্বপন (সম্পা)। সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি নারী। বুকস স্পেস (কলকাতা)।
৩. বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ (সম্পা)। উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি। পুস্তক বিপণি (কলকাতা)।
৪. বসু, স্বপন (সম্পা)। উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র। পুস্তক বিপণি (কলকাতা)।
৫. বসু, স্বপন (সম্পা)। বাংলার নবচেতনার ইতিহাস। পুস্তক বিপণি (কলকাতা)।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 336- 341
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.214

শেখর দেবরায়ের *মনসাকথা* নাটক: নির্মাণ-বিনির্মাণ

ড. প্রশান্ত দাস, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গভ. ডিগ্রি কলেজ ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 09.10.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The deconstructionists have remarkably explored and restructured the multiple dimensions of textual interpretation. *Deconstruction* literally implies a special mode of construction or reconstruction. Hence, it may be asserted that a literary work does not possess any fixed or absolute meaning or significance. Depending on the reader and the context of reading, the same text may reveal diverse meanings at different times. Although a particular meaning may appear conclusive after a single reading, multiple readings can gradually unfold several other interpretations, each of which remains equally possible and valid. The present paper analyzes Shekhar Debroy's celebrated play *Monsakatha* from Northeast India in the light of *Deconstruction Theory*. The discussion examines how the playwright, drawing upon the narrative framework of the *Mansamangal*, incorporates various elements of modern life and contemporary sensibilities into the dramatic discourse. Furthermore, through the innovative reinterpretation of *Mansamangal* motifs and a modern analytical perspective, the play emerges as a unique reflection of contemporary social consciousness.

Keywords: Deconstruction, Shekhar Debroy, Monsakatha, Mansamangal, Modern Interpretation, Northeast Indian Drama, Contemporary Consciousness

(এক)

'Deconstruction' বা 'বিনির্মানবাদ'-এর প্রবক্তা জাক দেরিদার (১৯৩০-২০০৪) মতে কোনো বয়ান বা পাঠকৃতির চূড়ান্ত অর্থ বলে কিছু হয় না। তাঁর মতে এতকাল মানব সমাজ যেসব অর্থকেন্দ্র তৈরি করে স্থিতিলাভের চেতনা গড়েছে, সেটি মানুষকে 'কেন্দ্র' কেন্দ্রিক একটি নির্দিষ্ট ধারণায় আবদ্ধ রেখেছে মাত্র। তিনি এই কেন্দ্রকেই ভেঙে দিতে চেয়েছেন, যাকে ভাঙন বা Deconstruction বলা যেতে পারে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে সাহিত্য সমালোচনায় এই তত্ত্বের ব্যাপক সম্প্রসারের সাথে সাথে টেক্সটকে দেখা হতে থাকে বিবিধ অর্থের মধ্যে। দেরিদার বিনির্মাণ বা 'Deconstruction' অর্থের বহু সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয়। এই পদ্ধতিতে একটি টেক্সটকে পূর্বের তুলনায় আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। রচনার যাবতীয় সম্ভাব্য ব্যঞ্জনা পাঠকের সামনে বহু পাঠের ফলে উঠে আসে। বিনির্মাণ তত্ত্বের মধ্যে এক ধরনের ব্যাখ্যা বা interpretation থেকে যায়। একটি টেক্সট-এর ব্যাখ্যা কখনোই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। কেননা রচনার ভাষা ও বয়ানে বহুমাত্রিকতা থাকে, থাকে বহুকৌণিক বুনট যার কোনোটিই চূড়ান্ত নয় বা স্থির নয়। জাক দেরিদা মার্কস-এর ক্লাসিক রচনা পাঠ করে জানিয়েছিলেন, এই ধরনের রচনা ব্যাখ্যা করে কখনো সম্পূর্ণ অর্থ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাঠ এই ধরনের রচনায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে আসে। তাই রচনার পাঠ নিয়তই পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক পাঠের পরেই একটি বিশেষ অর্থ বা ব্যঞ্জনাকে চূড়ান্ত মনে হলেও একাধিক পাঠে আরো অনেক অর্থ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে পারে, যেগুলিকে সমানভাবেই সম্ভাব্য মনে

হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। সেই অর্থগুলোর কোনোটাকেই অগ্রাহ্য করা যায় না। পাশাপাশি বহু অর্থময়তার উন্মোচনে মূল পাঠের স্রষ্টা বা Author-এর উদ্দিষ্ট অর্থ কী ছিল সে ভাবনা-চিন্তাটাও অনেক সময় গৌণ হয়ে পড়ে।

Deconstruction অর্থাৎ বিশেষরূপে নির্মাণ। তাই বলা যেতে পারে, সাহিত্যিক রচনার একক কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ বা ব্যঞ্জনা নেই। পাঠভেদে কিংবা পাঠকভেদে একই রচনা নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ উপস্থাপন করতে পারে। সেই সঙ্গে রচনাটির সমস্ত অর্থ কিংবা ব্যঞ্জনা সমান গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণীয় হবে। কোনো রচনা যখন বিনির্মিত হয়, তখন শোষক ও শোষিতের স্থান পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়। অনেক সময় পুনর্নির্মাণের ফলে অব্যক্ত ও আপাত গৌণ বিষয় তার প্রান্তিক অবস্থান থেকে চলে আসতে পারে মনোযোগের কেন্দ্রে। কুহেলিকা সরে যায় আর নতুন পরিচয়ের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে পাঠকৃতির তাৎপর্য। সাধারণ পাঠে ভাষ্যকারেরা পাঠকৃতির এরূপ সম্ভাবনার কথা লক্ষই করেন না। বিনির্মাণবাদীদের দ্বারা পাঠকৃতির এইসব প্রান্তিক পরিসর আশ্চর্যজনকভাবে আবিষ্কৃত ও পুনঃগঠিত হয়ে থাকে। বিনির্মাণ নিয়ে দেরিদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পাঠের রীতি 'way of reading text'. দেরিদা প্রচলিত পাঠ পদ্ধতির বিপ্রতীপে এক ভিন্ন পাঠ পদ্ধতির সন্ধান দেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী বিনির্মাণ কোনো সাহিত্য সমালোচনা প্রণালী বা পাঠরীতি নয়। দেরিদা বিনির্মাণের মাধ্যমে text-কে অধিভৌতিক শাসন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন।

দেরিদা নিজে টেক্সটকে কীভাবে পড়েন তার একটা সূত্রের কথা বলেছেন, সেটি হচ্ছে দুইবার করে পাঠ করা। রচনার বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করা। পাঠক নিজেই রচনাটি বারবার পড়ে অনেক সময় নানান অর্থ করে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাঠ করলে অর্থও ভিন্ন রকম হয়ে যায়। কোনো পাঠই তাই অনিবার্য নয়। একটি পাঠের দ্বারা অন্য পাঠটি প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। পাঠ বিশ্লেষণ বা সমালোচনার কাজটি তাই সৃজনশীল। একই রচনা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাঠ করেন, বিশ্লেষণ করেন। এই পদ্ধতিতে টেক্সট যেমন সৃজনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সমালোচনাও সৃজনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে নির্মাণ-বিনির্মাণের আলোকে শেখর দেবরায়ের জনপ্রিয় 'মনসাকথা' নাটকের একটি সৃজনশীল সমালোচনার প্রয়াস করা হলো।

(দুই)

দুই বঙ্গের জনপ্রিয় কাব্যধারা 'মনসামঙ্গল'-এর কাহিনি বহুল প্রচারিত ও পরিচিত। খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অসংখ্য মনসামঙ্গল রচিত হয়েছে। কাব্যগুলো নিঃসন্দেহে ধর্ম বিষয়ক আখ্যান। দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে এগুলো রচিত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের কাহিনি অবলম্বনে আধুনিককালে একাধিক উপন্যাস ও নাটক রচিত হয়েছে। যেমন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), 'অরণ্যবহ্নি' (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ), অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'চাঁদবেনে' (১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ), সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' ইত্যাদি। তাছাড়া জনপ্রিয় কিছু উপন্যাসের মূল কাহিনির খণ্ডচিত্রে মনসামঙ্গলের কাহিনি যুক্ত হয়েছে। যেমন, অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাস দুটির কাহিনিতে মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ এসেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্বের কাহিনি নিয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য দুটি নাটক হলো অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগরের নৌকা' এবং শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বনিকের পালা'। তবে প্রতিটি নাটকের আবেদন ভিন্ন। মনসামঙ্গলের কাহিনি ও চরিত্রকে আর্কেটাইপ হিসেবে গ্রহণ করে এই নাট্যকারেরা আধুনিক যুগ-জীবন-জিজ্ঞাসাকে নিজেদের মত করে উপস্থাপন করেছেন। নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সওদাগরের নৌকা' নাটকে তাঁর ব্যক্তি জীবনের টানাপোড়েনকে চাঁদ সওদাগরের রূপকে ধরতে চেয়েছেন। অন্যদিকে নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে আধুনিক যুগের মানব মনের দ্বন্দ্ব-চেতনাকে রূপায়িত করেছেন। এখানে 'শিব জ্ঞানেশ্বর' আর মনসা 'সর্পিল অন্ধকারের প্রতীক'। জ্ঞানের সাধনায় চাঁদ দিগ্বিজয়ে পাড়ি জমালেও অজ্ঞানের অন্ধকার তাকে পরাভূত করে রাখে। যেমন করে আধুনিক যুগের মানুষ প্রেতের মত চিরকাল অন্ধকারের মধ্যেই জ্ঞানের সন্ধানে পাড়ি দেয়।

আমাদের আলোচ্য শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা' নাটকটি নাট্যকার নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা করেছেন। মনসামঙ্গলের উপাদানের নবপ্রয়োগে নাটকটি অনন্য হয়ে উঠেছে। নাট্যকার প্রচলিত কাহিনিকে আশ্রয় করে সমকালীন সময়ের বাস্তব প্রতিফলন করতে চেয়েছেন। এই নাটকের বয়ান পাঠকের মনে একাধিক অর্থ বা ব্যঞ্জনার

জন্ম দেয়, মানব জীবনসংশ্লিষ্ট একাধিক বিষয়ের নতুন ব্যাখ্যা তুলে ধরে। এই নাটকের চরিত্র মধ্যযুগীয় হলেও তারা কেবল মধ্যযুগীয় হয়ে থাকেনি, প্রত্যেকটি চরিত্রই যেন বিশ শতকীয়, একুশ শতকীয় আধুনিক মানুষ হয়ে উঠেছে। মনসামঙ্গলের চিরাচরিত কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'মনসাকথা' নাটকটি নিছক মঙ্গলকাব্যের কাহিনিমাত্র হয়ে থাকেনি। আধুনিক যুগ-জীবনের উপযোগী করে নাট্যকার মধ্যযুগের কাব্য-কাহিনিকে নাট্য-কাহিনিতে পুনর্নির্মাণ করেছেন। নাটকটির বয়ান বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১) শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্ব।
২) প্রান্তিক মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই।
৩) ধর্ম, সংস্কার-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সংকট।
৪) নারীর অধিকার আদায়ের লড়াই।

আর্থিক বৈষম্যজনিত বঞ্চনা ও সমৃদ্ধির দুটি শ্রেণির দ্বন্দ্বচিত্র মনসাকথার একটি জোরালো বক্তব্য হয়ে উঠেছে। যাদের অর্থবল বেশি তাদের ক্ষমতাও বেশি। নাটকে ধনী ও দরিদ্র বৈষম্য, উচ্চবিত্তের শাসন-শোষণ ও নিম্নবর্গীয়ের বঞ্চনার কথা উচ্চারিত হয়েছে। চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে চাঁদের বা হাতে মনসার পূজা আদায়ের বিষয়টি নাটকের একমাত্র আলোচ্য নয়। এই নাটকের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে প্রান্তিক মানুষের অধিকার আদায় তথা আর্থ-সামাজিক সমস্যার জটিল জিজ্ঞাসা এবং নারীর লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত।

শাসক ও শাসিতের চিরকালীন সম্পর্ককে এই নাটকে রূপায়িত হতে দেখা যায়। চাঁদ সদাগর সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারী জমিদারের প্রতিভূ, আধুনিক পুঁজিপতি। প্রজা শোষণ করে ধনতন্ত্র কীভাবে তার জায়গা দখল করে নেয় সে চিত্রও নাটকে লক্ষণীয়। যারা চিরকাল সভ্যতার রথের চাঁকা এগিয়ে নিয়ে যায় তারা নিজেরা পড়ে থাকে অন্ধকারের অতলে। মানব সভ্যতার এই চিরন্তন সত্যটি এই নাট্য-কাহিনিতে নির্মিত হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণির মানুষ আজীবন পরিশ্রম করে, অথচ তাদের দারিদ্র্য ঘুচে না। তারা গবীরই থেকে যায়। অন্যদিকে সমাজের ধনী শ্রেণির মানুষ (নাটকে চাঁদ) অর্থের পাহাড় জমাতে থেকে। তাদের জীবনে শুধু জোয়ার আর খেঁটে খাওয়া মানুষের জীবনে শুধু ভাঁটার টান। যুগে যুগে এভাবেই সাধারণ মানুষ নির্যাতিত ও শোষিত হতে হতে মাথা তুলে দাঁড়ায় ও নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। মাঝিমাল্লাদের কথা ও আচরণে বৈষম্যের দিকটি স্পষ্ট হয়—

> "নিজেগোর জানটা কার জন্য শেষ করছি। মোদের শরীরের ঘাম যত ঝরে— বণিক্যের দালান তত বাড়ে। হিসাব নিকাশের খাতাটা যখন খুলি— তখন দেখি, সদাগরেরা পূণ্নিমের চান্দের মত উজালা অইতেছে— আর আমরা যেন সব্বাই ঢাকা পড়্যে আছি অমাবস্যির আন্ধাইরে—। মা গো! জোয়ার ভাঁটা জগতের নিয়ম! মোদের জীবনে জোয়ার কই? কেবল দেখি ভাঁটার টান।"[১]

বর্তমান পুঁজিবাদের স্বরূপও নাটকে স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। মালিকের সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে শ্রমিকের পরিশ্রম, অথচ তারা মালিক কর্তৃক শোষিত হয়। বৈষম্যের বিরুদ্ধে মাঝিমাল্লাদের প্রতিবাদ যেন চিরকালীন শোষিত বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদ। নাটকে সমবেত শক্তির প্রাচুর্যের প্রসঙ্গটিও লক্ষ করার মত। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক মানুষেরাও নিজেদের অধিকারের কথা সরবে উচ্চারণ করতে শেখে। তাই ধন-বৈষম্যের বিরুদ্ধে মাঝিমাল্লাদের কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়—

> "আইজ থাইক্যা পণ করি-আমরা আর মধুকরের কাঁড়ার ধরুম না ! সদাগরের ডিঙার বৈঠা হাতে নিমু না!"[২]

মনসাকথা নাটকে আধুনিক যুগ জীবনের প্রেক্ষিতে চাঁদ চরিত্রটি নাট্যকারের নবনির্মাণ। সে স্বৈরতান্ত্রিক পুঁজিপতি, মালিকপক্ষ, একনায়ক। সে যখন কথা বলে তখন পাঁচজনকে তা মেনে নিতে হয়, এমনই তার আধিপত্য। সমাজে নিজের আধিপত্য কায়েম রাখতে চাঁদ কোনো পরিবর্তনের হাওয়া নগরে আসতে দেয় না। যুগ যুগ ধরে চলে আসা অন্যায় অত্যাচারের শাসনকে সে বহাল রাখতে চায়। চম্পকে তার কথাই শেষ কথা। সে মনসাকে বলে—

> "আরে যা যা! - চেঙ্গমুড়িকানী। যুগ যুগ ধরি আমার বাপ ঠাকুর্দা ছিল সর্বগুণে বলী— সেই তেজবীর্য আমি বহন কইর‍্যে চলেছি। আগেও মোদের ক্ষ্যামতা ছিল, যা করবার চাইছি,- করেছি। আইজও চান্দ সদাগর যে কথ্য কয়, চম্পকের মনিষ্যির কাছে সেটাই শেষ কথা।"[৩]

চাঁদের কাছে ন্যায়-অন্যায় বিচার করার সময় নেই। চৌদ্দ পুরুষের চলা পথে সেও হেঁটে চলেছে। মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে তার শ্রমিক মালিক সম্পর্ক। ধন উপার্জনে মাঝিমাল্লাদের প্রয়োজন, তার অতিরিক্ত কোনো বিষয় সে গ্রাহ্য করে চলে না। সে জানায়—

> "এত নায্যি অনায্যি দেখলি আমার চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর পুণ্ণ অইব না। আমার ডিঙার মাঝি যে অইব –তারে আমার মতেই চলতে অইব।"[৪]

ধর্মনৈতিক মৌলবাদের বিষয়টিও নাটকের অন্যতম জোরালো দিক। 'রাজার ধর্মই রাষ্ট্রের ধর্ম' প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রচলিত এই প্রথাটি বর্তমানেও বহাল আছে। চাঁদ সদাগর অর্থ ও ক্ষমতা বলে নিজের ধর্মবিশ্বাস সাধারণের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। সে জানিয়ে দেয়—

> "আমার ক্ষ্যামতার সীমানায় বাবা ভোলানাথ ছাড়া আর কারো পূজা আচ্চা করা নিষেধ।"[৫]

সে কোনোভাবেই চম্পকে জনসাধারণের সংস্কৃতি ও ধর্মভাবনাকে স্বীকৃতি দেয় না। চম্পকের মানুষ নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, দেবদেবী, আচার-আচরণ নিয়ে চম্পকে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু চাঁদের আধিপত্যে তারা শেকড়হীন মানুষের মত বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িকতা ও অসহিষ্ণুতার বিষ যেভাবে চারদিকে আধিপত্য বিস্তার করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেও এই নাটকটি তাৎপর্যপূর্ণ।

মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে দেশজাতি সংস্কৃতির বিনাশকারী শক্তিকেও যে পরাভূত করা সম্ভব, সে চিত্রও নাটকে স্পষ্ট। চম্পকের মানুষ একসময় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথ নেয়। তাদের এই লড়াইয়ে মনসা তাদের নেত্রী। শোষিত, বঞ্চিত মানুষের মানসকন্যা মনসা। তাদের দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবনের শান্তি ও সান্ত্বনার আশ্রয়স্থল। তারা দেবী মনসাকে জানায়—

> "যতদিন বাম হাতের মাইন্যতা ডাইন হাতে আনতে না পারছি ততদিন আমরাও ক্ষান্তি দিমু না! কোনদিন না !"[৬]

মনসাকথা নাটকে অপর যে সংকটের প্রসঙ্গটি চোখে পড়ে তা হলো একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের ভাষা, সমাজ-সংস্কৃতির সংকট অর্থাৎ বলা যায় অস্তিত্বের সংকট। মানুষের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার ও সংস্কৃতির বিপর্যয়কে নাট্যকার চিহ্নিত করেছেন এখানে। নাটকে গায়েনের প্রশ্ন থেকে সেই সংকটের স্বরূপ আঁচ করা যায়।

> "আমার সমাজ ধর্ম আচার আচরণ আমার বুলি বাইক্য আমার গান বাদ্যি লইয়া আমি বাঁচুম— এইটায় যদি কেউ বাধা দিবার চায় তে অইলে তো মহাবিপদ।...জন্মের পর থাইক্যা যে বিরিক্ষির লগে আমাগোর চেনাজানা হয়, কেউ যদি তার শিকড় উপড়াইতে চায়—তে অইলে কি সেটা মাইন্যা লওন যায়? নাকি মাইন্যা লওন উচিত ?"[৭]

একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রাণসত্তা নিহিত থাকে তার ভাষা, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে। মানুষ আজন্ম নিজের ভাষা সংস্কৃতিকে অন্তরে লালন করে বেঁচে থাকে। অথচ চাঁদের রাজত্বে, তার আধিপত্যে কারো অধিকার ছিল না নিজের বুলি বাক্য, সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জীবনযাপন করার। চাঁদের ধনদৌলত, বাণিজ্যের ও ঐশ্বর্যের মূল কাণ্ডারি যারা সেই মাঝিমাল্লাদের ভাষা, বুলি, সংস্কার-বিশ্বাস ও ধর্মকে সে অপদস্ত করেছে। অন্যদিকে নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে সাধারণ মানুষ। চাঁদের অত্যাচারে চম্পকনগরে মনসা পূজা তথা নাগ পূজার অধিকার নেই। তাতে নাগ বংশ তথা মাঝিমাল্লাদের নিজের সংস্কার-বিশ্বাসের জগতে আঘাত লাগে। মনসাসহ নাগ সমাজের প্রতিটি মানুষ নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও পূজা-পার্বণ নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। বর্তমান বিশ্বে আধিপত্যবাদী শক্তির চাপে যেভাবে দেশীয় ছোট ছোট জাতি বা সম্প্রদায়ের ভাষা সংস্কৃতি বিপন্ন, চাঁদের আধিপত্যে দরিদ্র্য মাঝিমাল্লাদের সংকটের চিত্রটি যেন সেই সমস্যার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ নাটকে প্রতিফলিত চাঁদ ও মনসার লড়াই শুধুমাত্র মনসার পূজা আদায়েরই লড়াই নয়। এ যেন নারী পুরুষের সমতার লড়াই, অধিকারের লড়াই। চাঁদ সদাগর পুরুষ, প্রথম লিঙ্গের মানুষ। লিঙ্গের বিচারে সমাজে নারীর স্থান দ্বিতীয়। সামাজিক বিচারে নারীও তো নিম্নবর্গীয়, তাই তাদের আবেগ আকাঙ্ক্ষাগুলো পুরুষের পদতলে পিষ্ট হয়। পুত্রহারা সনকার করুণ আকুতিতে চাঁদের মন গলেনি। নারী হওয়ার কারণে চাঁদ মনসাকে কোনো ভাবেই সম্মতি দেবে না। এই নাটকে শাসক-শাসিতের লড়াই, শ্রমিক-মালিকের লড়াই, সমাজপতি ও প্রজার লড়াইয়ের পাশাপাশি নারী

পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নটিও বারবার উঠে এসেছে। পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ চাঁদ কোনো ভাবেই হীনজাতির স্ত্রী দেবী মনসাকে পূজা করতে রাজি নয়। সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়—

> "আর শোন ! পুরুষ অইয়ে লঘু জাতি নারীরে পূজা দিমু। জান থাকতি তা হবে না।"[৮]

বেহুলা ও মনসার কথোপকথনেও এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, নারী বলেই মনসাকে চাঁদ হেয় চোখে দেখে। বেহুলা বলে—

> "আমি বুঝি গো মা— এখন সব বুঝতে পারতেছি চম্পকনগরীর সমাজপতি একজন পুরুষ। তোমারে নারী বলে অমান্য করে।"[৯]

নারীর অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের প্রসঙ্গটিও নাটকের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে নিজের অধিকার আদায় করেই মনসা ক্ষান্ত নয় বরং পুরুষ হওয়ার অন্য চাঁদের যে দম্ভ ও অহংকার, মনসা তার বিনাশ করতে লড়াইয়ে নেমেছে। মনসা জানিয়েছে—

> "আমি যেমন নাগবংশের মাইন্যতা আদায় করতে চাই— তেমনি চাই চান্দের পুরুষ বইল্যা দম্ভের বিনাশ।"[১০]

মনসা ও বেহুলা দুজনেই নারী, উভয়েই পুরুষ শাসিত সমাজে নিজেদের অধিকার আদায় করতে চেয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বামীর ধর্ম স্ত্রীর ধর্ম হলেও মনসার পূজা করে সনকা স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। বস্তুত নাটকটি নারীর অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের জীবন্ত চিত্র হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখনীয় যে, জাঁক দেরিদার Deconstruction থিওরিও লিঙ্গ-নির্ভর চিন্তা ও সংস্কারের ভেদ রেখাকে মুছে ফেলে নারী-পুরুষ সমতার কথা, সমনির্ভরশীলতার কথা বলে। যার ভিত্তি লিঙ্গভেদ নয়, নারী-পুরুষের বিপরীত অবস্থান নয়।

সামন্ততান্ত্রিক শক্তির কাছে আপাত পরাস্ত হলেও চাঁদের বা হাতের পূজা আদায়ে সক্ষম হয় মনসা ও তার অনুগামীরা। শোষিত নির্যাতিতের প্রতিনিধি হিসেবে মনসা সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তুলেছে। একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের মতো মনসা ভবিষ্যতে ডান হাতের পূজা আদায়ের লক্ষ্যে লড়াই জারি রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। কেননা সমবেত শক্তির প্রচেষ্টা কখনো শেষ না, প্রবাহিত হয় যুগ যুগান্তরে। সাধারণ মানুষের কণ্ঠে শোনা যায় সংগ্রাম চালিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি—

> "মাগো আরম্ভ করেছ তুমি, কিন্তু শেষ করব আমরা।"[১১]

এ যেন মানুষের নিরন্তর জীবন সংগ্রামের ধারা।

(তিন)

মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে 'মনসাকথা' নাটকটি নাট্যকারের নবনির্মাণ, অতীতের মানুষের মধ্যে আধুনিক মানুষের সমস্যা আরোপ করে নাট্যকার নতুন কথা বলবার চেষ্টা করেছেন। শৈল্পিক কুশলতায় আধুনিক জীবনের জটিল স্বরূপ মনসাকথা নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। আধুনিক চিন্তন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নাটকটি হয়ে উঠেছে সমকালীন সময়ের প্রতিচ্ছবি। কাহিনি, চরিত্র মধ্যযুগীয় হলেও বিশ্লেষণে দেখা যায় নাটকটির আবেদন নিছক মধ্যযুগীয় হয়ে থাকেনি। নাটকের বয়ানে আধুনিক যুগ-জীবনের নানা অনুষঙ্গ এসে যুক্ত হয়েছে। রাজনৈতিক কূটকচাল, অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারীর অধিকার আদায়ের লড়াই ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। যেহেতু বিনির্মাণ তত্ত্ব একটি টেক্সট বা পাঠকৃতিকে নানাভাবে বিশ্লেষণের সুযোগ দেয় তাই উক্ত প্রসঙ্গগুলোর বাইরেও একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে টেক্সটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কেননা টেক্সট বা পাঠকৃতি হলো একটি সজীব সত্তা, তাই টেক্সট-এর ব্যাখাও হবে নিয়ত পরিবর্তনশীল।

তথ্যসূত্র:

১) দেবরায়, শেখর। মনসাকথা। শিলচর কালচারাল ইউনিট, আসাম, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ- ১২।
২) তদেব, পৃ- ১১।
৩) তদেব, পৃ-২২।
৪) তদেব, পৃ-২২।
৫) তদেব, পৃ-৭।

৬) তদেব, পৃ-৪৫।
৭) তদেব, পৃ-১৫।
৮) তদেব, পৃ-২২।
৯) তদেব, পৃ-৩৭।
১০) তদেব, পৃ-৩৫।
১১) তদেব, পৃ-৪৫।

সহায়ক গ্রন্থ/প্রবন্ধ:

১) ভট্টাচার্য, উৎপল (সম্পাদিত)। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর। বাকপ্রতিমা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১২।
২) ঘোষ, প্রসূন। মঙ্গলকাব্য ও আধুনিক উপন্যাস (প্রবন্ধ) । বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৪১৩।
৩) দেবরায়, শেখর। মনসাকথা। শিলচর কালচারাল ইউনিট, আসাম, প্রথম প্রকাশ ২০০২।
৪) চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদক) । বুদ্ধিজীবীর নোটবই। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১।
৫) চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫।
৬) মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার। সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩।
৭) মুখোপাধ্যায়, বিমল। সাহিত্য বিবেক। গ্রন্থমেলা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬।
৮) সেন, নবেন্দু (সম্পাদক) । পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা। রত্নাবলী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২।

Web:

srijonbd.com/2017/06/29/সমালোচনা, accessed date 02/09/2018

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 342- 349
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.215

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় ‘কবিতার’ প্রসঙ্গ

মিহির মজুমদার, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাধাগোবিন্দ বরুয়া মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*
সঞ্জয় ভট্টাচার্য, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 19.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Nirendranath Chakraborty was born in Faridpur, Bangladesh. Since childhood, he was fond of writing poetry, that is, playing the game of connecting words with words. He started writing and publishing poetry at the age of 16. His first published book is 'Neel Nirjan'. He has been writing poetry for a long time. He has done various experiments with poetry. He always tried to make poetry understandable to the common man. The poet's vision of life is very broad. Urban and rural life, nature, contemporary politics all find equal place in his poetry. Nirendranath Chakraborty is an unforgettable name in modern Bengali poetry. Many things are still unexamined in the discussion of his poetry. Like many other poets, he has written a lot about poetry, sometimes in verse and sometimes in prose. This is also a unique aspect of the poet's talent. He is a match for making poetry understandable to the common man. His poems are diverse in terms of thought and subject matter. He has experimented in creating the style of poetry. The ‘kabitar class’ book of about prosody is widely read. He has presented the beautiful and simple identity of Bengali rhythm. His poems are brilliant with the use of various rhythms, that is beyond words. The poet has thought a lot about the relationship between poetry and human life. We see the expression of that thought in many of his poems.

Keywords: Modern Bengali Poetry, Poetic Experimentation, Accessibility of Poetry, Human Life and Poetry, Rhythm and Prosody

কবিতার স্বরূপ নির্ণয়ে পৃথিবীর সকল কবিই ভাবনা-চিন্তা করেছেন। চর্যার (প্রাচীন বাংলার) কবিদেরও কিছুটা এমন ভাবনায় তাড়িত হতে দেখা যায়। ‘‘এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ’’[১] এই বাক্যবন্ধে কবি লুইপাদ কাব্যের পরিমিতির বিষয় অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। বাংলা কবিতার অন্তরমহলের কারুকাজ সম্পর্কে এমন সূত্র অন্যত্রও খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে যেমন বলেছেন, ‘‘অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল’’[২]। ভাষা কাব্যরস সমন্বিত হওয়া চাই, এই ছিল ভারতচন্দ্রের সিদ্ধান্ত। পরবর্তীকালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সেখানে তিনি ইংরেজ কবি মিলটনের একটি কবিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ‘‘Hence, loathed melancholy’’[৩]। প্রসঙ্গত তিনি বলেন— ‘‘আমাদিগের দেশের কবিতা, কোমল বনিতা, “রসেন মিলিতা” তাঁহার সহিত গাম্ভীর্য্যের কোনো সম্পর্ক নাই’’[৪]। অন্যত্র কবি তাঁর ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন— “ কবিতার আর এক গুণ এই, তাহা সুষুপ্তপ্রায় মানসিকবৃত্তিচয়কে সহসা জাগরিত এবং উত্তেজিত করিতে পারে।”[৫] বঙ্কিমচন্দ্রও কবিতা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বরূপ অনুধাবনে

বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরাও কবিতার মাহাত্ম্য উপলব্ধিজাত নানা বক্তব্য নানা সময়ে উপস্থাপন করেছেন। এঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ অন্যতম। জীবনানন্দের 'কবিতার কথা' বুদ্ধদেবের 'কালের পুতুল' গ্রন্থ দুটি আজও সমাদৃত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''কবির কর্তব্য তাঁর প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতায় একটা পরম উপলব্ধির মাল্য রচনা। কবির উদ্দেশ্য তার চার পাশের অবচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ।''[৬]

সাহিত্য চিরকাল মানুষের কথা বলে এসেছে। মানুষের কল্পনা আশা আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যে প্রকাশ পায়। কবি বিষ্ণু দে তাঁর 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''সকল সচেতন মানুষের মধ্যেই তো অন্তরের ধ্যানখানি আপনার ভাষা খোঁজে। কিন্তু জীবনযাত্রার অমানুষিক রথচক্রঘর্ঘরে সে ভাষা ডুবে যায়, মন ভবিষ্যতে খুঁজে বেড়ায় তার সম্পূর্ণ বাণী।''[৭]

অন্যদিকে কবি জীবনানন্দ কবিতা সম্পর্কে ইংরেজ কবি অডেনের উক্তি 'memorable speech'— এই কথাকে খণ্ডন করে বলেছেন, কবিতার অবয়বে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।[৮] কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় পিছিয়ে নেই কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও (১৯২৪ - ২০১৮)। এ সম্পর্কিত তাঁর দুটি বই খুবই উল্লেখযোগ্য। 'কবিতার দিকে ও অন্যান্য' এবং 'কবিতা কী ও কেন?' এই দুটি গ্রন্থে নীরেন্দ্রনাথ কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তাঁর রচিত কবিতার কিছু পর্যালোচনা করতে চাই; বিশেষত যে কবিতাগুলোতে কবির কবিতা-সংক্রান্ত ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা কবির ১৯৭১ থেকে ১৯৮৩ সময়কালে রচিত ও প্রকাশিত মোট ছয়টি কাব্য শুধু নির্বাচন করেছি।

১। 'উলঙ্গ রাজা' (১৯৭১) ২। 'খোলামুঠি' (১৯৭৪) ৩। 'কবিতার বদলে কবিতা' (১৯৭৬) ৪। 'আজ সকালে' (১৯৭৮) এবং ৫। 'পাগলা ঘন্টি' (১৯৮১) ৬। 'ঘর-দুয়ার' (১৯৮৩)

এই কাব্যগুলির কিছু কবিতায় 'কবিতার' প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যে মোট ৩৫টি কবিতা আছে। যার মধ্যে ৪ টি কবিতায় সরাসরি কবিতার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি হল— ক) 'না এলে না-ই বা এলে' খ) 'প্রাকৃত বচন' গ) 'কাচের গুঁড়ো' ঘ) 'কবিতা '৭০'

'না এলে না-ই বা এলে' কবিতাটিতে কবির এক স্বীকারোক্তি প্রকাশ পেয়েছে। আবাল্য কবিতার সঙ্গে পরিচিত কবি হালে তার সাক্ষাৎ লাভ করছেন না। এ নিয়ে কবিমনে খানিকটা উদ্বেগ ও অভিমান মিশ্রিত হয়ে আছে। কবিতা কল্পনালতা বলে কবি মনে করেন না। রক্তমাংসের মূর্তিরই তিনি সন্ধানি। তাকে না পেলে শব্দের ভেতরে ফোটাতে হবে, এই কবির মত।

> ''তবে তাকে শব্দের ভিতরে
> সমূহ ফোটাতে হবে, না-ফোটালে এ-জন্মে আমার
> পরিত্রাণ নেই।''[৯]

কবি বলেছেন কবিতা তাঁকে যতই ধোঁকা দিক, চালাক মাছের মতো দূরে ঘোরাফেরা করুক, তাতে জেদ বেড়ে যায়। তিনি শব্দ নির্বাচনে সতর্ক হবার চেষ্টা করেন। তাঁর ডানে বাঁয়ে শব্দের পাহাড় জমে আছে। তা দিয়েই জোড় মেলাবার চেষ্টায় ব্রতী আছেন। তবে দুবার তিনি কবিতাকে দেখতে পেয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন এই বলে-

> ''একবার আগ্রার এক ভগ্ন মিনারের শীর্ষে সন্ধ্যার আগুনে
> একবার পুরীর
> দীপ্র মরকতকান্তি তরঙ্গমালায়।''[১০]

কবি তাঁর বাল্যস্মৃতির প্রসঙ্গ টেনে 'কবিতার দিকে' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে কবিতা তাঁর সহজাত ভাষা। গদ্য নয়। শব্দে-শব্দে জোড় মেলাবার খেলায় তিনি শৈশবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।[১১]

তাঁর 'প্রাকৃত বচন' কবিতায় কবিতার শব্দ প্রয়োগ ও প্রতীক নির্বাচনের কথা আছে। বলছেন ব্যাধির ওষুধ প্রকৃতির ভিতরে রয়েছে বলেই বার বার কবিতায় প্রকৃতির প্রসঙ্গ ফিরে আসে। কবির ভাষায়—

> ''যদি শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে কবিতায়
> ফুলের উল্লেখ করো, তবে
> উদ্যানে-অরণ্যে গিয়ে চিনে নিতে হবে

কোনটা কোন্ ফুল''[১২]

'কাচের গুঁড়ো' কবিতাটি রূপকধর্মী। তাতে 'শব্দ' ভাষার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। এই শব্দ সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে একীভূত। সাতের দশকের বাংলার রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্র এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। মানুষের জীবনে বোমাবাজি সংক্রান্ত মৃত্যুর আতঙ্ক কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা-ই কবি একটি চিত্রকল্পের মাধ্যমে ধরতে চেয়েছেন।

''এবং কারা গদ্যে-পদ্যে
ঘুরছে-ফিরছে তারই মধ্যে,
তুলতে চাইছে নতুন করে দেবালয়ের চূড়ো।
আমরা দেখছি, তাদের
পায়ের তলায় ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাচের গুঁড়ো''[১৩]

'কবিতা '৭০' কবিতাটি কবিতার বিচিত্র অভিব্যক্তি নিয়ে রচিত। কবিতা কত কথা বলে কীভাবে বলে, তার ফিরিস্তি দিয়েছেন কবি। মানুষের জীবন, ঘর-সংসার, জীবনের নানা টানাপোড়ন কীভাবে কবিতায় ব্যক্ত হয় তারই আশ্চর্য লেখ এই কবিতা। অধিকন্তু এই কবিতায় সাতের দশকের কলকাতার চালচিত্রের ছবি আছে।

কবি লিখেছেন—

''এক-একটা কবিতা যেন সুতানুটি-গোবিন্দপুরের
রাত্রিকে ফিরিয়ে আনে।
এক-একটা কবিতা যেন অকস্মাৎ
টান্ মেরে হটিয়ে দেয় ময়দানের সবুজ গালিচা
... ...
এক-একটা কবিতা যেন অকারণ আক্রোশে হঠাৎ
তরঙ্গে ডোবাতে চায়।''[১৪]

আমাদের আলোচনায় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটি হল 'খোলামুঠি'। এ কাব্যে মোট ৪৭টি কবিতা আছে। যার মধ্যে ৩টি কবিতায় কবিতার কথা আছে। কবিতা ৩টি হল— ক) নিজ হাতে, নিজস্ব ভাষায় খ) গোপন মুনিয়া গ) শব্দে-শব্দে টেরাকোটা। এই কাব্যে কবির আত্মপ্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, বোমাবাজি, খুনজখম ইত্যাদিতে জীবনের যে অশুভ লক্ষণ ঘনিয়ে উঠেছিল চারপাশে তা যে মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, সে-কথা প্রমাণিত হয়েছে। 'নিজ হাতে, নিজস্ব ভাষায়' কবিতায় কবি চিরন্তন ভালবাসার কথাই বলেছেন। বলছেন—

''স্নেহের চুম্বনখানি এঁকে দিতে ইচ্ছে হয়
সমস্ত শিশুর গালে''[১৫]

কেন না কবি জানেন ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন কথা কবির কণ্ঠে মানায় না। তাই অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কবি বলেন—

''ভালবাসা কবিতারই অন্য নাম।
যে-নাম হৃদয়ে তুমি উৎকীর্ণ করেছ, তাই জানো:
এখন সমস্ত মিথ্যা
কদর্য-অক্ষরে-লেখা সব গ্লানি ভুলবার সময়।
... ...
নিজস্ব ভাষায়
অঙ্কুরিত প্রতিটি বীজের কাছে নতজানু হয়ে
এখন বলবার লগ্ন:
গোপন থেকো না বৃক্ষ,''[১৬]

কিংবা 'গোপন মুনিয়া' কবিতায় কবি পাখির অনুষঙ্গে চরাচরের বিষাদের চিত্র অঙ্কন করেন। তাতে দেখা যায় চঞ্চল মুনিয়া পাখি উধাও হয়েছে। তাদের আকাশের সারাৎসার জানা হয়েছে কি না তা নিয়ে কবির সংশয়। সমস্ত শস্যের

স্বাদ না জেনেই সরে পড়েছে বুঝি। কোথায় বিবাদ। কোথায় রোদের আশ্লেষে বারুদের গন্ধ। এই দুশ্চিন্তা কবির মনে বিষাদের ছায়া আঁকে। পাখি কবির হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। মুনিয়ার রূপকল্পে কবিতার শব্দ কবিহৃদয়ে ঠোকর মারছে।

''হঠাৎ ভিতরে গিয়ে লাগালি শব্দের এই ঠেলা?
চোখের সমুখে
এতক্ষণ যারা ছিল, এখন রয়েছে তারা বুকে।
বুকের ভিতরে শব্দ ওঠে-পড়ে,
বুকের ভিতরে
বর্ণের আগুন জ্বলে ধিকিধিকি:''[১৭]

'খোলামুঠি' কাব্যের কবিতা-বিষয়ক একটি উজ্জ্বল কবিতা 'শব্দে-শব্দে টেরাকোটা'। এখানে কবি বলেছেন যে যার নিজস্ব শিল্প সমূহ অর্জন করে নেয়। কবি তার শব্দকে অভিজ্ঞতার চুল্লির ভেতর ঠেলে দেন। এবং তাতে কিছু শব্দ অগ্নিকুণ্ডে ঝরে যায়। কিছু হরিচন্দনের ফোঁটা হয়ে গ্রীষ্মরাত্রির আকাশে জ্বলে। কিছু শব্দ দীর্ঘায়ু হতে চায়। কবিতা টেরাকোটা শিল্পের বিষ্ণুমূর্তির মতো অক্ষত হবার দাবি রাখে। এই অভীপ্সা কবিতাটিতে ঘোষিত হয়েছে।

''আমি কি তোমার কাছে সনন্দ নিয়েছি কবিতার,
যে আমি তোমার জন্যে যাব
পাতালে, অথবা ঊর্ধ্বে আকাশে ফোটাব
তোমারই আলেখ্য?''[১৮]

অন্যদিকে 'কবিতার বদলে কবিতা' বইয়ে ৪৯টি কবিতা আছে। যার মধ্যে ৫টি কবিতা এমন যেখানে কবি কবিতা নিয়ে কথা বলেছেন। কবিতাগুলো হল— ক) 'কবি' খ) 'কবিতার বদলে' গ) 'ভাষায়, ভালবাসায়' ঘ) 'একটি-দুটি' ঙ) 'একদিন এইসব হবে, তাই'

'কবি' নামক কবিতায় একটি আত্মজিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি গদ্যের সভায় গেলে তাঁর পা যেন টলে না যায়। কবির পক্ষে গদ্য রচনার সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের মানসিক ও শৈল্পিক স্থিতি কতটা জরুরি হয়ে ওঠে তা-ই কবি বলতে চেয়েছেন। 'কবিতার বদলে' কবিতায় কবিতা কী তা নিয়ে এক লম্বা ফিরিস্তি কবি দিয়েছেন। কবিতা কী, এ প্রশ্নে অল্পবিস্তর সব কবিই তাড়িত হয়েছেন। নীরেন্দ্রনাথ বলতে চান কবিতা শোকে সান্ত্বনা দেয়, ভয়ে সাহস জোগায়। আনন্দ ও শান্তি দেয় কবিতা।[১৯] আলোচ্য কবিতাটিতে চিলের অনুষঙ্গ জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। চিলের কান্নার সুরে প্রেমিকার ম্লানমুখ মনে পড়ে, যে-মুখ বেতের ফলের মতো করুণ। কবি নীরেন্দ্রনাথের ভাষায়—

''সূক্ষ্ম কি জটিল নয়, বরং বিমূর্ত সরলতা—
এইগুলি কবিতা নয়, যুদ্ধ কি মীমাংসা নয়, খেলা
ভেঙে দিয়ে চলে যাওয়া নয়।''[২০]

প্রকারান্তরে 'ভাষায়, ভালবাসায়' কবিতা কবি বলেন ভাষার মধ্যে অন্য এক ভাষা থাকে। তা বেগনিবর্ণ ভালবাসা। কবিতার ভাষা ভাষাকে ছাড়িয়ে যায়। অন্য এক সুন্দর অনুভূতিলোকে আমাদের নিয়ে যায়। সুখের মধ্যে সুখের অতীত নিভৃতলোক রচনা করে। কবি দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—

''ভাষার মধ্যে ভাষা, এবং পুনশ্চ সেই ভাষা...
একটা ছিল ওষ্ঠে তোমার, একটা ছিল বুকে,
সেই দুটোকে মিলিয়ে নিলেই হিসেবটা যায় চুকে
ভাষার।''[২১]

এই কাব্যের 'একটি-দুটি' কবিতায় দুটি বিপরীত ছবি আমরা পাই। আমাদের পরিপার্শ্বের মানুষজন সকলেই আত্মপরতায় মগ্ন। সেখানে সত্যিকার মানুষ দু-একজন। এ কথা সত্য। সচরাচর মানুষ পরদুঃখে কাতর হয় না। অন্যের বিপদে সহায়ক ভূমিকা পালন করে না। পাশ কেটে চলে যায়। অনুরূপ ভাবে কবিও একটি-দুটি মাত্র আছে। যাঁরা প্রকৃতার্থে কবি কেবল তাঁরাই সমূহের বিপদে ঝুঁকি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন।

''ওই কবি তরঙ্গ ছিঁড়ে

অগাধ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে,
অন্যেরা সব দাঁড়িয়ে তীরে
পরের পকেট হালকা করছে।''[২২]

একেবারে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে 'একদিন এইসব হবে, তাই' কবিতাটি। এখানে কবি বলছেন, সমস্ত যোদ্ধা বিষণ্ণ হবার মন্ত্র শিখে যাবে। মৃত্যুকালে বৃদ্ধ মানুষ সহজে বলতে পারবে যাই। কোনো পার্থিব বেদনা ছাড়াই। মানুষের ঘাম, পরিশ্রম, বিশেষ মাহাত্ম্য পাবে। নারী তার প্রেমের ভাষায় আহ্বান করবে। এবং এইসব জাগতিক জীবনের শুভবোধক বলেই কবিতা লেখা হয়। কবি বলেন—

''একদিন এইসব হবে বলেই এখনও
সূর্য ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, এবং কবিতা লেখা হয়।''[২৩]

এই আলোচনার চতুর্থ কাব্য 'আজ সকালে'। এতে ৪৭টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে কেবল ৩টি কবিতায় কবিতার প্রসঙ্গ আছে। কবিতা ৩টি হল- ক) একদা লিখতেন খ) ছবি গ) হেমলতা

'একদা লিখতেন' কবিতায় কবিজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। তাতে কবিতার রচনা সংক্রান্ত খোশ গল্পে কবির যে আস্থা নেই তা সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করেন সকল কবিই এমন কিছু অবশ্যই লিখেছেন যা কালের বিচারে টিকে যাবে। এমন সিদ্ধান্তের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে কবি স্বগতভাবে এমন প্রশ্ন নিজেকেও করেন। এবং তাঁর কবিতা লেখার কলমও যে একদিন শুকিয়ে তাতে তাঁর নিজের কোনো সন্দেহ নেই। তাই কবি মনে করেন নিজের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে যে-কবি কবিতা রচনা করে চলেছেন সে-কবিকে কিছু শেখানোর চেষ্টা করা একেবারে উচিত নয়। অন্যদিকে 'হেমলতা' কবিতায় প্রায় ব্যর্থ হতে চলা একটা প্রেমের সম্পর্কের বিপর্যাসে কবি কবিতার নির্মাণের অধ্যবসায়ের কথা বলেন।

''বাতাসে আগুনে জলে উদয়াস্ত আজও মায়াজাল
টেনে যাচ্ছি, জোড়-মেলানো কথা
যদি পাই, তোমাকেই দেব।''[২৪]

আমাদের উদ্দিষ্ট আলোচনায় নির্বাচিত পঞ্চম কাব্য 'পাগলা ঘন্টি' কাব্যে মোট ৪১টি কবিতা আছে। এর মধ্যে ৬টি কবিতায় কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। সেগুলি হল— ক) 'কবিতা হয় না' খ) 'কবিতার পাণ্ডুলিপি' গ) 'ঝড়বাদলে' ঘ) 'কবিরা যখন' ঙ) 'কবির নিয়তি' চ) 'শব্দ,শুধু শব্দ'

'কবিত হয় না' কবিতায় কবিতার হয়ে ওঠার রসায়ণের প্রসঙ্গ খুব সহজ ভাষায় কবি ব্যক্ত করেছেন। কবিতায় বিশেষ কথা কীভাবে নির্বিশেষ হয়ে ওঠে তা অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কাব্যের আত্মা তার ধ্বনি। যাকে বলা হয় বাচ্যাতিরিক্ত ভাবের ব্যঞ্জনা। কবিতার আপ্ত জিজ্ঞাসা- হিংসা কাকে উন্মাদ করেছে, কোন মানুষকে, সেই বিশেষ মানুষকে কবিতা নির্বিশেষ করে তুলতে বদ্ধপরিকর।

'কবিতার পাণ্ডুলিপি' কবিতায় একটি কবিতার সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার অভিজ্ঞান রচনা করতে চেয়েছেন কবি। জীবনের ছোট বড় নানা অভিঘাতে কবিতা আন্দোলিত হয়। বন্ধু ও স্বজনবর্গ দূরে সরে যায়। কখনো এমন হয়, একদা অর্থবহ শব্দ অর্থহীনতায় ডুবে যায়। শিল্পীর জীবনেও এমনটাই ঘটে। এখানে প্রত্যাশা ও বিদ্রূপ সমান্তরাল হাঁটে। কখনো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নষ্ট ভাষা। এতকিছু বৈপরীত্যের মধ্যে থেকেই একটি কবিতা জন্ম লাভ করে। কবির আত্মস্খলনও ঘটে। নিজের ভাবমূর্তি প্রকাশের তাগিদে শাসকের পদলেহন করে। এটা কবিতার জগতে এক বিচ্ছিরি রোগ, এমনই মনে করেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।[২৫] 'কবির নিয়তি' কবিতায় এমন আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন কবি। নিয়তির গুলি কবির পায়ে বিঁধলে তিনি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন না। শব্দগুলি তখন কবিকে ধোঁকা দেয়। একটা সময় কবি আর দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন না। তখন সরাইখানায় বসে কেবল ''কেউ কিসসু লিখতে পারে না...''[২৬] বলে থুতু ছেটান। কিন্ত হতচ্ছবি কবির কাম্য নয়। তাই যে হাজার শব্দ মাথায় ও বুকে ছিল তাকেই কবি কুড়িয়ে তোলেন নতুন করে জোড় মেলানোর জন্যে। কবিতার ভুলগুলি মুছে ফেলার জন্যে।

এবার 'ঘর-দুয়ার' কাব্যের প্রসঙ্গে বলতে হয়, এখানে ৩৯ টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত আছে। এর মধ্যে কবি ৪ টি কবিতায় কবিতার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। কবিতাগুলি হল— ১। 'আমরা ক'জন' ২। 'মধ্যরাতে উন্মাদেরা' ৩। 'খেলোয়াড়ের টুপি' ৪। 'মর্জিমতন'

'আমরা ক'জন' কবিতায় কবির কাঙ্ক্ষিত শব্দ সন্ধানের প্রসঙ্গ আছে। সূর্যোদয়ের কথা আছে। যে-সূর্যোদয় মানব জীবনের গভীরে আলো ফেলবে। জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ধরা পড়বে। কবিতাটিতে 'মাঘ রাত্রের' অন্ধকার আকাশ ভেদ করার রূপক মুলত জীবনের আঁধার বিলোপের বার্তাবহ। কবির ভাষায়—

"সেই কথাটাই একটুখানি
অন্যভাবে বলতে চাই;
বলব, যদি অন্যরকম
শব্দাবলীর নাগাল পাই।"[২৭]

কবিতাটিতে অন্ধকারের অনুষঙ্গে কবির শব্দ সন্ধান থেকে এটা অনুভব করা যায়, কবিতার শব্দের প্রতি কবির অপার মায়া। এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে-শব্দ অন্যরকম তার বিশেষত্ব অনেকখানি। তা দিয়ে নিভৃত সংলাপ তৈরি হতে পারে। সেই কথা সূর্যোদয়ের মতো সত্য। জীবনপথের দিশারি।

'মধ্যরাতে উন্মাদেরা' কবিতায় কবি লিখছেন শব্দ-সমাহারে যজ্ঞ যুদ্ধ প্রণয় হিংসার ফলাফলের সুত্র খুঁজে মরে উন্মাদেরা। এখানে শ্লেষের ভঙ্গিতে কবিমাত্রের আত্ম-জিজ্ঞাসার কথাই বলেন তিনি। কবিতা শব্দশিল্প। শব্দের কারুকাজে কবিতার রূপমূর্তি প্রকাশ পায়। কবির মনোবেদনার একটি কারণ এই প্রকৃত শব্দটি চয়ন করার ব্যর্থতা। দীর্ঘ কবিতাযাপনে তিনি অনুভব করেন, বহু শব্দ বহুধা ব্যবহৃত। যেমন তিনি লিখেন—

"কিছু শব্দ ডুবে গেছে সমুদ্রের রূপবর্ণনায়;
কিছু শব্দ লটকে আছে অশথের ডালে;
বৈকালী হাওয়ায়
ভো-কাট্টা ঘুড়ির মতো কিছু শব্দ দৃষ্টির আড়ালে
চলে যাচ্ছে; কম্পজ্বরে আর
অস্ত্রের ব্যাধিতে ভুগছে কিছু শব্দ ওই।
অন্যদিকে, গুরুবন্দনার
মন্ত্র হয়ে উঠতে গিয়ে কিছু শব্দ গম্ভীর বড়ই।"[২৮]

কবির দরদী হৃদয়ের স্বরূপ এখানে ধরা পড়ে। কবিতার প্রতি আত্মমগ্ন থেকে চরাচরে চোখ তুলে দেখছেন। কোথায় কাব্য লুকনো আছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে। কবির মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়েও সত্য। কবির কল্পদৃষ্টি সাধারণ নয়। তিনি সত্যের আবিষ্কারক। তাঁর দেখার ভঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে থাকে নতুনকে জানার অভিব্যক্তি। 'খেলোয়াড়ের টুপি' কবিতায় ভাষার বাঁক বদলের ইঙ্গিত পাই। শব্দ-নির্ভরতার আঁচল থেকে শব্দহীন মূক সৌন্দর্যের দিকে কবি যাত্রা করতে চান। অন্তরে বাজছে ফেরার বাঁশি। বলা যায় উৎসে ফেরার ডাক কবি শুনতে পেলেন। "গন্ধ ফিরে যাচ্ছে ফুলের মধ্যে"[২৯], এই যাত্রা পরিপার্শ্ব জুড়ে, তা অবলোকন করেছেন কবি। তবে কবি মর্জিমতন চলতেই পছন্দ করেন। একবার নীরেন্দ্রনাথ সগর্বে বলে উঠেছিলেন—

"তা হলে আপনারা জেনেই রাখুন যে,
আপনাদের জন্যে আমি
লিখি না। বরং,
বাবুমশাইরা,
আপনারা যে সর্বদা আমাকে
নজরবন্দি করে রেখেছেন, এবং
তা সত্ত্বেও যে আমি এখনও
আমারই মর্জিমতন
লিখতে পারছি, লিখে যাচ্ছি,

এইটে ভেবে মাঝেমধ্যে আমার একটু
গর্বই হয়।"[৩০]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় 'কবিতা'র প্রসঙ্গ নানা ভাবে এসেছে। কবিতার শরীর নির্মাণের কথা, কবিতার স্বরূপ এবং কবিতার গুরুত্ব, মানব জীবনে কোথায় এবং কতটা, এমন বহুবিধ প্রতর্ক কবি উত্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে 'কবিতার ঘর ও বাহির' গ্রন্থে পূর্ণেন্দু পত্রী অনুরূপ একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "পৃথিবীর আলোয় ছন্দোবদ্ধ পদাবলীর যেদিন প্রথম জন্ম, সেদিন থেকেই সাহিত্যের এই মায়াবী সন্তানটির দিকে মানুষের কৌতূহল এবং কৌতুক, স্নেহ এবং সন্দেহ, বৈরাগ্য এবং ব্যাকুলতার মাত্রা প্রায় সমান সমান।"[৩১] নীরেন্দ্রনাথের গদ্য আলোচনাগুলি ছাড়াও কেবল কবিতার মধ্যে কবিতার স্বরূপের নানা কথা ও ইশারা আছে। যা তাঁর কাব্য আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিসর দাবি করে।

তথ্যসূত্র:

১. সেন, সুকুমার। চর্যাগীতি-পদাবলী। সাহিত্য সভা, বর্ধমান, মডার্ন আর্ট প্রেস, কল-১, ১৯৫৬, পৃ. ৪৮।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ এবং দাস, শ্রীসজনীকান্ত। ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৯, পৃ. ৪৮৫।
৩. https://allpoetry.com/L'Allegro
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল। বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা-৬,২০০৯ পৃ. ৪৪।
৫.https://ia800807.us.archive.org/5/items/in.ernet.dli.2015.338558/2015.338558.Rangalal-Bandyopadhyayer.pdf পৃ-১৬
৬. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। স্বগত। ভারতী ভবন, কল-১২, প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৫, পৃ. ২২।
৭. দে, বিষ্ণু। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২০, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৯, পৃ. ৪০।
৮. দাশ, জীবনানন্দ। কবিতার কথা। সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২৩, ১০ম সংস্করণ, ১৪১৩, পৃ. ৩৩।
৯. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতাসমগ্র-২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা-৯ প্রথম সংস্করণ, ৭ম মুদ্রণ-২০১৬, পৃ. ১৬।
১০. তদেব, পৃ. ১৬।
১১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা। পুনশ্চ, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ১৫।
১২. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতাসমগ্র-২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা-৯ প্রথম সংস্করণ, ৭ম মুদ্রণ-২০১৬, পৃ. ১৭।
১৩. তদেব, পৃ. ২৫।
১৪. তদেব, পৃ. ২৯।
১৫. তদেব, পৃ. ৬০।
১৬. তদেব, পৃ. ৬১।
১৭. তদেব, পৃ. ৬৫।
১৮. তদেব, পৃ. ৭৯।
১৯. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতার কী ও কেন। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৮, পৃ. ৩৪।
২০. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতাসমগ্র-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা-৯ প্রথম সংস্করণ, ৭ম মুদ্রণ-২০১৬, পৃ. ১০১।
২১. তদেব, পৃ. ১১২।
২২. তদেব, পৃ. ১১৫।
২৩. তদেব, পৃ. ১২০।
২৪. তদেব, পৃ. ১৫৭।

২৫. তদেব, পৃ. ১৮৪।
২৬. তদেব, পৃ. ১৯৭।
২৭. তদেব, পৃ. ২০৩।
২৮. তদেব, পৃ. ২০৬।
২৯. তদেব, পৃ. ২১৪।
৩০. তদেব, পৃ. ২২৪।
৩১. পত্রী, পূর্ণেন্দু। কবিতার ঘর ও বাহির। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ১১।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 350- 355
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.216

জীবনের যাপন ও জড়বাদী ভাবনা: চার্বাক দর্শনের আলোকে একটি সমীক্ষা

ড. মৈত্রী গোস্বামী, *স্বাধীন গবেষক, উষাগ্রাম, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Cārvāka or Lokāyata school of Indian Philosophy represents the materialist stand. They are in clear opposition to the dominant spiritual and idealistic traditions. Rejecting metaphysical entities such as soul, God, karma, and rebirth, the Cārvākas grounded their philosophy entirely on the reality of matter. They only accept the validity of perception as *pramāna*. For them, only what is empirically verifiable can be regarded as true; all other forms of knowledge—such as inference (*anumāna*) or scriptural authority (*sabda*)—are considered uncertain and speculative. This paper will highlight an analytical examination and will try to show how the Cārvākas explained the nature of the world and human life through their doctrine of materialism (*jaḍavāda*). In contrast to the transcendental tendencies of other Indian systems, the Cārvāka view affirms worldly and human-centered approach of knowledge, ethics, and happiness. This discussion will further explore the philosophical significance of Cārvāka thought in challenging the metaphysical assumptions of Indian spiritualism.

Keywords: Materialism, Universe, Naturalism, Hedonism, Life

জগৎ ও জীবনের উপলব্ধির ভিন্নতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন এমনই এক একটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়। বেদের প্রামাণ্যকে কেন্দ্র করে উক্ত দর্শন সম্প্রদায়গুলিকে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যায়। যথা, আস্তিক ও নাস্তিক। তবে আস্তিক ও নাস্তিক নামে পরিচিত এই দুই ধারার মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য বিদ্যমান যা ভারতীয় দর্শনকে বহুমুখী রূপ প্রদান করেছেন। উক্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও তাঁদের দর্শনে বেদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বা বলা যেতে পারে অধ্যাত্মবাদী ভাবনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তাঁদের দর্শনচিন্তায়। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে চার্বাক দর্শন প্রচলিত ধারা থেকে ব্যতিক্রমী এবং ভিন্ন ধারার। তাঁরা জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন জড়ের মাধ্যমে এবং জীবনের সত্যকে অনুধাবন করেছেন জড়ের মধ্যে। তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় দর্শনে অধ্যাত্মবাদী দর্শন চিন্তার একদম বিপরীত। অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শন এই জড় জগতের অতিরিক্ত এক সত্তায় বিশ্বাসী। সেই আলোচনার মূলে রয়েছে উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব। চার্বাক দর্শনে শুধুমাত্র উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব নয়, বরং উপনিষদসহ সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের প্রতি অনাস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ তথা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারটি জড় ভূতের মাধ্যমে জগতের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের মধ্যেই জীবনের সাধনকে অনুসন্ধান করেছেন। যার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা নেই সেরূপ কোনো তত্ত্বের আলোচনা তাঁদের কাছে নিষ্ফল ও অপ্রয়োজনীয়। স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, ঈশ্বর, আত্মা এই সবকিছুই তাঁদের কাছে অলীক ও অবাস্তব। ইহজাগতিক সুখভোগই চার্বাকদের মূল লক্ষ্য। কঠিন গূঢ়তত্ত্ব নয় বরং ইহজগৎ এবং ইহজীবনই তাঁদের দর্শনে চর্চিত ও চর্যিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধটি

চার্বাক দর্শনের আলোকে জীবনের যাপন কেন্দ্রিক। এই আলোচনায় চার্বাক জড়বাদ যেমন আলোচ্য বিষয় তেমনি ভারতীয় দর্শনের অধ্যাত্মবাদী ভাবধারার বিপরীতে অবস্থিত হয়ে চার্বাক দর্শন কীভাবে জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে জগৎ ও জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন সেবিষয়ে একটি বিশেষণাত্মক আলোচনাও মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শনে চরমপন্থী নাস্তিক নামে পরিচিত। এই নাস্তিকতা ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে নয়, বেদ তথা বৈদিক সাহিত্যের প্রতি অনাস্থাই এই নাস্তিকতার পরিচায়ক। বেদকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনের বিকাশ এবং বিস্তৃতি। চার্বাক দর্শন ঠিক তার বিপরীত। চার্বাক দর্শন বেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী হওয়ার সাথে বৈদিক ভাবধারাগুলিকে নিন্দা করার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বার্হস্পত্যসূত্রের ছত্রে ছত্রে বেদের নিন্দা পরিলক্ষিত হয়। বার্হস্পত্যসূত্রের সূত্রকার বৃহস্পতির বক্তব্য "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ"।[১] অর্থাৎ সূত্রকারের বক্তব্যের মর্মার্থ হল, তিন শ্রেণীর লোক বেদের রচয়িতা- ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর। তাঁদের এরূপ বিবৃতিই ব্যক্ত করে যে বেদ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কী। ভারতীয় দর্শনে বেদ ও বৈদিক সাহিত্যের যে গরিমা বিরাজমান, তাঁদের কাছে বেদ নিতান্তই সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর জন্য সৃষ্ট বিষয়। আবার বার্হস্পত্যসূত্রে এরূপ বক্তব্যও পাওয়া যায় যে, "অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।"[২] অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, ত্রিবেদ ও ভস্মলেপন এগুলি বুদ্ধি ও পৌরুষহীন লোকেদের জীবিকা অর্জনের উপায় মাত্র। তাঁদের এই বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্টত বোঝা যায় যে বেদ ও বৈদিক যাগযজ্ঞাদির প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা বিদ্যমান।

অপরদিকে চার্বাক ব্যতীত ভারতীয় অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়গুলিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যার ফলস্বরূপ তাঁদের ভাবনায় অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তাঁদের দর্শনচিন্তা অধ্যাত্মবাদী ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁরা সর্বদায় বাহ্য জগতের অতিরিক্ত এক সত্তার অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন তাঁদের দর্শনচর্চায়। জগতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বা জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদী দর্শন সম্প্রদায়গুলিতে এক অতীন্দ্রিয় সত্তার অনুসন্ধানই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। জগতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁরা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের অতিরিক্ত এক সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। এই অতিরিক্ত সত্তা কোথাও ব্রহ্ম, কোথাও ঈশ্বর, কোথাও বা আত্মারূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁদের মতে এই জড় জগতের অতিরিক্ত এক অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে ভোক্তারূপে। নইলে জগত সৃষ্টির ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় বৈশেষিক দর্শনের কথা। বৈশেষিক দর্শনে জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জগতের উপাদানরূপে পরমাণুর উল্লেখ করা হলেও সেখানে ঈশ্বরের ভূমিকা রয়েছে। বৈশেষিক মতে জগৎ পরমাণু দ্বারা গঠিত, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতের সমন্বয়ে জগত সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মতে এই পরমাণুগুলি স্বভাবত নিষ্ক্রিয়। ফলে এই জগত সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় এক অতীন্দ্রিয় সত্তা বিদ্যমান যার ইচ্ছাই এই জগতের উৎপত্তি হয়েছে, যিনি সর্বব্যাপী শক্তি ঈশ্বর।

চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শন পরম্পরার এমন একটি ধারা, যেখানে জাগতিক যাবতীয় বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে জড়বাদী ভাবধারা ও ইন্দ্রিয়নির্ভর যুক্তির মাধ্যমে, এবং কোনো অতিপ্রাকৃত বা ঐশ্বরিক সত্তার সাহায্য ছাড়াই। এই দর্শনের মূল বক্তব্যই হল যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা অস্তিত্বহীন। তাই ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক, অদৃষ্ট বা কর্মফল— এই সমস্ত ধারণাকে তাঁরা কেবল মনুষ্যকল্পিত বলে প্রত্যাখ্যান করেন। এর প্রমাণ স্বরূপ বৃহস্পতির বক্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি স্বর্গ, নরক প্রভৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "নস্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
> নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ।।"[৩]

চার্বাকগণ জগতের মূল উপাদান প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি বার্যনলানিলাঃ।
> চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।।"[৪]

চার্বাক দর্শনে উল্লিখিত এই বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু— এই চারটি জগতের মূল উপাদান। এই উপাদানগুলি পরস্পরের সংযোগ ও বিকারের মাধ্যমে স্বভাবতই নানা রূপ ধারণ করে এবং তার থেকেই

এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়। তবে তাঁরা এই চারটি ভূতের মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অতীন্দ্রিয় বা ঐশ্বরিক সত্তার ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দেননি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ঈশ্বর তাঁদের দর্শনে অস্বীকৃত। তাঁদের কাছে লোকসিদ্ধ রাজাই ঈশ্বর।[৫] তাঁদের মতে, জগৎ-সৃষ্টি কোনো চেতনসত্তা বা ঐশ্বরিক ইচ্ছার ফল নয়, বরং জড়দ্রব্যগুলি নিজস্ব স্বভাববশত এই জগত সৃষ্টি করেছে। এবিষয়ে তাঁদের বক্তব্য, জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে না ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা আছে, না অদৃষ্টের। এমনকি তাঁরা কার্য-কারণ নীতিকেও অস্বীকার করেছেন, কারণ কার্য ও কারণের মধ্যে অপরিহার্য সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে কোনো যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নেই। জগতে যা কিছু ঘটে বা যে কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়, তা মূলত ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি) ও মরুৎ (বায়ু)— এই চারটি মৌলিক পদার্থের স্বভাববশত সংঘটিত হয়। প্রতিটি পদার্থেরই একটি নির্দিষ্ট স্বভাব আছে, এবং সেই স্বভাব অনুযায়ী নানা কার্য সংগঠিত হয়। বার্হস্পত্যসূত্রে বলা হয়েছে,

"অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিত তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্ব্যবস্থিতিঃ।।"[৬]

অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, জলের স্বভাব শীতলতা, বায়ুর স্বভাব অনুষ্ণতা ও অশীতলতা।

এই স্বভাবতত্ত্বই চার্বাক দর্শনের জগত সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার মূল ভিত্তি, যা স্বভাববাদ নামে পরিচিতি। চার্বাক দার্শনিকগণের মতে, জগতে যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় তা এই পদার্থগুলির স্বভাবগত বৈচিত্র্যের কারণেই হয়ে থাকে। এর ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বর, আত্মা বা অদৃষ্টের মতো অদৃশ্য সত্তার প্রয়োজন হয় না। জগৎ হল দৃশ্যমান পদার্থসমষ্টি, এর মধ্যে কোনো অতিপ্রাকৃত উদ্দেশ্য নিহিত নেই। তাঁদের এই ভাবনার প্রতিফলন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে যদৃচ্ছাবাদ।

চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় জগৎকে ঈশ্বরসৃষ্ট বা কার্যকারণ নীতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছেন। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকগণ জগৎকে কোনো উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি হিসেবে দেখেননি। তাঁদের মতে, জগৎ পদার্থসমূহের সংযোগ ও বিয়োগের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল রূপে উপস্থিত। এখানে কোনো স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজন নেই, কারণ জগৎ নিজের স্বভাবেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত। চার্বাক দার্শনিকগণের এই বক্তব্য যদৃচ্ছাবাদ নামে অভিহিত। এখানে 'যদৃচ্ছা' বলতে পদার্থগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বভাবজনিত অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জগত সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁরা যেমন কোনো দৈবের ভূমিকা স্বীকার করেননি তেমন কোনো নিয়ম বা নীতিকেও তাঁরা স্বীকার করেননি। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে জগৎ ভূতচতুষ্টয়ের অন্তর্নিহিত স্বভাব অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপান্তরিত হয়। যেমন অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, জলের স্বভাব শীতলতা, তেমনি পদার্থের স্বভাবই তার কার্য নির্ধারণ করে। এই কার্যকারণ সম্পর্ক কোনো অনিবার্য নিয়মের দ্বারা পরিচালিত নয়, বরং প্রকৃতির স্বভাবের পরিবর্তনশীলতার দ্বারা নির্ধারিত। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, চার্বাক দর্শনে জগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ জড়বাদী ভাবনার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে, যেটি প্রকৃতিনির্ভর, ঈশ্বরবর্জিত স্বতঃফূর্ত একটি প্রক্রিয়া, যেখানে ভৌত উপাদানগুলির পারস্পরিক সংযোগই সৃষ্টির একমাত্র ব্যাখ্যা। জগৎ এখানে কোনো ঐশ্বরিক বা দৈব পরিকল্পনার ফল নয়, বরং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত স্বভাব ধর্মের গতিশীল প্রকাশ।

তবে এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি ওঠে তা হল, জড়ভূতের মাধ্যমে সৃষ্ট জগতে চৈতন্যরূপ গুণের সৃষ্টি হয় কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বার্হস্পত্যসূত্রে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যঃ দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ"[৭] অর্থাৎ কিণ্ব বা বৃক্ষবিশেষের নির্য্যাস ইত্যাদির বিকার বা পরিণাম থেকে যেমন মাদকশক্তি উৎপন্ন হয়, সেইভাবে এই চারটি ভূত মিলিত হয়ে যে পরিণাম প্রাপ্ত হয় তা থেকে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। তাঁদের এই মতবাদ ভূতচৈতন্যবাদ নামে পরিচিত।চার্বাক দর্শনে জগৎ ও জীবনের প্রতি এক সম্পূর্ণ ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। তাঁদের মতে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য ইহজাগতিক সুখের পরিপূর্ণ উপভোগ। এপ্রসঙ্গে তাঁদের উক্তি,

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।"[৮]

চার্বাক দার্শনিকগণের এই উক্তি থেকে জীবন সম্পর্কে তাঁদের সুখবাদী ও ভোগবাদী ভাবনার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের এই উক্তির মর্মার্থ হল যদি সুখলাভের জন্য ঋণ করতেও হয়, তবু ভোগ থেকে বিরত থাকা অনুচিত। কারণ দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেলে তা আর ফিরে আসে না। এই উক্তির মধ্য দিয়ে চার্বাকদর্শন ঘোষণা করে যে জীবনের

সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল ইহজাগতিক সুখের সম্পূর্ণ উপভোগ, কারণ ভোগই জীবনের স্বরূপ। চার্বাকদৃষ্টিতে সুখ ও দুঃখ পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত। কিন্তু দুঃখের সম্ভাবনা সুখপ্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধক নয়। বরং তাঁরা মনে করেন, দুঃখকে ভয় না করে ভোগের পথে এগিয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এপ্রসঙ্গে চার্বাক গণের বক্তব্য,

"ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাম্
দুঃখোপসৃষ্টিমিতি মূর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীন্‌জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্
কো নাম ভোক্তৃ ষকণোপহিতান্ হিতার্থী।।"[৯]

তাঁদের বক্তব্য হল বিষয়ের সংস্পর্শে সুখ দুঃখ উভয়ই সংযুক্ত আছে। সেই কারণে কোনো ব্যক্তি যদি সেই সুখকে পরিত্যাজ্য বলে মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে মূর্খ। যেমন সামান্য তুষকণাযুক্ত থাকার কারণে কেউ কি উৎকৃষ্ট তুণ্ডলপূর্ণ ধান্যকে ফেলে দেয়? তাঁদের এই বক্তব্য থেকে এক বাস্তববাদী জীবন দর্শন সূচিত হয়। সুখ ও দুঃখ মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জগতের যা কিছু সুখদায়ক তা কোনো না কোনোভাবে দুঃখের সহচর— এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই কারণে যদি কেউ সমস্ত সুখকেই ত্যাগ করতে উদ্যত হয়, তাহলে মানবজীবন থেকে আনন্দ, রস ও জীবনীশক্তির উৎসই নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় বৌদ্ধ দর্শনের কথা। বৌদ্ধ দর্শনও ভারতীয় দর্শনের অন্যতম নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়। এই দর্শনেও উপনিষদীয় ঈশ্বর, ব্রহ্ম ও আত্মার অতীন্দ্রিয় সত্যে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য না খুঁজে, মানুষকেই এই বিশ্বচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছেন। যদিও জীবন সম্পর্কে চার্বাক দার্শনিকগণের থেকে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। চার্বাকগণ সুখে মিশ্রিত দুঃখকে অগ্রাহ্য করে সুখকেই জীবনের মূল লক্ষ্যরূপে মান্যতা দিয়েছেন। অপরদিকে বৌদ্ধ দর্শনে মানবজীবনের দুঃখময়তাকে স্বীকৃতি দিয়ে দুঃখের কারণ, এবং সেই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। গৌতম বুদ্ধের মতে জীবনে দুঃখ অনিবার্য, তার কারণ হল ভোগতৃষ্ণা, তৃষ্ণার নিবৃত্তির মাধ্যমেই দুঃখের নিরোধ ঘটে, আর সেই নিরোধের পথ হল অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। তাঁর মতে মানুষ নিজস্ব নৈতিক চর্চা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে। এর ফলে বলা যায় গৌতম বুদ্ধের দর্শনে দুঃখমুক্তি হল মানুষের জ্ঞান, নৈতিকতা ও আত্মসংযমের ফল।

এখানে বৌদ্ধ ও চার্বাক দর্শন উভয়ই আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব ও ঈশ্বর বিশ্বাসকে অস্বীকার করে মানুষকেই কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছে, তবে যেকথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহল তাঁদের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন সুরেই দ্যোতীত হয়। চার্বাক দর্শন ভোগবাদী— তারা ইন্দ্রিয়সুখকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, "যাবৎ জীবেত্ সুখং জীবেত্" —অর্থাৎ যতদিন বাঁচবো, ততদিন সুখ ভোগেই নিমজ্জিত থাকবো কারণ, সুখই সত্য, সুখের অন্তরালে পরলোক বা স্বর্গ বলে কিছু নেই। অপরদিকে, বৌদ্ধ দর্শন নৈতিক ও করুণানির্ভর। মানুষের দুঃখকে জীবনের সত্য বলে মেনে নিয়ে দুঃখনিবারণকেই মানবকল্যাণের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে, ঈশ্বর বা আত্মা নয়, মানুষই নিজের মুক্তির স্রষ্টা। চারটি আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধ মানবজীবনের নৈতিক শৃঙ্খলা, অহিংসা, দয়া ও করুণার শিক্ষা দিয়েছেন। চার্বাক যেখানে ইন্দ্রিয়নির্ভর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোগকে সর্বোচ্চ মূল্য দেয়, সেখানে বুদ্ধ সমাজকেন্দ্রিক নৈতিক অনুশাসনের মাধ্যমে শান্তিকে পরম লক্ষ্য হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। চার্বাক মানুষকে ভোগের স্বাধীনতা দিয়েছেন, আর বুদ্ধ মানুষকে দিয়েছেন নৈতিক মুক্তির মর্যাদা— এই দুই দর্শন ভারতীয় চিন্তায় ভোগ ও সংযম, ইহলৌকিকতা ও নৈতিকতার দুই বিপরীত ধারা রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে আলোচ্য এই ধারায় বৌদ্ধ দার্শনিকগণ দুঃখ মুক্তির উপায়রূপে যে নৈতিকতা ও সংযমের পথ বেছে নিয়েছেন তা দীর্ঘ অধ্যাবসায়ের পথ। সেই সাধনায় দুঃখমুক্তি হয়ত সম্ভব কিন্তু ইহজীবন ভোগ কতটা সম্ভব তা সংশয়পূর্ণ। এক্ষেত্রে চার্বাকগণ অতিরিক্ত বৈরাগ্য বা নৈরাশ্যবাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বাস্তববাদী জীবন বোধের জয়গান করেছেন। তাঁদের এই বাস্তববাদী জীবনের যাপন সাধারণ মানুষকে যে গভীর বার্তা দেয়, তাহল জীবনের প্রতিটি সুখে কিছু দুঃখ মিশে আছে, কিন্তু সেই অল্প অপূর্ণতার জন্য সম্পূর্ণ জীবন-আনন্দকে ত্যাগ করা কেবল অজ্ঞতার প্রকাশ। দুঃখকে বাদ দিয়ে সুখের সন্ধান অসম্ভব, কারণ এরা পরস্পরের পরিপূরক এবং সুখপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই মানব অস্তিত্বের চালিকা শক্তি। তাই চার্বাক দার্শনিকগণ কাম এবং অর্থকেই পরম পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় দর্শনে চার

প্রকার পুরুষার্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। মোক্ষকে প্রায় সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় পরম পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ করেছেন। একারণে ভারতীয় দর্শনকে মোক্ষ শাস্ত্র বলা হয়। তবে চার্বাকগণ এই ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই পরম পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ করেছেন। এবং সেই পরম পুরুষার্থ অর্জন করার উপায়রূপী অর্থকে তাঁরা গৌণ পুরুষার্থ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুখকে পরম কাম্য বস্তুরূপে গ্রহণ করায় তাঁদের সুখবাদী বলা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, চার্বাক দার্শনিকগণ তাঁদের দর্শন আলোচনাকে কোনো জটিলতার বেড়াজাল দিয়ে আবদ্ধ করতে চাননি। এমন কোনো বিষয় যা লৌকিক অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় না তা নিয়ে অহেতুক চর্চাকেও তাঁরা প্রাধান্য দেননি। লোকচক্ষুর আড়ালে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বা অতিপ্রাকৃত বিষয়ে তাঁরা সবসময় অন্যান্য দর্শনের বিপরীত পক্ষেই অবস্থান করেছেন। ইন্দ্রিয়নির্ভর জড় জগত ও মানুষের সুখই তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে। তাই তাঁরা হয়ে উঠেছেন লোকায়ত। পরলোক, পাপ-পুণ্য বা দুঃখনিবৃত্তি ইত্যাদি অধ্যাত্মবাদী ভাবনাকে তাঁরা দর্শনে স্থান দেননি। চার্বাক দার্শনিকগণ জীবনকে এক ভোগ উপযোগী সাধন হিসেবে স্বীকার করেছেন, যেখানে সুখই জীবনের একমাত্র অভীষ্ট। বস্তুজগত তার রূপ-মাধুর্যে মানুষকে আকর্ষণ করে, এবং সেই আকর্ষণকে দমন না করে বরং তাকে গ্রহণ ও ভোগ করাই চার্বাকদের মতে মানবজীবনের যথার্থ সার্থকতা। এভাবে তাঁরা ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার বিরোধী এক জীবনদর্শনের প্রতিনিধি, যেখানে ত্যাগের পরিবর্তে ইহজাগতিক উপভোগই মুখ্য। তাঁদের মতে ত্যাগ, সন্ন্যাস বা কৃচ্ছসাধন জীবনবিমুখতার প্রতীক। জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জন সম্ভব কেবল ভোগের মাধ্যমে, ত্যাগের দ্বারা নয়। তাই ভস্মলেপন, দণ্ডধারণ বা অতিজাগতিক সাধনা তাঁদের দৃষ্টিতে জীবিকার নিম্নতম রূপ মাত্র। জীবনের প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ইন্দ্রিয়সুখনির্ভর, নীতি নৈতিক জীবনযাপনের বাইরে অবস্থিত এক বিশেষ চিন্তাধারা প্রবর্তকরূপে তাঁদের চিত্রিত করেছে। সেখানে নীতি বা ঔচিত্যবোধের চেয়ে ইহজাগতিক সুখই জীবনের মূল লক্ষ্য।

তথ্যসূত্র:

[১] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫।

[২] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫।

[৩] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫।

[৪] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৭।

[৫] "লোকসিদ্ধো ভবেদ্রাজা পরেশা নাপরঃ স্মৃতঃ", *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৭।

[৬] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈনদর্শন, অমিত ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদনা থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৭৮।

[৭] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৭।

[৮] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য,সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫।

[৯] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য,সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. *প্রশস্তপাদভাষ্যম্* (প্রশস্তপাদাচার্য), ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (২০১৭), কলকাতা: দামোদর আশ্রম।

২. *সর্বদর্শন সংগ্রহ* (সায়ন মাধবীয়), সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ (প্রথম খণ্ড), (১৪০৭), কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।

: সত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), (১৪১৫), কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।

ইংরেজী গ্রন্থ:

১. Dasgupta, Surendranath, *A History of Indian Philosophy.* (Vol. I- V), (1969), Cambridge University Press.

২. Raju, P.T., *The Philosophical Traditions of India.* (2009), Delhi: MLBD Publishers.

৩. Sharma, C.D., *A critical survey of Indian philosophy.* (2000), Delhi: MLBD Publishers.

সহায়ক গ্রন্থ:

৪. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। *লোকায়ত দর্শন।* (২০১৯), কলকাতা: নিউজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৫. চট্টোপাধ্যায়, লতিকা। *চার্বাক দর্শন ।* (২০১৫), কলকাতা: নিউজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৬. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা।* (২০০৪), কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।

৭. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। *চার্বাকচর্চা।* (২০১৮), কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 356- 362
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.217

শিক্ষা ভাবনায় দর্শন: একটি নৈতিক ও চিন্তাগত অন্বেষণ

কাজী মাহফুজা হক, *সহকারী অধ্যাপক, নীতিবোধ ও সমতা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 14.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the overall education system, science is important, but it is just as important to include ethics and humanity with it. Because of the progress of modern science and technology, people are enjoying many benefits, but the loss of values has made it difficult to build a truly humane society. That is why the education system should not only teach information or technical skills; it must also include humanistic and moral education. This article discusses the ethical and human aspects of the modern education system. It explains the current crises and possibilities of education in the light of the educational philosophies of Rabindranath Tagore and Bertrand Russell. The main goal of education is presented as the development of humanity, morality, and the ability to think independently.

Keywords: Humanistic Education, Ethics and Morality, Modern Science and Technology, Educational Philosophy, Tagore and Russell

শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে মুক্ত ও মননশীল। একাডেমিক সনদ বা ডিগ্রি নয়, বরং জীবনের সার্বিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত— এটাই রবীন্দ্রদর্শনের মূল কথা। তাই তিনি শিক্ষাকে আত্মিক অভিজ্ঞতার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত শিক্ষা মানে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে জীবন উপলব্ধি করা। এ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শুধু তথ্য নয়, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও সমবেদনা অর্জন করে। সার্বিক শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, একচেটিয়া শ্রেণিকক্ষে পাঠদান যথেষ্ট নয়। মানুষের অন্তর্গত চেতনাবোধ ও মননের বিকাশই শিক্ষার আসল লক্ষ্য। আধুনিক সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল সমাজে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তাই 'নলেজ সোসাইটি' গড়ার চিন্তা এখন জরুরি। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দর্শনের আলোকে প্রাকৃতিক শিক্ষা, মানবিকতা এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশের কথা বলেছেন। আধুনিক সমাজে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায়ও পরিবর্তন এসেছে। তবে এই পরিবর্তনে শিক্ষার নৈতিক ও মানবিক দিকগুলো কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রবন্ধে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে।

শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি:

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু তথ্য প্রদান নয়, বরং শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা। শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু পাঠ্যবই পড়ানো নয়, বরং শিক্ষার্থীদের চিন্তা-ভাবনার বিকাশে সহায়তা করা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শন:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাকে আনন্দময় ও সৃজনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। তিনি বলেন, "শিক্ষা হচ্ছে আত্মার মুক্তি, পাঠ্যবই মুখস্থ নয়।"[১] তিনি শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা দর্শনে শিশুর প্রাকৃতিক বিকাশকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, একমাত্র আনন্দের মাধ্যমে শিশুর মনে শিক্ষা গেঁথে দেওয়া সম্ভব। এজন্য তিনি শিক্ষাকে পাঠ্যবইয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে শিশুর অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও সৃজনশীলতা বিকাশের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন।

তিনি শিক্ষাকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের উপর দাঁড় করিয়েছেন:

১. শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা তৈরি করা
২. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা
৩. ধর্মীয় সহনশীলতা
৪. সামাজিক সচেতনতা

বার্ট্রান্ড রাসেলের শিক্ষা দর্শন:

বার্ট্রান্ড রাসেল শিক্ষার মাধ্যমে মানবিকতা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়ের কথা বলেন। তিনি বলেন, "The first thing the average educator sets to work to kill in the young is imagination."[২]

রুশোর শিক্ষা দর্শন:

জ্যাঁ-জ্যাক রুশো তাঁর 'Émile, or On Education' গ্রন্থে শিশুর প্রাকৃতিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, "Everything is good as it leaves the hands of the Author of things; everything degenerates in the hands of man."[৩] (Russell, B. (1932). Education and the Social Order. London: George Allen & Unwin)

শিক্ষা ভাবনায় দর্শন:

সার্বিক শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, একচেটিয়া শ্রেণিকক্ষে পাঠদান যথেষ্ট নয়। মানুষের অন্তর্গত চেতনাবোধ ও মননের বিকাশই শিক্ষার আসল লক্ষ্য। আধুনিক সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল সমাজে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তাই 'নলেজ সোসাইটি' গড়ার চিন্তা এখন জরুরি। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দর্শনের আলোকে প্রাকৃতিক শিক্ষা, মানবিকতা এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশের কথা বলেছেন। শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে মুক্ত ও মননশীল। একাডেমিক সনদ বা ডিগ্রি নয়, বরং জীবনের সার্বিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত— এটাই রবীন্দ্রদর্শনের মূল কথা। তাই তিনি শিক্ষাকে আত্মিক অভিজ্ঞতার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত শিক্ষা মানে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে জীবন উপলব্ধি করা। এ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শুধু তথ্য নয়, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও সমবেদনা অর্জন করে।

মূল বিষয়বস্তু আলোচনা:

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদর্শন ও চিন্তাধারা আমাদের শিক্ষা ভাবনায় গভীর প্রভাব রেখেছে। তিনি ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক এবং মানবতাবাদী চিন্তাবিদ। তাঁর দর্শন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও চেতনাবোধের ওপর আস্থা রাখে। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা মানেই জীবনের প্রকৃত উপলব্ধি। তাঁর মতে, "আধ্যাত্মিক জীবন না থাকলে মানুষ প্রকৃত মানুষ নয়।" তাই তিনি মানুষকে আত্মার বিকাশ ও নৈতিক চেতনার ভিত্তিতে শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে আত্মার জাগরণ এবং সৌন্দর্য ও সত্যের উপলব্ধির পথ তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, জীবনের সত্য উপলব্ধির মাধ্যমেই শিক্ষার মূল ভিত্তি গড়ে ওঠে। তাঁর শিক্ষা দর্শনে ব্যাক্তি ও সমাজ-উভয়ের বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া

---

[১] - ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৩) । শিক্ষা, বিশ্বভারতী প্রকাশন।

[২] Russell, B. (1932). Education and the Social Order. London: George Allen & Unwin, p. 95)

[৩] Rousseau, J.-J. (1762). Émile, or On Education. New York: Basic Books, 1979.

হয়েছে। তিনি পাঠ্যক্রম বা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং মানবিক চেতনার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করেছেন। শিক্ষার্থীদের আত্মিক বিকাশ, নৈতিকতা, মানবতাবোধ ও সৃজনশীলতা— এই চারটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তিনি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন।

তাঁর মতে:

১. শিক্ষার্থীদের ইচ্ছাশক্তিকে প্রজ্জ্বলিত করতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই জ্ঞানের পথ অনুসন্ধান করতে পারে।
২. শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা জাগ্রত করতে হবে।
৩. শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহলকে গুরুত্ব দিতে হবে।
৪. সমাজজীবনের বৃহত্তর বাস্তবতায় শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে।

তিনি শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলেছেন এবং তাদের চারিত্রিক বিকাশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শিশুদের মনোভাব বুঝে শিক্ষাদান করতে হবে। প্রথাগত পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতির বদলে আনন্দময়, অনুসন্ধানমূলক পাঠদানকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আজও পাঠ্যবই মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালো ফল করাকে শিক্ষা মনে করা হয়। অথচ শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি বা সৃজনশীলতা তেমনভাবে বিকাশ পাচ্ছে না। পাঠ্যবই নির্ভরতা শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনা কমিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীদের শেখানোর ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য হারিয়ে ফেলি। শিক্ষকরা পাঠদানের প্রস্তুতি ছাড়াই ক্লাসে প্রবেশ করেন। অথচ পাঠদানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা থাকা জরুরি, যাকে আমরা লেসন প্ল্যান বলি।

বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষকদের অনেকেই শুধু পেশা হিসেবে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু আদর্শ শিক্ষক হতে হলে আগে নিজে শিখতে হবে এবং অন্তর থেকে শিক্ষাকে ধারণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "শিক্ষা মানে শুধু তথ্য দেওয়া নয়, বরং মনুষ্যত্বের বিকাশ।"[৪] তিনি এমন অনেক মনীষীর কথা বলেছেন যারা লেখাপড়ায় দক্ষ না হয়েও ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী। তিনি মনে করতেন, প্রকৃত শিক্ষক সেই, যার নিজস্ব মানসিক অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যিনি শিক্ষার্থীর হৃদয়ে স্পর্শ রাখতে পারেন। মানবতার অন্তরায় ঘোচানোর প্রক্রিয়া হলো শিক্ষা। 'আত্মার প্রকৃত উন্মেষ'— তিনি বলেছিলেন, শিক্ষা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা সামাজিক সাফল্যের হাতিয়ার নয়, বরং মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষের মাধ্যম।

তিনি আরও বলেন—

> "The education we desire for our children must depend upon our ideals of human character and our hopes as to the part they are to play in community."[৫]

আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে Bertrand Russell-এর চিন্তাভাবনার প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম হলেও তার বক্তব্য অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার্থীর নেতিবাচক অভ্যাসকে শুধরে তুলে তার বুদ্ধি, অনুভব ও নৈতিকতা জাগ্রত করাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি Education and the Social Order গ্রন্থে বলেছেন, শিক্ষাকে যদি কেবল অর্থনৈতিক লাভের জন্য গড়ে তোলা হয়, তাহলে তা মানবতাবোধ (Humanism) এর বিপরীতে গিয়ে কেবল উপযোগবাদী (Utilitarian) শিক্ষায় পরিণত হয়।

তিনি লেখেন—

> "The humanistic element in education must remain lost, they must we simply died to leave room for the other elements without which the new world rendered possible by science can never be realized."[৬]

---

[৪] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৩) । শিক্ষা, বিশ্বভারতী প্রকাশন। c,40

[৫] Education and the Social Order, Bertrand Russell)

[৬] Russell, B. (1932). Education and the Social Order. London: George Allen & Unwin, p. 95)

রাসেল চেয়েছেন এমন এক শিক্ষা যেখানে মানুষের বিবেক, নৈতিকতা ও সৃজনশীলতা সমান গুরুত্ব পাবে। শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা তার দর্শনের অন্যতম দিক। তিনি মনে করেন, শিশুদের শেখানো মানে তাদের মনোজগতে প্রশ্ন, কৌতূহল ও উপলব্ধি সৃষ্টি করা। শুধুমাত্র মুখস্থনির্ভর বা ভয়ভীতিনির্ভর শিক্ষা নয়, বরং আনন্দঘন ও ভাবনাসমৃদ্ধ শিক্ষা হওয়া উচিত। তিনি বিশেষভাবে মন্টেসরির শিক্ষাপদ্ধতির প্রশংসা করেছেন। মোন্তেসরি পদ্ধতিতে শিশুদের শিখতে বাধ্য না করে বরং তারা কীভাবে শেখে তা পর্যবেক্ষণ করে শেখার পরিবেশ তৈরি করা হয়। তিনি বলেছেন, এমনকি যদি কোনো শিশু গুণনসূত্র (Multiplication Table) মুখস্থ করতে না পারে, তাহলেও তাকে কটু কথা না বলে, বরং সহনশীলতা ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে শেখার সুযোগ দিতে হবে। তিনি এইভাবে দেখিয়েছেন, শিক্ষা কোনো শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া নয়, বরং বিকাশের জন্য সহানুভূতিশীল সহচর। শিক্ষার লক্ষ্য কেবল পেশাদার দক্ষতা অর্জন নয়, বরং আত্মিক ও নৈতিক বিকাশও নিশ্চিত করা। শিক্ষার্থীকে মানবিক মূল্যবোধে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা। মানবিকতা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে গণতান্ত্রিক চেতনায় গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীই ভবিষ্যৎ সমাজের চালিকাশক্তি হতে পারে। তাই শিক্ষা হতে হবে মানবিক ও মুক্তবুদ্ধিচর্চার সহায়ক।

বর্তমান শিক্ষার কাঠামোতে authority বা নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে মুখ্য ভূমিকা রাখছে, যার ফলে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ও কৌতূহল দমে যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষায় প্রয়োজন মূল্যায়নকেন্দ্রিক নয়, বরং প্রক্রিয়াভিত্তিক ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পদ্ধতি। প্রাথমিক স্তরে শিশুদের শিক্ষা খেলাধুলা, শরীরচর্চা, চারুকলা ও গল্পের মধ্য দিয়ে হওয়া উচিত। পাঠ্যবই নির্ভরতা কমিয়ে বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষা প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। স্থানভেদে স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও বাস্তব তথ্য সংযুক্ত করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হলে তা হবে আরও শিক্ষার্থীদের মধ্যেই ভবিষ্যতের সমাজ গড়ে উঠবে। তাই শিক্ষা হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক। বিশেষ করে বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট, প্রযুক্তির বিস্তার ও সমাজে সংঘাত— এই তিনটি চ্যালেঞ্জের মুখে শিক্ষা হতে হবে দায়িত্বশীল ও নৈতিক।

শিক্ষককে কেবল একজন বিদ্যাদানকারী হিসেবে নয়, বরং একজন সচেতন সমাজ-নির্মাতা হিসেবে ভাবতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীর মানসিক জগতের সঙ্গে যুক্ত থেকে, তাদের চিন্তার জগতে আলো ফেলে দিতে পারেন। শিক্ষক মানেই একজন সত্যিকারের অভিভাবক— যিনি সমাজের দায়িত্বও বহন করেন। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে আমরা দেখেছি কীভাবে অনলাইন শিক্ষা দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। তবে প্রযুক্তির ব্যবহার যেন মানবিক মূল্যবোধকে হ্রাস না করে, সেটিই নিশ্চিত করতে হবে।

গণতান্ত্রিক সমাজে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা যেমন বাস্তবতা, তেমনি মানবিক সংবেদনশীলতা বজায় রেখে শিক্ষা প্রদান করাও জরুরি।

শিক্ষার প্রকৃতির কোনো সীমারেখা নেই। শিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্কটি যেন কেবল শ্রেণিকক্ষভিত্তিক না হয়। শিক্ষা হতে হবে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত, যা বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে শিশুর চেতনাকে জাগ্রত করে। শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের বাইরে চিন্তা করতে শেখাতে হবে। বিষয়বস্তুর গভীরতা অনুধাবনের সুযোগ দিতে হবে, যাতে তারা বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। শিক্ষার্থীর চিন্তা স্বাধীনতা ও কল্পনার জগৎ যেন সংকুচিত না হয়, বরং তা বিকশিত হয়— এটাই হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য। দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হলে শিক্ষার্থীর চেতনায় নৈতিকতা, মানবিকতা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে।

তিনি (রবীন্দ্রনাথ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর মতে, শিশুরা নারীদের স্নেহ ও মাতৃসুলভ আচরণের মাধ্যমে আরও ভালোভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— শিক্ষা দিতে হবে এমনভাবে, যাতে শিশুদের মননশীলতা ও কল্পনাশক্তি বিকশিত হয় এবং তারা নিজের জীবনের পথ খুঁজে নিতে পারে। নারী শিক্ষকেরা শিশুদের মানসিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

শিশুরা গল্প, গান, খেলা, ভালোবাসা ও অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই প্রাথমিক স্তরে শিশুর উপযোগী উপকরণ ও পদ্ধতি প্রয়োজন। সমাজের বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনতে প্রয়োজন সমতা, উদারতা ও সহমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— শিক্ষা দিতে হবে এমনভাবে, যাতে শিশুদের মননশীলতা ও কল্পনাশক্তি বিকশিত হয় এবং তারা নিজের জীবনের পথ খুঁজে নিতে পারে। আজকের শিক্ষায় কেবল

সিলেবাস নয়, প্রয়োজন শিক্ষার্থীর জীবনজগৎ অনুযায়ী পাঠ উপযোগী পরিকল্পনা। বাংলা ও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শেখাও গুরুত্বপূর্ণ। ছোটবেলায় শেখা ভাষা সহজে মনে থাকে, এবং শিশুর চিন্তার পরিধি বাড়াতে সহায়ক হয়।

শিক্ষা জাগরণের দর্শন:

সামাজিক প্রেক্ষাপট:

বর্তমান সময়ে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। মানুষের জাগরণ ও মানবিক উৎকর্ষের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নয়নের মধ্যেও শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসর বাড়লেও শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবিকতা, নৈতিকতা ও চিন্তাশীলতা ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। শিক্ষা যদি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়, তবে তার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সচেতন নাগরিক গড়ে তোলা। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল দক্ষতা অর্জন নয়, বরং আত্ম-উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ জাগ্রত করাও এর অন্যতম দায়িত্ব। শিক্ষা মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও জাতির উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। আধুনিক সমাজে শিক্ষা শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন নয়, বরং নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিকাশের ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, "প্রকৃত শিক্ষা সেই যা মানুষকে মুক্ত করে" (ঠাকুর, ১৯১০)। এই শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ও কর্মে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বর্তমান বৈশ্বিকায়নের যুগে, প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের সংকট দেখা দিয়েছে। এ সংকট থেকে উত্তরণে শিক্ষা জাগরণের দর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

শিক্ষা ও মানবিকতা:

শিক্ষা শুধুমাত্র পাণ্ডিত্য অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং এটি ব্যক্তির চরিত্র গঠন এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের প্ল্যাটফর্ম। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, "শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র তথ্য দেওয়া নয়, বরং চিন্তাশীল ও নৈতিক মানুষ গড়ে তোলা"[৭] শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হয় এবং সহনশীল ও মানবিক আচরণ শিখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা শুধু পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবাধিকারের পক্ষে সচেতন নাগরিক গড়ে তোলার মাধ্যম।

আধুনিক শিক্ষার সংকট:

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্যাভিভার ও পরীক্ষার চাপ শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে। আমাদের দেশে শিক্ষা পাঠ্যক্রম এমন যে বিজ্ঞান বিভাগ, মানসিক বিভাগ, বানিজ্য বিভাগ এর মধ্যে সর্বত্তম হচ্ছে বিজ্ঞান বিভাগ এর প্রতি শিক্ষার্থীদের এমনভাবে জোর করা হয় যে বিজ্ঞান এ না পড়তে পাড়লে জীবনবৃথা। বাবা-মা এর ইচ্ছা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে। কিন্তু শিক্ষার্থী ভালো শিল্পি অথবা খেলোয়াড় হতে পারতো। ইচ্ছার বিরুদ্ধে পড়তে গিয়ে না হয় ভালো ডাক্তার, না হয় ভালো ইঞ্জিনার হয়ে উঠে টাকা কামানোর কারিগর। "শিক্ষা শুধু কারিকুলাম নয়, বরং জীবন ও মূল্যবোধ শেখার প্রক্রিয়া"[৮] (Montessori, 1949)। ডিজিটাল যুগে তথ্যের প্রবাহ থাকলেও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্তাশীল ও দায়িত্বশীল মানুষ তৈরি করা।

শিক্ষা জাগরণের দর্শন এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখায়। এটি শিক্ষাকে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সংযুক্ত করে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তোলে।

---

[৭] মন্তেসরী পদ্ধতি এমন এক শিক্ষাপদ্ধতি যেখানে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে শিশুর ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, নিজে চেষ্টা করে শেখা এবং নির্দিষ্ট উপকরণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। মন্তেসরি পদ্ধতি অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের স্বশিক্ষার (Auto-education) সুযোগ দিতে হলে তাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হয়। এ পদ্ধতিতে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি ও আত্মপ্রকাশের বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে শিক্ষকের ভূমিকা হয় একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে শেখার মাধ্যম হিসেবে কাজ করা।

আধুনিক শিক্ষার সংকট দূরীকরনের উপায়:

কবি, সাহিত্যিক এবং দার্শনিকগণ প্রতেকেই শিক্ষা সম্পর্কে প্রতি যত্নবান হতে বলেছেন। কেননা কোন জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছতে হলে, সেই জাতীর শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগ উপযোগী হতে হবে। ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী সবার জন্য আধুনিক শিক্ষা সংকান্ত প্রস্তাব দেন। তিনি নয়াদিগন্ত পত্রিকায় ৭ই ডিসেম্বর ২০২০ চতুর্থ প্রস্তাব এ বলেন যে দশম শ্রেণি শিক্ষা পযর্ন্ত অধ্যয়ন সবার জন্য বাধ্যতামূলক হবে। প্রাইমারি শিক্ষার পাঁচটি শ্রেণি থাকবে। প্রাইমারি স্কুলে চারুকলা, শরীরচর্চা খেলাধুলা ও গানবাজনার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি স্টেট নিজস্ব ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সম্মানীয় মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ জনসেবকদের তথ্য কারিকুলামেও যুক্ত হবে। স্থানীয় পর্যায়ে এসব টেক্সট বই প্রনীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবে।

২০২০ সালে আমরা বড় ধরণের ক্রাইসিস এর মধ্যে পড়ি আমাদের শিক্ষা প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় বাইরে এসে আমাদের শিক্ষা প্রদান এ অংশ গ্রহন করতে হয়। আমাকে অনলাইন শিক্ষা প্রদান এ অংশ গ্রহন করতে হয়ে। আমি অনলাইনে শিক্ষার কথা বলছি। অনলাইন শিক্ষার প্রকৃতির কোন ছোয়া নেই। শিক্ষকের সাথে সহপাঠিদের নিয়ে একই কক্ষে অংশ গ্রহনের সুযোগ নেই। কিন্তু তাই বলে কি শিক্ষা গ্রহন বন্ধ থকবে? আমাদের শিক্ষক সমাজকে ভাবতে হবে কিভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ তৈরী করা যায়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় অংশ গ্রহন করতে হবে। বিষয়বস্তুর সাথে বাস্তব অবস্থার মিল খুজে বের করতে হবে। এমন ভাবে বিষয়বস্তু আলোচনা করতে হবে যে শিক্ষার্থী চোখ বন্ধ করে বিষয়বস্তু দেখতে পায়। শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খোজ নিতে হবে। নতুন নতুন বিষয় এ আগ্রহ তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন সমাজ সেবা মুলক কাজে অংশগ্রহন করতে হবে। দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করতে হবে। মত প্রকাশের সাহস যোগাতে হবে।

প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষা প্রদানের জন্য নারী এবং শিক্ষিত বয়োবৃদ্ধরা শিক্ষক হিসেবে পাঠদানে নিয়োজিত থাকবেন। আমরা পূর্বের দার্শনিকদের চিন্তার সাথে সমন্বয় করে দেখি যে বিষয়টি যর্থার্থ কারণ বয়োবৃদ্ধারা এবং নারীরা ধৈয্য সহকারে বাচ্চাদের আনন্দের সহিত শিক্ষা গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করে। বাচ্চারা দাদু/ নানুর কাছে গল্প শুনতে ভালো বাসে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহন করলে বাচ্চাদের শিক্ষা বাস্তব হবে এবং আমাদের সমাজের বয়োবৃদ্ধারা নিজেরাও আনন্দের সাথে জীবন অতিবাহিত করতে পারবে। সমাজে তাদের অবদান থাকবে। সমাজ অর্থনৈতিক সামাজিক এবং নৈতিক ভাবে লাভবান হবে। ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী তার প্রস্তাবে একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় বলেছেন যেটি হলো সকল হাইস্কুলে ভোকেশনাল শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয় এতে করে যারা ছোটবেলায় খেলনা গাড়ী ভেঙ্গে গাড়ীর যন্ত্রাংশ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসে বাথরুমে পানি জমিয়ে ককসিট দিয়ে খেলনা বানিয়ে দুটো মটর লাগিয়ে ছোট পেন্সিল ব্যটারি দিয়ে কানেকশন দেয়। পাঠকাঠিতে কাগজ লাগিয়ে পাখা বানিয়ে বাতাসের ব্যবস্থা করে তাদের দেখে বোঝা যায় তারা থিউরী পড়ে মুখস্থ করার চেয়ে প্র্যাকটিকাল এ ভালো করবে। কে জানে তাদেও ভেতর থেকে আমরা বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার পেয়ে যেতে পারি। তিনি প্রস্তাবে আরও একটি গুরুপ্তপূর্ন বিষয় বলেছেন যা মানুষকে ছেলে অথবা মেয়ে হিসেবে ভাবার চেয়ে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখাবে। লিঙ্গ সমতার ভাব আমাদের দেশের জন্য অতি প্রয়োজন। এই জ্ঞানের অভাবে প্রতিনিয়ত নারীরা এবং সমাজের কমন জেন্ডার যারা আছে তারা সহ অনেকেই বৈষম্যের চেয়ে অন্যবিষয় অর্থ, ক্ষমতা, স্বার্থ এগুলোর প্রাধান্য অনেক বেড়ে গেছে কাজেই নিজেকে রক্ষার ক্ষেত্রে কৌশল অতি প্রয়োজন। প্রাইমারী স্কুলে বাংলা ও ইংরেজী ভাষার পাশাপাশী অন্যান্য ভাষা শেখা টাও জরুরী। ছোটবেলায় ভাষা শেখতে কম বেগ পেতে হয় কেননা তখন শিশুদের মনে বা ছাপফেলা হয় সেটা খুব দ্রুত গেথে যায়। যেমনঃ জন্মের পর শিশুরা যে দেশে থাকে সেই দেশের ভাষায় অভস্থ হয়ে যায়। বিভিন্ন ভাষা শেখা থাকলে ভবিষ্যতে কর্মস্থলে সহায়তা পাওয়া যায়।

উপসংহার:

দোলনা থেকে শুরু করে কবর পর্যন্ত মানুষ শিক্ষা গ্রহন করে। সেই শিক্ষা হতে হবে সময় উপযোগী, রাষ্ট্র উপযোগী, শিক্ষায় থাকতে হবে মানবিকতা, কল্যান ভাবনা শিক্ষার্থীকে তৈরি করতে হবে মূল্যবোধের আধার। যে শিক্ষা মানুষের মাঝে কোন ভেদাবেদ তৈরি করবে না। কেও নিজের স্বার্থের জন্য অন্যকে ব্যবহার করবে না। মানুষ নিজের সুখের

চেয়ে পরসুখে বিশ্বাসী হবে। সবাই কর্তব্য দ্বারা পরিচালিত হবে। দার্শনিক মিলের উক্তিটি অর্থাৎ সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক সংখ্যক সুখ, সবাই ধারন করবে। তাহলে আমরা আদর্শ রাস্ট্র পেয়ে যাবো। আমাদের দেশ হবে সোনার বাংলাদেশ। শিক্ষা জাগরণের দর্শন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, শিক্ষা কেবল বিদ্যার অর্জন নয়, বরং এটি মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বার্ট্রান্ড রাসেল ও মন্টেসরি'র মত গুণীজনের মতাদর্শ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও মানবিক ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, সুশীল। *শিক্ষাতত্ত্ব ও দর্শন*। ১৯৯৪, কলকাতা।

২. করিম, সরদার ফজলুল। *প্লেটোর রিপাবলিক*। ২০০৭ ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স।

৩. নন্দী, সুধীর কুমার। *রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ* ১ম খণ্ড। ২য় সংখ্যা। (n.d.)

৪. মোহন, মদন। *শিক্ষা ভাবনা: বঙ্গ ভাবনা, রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালি*। ১৯৯৫, জানুয়ারি, কলকাতা: পুস্তক বিপনী।

৫. Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

৬. খালেক, এ. এস. এম. আব্দুল। *ন্যায়পরায়ণতা*। (n.d.)

৭. নয়া দিগন্ত। সংবাদ প্রবন্ধ। *নয়া দিগন্ত*। ২০২০, ৭ ডিসেম্বর।

৮. খালেক, এ. এস. এম. আব্দুল। *সামাজিক ন্যায়বিচার ও জন রলস*। (n.d.)

৯. Russell, B. (1932). *Education and the social order*. London: George Allen & Unwin.

১০. Rousseau, J.-J. (1979). *Émile, or on education*. New York, NY: Basic Books. (Original work published 1762).

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *শিক্ষা*। ১৯৩৩, বিশ্বভারতী প্রকাশন।

১২. Kant, I. (1785). *Groundwork of the metaphysics of morals*.

১৩. Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*.

১৪. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York, NY: Continuum.

১৫. Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. New York, NY: Macmillan.

১৬. Plato. (n.d.). *The Republic*.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 363- 368
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.218

মানবিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বসংস্কৃতি রক্ষার্থে সংস্কৃত-ভাষা: একটি সমীক্ষণ

অভিজিৎ পণ্ডিত, *সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, বেলদা কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Sanskrit is not only an integral part of Indian culture, but also has a profound influence on world culture. World culture refers to a collective identity that transcends national boundaries, promoting shared human values, knowledge, and experiences. Vedas, Upanishads, Puranas, Kavayas, Natakas, Epics as well as the whole Sanskrit Literature has given much importance to human values. The makers of Sanskrit literature have a clear vision about the life which is undisturbed and pious. They know how a man can make his life happy by following human values. Life without human values is meaningless and sinful. That is why the Sanskrit writers have filled their works with human values like truth, charity, service to humanity, self-control, patriotism [Respect towards mother and mother land], respect forwards elderly people, God-fearing nature etc. A lifestyle based on human values makes the society peaceful and corruption-free. Without human values world peace unimaginable. Only the practice of human values can protect humanity from this horror. Without moral values, universal brotherhood, humanism, equality, world peace etc. are unthinkable. The development of a healthy culture in society is possible only through the implementation of the human values described in Sanskrit literature. Today, humanity is terrified by the possibility of world war. Only the practice of human values, which are the root of Indian culture, which originated in Sanskrit, can save humanity from this horror.

Keywords: Sanskrit, Human Values, Culture, Degradation, Morality, Civilization.

'বেদ' কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রথম উপলব্ধ গ্রন্থ। 'বেদ' থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমগ্র ভারতীয় চিন্তাধারা সংস্কৃত সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধের নৈতিক প্রকাশের মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির কল্যাণ সম্ভব। বর্তমান সমাজের অবস্থা বিশৃঙ্খল, সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রচুর দ্বন্দ্ব রয়েছে, পাপ কী এবং পুণ্য কী? নৈতিক কী এবং অনৈতিক কী? কী গ্রহণযোগ্য এবং কী প্রত্যাখ্যান করা উচিত? সত্য কী এবং কী মিথ্যা? এই ধারণাগুলিতে প্রচুর দ্বন্দ্ব রয়েছে, এর কুফল হল আজ সমাজে অপরাধ, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, বেকারত্বের মতো কুফল ছড়িয়ে পড়ছে, এই সমস্যাগুলি সমাজের সুষম বিকাশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে, পাশাপাশি প্রজন্মের মধ্যে আদর্শিক পার্থক্যের জন্ম দিয়ে, সম্পর্কের বন্ধনের মর্যাদা ভেঙে ফেলছে। যদি আমরা বর্তমান সমাজ এবং সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের কথা বলি, তাহলে এটি একটি বিমূর্ত ধারণা। সমাজে এর বিকাশ কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত মানবিক মূল্যবোধের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। প্রাচীন ঋষিরা মানবিক মূল্যবোধের আলোয় সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁরা মহান ধর্মগ্রন্থ সমূহ রচনা করেছিলেন। মানুষ বিবর্তনশীল প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে এই মানবতা পরিবেশগতভাবে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত

হয়েছে। মানবতার এই অনুভূতি মানুষের মূল্যবোধকে বিকশিত করে এবং মানুষ তার নিজের অন্তরে নিজেকে বিকশিত করে অর্থাৎ মানবিক মূল্যবোধ এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক 'অবয়ব' এবং 'অবয়বী' সম্পর্কের মতোই। পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার মধ্যে মূল্যবোধর প্রকাশ নেই। কারণ অজ্ঞতার অন্ধকার যেভাবে জ্ঞান বা বস্তুগত অস্তিত্বকে মিথ্যা হিসেবে প্রতিপন্ন করে ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করে এবং জ্ঞানের প্রকাশের মাধ্যমে অজ্ঞতার ধ্বংস সাধন করে, ঠিক একইভাবে মূল্যবোধও প্রকাশিত হয়। মানুষের দ্বারা সংঘটিত ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, ধর্মীয় সংস্কার, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং শ্রেণী বা জাতিগত বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে সামাজিক সমস্যাগুলিকে এই প্রকাশিত সত্তার পথে বাধা হিসেবে উপস্থিত হয়। বর্তমান সংগ্রামমুখী বৈজ্ঞানিক যুগে মনের নানা উদ্বেগ, উত্তেজনা, ঘৃণা এবং অস্থিরতা প্রকাশিত, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ই এর কারণ তাই আজ এই মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন যে, বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা এবং সভ্যতায় ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণই হল সেই অখণ্ড শৃঙ্খল যা প্রাচীন বিশ্বকে আধুনিক বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করে। সময়ের সাথে সাথে সমাজে মানবিক মূল্যবোধ এবং বৈষম্যকে সামাজিক অবক্ষয়ের একমাত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং এ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করার জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষ মানবতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মানুষ উপলব্ধি করেছে যে মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সামাজিক অবক্ষয়ের মাঝে মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি সুষম পরিবেশ তৈরি করে পরম ব্রহ্মের আলোয় পৃথিবী ও জীবনকে আলোকিত করা। উত্তম ইন্দ্রিয় এবং মন সম্পন্ন ব্যক্তি জীবকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী, অপবিত্রতামুক্ত মন হল মানবিক মূল্যবোধের সংগঠন। মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ধীরে ধীরে পরিবেশগত চেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। লাগামহীন লোভ এবং একে অপরের প্রতি শ্রেণীভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষকে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিকে পরিচালিত করে। ঐশ্বরিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সকলের মধ্যে ভোগ্যপণ্য ভাগ করে নেওয়া যুক্তিযুক্ত, কারণ প্রয়োজনের থেকে বেশি সম্পদের আকাঙ্ক্ষা বা সম্পদ সঞ্চয় মানব সমাজের জন্য উপকারী নয়। এই পৃথিবীকে সুন্দর এবং সুস্থ করে তুলতে মানুষকে ক্রমাগত কাজ করতে হবে। কর্মময় জীবন মানুষকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করে তোলে, ফলস্বরূপ পরিবেশ সুন্দর ও উপকারী হয়ে ওঠে এবং মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষিত হয়, তাই 'ঈশোপনিষদ্' গ্রন্থে বলা হয়েছে–

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনমরং।।[১]
কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোऽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥[২]

'বেদ' হলো ধর্মের ভিত্তি, বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের স্মৃতিশক্তি, মহৎ গুণাবলী এবং বিবেকের সন্তুষ্টি ধর্মের উৎস। এটি সকল ধর্মীয় নীতি ও অনুশীলনের ভিত্তি হিসেবে বেদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। 'পুরুষার্থ-চতুষ্টয়' হলো ধর্ম বা ধার্মিকতা, অর্থ বা সমৃদ্ধি, কাম বা আনন্দ ইচ্ছা এবং মোক্ষ বা মুক্তি। এই 'পুরুষার্থ-চতুষ্টয়' সর্বত্র ধর্মের মূল্যবোধের প্রাধান্যের উপর জোর দেয়, সম্পদের আকাঙ্ক্ষাকে মোটেও প্রত্যাখ্যান করা হয় না, বরং ধর্মের বিপরীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়–

বেদোহখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ।।[৩]

আধুনিক সমাজের দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত, আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধগুলি বহুকাল পূর্ব থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই মূল্যবোধগুলি চারটি বেদে প্রবাদের আকারে সংগৃহীত। আমাদের এমন চিন্তাভাবনা গ্রহণ করা উচিত যা অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি না করে এবং প্রতিদিন দেবতার মতো নিজেদের রক্ষা ও সমৃদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, যেমন ঋগ্বেদে বলা হয়েছে–

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতোऽদব্ধাসো অপরীতাস উদ্ভিদঃ।
দেবা নো যথা সদমিদ্ বৃধে অসন্নপ্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবে দিবে।।[৪]

মহান বা উন্নত চিন্তাধারা যেখানে বা যাদের দ্বারাই বলা হোক না কেন তা সর্বদা গ্রহণযোগ্য এবং মানুষের আন্তরিকতার সাথে তা গ্রহণ করা উচিত। এই গ্রহণযোগ্যতা পুরানো ধারণার পাশাপাশি নতুন ধারণার ক্ষেত্রেও হতে পারে। "ব্রাহ্মণঃ

কোশয়সী মেধয়া পিহিতঃ । শ্রুতম্ মে গোপায়”[৫]– এটি এমন একটি প্রার্থনা যেখানে কেউ ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান ধারণ এবং সংরক্ষণের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। এটি জ্ঞান এবং জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য একটি বৈদিক প্রার্থনা, এবং প্রায়শই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতিবাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি কেবল পালন করা উচিত নয়, বরং অধ্যয়ন এবং প্রচারের মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে আরও উন্নত করা উচিত। বন্ধুত্বের বন্ধন সামাজিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে, যেমনটি আমরা ‘ঋগ্বেদে’ উল্লেখ পাই- ‘ন সঃ সখা যো ন দদাতি সখ্যে’।[৬] দান করা, গ্রহণ করা, গোপনীয়তা প্রকাশ করা, শোনা, খাওয়া এবংখাওয়ানো- এই ছয়টি হল বন্ধুত্বের লক্ষণ

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গৃহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধম্ প্রীতিলক্ষণম্।।[৭]

এটি সুমনের পূর্ণ সহাবস্থানের বার্তা বহন করে, সামাজিক জীবনে সর্বদা একে অপরকে সহযোগিতা করা যা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ বর্তমান জীবন প্রায়শই সংঘর্ষ, ঘৃণা ইত্যাদি দ্বারা জর্জরিত অর্থাৎ সম্প্রীতি, শান্তি এবং প্রেমের মতো মূল্যবোধের অভাব রয়েছে। বেদে তাদের গুরুত্ব সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে আমাদের সকলের উচিত সর্বদা সকলের কল্যাণের জন্য এক মন এবং এক উদ্দেশ্য নিয়ে একসাথে কাজ করা। আমরা সর্বদা সকলের মুখ থেকে সুসংবাদ শুনতে চাই, আমরা সকলের মঙ্গল দেখতে চাই, আমরা কারও ক্ষতির কথা ভাবি না। যজুর্বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃনুয়াম দেবাঃ।
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।।[৮]

সকলেই সুখী হোক, সকলেই রোগমুক্ত হোক, সকলেই অপরের মঙ্গল কামনা করুক এবং কেউ যেন দুঃখ ভোগ না করুক। এটি শান্তি এবং সর্বজনীন মঙ্গল কামনা করে, একই ধারণা ‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ পাওয়া যায়- “ওঁ সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ। সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু। মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥” আমাদের সকলের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব থাকা উচিত–

মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমিক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমিক্ষামহে।।[৯]

বেদের অনেক শ্লোক আমাদের একে অপরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রার্থনা করতে শেখায়, যা সমস্ত জীবের প্রতি সদিচ্ছা এবং করুণা সৃষ্টি করে। যে মন মানুষের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ সেই মন আবার ঘৃণা এবং দ্বন্দ্বের মতো আবেগের মূল উৎস। আমাদের এমনভাবে চিন্তা করা উচিত যাতে মনের মধ্যে সর্বদা শুভ চিন্তাভাবনা আসে। “তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু”[১০]– এটি ‘যজুর্বেদে’র অন্তর্গত ‘শিবসংকল্পসূক্তে’র অংশ যা মনকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং ভালো চিন্তার দিকে পরিচালিত করার জন্য প্রার্থনা করে। এই মন্ত্রটি মনের শক্তিগুলি বোঝার এবং সেগুলিকে সঠিক দিকে পরিচালিত করার উপর জোর দেয়। কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষতার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা উচিত, তবে তা অন্যের কল্যাণ এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা উচিত, যা জীবনে অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি আনবে।

দশতহস্তঃ সমাহারঃ সহস্রহস্তঃ সংকিরহঃ।
কৃতস্য কার্যস্য চ ইহ স্ফাতিং সমাবহঃ।।[১১]

ধর্মীয় পথের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ উপভোগ করা উচিত এবং লক্ষ্মীকে সম্মান করা উচিত, বৈদিক ঋষিরা প্রার্থনা করেন যে পাপের মাধ্যমে অর্জিত সমস্ত সম্পদ অবিলম্বে ধ্বংস করা উচিত- “রমন্তাং পূণ্যা লক্ষ্মীহ্যাঃ পাপীষ্টাঅনীনশম্।”[১২] ‘বেদে’ অনেক উক্তি আছে যা শান্তির মূল উৎস, সকল মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এমন কামনা, যা বেদ ও উপনিষদে সর্বত্র ঘোষিত হয়েছে, তিন ধরণের শান্তি রয়েছে- আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক। মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানবিক মূল্যবোধের অনুশীলনের মাধ্যমে পরম দেবত্বের পথে পৌঁছানো। বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন এবং ঐতিহ্য সত্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন পথ নিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সকলেই একই মৌলিক বৈদিক সত্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ঐক্যের চাবিকাঠি। বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসে ঈশ্বরকে অনেক নামে এবং রূপে ডাকা যেতে পারে, কিন্তু তাদের সকলের পিছনে রয়েছে একমাত্র পরম সত্য। সভ্যতার শুরুতে, যখন মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করত, তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক, হৃদয় ও মনের দিক থেকে তারা একত্রে বসবাস করত–

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদায়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥[১৩]

সংস্কৃত এবং বিশ্বসংস্কৃতি সমাজের দুটি দিক যা আলাদা করা যায় না কারণ সংস্কৃত নিজেই সংস্কৃতির আধার। সংস্কৃতি সৃষ্টিতে যে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা সেই সংস্কৃতির সাথে একটি ব্যাপক সম্পর্ক তৈরি করে। বর্তমান সময়ে ভারতের সনাতন সংস্কৃতির দিক ও অবস্থা এবং এর দ্বারা অনুপ্রাণিত শিক্ষাব্যবস্থা বোঝার পর এটি বিবেচনা করা মূল্যবান হয়ে ওঠে যে বর্তমান সমাজে সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগিতা প্রদর্শনের জন্য সমাজের সামনে সংস্কৃতের বিভিন্ন দিকের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা উচিত যা পাঠকের মনে সংস্কৃতের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রদান করার মাধ্যমে তাকে সংস্কৃত অধ্যয়নের দিকে অনুপ্রাণিত করবে। সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত মানবিক মূল্যবোধের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব–

সা প্রথমা সংস্কৃতির্বিশ্ববারা স প্রথমো বরুণো মিত্রোऽঅগ্নিঃ।[১৪]

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, সংস্কৃতির প্রাণ কেবল সংস্কৃত, এই উক্তিটিই এর খ্যাতির প্রমাণ দেয়–

ভারতস্য প্রতিষ্ঠে দ্বে সংস্কৃতং সংস্কৃতিস্তথা।
বিহায় সংস্কৃতং নাস্তি সংস্কৃতিস্সংস্কৃতাশ্রিতা।।[১৫]

প্রাচীনকাল থেকেই সমাজ গঠনে সংস্কৃত ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্কৃত ভাষার লিখিত প্রমাণ পাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের মধ্যে কোনও না কোনও রূপে সংস্কৃতের অনুভূতি বিদ্যমান। এর অক্ষত অস্তিত্ব ভারতে আঘাত হানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধাক্কার বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে কাজ করেছে। এখন বর্তমান সমাজ একটি নতুন মাত্রার দিকে এগিয়ে চলেছে, তাই এখন সমাজের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ এবং নতুন লক্ষ্য রয়েছে। আসলে, উদ্দেশ্যগুলিতে নতুনত্ব বস্তুবাদের কারণে, মানুষের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, উদ্দেশ্যগুলির আবেগগত প্রকৃতি এখনও স্বাভাবিকভাবেই যেমন থাকা উচিত তেমনই রয়েছে। বর্তমানে, প্রযুক্তি উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে একটি নতুন মাত্রা প্রতিষ্ঠা করছে, যার ফলে প্রতিদিন কিছু না কিছু প্রযুক্তি সমাজকে একটি নতুন উদ্দেশ্যে অভিযোজিত করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো আধুনিক প্রযুক্তি সমাজের অবস্থাকে রূপ দিচ্ছে। ভবিষ্যতে মানব সভ্যতার জন্য এই ধরনের প্রযুক্তির অন্ধ ব্যবহার চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এই প্রক্ষেপিত ধারণার চূড়ান্ত পরিণতি সঠিক সময়ে সঠিক জ্ঞানের সাথে যদি নির্ধারণ না করা হয়, তাহলে এর সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতায়। সংস্কৃতশিক্ষা সৃজনশীলতার এই অভাব দূর করতে এবং এই প্রযুক্তিকে আরও কার্যকর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সংস্কৃত ভাষা কেবল ধর্মীয়, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বরং বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গভীর উপাদানের ভান্ডার। 'বেদে' পাওয়া মানব উৎকর্ষের গভীর ধারণাগুলি জীবনের রহস্যের এক অমূল্য সম্পদ, যা কেবল জীবনযাপনের শিল্পই নয়, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নতুন দ্বারও উন্মোচন করে। ছয়টি ভারতীয় দর্শন হল উৎকৃষ্ট মানবিক মূল্যবোধের মূল বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের ভিত্তি। ন্যায়দর্শন, বৈশেষিকদর্শন, সাংখ্যদর্শন এবং বেদান্তের দর্শনের অভিজ্ঞতামূলক বিশ্লেষণ অতুলনীয় বৌদ্ধিক সম্পদের উৎস, যা উপাদানগুলির অনস্বীকার্য জ্ঞান প্রদান করে এবং প্রচলিত রক্ষণশীল মতাদর্শকে খণ্ডন করে। যোগ মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে এবং একাগ্রতা উন্নত করে, বৌদ্ধিক সাধনায় নিযুক্তদের জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ প্রদান করে। সংস্কৃত ভাষা মানবজাতির স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যোগ, ধ্যানের মতো সংস্কৃত কৌশলগুলি কেবল একজন ব্যক্তিকে জীবনযাপনের শিল্প শেখায় না বরং ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে অগ্রাধিকার দেয় এবং মানসিক শান্তি ও ভারসাম্য প্রদান করে যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে কাজ করে। 'আয়ুর্বেদ' সংস্কৃত ভাষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। চরকের 'চরকসংহিতা', সুশ্রুতের 'সুশ্রুতসংহিতা', বাগ্ভটের 'অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্' ইত্যাদি প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থার মৌলিক গ্রন্থগুলির জ্ঞান সংস্কৃত ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হয়ে উঠছে, অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মতো ধ্বংসাত্মক অনুভূতির জন্ম হচ্ছে, নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং জনগণ দুর্দশাগ্রস্ত। আসলে, এর আসল কারণ কী? অদক্ষ রাজনৈতিক ধারণা, দ্বিচারিতা এবং জনগণের মধ্যে অসন্তোষের অনুভূতি। সংস্কৃত শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি', 'মনুস্মৃতি'র মতো নীতিশাস্ত্রগুলো ব্যক্তিকে শাসনব্যবস্থার জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে

আদর্শ নাগরিক হতে শেখায়। বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ, যেখানে একটি দেশের ব্যক্তিগত অর্থনীতির ভিত্তি হলো বিশ্ববাজারে প্রবেশাধিকার এবং বিশ্ব বাণিজ্যে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, এক দেশের সাথে অন্য দেশের মানসিক বন্ধন জোরদার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ত। বর্তমান সমাজ আত্মকেন্দ্রিক বা একাকী সমাজের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। প্রায়শই দেখা যায় যে আজকাল মানুষের সম্পর্কের মধ্যে সেই মধুরতার অভাব রয়েছে যা একজনের সাথে অন্যজনের মানসিক সমন্বয় সাধন করতে পারে, সম্পর্কের মর্যাদাকে সম্মান করে এবং সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে শক্তিশালী করে। আজ, ব্যক্তির ধারণা পরিবর্তিত হচ্ছে, তাদের মধ্যে সহানুভূতি দুর্বল হওয়ার কারণে, মানসিক স্থিতিশীলতার অভাব অনুভূত হচ্ছে। ফলস্বরূপ, উদ্বেগ, চাপ এবং আত্মহত্যার মতো মনোভাব অপ্রত্যাশিতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এর মূল কারণ হল ব্যক্তির পরিবর্তিত ধারণা এবং জীবনধারা। আজ, আচরণ এবং চিন্তাভাবনার ধরণ পরিবর্তিত হয়েছে। সঠিক শিক্ষাগত এবং সামাজিক নির্দেশনার অভাবে ব্যক্তির একাকীত্ব মারাত্মক শত্রু হয়ে উঠছে। অতএব, সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা কেবল ব্যক্তির সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটিকে সঠিকভাবে লালন করে না বরং একাকীত্বকে সমষ্টিগত অনুভূতিতে রূপান্তরিত করার জন্য অপরিসীম ক্ষমতা প্রদান করে–

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈভ কুটুম্বকম্।।[১৬]
ভাবাভাববিনির্মুক্তং জরামরণবর্জিতম্।
প্রশান্তকলনারম্ভং নীরাগং পদমাশ্রয়।।[১৭]

অতএব বিশ্বায়নের এই যুগে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি অস্থিরতার এমন পরিস্থিতিতে 'বসুধৈভ কুটুম্বকম্'– এমন চেতনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একথা সত্য যে সংস্কৃত ছাড়া ভারতের চিরন্তন সাংস্কৃতিক ধারণা অসম্ভব–

রক্ষিতুং ন চ শক্যন্তে বিনা সংস্কৃতশিক্ষণম্।
সভ্যতাসংস্কৃতির্লোকে ভারতস্য চ শেবধিঃ।।[১৮]

সুতরাং, এটা বলা যেতে পারে যে বর্তমান সমাজে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত অপরিহার্য প্রয়োজন কারণ সংস্কৃত শিক্ষা কেবল আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ.আই.) এবং কৃত্রিম ভাষার বিকাশে বিজ্ঞানীদের দ্বারাও এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও, ভাষাগত দক্ষতা, স্বাস্থ্য দক্ষতা, বৌদ্ধিক সম্পদ, রাজনৈতিক দক্ষতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদির মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল সমাজ তৈরি করে, এমন সংস্কৃত ভাষা বর্তমান সমাজে বিদ্যমান সম্পর্কের তিক্ততা এবং প্রজন্মগত আদর্শিক দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্ব দূর করতে সক্ষম। এই কারণেই জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০– তে সংস্কৃত ভাষার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। বৈজ্ঞানিক চেতনায়, মানুষ পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে সেরা, তাই এই প্রাণীদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব আশা করা যায়। আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেকে একজন প্রগতিশীল, সুবিবেচক, চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে মনে করে, যারা বিশ্বকে শান্তিশৃঙ্খলে রূপান্তরিত করতে পারে কিন্তু সভ্যতার রঙে নিজেকে রাঙিয়ে তুললেও আসল রঙ ম্লান হয়ে গেছে, পরিবেশ দূষিত হয়েছে, যা মূল্যহীনতার দূষণ, মানবিক মূল্যবোধের দূষণ। যা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে। মানবিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে জীবনধারা, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং জাতিকে সুস্থ, শান্তিপূর্ণ, উজ্জ্বল এবং দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। মানবিক মূল্যবোধ ছাড়া, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, মানবতাবাদ, সাম্য, মানবাধিকার, প্রেম, ত্যাগ, বিশ্ব শান্তি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বন্ধুত্ব অকল্পনীয়। আজ মানবতা বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত। কেবলমাত্র মানবিক মূল্যবোধের চর্চাই মানবতাকে এই ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে পারে, যা সংস্কৃতজাত ভারতীয় সংস্কৃতির মূল।

তথ্যসূত্র:

১. ঈশোপনিষদ্, মন্ত্র-১।
২. ঈশোপনিষদ্, মন্ত্র-২।
৩. মনুস্মৃতি, ২.৬।
৪. ঋগ্বেদ, ১.৮৯.১।
৫. তৈত্তিরিয়োপনিষদ্, শিক্ষাবল্লী, মন্ত্র-১।

৬. ঋগ্বেদ, ১০.১১৭.৪।
৭. পঞ্চতন্ত্রম্, ২.৫১।
৮. যজুর্বেদ, ২৫.২১।
৯. যজুর্বেদ, ৩৬.১৮।
১০. যজুর্বেদ,শিবশংকল্পসূক্ত।
১১. অথর্ববেদ, ৩.২৪.৫।
১২. অথর্ববেদ, ৭.১১৫.৪।
১৩. ঋগ্বেদ, ১০.১৯১.৪।
১৪. যজুর্বেদ, ৭.১৪।
১৫. সংস্কৃত সাহিত্যে।
১৬. মহোপনিষত্, ৬.৭১।
১৭. মহোপনিষত্, ৬. ৭২।
১৮. ড. হরিনারায়ণ দীক্ষিত, ভারতমাতা ব্রূতে, ৯.৮৪।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. সেন, অতুলচন্দ্র এবং তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ এবং ঘোষ, মহেষচন্দ্র। উপনিষদ্ অখণ্ড সংস্করণ। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-০৭, ১৯৭২।
২. গম্ভীরানন্দ, স্বামী। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৩।
৩. বসু, যোগিরাজ। বেদের পরিচয়। ফার্মা কে এল্ এম্ প্রা. লি., কলকাতা, ২০১৫।
৪. ঋগ্বেদ সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড)। হারফ প্রকাশন। কলকাতা-০৭।
৫. গোস্বামী, বিজনবিহারী। অথর্ববেদ। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-০৭, ১৯৭৮।
৬. ভট্টাচার্য, সুকুমারী। ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১।
৭. বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু। মনুসংহিতা। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১২।
৮. দীক্ষিত, ড. হরিনারায়ণ। ভারতমাতা ব্রূতে। ইস্টার্ন বুক লিংকার্স, নিউ চন্দ্রাবল জওহর নগর, দিল্লি, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩।
৯. বেদ.কম্। https://share.google/0HY0mMJMsHl63JODO
১০. হট্টঙ্গডি, সুন্দের, মহোপনিষত্। https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/maha.pdf

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 369- 382
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.219

হিন্দু ও ইসলামের ধর্মীয় শাস্ত্রে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দর্শন

সান্তনা রানী সামন্ত, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
আশাদুজ্জামান খান, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 03.11.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research article analyses women's issues, roles, and social perceptions in Hinduism and Islam in the light of feminist philosophy. The treatment of women in ancient social institutions in religious rituals, scriptures, and myths is not merely a matter of religious discipline, but also a reflection of power dynamics between men and women in society. By exploring Hindu texts such as the Vedas, Upanishads, Manu smriti, Ramayana, Mahabharata etc. and on the other hand, the primary sources of Islam, especially the Qur'an and Hadith, the study reveals how women were once glorified as symbols of power, motherhood, and respect but over time, their roles became confined to a secondary within society. The main purpose of this study is to assess the influence of a patriarchal worldview on the determination of women's status in the scriptures and religious practices of two religions and to reread this position from the perspective of feminist philosophy. The primary goal of this research is to assess how patriarchal mindsets influenced women's status in both religions and to reconsider these roles through a feminist lens. The study employed analytical and comparative approaches to achieve this. The work is limited to selected religious contexts and verses. From a feminist view, there is a contradiction: religion often respects women, but at the same time, limits their freedom in social and personal life.

However, with the emergence of contemporary feminist thought and human rights consciousness, there is an urgent need to reconsider and reconstruct this position. Therefore, the importance of this study lies in its attempt to reassess the position of women in religious and social contexts, which may make future discussions about religion, culture, and gender equality deeper and more realistic. There is no fundamental contradiction between religious principles and feminist philosophy. Rather, it is the social and historical interpretations that have produced these inequalities. Therefore, only by rereading religious interpretations and combining them with modern feminist consciousness is it possible to establish true women's freedom and fair equality in society. In conclusion, the study asserts that there is no fundamental contradiction between religious principles and feminist philosophy. The inequalities observed today stem from social and historical interpretations rather than the religions themselves. Therefore, only by reinterpreting

religious concepts and combining them with modern feminist consciousness is it possible to establish true women's freedom and fair equality in society.

Keywords: Religion, Hinduism, Islam, Gender inequality, Feminist philosophy

"... কোন কালে একা হয়নি ক জয়ী পুরুষের তরবারী /প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষী নারী।..."

-কাজী নজরুল ইসলাম।

সাম্যবাদী কবি নজরুল ইসলামের বাস্তববাদী মনন শীলতার উপর ভর করে স্মরণ করতেই হবে যে ধরিত্রীর বুকে সকল মহান সৃষ্টির অর্ধেক কারিগর পুরুষ এবং অর্ধেক কারিগর রমণী। আবার এই বিশ্বের সকল পাপ ও অমঙ্গলের কারণও পুরুষ রমণী উভয়ই। তাই কালের ধারাকে অনুসরণ করে পুরুষ যদি আজও নারীকে বন্দী করে রাখতে চাই তাহলে যুগের ধর্মে পুরুষ জাতিকেও বন্দী হতে হবে এক অন্ধকারচ্ছন্ন সামাজিক কারাগারে। তাই কবির ছন্দে আওয়াজ মিলিয়ে বহু নারীর দীপ্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে- ঘোমটার আড়াল উন্মুক্ত করে অসাম্যের বন্ধন তারা ভাঙবেই। বিশ্বব্যাপী সমাজের বুকে লিঙ্গ বৈষম্য গত সমস্যাটি দীর্ঘকালীন গভীর উদ্বেগের বিষয়। ধর্মীয় ঐতিহ্য ও প্রথা গুলি সামাজিক নিয়ম ও মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের বুক থেকে নারী নিপীড়ন এবং নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কে উৎখাত করে তাদের সার্বিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান তথা ক্ষমতায়নের পক্ষে নারীবাদীরা একটি আদর্শায়িত আন্দোলন সংগঠিত করে। এই গবেষণা নিবন্ধে এটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে যে কিভাবে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ মানবতাবাদ, প্রকৃতিবাদ এবং সামগ্রিকভাবে ধার্মিকতার প্রেক্ষাপটে নৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে বর্ণনা করে। নারীবাদী আদর্শের আতশ কাঁচে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে লিঙ্গত্বের জটিল জালে নারীদের জীবন পরিসরকে উন্মোচন করায় হল এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। ধর্ম, লিঙ্গ ও সমাজ এর জটিল আবর্ত প্রসঙ্গে আমাদের জ্ঞানের গভীরতাকে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করার সম্ভাবনার মধ্যেই এই অধ্যয়নের তাৎপর্য নিহিত আছে।

গবেষণার ব্যবধান (Research Gap):

হিন্দু এবং ইসলামের ধর্মীয় অনুশীলনে লিঙ্গ পক্ষপাত পরীক্ষা সংক্রান্ত সাহিত্য বিদ্যমান সত্ত্বেও, একটি উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে যা আরও তদন্তের প্রয়োজন। বিশেষত, ধর্মীয় অনুশীলনের প্রেক্ষাপটে নারীদের লিঙ্গ পক্ষপাত সম্পর্কিত আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্ক তথা নারীবাদী ও ধর্মীয় দর্শনেরর মধ্যে আন্তঃ বিভাগীয় (Inter disciplinary) দৃষ্টিভঙ্গি নীর্ভর সীমিত গবেষণা বিদ্যমান।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

- হিন্দু ও ইসলাম মহিলাদের জীবনযাত্রার উপর ধর্মীয় গ্রন্থের বিধান, ধর্মীয় প্রথা এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব অন্বেষণ।
- হিন্দু ও ইসলাম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থ ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার মধ্যে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করা ও তা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা।
- দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মীয় বহুত্ববাদের মধ্যে নারীবাদী আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা।

গবেষণা পদ্ধতি (Research methodology):

এই গবেষণাটি সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী। বিশ্লেষণাত্মক এবং বর্ণনাত্মক এই দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণায় ধর্মীয় শাস্ত্রের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদকে প্রাথমিক তথ্যের [প্রধান উল্লেখযোগ্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থ: (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita : English Translation*, 1909; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) এবং প্রধান উল্লেখযোগ্য মুসলিম ধর্মগ্রন্থ: (*The Holy Quran (Bengali Translation)*, 2022; *The Holy Quran (Translated in English)*, 2022)] এবং প্রাসঙ্গিক বই, জার্নাল, নিবন্ধ, সংবাদপত্র, সমালোচনামূলক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ সম্পর্কিত প্রকাশনা এবং ওয়েবসাইটগুলি গৌণ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দার্শনিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে নির্বাচিত ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ও আয়াত বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে, কীভাবে ধর্মীয় অনুশীলনে নারী-পুরুষের মধ্যে পক্ষপাত তৈরি হয়েছে। এই গবেষণার নকশা দার্শনিক দৃষ্টিকোণের উপর ভিত্তি করে। কাজটি কেবল নির্বাচিত ধর্মীয় প্রেক্ষাপট, মন্ত্র, শ্লোক তথা আয়াত গুলির মধ্যে

সীমাবদ্ধ রয়েছে যেগুলি উভয় ধর্মের মহিলাদের মর্যাদার উপর বিভিন্ন ভাবে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গবেষণার সমস্যাটি একটি আন্তঃবিভাগীয় (Inter disciplinary) দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করে।

বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা (Analysis and interpretations):

নারী সত্ত্বার মর্যাদা, নারীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধিকার, লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যের নির্দেশনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের উপস্থাপনা বিশ্লেষণ করে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য থেকে নারীবাদী দর্শনের নির্যাস অন্বেষণ করা এই অধ্যায়নের আবিষ্কার ধর্মী উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম নারীবাদ শব্দটির উৎপত্তি, সংজ্ঞা, বিভিন্ন নারীবাদী ধারণা তথা নারীবাদী আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো। সর্বোপরি হিন্দু ও মুসলিম ধর্মে প্রতিফলিত নিরীবাদ ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষিত হলো।

নারীবাদের দর্শন (Philosophy of feminism):

নারীবাদ কোনো নির্দিষ্ট ধারণা, তত্ত্ব বা নারীদের নিয়ে সাজানো কোনো নিয়মিত বক্তব্য নয়, বরং এটি এমন এক উপায়, যার মাধ্যমে কিছু নারী নিজেদের বাস্তব জীবনের অবস্থান নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের নারীত্বের অবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে (Thompson, 1994)। বন্দনা চ্যাটার্জির লেখা Women and politics in India গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত নারীবাদের একটি প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা হলো- 'নারীবাদ বলতে বোঝায় একটি শক্তি যা নারীদেরকে আত্মসচেতন সামাজিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত করেছে' ("Feminism is the force which has transformed women into self-conscious social category") (K. K. Sarkar, 2018)। অপর এক নারীবাদী লেখিকা রাজশ্রী বসুর মতে- 'নারীবাদ এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তাত্ত্বিক চিন্তা, দার্শনিক মতবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলন সমান্তরালভাবে নারীবাদ কে সমৃদ্ধ করেছে; একে অপরের সম্পূরক হিসেবে নারীবাদকে পথ প্রদর্শন করেছে' (Basu, 2012)।

সপ্তদশ শতক থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং যুক্তিশীল চেতনার প্রসারের মধ্য দিয়ে ইউরোপে আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষ ধীরে ধীরে নিজের কর্মদক্ষতা ও বিচারবুদ্ধির উপর আস্থাশীল হতে থাকে। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অন্ধত্ব ও কুসংস্কার থেকে মানুষ অনেকটা মুক্ত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীদের সার্বিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস কে সামনে রেখে নারী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৭০৬ সালে মেরি অ্যাস্টেলের (Mary Astell) এর লেখা Some Reflection upon Marriage গ্রন্থে নারীবাদী চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। এই গ্রন্থে তিনি সনাতনী চিন্তার বিপরীতে গিয়ে লেখেন 'If all men are born free how is it that all women are born slaves'। বর্তমানে মেরি অ্যাস্টেলকে আধুনিক নারীবাদী চিন্তার প্রবর্তক হিসেবে অনেকে মনে করেন। ১৭৬০ সালে শিল্প বিপ্লবের ফলে নারীরা শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হলেও, তারা বেশি সময় কাজ করা সত্ত্বেও পুরুষের তুলনায় কম পারিশ্রমিক পেতো। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্রিটেনে এবং পরবর্তী সময় আমেরিকায় মহিলারা ন্যায্য অধিকারের দাবিতে সংঘটিত হতে থাকে। ১৭৭৬ সালের মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাধীনতা ও সাম্যবাদী চিন্তার বিকাশ কে ত্বরান্বিত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে ১৭৮৯ সালে সংগঠিত ফরাসি বিপ্লব উদারনীতিবাদী চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করে। ফ্রান্সের গণপরিষদে ১৭৮৯ সালে Declaration of the Rights of Man and Citizen গৃহীত হয় যার মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি অধিকার কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পশ্চিম দেশ গুলিতে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নারীদের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা গুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং উক্ত সমস্যা গুলি থেকে মুক্তি লাভের তথা দাবী দেওয়া আদায়ের জন্য সক্রিয় প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে অলিম্পে দ্যা গজ (Olympe de Gouges) এর লেখা Declaration of the Right of Women গ্রন্থে নারীদের ন্যায্য অধিকারের দাবি উপস্থাপিত হয়। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ বৃটেনের দার্শনিক তথা প্রখ্যাত নারীবাদী মেরি ওলস্টোন ক্রাফ্ট (Mary Wollstonecraft) এর লেখা A Vindication of the right of Women গ্রন্থে নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়াস উপস্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে নারীবাদী আন্দোলনে বিভিন্ন দাবি দাওয়ার সঙ্গে ভোটাধিকার ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের অধিকার এই দুটি বিষয় গুরুত্ব পায়। ১৮৩২ সালে বৃটেনের সংস্কার আইনে প্রতি ছয় জন পুরুষের

একজনকে ভোটাধিকার দেওয়া হলেও নারীদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে---- প্রভৃতি নারী সংগঠনগুলি আন্দোলনে লিপ্ত হয়। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১৯-২০ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে Seneca Falls convention অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলনকে পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলনের ভিত্তি বলে চিহ্নিত করা হয় (Apetrei, 2010; Astell, 2015)।

১৯৭০ সাল থেকে নারী আন্দোলনের একটা স্বতন্ত্র দার্শনিক ভিত্তি বিকাশ লাভ করে যা New wave of feminism নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার শৃংখলে নারীদের স্বাধিকারের দাবি গুলি বিদেশি শাসকের কাছে অবহেলিত হয়েছে। ব্রিটিশরা তার প্রশাসনিক কাজের স্বার্থে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষে চালু করেছিল সেই শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ তৎকালীন ভারতীয় মহিলাদের নিকট প্রায় অধরা ছিল। তথাপি স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় নারীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যে দেশপ্রেমের নিদর্শন রচনা করে সেই ইতিহাস স্বাধীনোত্তর পরবর্তী সময়ে নারীবাদী আন্দোলনের রসদ প্রদান করে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই (Chaudhuri, 2015; Maitra, 2003)। সুতরাং উনিশ শতকের সত্তরের দশকে নারীবাদী আন্দোলনের জোয়ার গোটা বিশ্বে প্রভাব ফেলে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা নারীবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও নৈতিক বিচার বিবেচনার মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠা নারীবাদী দর্শনকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। নারীবাদের উল্লেখযোগ্য ধারণা গুলি নিম্নে আলোচিত হলো।

উদারনৈতিক নারীবাদ (Liberal Feminism):

উদারনৈতিক নারীবাদ এর অন্যতম স্রষ্টা হলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তার রচিত দুটি বই হল- The subjection of women এবং Liberty। এই দুটি বইয়ের মধ্যে তিনি নারীদের জন্য পুরুষের সমতুল্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উদারনৈতিক নারী বাদের মূল কথা হলো সমাজের বুকে নারীরা আবহমানকাল জুড়ে লিঙ্গ বৈষম্যের স্বীকার হয়ে চলেছে এবং এই শৃঙ্খল থেকে নারীদেরকে মুক্ত করার জন্য তাদের নাগরিক অধিকার তথা মানবাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। উদারনৈতিক নারীবাদীরা মনে করেন- আমাদের Sex identity এবং Gender identity এই দুটি পরিচয়ের থেকেও মানুষ হিসেবে আমাদের পরিচিতির ব্যাপকতা অনেক বেশি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে Liberalism বা উদারতাবাদ বলতে বোঝানো হয় স্বতন্ত্র বাদ বা individualism কে। সুতরাং ব্যক্তির স্বতন্ত্র্য সত্তা অটুট রাখার গুরু দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। তাই সমাজ তথা রাষ্ট্রকে পরিচালনার জন্য যে বিধি নিদান বা আইন তৈরি করা হয় তা নিরপেক্ষ ও মানবিক হবে, কোনরকম বৈষম্য দোষে দুষ্ট হবে না। উদারপন্থী নারীবাদীরা ধর্ম-বর্ণ, জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে ন্যায়সঙ্গত বিধি নিয়মের (Principal of justice) পক্ষে মত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক দেকার্তের অধিবিদ্যা গত ধারণার প্রভাব লক্ষণীয়। দেকার্তের অধিবিদ্যায় দুটি পদার্থ স্বীকার্য, যথা- মন (mind) এবং বস্তু (matter)। তাই লিঙ্গ পরিচয় ও দৈহিক প্রকাশ ক্রোমোজোম ও হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও মানুষের মন নিয়ন্ত্রিত হয় যুক্তির দ্বারা। আর এই রূপ যুক্তি লব্ধ নৈতিক আদর্শ থেকে তৈরি হয় লিঙ্গ নিরপেক্ষ আচার-আচরণ, বিধি নির্দেশ, তথা সংস্কৃতি। তাই জন্মসূত্রে কখনো পুরুষ ও নারীর আদর্শ আচরণ ব্যক্তির মধ্যে প্রথিত হতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনকারী রাজনৈতিক দলগুলির আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়। David Bouchier নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে কতগুলি মূলগত দিক উল্লেখ করেন, যেমন- তাদের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা, রাজনীতি ও সাংবাদিকতায় নারীদের অনুপ্রবেশ ঘটানো, সম কাজে সম বেতন এর অধিকার নিশ্চিত করা সর্বোপরি প্রাত্যহিক দাবি-দাওয়া গুলি পূরণের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে ১৯৬৬ সালে আমেরিকায় লিবারাল নারী বাদীর আদর্শে গঠিত National organisation for women (NOW) তৎকালীন রিপাবলিক এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির কাছে নারীদের সমান অধিকার প্রসঙ্গে এইরূপ আট দফা দাবি পেশ করেন (Maitra, 2003; Mariana, 2006; M. M. Rahman, 2021)।

বৈপ্লবিক নারীবাদ (Radical feminism):

১৯৪৯ সালে ফরাসি নারীবাদী লেখক Simone de Beauvoir- এর লেখা The Second Sex গ্রন্থটির প্রভাব পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা বৈপ্লবিক নারীবাদে প্রতিফলিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন নারীদের স্বার্থ বিরোধী আইন কানুন প্রণয়নের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোত থেকে আলাদা করে রাখা হয়। সমাজে পুরুষালি বৈশিষ্ট্য গুলিকে অধিক প্রাধান্য দেওয়ার সাথে সাথে নারী সত্তাকে পুরুষত্বের অপর বা Other হিসাবে বিবেচনা করে প্রান্তিকীকরণ করা হয়। বোভোয়ারের এই ধারণা 'অপরত্ব' বা 'Otherness' নামে পরিচিত। ১৯৬০-এর দশক থেকে বৈপ্লবিক নারীবাদী তত্ত্ব তথা আন্দোলন পরিব্যপ্ত হতে থাকে। Jene Genet, Germaine Greer প্রমুখ নারীবাদী সাহিত্যিক মনে করেন ধর্ম, সংস্কৃতি তথা নৈতিকতার মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক আস্ফালন নারীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশকে অবরুদ্ধ করে এবং ছোটবেলা থেকেই নারী মনে নেতিবাচক চিন্তার বীজ বপন করে। Kate Millett, ১৯৬৯ সালে লেখা Sexual Politics গ্রন্থে উল্লেখ করেন- ব্যক্তিগত পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক খেলা চলে। এই ধারণাকে তিনি 'Personal is political' বলে ব্যাখ্যা করেন। এই ধারণা অনুসারে পুরুষেরাই হলো নারীদের প্রধান প্রতিপক্ষ। পুরুষদের নারীদের প্রতি নিপীড়নমূলক আগ্রাসী মানসিকতা এবং নারীর প্রতি শক্তি প্রদর্শনের প্রকট বা প্রচ্ছন্ন বাসনা থেকেই নারীরা পরাধীন জীবন যাপনে বাধ্য হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৬ সালে Susan Brown Miller তার লেখা গ্রন্থে উল্লেখ করেন- 'ধর্ষণ ক্ষমতার বলেই পুরুষ নারীকে ভীত করে রাখে এবং নিয়ন্ত্রন করে'। বৈপ্লবিক নারীবাদী সমর্থকরা মনে করেন- পুরুষের সঙ্গে প্রচলিত বৈবাহিক সম্পর্কের শৃঙ্খল নারীরা ছিন্ন করতে পারলে এবং স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্টিত করতে পারলে তবেই নারীদের স্বাধীনতা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হব। বৈপ্লবিক নারীবাদের আবার দুটি ধারা লক্ষনীয়, যথা- স্বাধীনতাকামী নারীবাদ এবং সাংস্কৃতিক নারীবাদ। স্বাধীনতাকামী নারীবাদে বলা হয়- নারীরা তার প্রাকৃতিক জৈবিক গুণাবলী পরিত্যাগ করে পুরুষালি গুণাবলী গ্রহণ করবে। এর ফলে সমাজে নারীদের সম্পর্কে যে Stereotype তৈরি হয়েছে সেগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হবে। নারীবাদী দর্শনে এটা Androgyny ধারণা নামে পরিচিত। অপরপক্ষে বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক নারীবাদে নারীর নিজস্ব গুণাবলী ও স্বকীয়তা যা পুরুষের থেকে ভিন্ন সেগুলি পূর্ণমাত্রায় অর্জন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এইরূপ Feminization of culture এর অন্যতম প্রবক্তা হলেন মার্গারেট ফুলার। এই ধারণা অনুসারে পুরুষের প্রতিযোগিতামূলক, অনমনীয় স্বভাবের তুলনায় নারীদের সহানুভূতিশীল, শান্ত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য গুলি সংরক্ষণের মাধ্যমে নারীদের প্রকৃত মূল্যবোধের স্বতন্ত্র্যতা সুদৃঢ় হবে (Basu, 2012; Maitra, 2003)।

মার্ক্সিয় নারীবাদ (Marxian feminism):

রাশিয়ার আলেকজান্দ্রা কোলোন্তাই (Alexandra Kollantai; 1872-1992), জার্মানের রোসা লুক্সেমবার্গ (Rosa Luxemburg; 1871-1919) এবং ক্লারা জেটকিন (Clara Zetkin; 1857-1993) প্রমুখ নারীবাদী তাত্ত্বিকগণ মার্কসীয় শ্রেণি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এই নারীবাদী ধারণা গড়ে তোলেন। মার্কস তার জীবনের শেষ পর্যায়ে Ethnological Notebooks রচনা করেন, যেখানে তিনি ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিতে নারীর উপরে পুরুষের অবদমন বিষয়টি আলোচনা করেন। পরবর্তী সময়ে এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে এঙ্গেলস The origin of family private property and state রচনা করেন। এই মতবাদ অনুসারে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গতানুগতিক ধারণায়, পুরুষের চেতনায় নারীরা পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। বস্তুগত উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে যেমন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, ঠিক একই ভাবে সুগৃহিনী তথা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র স্বরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে নারী সত্তা অবগুণ্ঠিত ও অবহেলিত হয়ে এসেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে নারীরা। এইরূপ ধারণার চিরাচরিত আবর্তে নারীদের প্রতি লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য সমাজের বুকে যুগে যুগে প্রকট হয়ে ওঠে। তাই মার্কসীয় নারীবাদের মূল কথা হলো ব্যক্তি মালিকানাধীন পারিবারিক সংকীর্ণতা থেকে নারীদেরকে মুক্ত করতে হবে এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নারীদেরকে অবাধে কাজ করার সুযোগ প্রদান করতে হবে। ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার অবসান হলে এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে উৎপাদনের সমবন্টন হলে যেমন শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বিলুপ্তি হবে, ঠিক একইভাবে সমাজ জীবনে নারীর কর্ম ও বৌদ্ধিক ক্ষমতা দ্বারা সমাজ দেশ ও জাতি উপকৃত হলে

লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণি বৈষম্য দূর হবে।মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে বাদ ও বিবাদের মিথস্ক্রিয়ার (Dialectical contradiction) মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আসে। সমাজের বুকে রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা তথা ক্ষমতার ভিত্তি হল উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার বন্টন। এইগুলির মধ্যে নিহিত দ্বন্দ্ব থেকেই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এক উন্নততর সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গ সাম্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে (Armstrong, 2002; Basu, 2012; Nari O Communism: Marx Theke Mao, [Women And Communism: From Marx To Mao, Edited by Harry Politt], 2022)।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist Feminism):

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ হলো রেডিয়াল এবং মার্কসিয়ান নারীবাদ এর মিথস্ক্রিয়া লব্ধ একটি ধারণা। এর সমর্থকরা মনে করেন- ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণি বিভক্ত সামাজিক কাঠামোর আগ্রাসন এবং নারী পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের চিরাচরিত সংকীর্ণতা এই দুইয়ের আবর্ত থেকে নারীরা মুক্ত হলে তবেই পিতৃতন্ত্রের বিলুপ্তি সম্ভব এবং জৈবিক লিঙ্গ বৈষম্যের উর্ধ্বে থেকে সামাজিক লিঙ্গ সমতা প্রদান সম্ভব হবে (Armstrong, 2002)।

পরিবেশবাদী নারীবাদ (Ecofeminism):

Ecofeminism শব্দটি ১৯৭৪ সালে ফরাসী লেখক Francoise d' Eaubonne প্রথম ব্যবহার করেন। নারীবাদের এই ধারণা অনুসারে প্রকৃতি এবং নারী উভয়ের উপর যে শোষণ ও নিপীড়ন চলে তার কারণ হিসেবে একটি সাধারণ আগ্রাসী পিতৃতান্ত্রিক মনস্তত্ত্বকে দায়ী করা হয়। পরিবেশবাদী নারীবাদীরা এইভাবে পরিবেশের মধ্যে বর্তমান সকল জীবজ ও অজীবজ উপাদানের প্রতি সহমর্মিতা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। অন্যতম একজন ভারতীয় পরিবেশবাদী ও নারীবাদী বন্দনা শিবা (Vandana Shiva) উল্লেখ করেন যে বিজ্ঞান, শিল্প তথা যন্ত্রসভ্যতার পীড়নে পরিবেশ যেমন ভারসাম্য হারাচ্ছ, একইভাবে নারীদের প্রান্তিকীকরণের ফলে সমাজ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। তাই নারীবাদের এই ধারায় মনে করা হয়- স্থিতিশীল সবুজ পরিবেশ এবং সুসংহত সমাজ ব্যবস্থার একটি যুগপৎ তত্ত্বের মতাদর্শে লিঙ্গসাম্যতার পুনঃনির্মাণ সম্ভব (Basu, 20 12; Glazebrook, 2002; Shiva, 2002)।

বিনির্মাণকারী নারীবাদ (Deconstructionist Feminism):

ফরাসি দার্শনিক Jacques Derrida- এর মতে ভাষা স্থিতিশীল নয়, ভাষার লক্ষণ ও প্রতীক সমূহের ক্রমাগত বিবর্তনের মাধ্যমে ভাষা বিকশিত হয় ('Language is not fixed and stable but rather is a constantly shifting and evolving system of signs and symbols'.)। একইভাবে বিনির্মাণকারী নারীবাদীরা মনে করেন লিঙ্গগত ধারণা একটি সামাজিক গঠন যা সাংস্কৃতিক অনুশীলন লব্ধ এবং ভাষার মিথস্ক্রিয়ায় নির্মিত। সুতরাং লিঙ্গগত ধারণা স্থির বা স্থিতিশীল নয়। Martha Minow, Carol Bacchi প্রমুখ বিনির্মাণকারী নারীবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে নারীদের জন্য কোন বিশেষ অধিকার প্রদান করার অর্থ হল নারী ও পুরুষের পৃথক সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করা। তাই এই মতবাদে- সম পরিস্থিতিতে সমানাধিকার (Same right within same situation) এর কথা উপস্থাপন করা হয়। বিনির্মাণকারীরা চিন্তা লব্ধ উপযোগী গণতান্ত্রিকরণকে বিনির্মাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। নারীবাদ এর এই ধারায় মনে করা হয় যে পুরুষ ও মহিলার বাইনারি ধারণাকে দূরে সরিয়ে একটি বিকল্প লিঙ্গ পরিচয় পুনর্গঠনের মাধ্যমে নারী পুরুষের সীমারেখার অবলুপ্তি ঘটানো সম্ভব। ১৯৯০ সালে Making all the difference গ্রন্থে মারথা মিনো উল্লেখ করেন যে সকলকে পরিস্থিতি ভিত্তিক উপযোগী অধিকার প্রদান করতে হবে অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ অধিকার প্রদান করা হলে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সর্বোপরি লিঙ্গ সাম্যতা ও অসাম্যতার মধ্যে যে সীমানা তা আসলে কৃত্রিমভাবে নির্মিত এবং এইরূপ সীমানা বর্জন করা উচিত। যে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় গঠন লিঙ্গ পরিচয় কে রূপদান করে সেই ঐতিহ্যগত অনুমান ও অর্থকে বিনির্মাণ ও চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে লিঙ্গ পরিচয় পুনর্গঠন সম্ভব (Elam, 2000; Maitra, 2003)।

হিন্দুধর্মে প্রতিফলিত নারীবাদ (Feminism reflected in Hinduism):

বেদের জ্ঞানকাণ্ডে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১/৪/৩ ('স বৈনৈব রেমে তস্মাদেকাকীন রমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতরত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদ মর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এবং তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত")

(Vedantaratna & Tattvabhushan, 1928)- থেকে পাওয়া যায় জনশূন্য পৃথিবীতে ঈশ্বর নিজেকে ছাড়া দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেন। যিনি লিঙ্গগত ভাবে উভকাম (Sexually bipotential) শক্তির ধারক। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের স্বয়ী শক্তিকে দ্বি বিভক্ত করে পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেন যারা পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। মনুসংহিতা ১/৩২ ("দ্বিধা কৃত্বাত্মননা দেহমর্ধেন পুরুষোহভবৎ। অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ") (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) থেকে পাওয়া যায় যে প্রভু প্রজাপতি আপন শক্তিকে দ্বি বিভক্ত করে নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেন। সুতরাং পৃথিবীর বুকে নারী-পুরুষ সৃষ্টি সম্পর্কিত হিন্দু পুরা কথায়- নারী সত্তার সৃষ্টিতে পুরুষ সত্তার আধিপত্য অথবা পুরুষ সত্তার সৃষ্টিতে নারী সত্তার আধিপত্য এমন বৈষম্য মূলক আস্ফালন প্রতীয়মান হয় না।

হিন্দু ধর্মে মনুসংহিতার ৯/২৬ ('প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন') (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) শ্লোকে মাকে দেবী হিসাবে বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে নারীর মাতৃত্বকে সম্মান জানানো হয়। সুতরাং Feminization of Culture এই ধারণা অনুসারে নারী নিজের মাতৃত্বের প্রকৃতির জন্য এবং মাতৃত্বের মূল্যবোধ সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই নারী স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। প্রকৃতি যেমন ফুল ফলে সজ্জিত হয়ে ওঠে একইভাবে মাতৃত্ব হেতু নারীর সংসারে উপস্থিতিতে গৃহ আলোকিত হয়ে ওঠে। মা হিসাবে একজন নারীর মমত্ববোধ, সহনশীলতা, নমনীয়তা প্রভৃতি Stereotype গুলি হল নারীর প্রকৃতি জাত স্বকীয়তা এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব গুণাবলী। বৈপ্লবিক নারীবাদ এর একটি ধারা হল সাংস্কৃতিক নারীবাদ যারা নারীর এই বৈশিষ্ট্য গুলি সংরক্ষণ ও সুদৃঢ় করার পক্ষে। সুতরাং গৃহলক্ষী হিসাবে মায়ের উপস্থিতিতে সংসারের কল্যাণ সাধন- এমন ধর্মীয় অভিব্যক্তি স্বাধীনকামী নারীবাদীদের দ্বারা সমালোচিত হলেও সাংস্কৃতিক নারীবাদীদের মতে তা নারীর স্বতন্ত্রতা রক্ষায় গ্রহণযোগ্য। আবার মনুসংহিতার ৩/১১৪ ('সুবাসিনীঃ কুমারাংশ রোগিণেণ গর্ভিণীন্তখা। অতিথিত্যোহগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ম্') (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) শ্লোকে গর্ভবতী মহিলাদের প্রসঙ্গে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়। এমন নির্দেশ জীববিজ্ঞান সম্মত বিশেষ শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও যত্নবান হওয়ার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকৃতি দেয়। এক্ষেত্রে বিনির্মাণকারী নারীবাদীদের পরিস্থিতি ভিত্তিক উপযোগী অধিকার প্রদান এর দাবি ধর্মীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনুসংহিতার ৮/২৭৫ ('মাতরং পিতরং জায়াং ভ্রাতরং তনয়ৎ গুরুং। আক্ষারয়ঞ্চুতং দাপ্যঃ পন্থানং চাদদদারোঃ') (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) শ্লোকে পিতা ও মাতা উভয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের উদ্দেশ্যে কোন বিরূপ ভাষা প্রয়োগ না করা এবং তাদের প্রতি কোন দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রনা প্রদান না করা এই বার্তা গুলি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পিতা ও মাতার মধ্যে কোন লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিফলিত হয় না। এক্ষেত্রে বিনির্মাণকারী নারীবাদীদের 'Same right within same situation' এই ধারণার সাপেক্ষে মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের মধ্যে সুদৃঢ় সাম্যতা হিন্দু ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মনুসংহিতায় "দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া। প্রজেন্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে" [মনুসংহিতা ৯/৫৯], "বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি। একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন"॥ [মনুসংহিতা ৯/৬০], "দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ। অনির্বৃতং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধমতস্তয়োঃ" [মনুসংহিতা ৯/৬১] "পূত্রেণ লোকান জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে। অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রয়ষ্যাপ্নোতি পিস্টপং"[মনুসংহিতা ৯/১৩৭] (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.)- শ্লোক সমূহের ব্যাখ্যা থেকে পাওয়া যায় কন্যা সন্তানের জন্মকে অকল্যাণকর বলে বিবেচনা করা হয়। একদিকে মাতৃত্বের প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন অপরপক্ষে কন্যা সন্তানের গ্রহণযোগ্যতার অস্বীকৃতি নারী প্রসঙ্গে দ্বিচারিতার বাতাবরণ তৈরি করে। কন্যা সন্তান লাভ অপেক্ষা পুত্র সন্তান লাভ অধিক শ্রেয়, এমন অভিব্যক্তি পিতৃতান্ত্রিকতার নিরবিচ্ছিন্নতাকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস বলে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুধাবন করা যায়। আবার নিয়োগ প্রথা, ক্ষেত্রজ পুত্র ইত্যাদি ধর্মীয় বিধিগুলি মায়ের উপর যৌন হয়রানির শক্ত ভিত্তি তৈরি করে। এই প্রসঙ্গে বিধান হল- "নারী ক্ষেত্রস্বরূপ, পুরুষ বীজস্বরূপ। ক্ষেত্র ও বীজের মিলনে সকল দেহীর উৎপত্তি হয়", "যেমন গাভী, অশ্ব, উট, দাসী, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াতে উৎপাদক সন্তানের অধিকারী হয় না, তেমনই পরস্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয় না", "যারা ক্ষেত্রস্বামী নয়, বীজের মালিক, তারা পরের ক্ষেত্রে বীজবপন করলে উৎপন্ন শস্যের ফললাভ করে না" [মনুসংহিতা ৯/৩৩,৪৮,৪৯] (*Manu Samhita*

(Byanganubad), 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) । ফলে পুরুষদের দ্বারা নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। উপরোক্ত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি গুলি একবিংশ শতাব্দীতেও কন্যা ভ্রুণ হত্যা, গর্ভপাত, যৌন হয়রানি ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত করতে উৎসাহ প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে উদারপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের উপর সংঘটিত অপরাধ গুলির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং এই সকল আইন গুলিকে বাস্তবে যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ধর্মীয় অসঙ্গতি গুলো রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রভাবিত না করলে নারীরা স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের সুযোগ পাবে এ বিশয়ে সন্দেহ নেই।

মনুসংহিতা ৩/৫৫, ৩/৫৬, ৯/১০১ ('পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা। পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ', 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ', 'অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ। এষ ধর্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ',) (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) এবং মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের ৩৪/৩৯, ৩৬/ ৫৭ ("পর্জন্যনাথাঃ পণবো রাজানো মন্ত্রীবান্ধবাঃ। পতয়ো বান্ধবাঃ স্ত্রীণাং ব্রাহ্মণা বেদবান্ধবাঃ"[মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব(১৩), অধ্যায় ৩৪, শ্লোক ৩৯], "ন বৈ তেষাং স্বদতে পথ্যমুক্তং যোগক্ষেমং কল্পতে নৈব তেষাম" [মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব, ৩৬/৫৭]) (*Mahabharata, composed by Maharshi Vedavyasa, Udyoga Parva-13. (Translated into Bengali)*, 1978) প্রভৃতি শ্লোক গুলির বিশ্লেষণে পাওয়া যায় যে স্বামী স্ত্রীর সুসম্পর্ক স্থাপন, সহাবস্থান এবং পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন এর মধ্য দিয়ে সংসার তথা বংশের কল্যাণ সাধন সম্ভব এবং জীবনের সকল কর্মে সফলতা আসে। উপরোক্ত শ্লোকের মর্মার্থে- পতি পত্নীর মধ্যে বন্ধুসুলভ সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধন রচনার অমৃত কথা উচ্চারিত হয়েছে। এই ভাবধারা লিঙ্গ বৈষম্যের সামাজিক প্রাচীর অবসানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী ধারণাকে সামনে রেখে বলা যায়- স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বন্ধু ভাবাপণ্য সম্পর্কের এই দর্শন যদি যথার্থ ভাবে সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত হয় তাহলে তা নারী বৈষম্য দূরীকরণের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হবে। নারী ও পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের চিরাচরিত সংকীর্ণতা এবং পুরুষের আগ্রাসন থেকে নারীরা মুক্ত হবে।

"অপশ্যং যুবতিং নীয়মানাং জীবাং মৃতেভ্যঃ পরিণীয়মানাম্। অন্ধেন যত্তমসা প্রাবৃতাসীৎপ্রাক্তো অপাচীমনয়ং তদেনাম" [অথর্ববেদ- কান্ড ১৮, অনুবাক-৩, সুক্ত-১, শ্লোক-৩], "উদীষর্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতহমুপশেষ এহি। হস্তাগ্যাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূব" [অথর্ববেদ- কান্ড ১৮, অনুবাক-৩, সুক্ত-১ শ্লোক-২] (Goswami, 1961)- এই দুইটি শ্লোক একত্রে বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলি প্রকাশ পায়— বেদ এখানে নারীর জীবনের মূল্য স্বীকার করছে। মৃত স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুবরণ নয়, বরং জীবনের পথে ফিরে আসাই তার কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্ববেদের এই মন্ত্রসমূহ প্রমাণ করে যে, বেদযুগে সতীদাহ কোনো ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ছিল না। বরং বেদ নিজেই এই প্রথার বিরোধিতা করেছে। এই মন্ত্রগুলি প্রমাণ করে যে, প্রাচীন বৈদিক সমাজে নারীর প্রতি সামাজিক সহানুভূতি ও বাস্তববাদী মনোভাব ছিল। বর্তমানে এই মন্ত্রগুলো নারীমুক্তি, জীবনমুখিতা ও মানবধর্মের প্রাচীন বৈদিক ভিত্তি হিসেবে অবশ্যই রসদ সরবরাহ করে। গরুর পূরণের ১/১০৭/২৮ শ্লোকে (*Garuda Purana (Complete English Translation)*, 1957) উল্লেখ আছে স্বামীর মৃত্যু হলে একজন বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করতে পারে। এই প্রকার ধর্মীয় পুরা কথা নারীবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত সাম্যতার ভিত্তি রচনা করতে অবশ্যই সাহায্য করে। তথাপি অগ্নি পুরাণের ১৯/২৩ (Dutta, 1904) শ্লোকে উল্লেখিত অল্প বয়স্কা বিধবার ব্রহ্মচার্য জীবন পালনের নির্দেশ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিন্দু ধর্মে নারী সত্তার মূল্যায়নকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। আবার পদ্মপুরাণের কতগুলি শ্লোকের (৫/১০৬/৫৮-৬৯) (Shastri et al., 1956) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঋষি নারদ এক ব্রাহ্মণ বিধবা নারীকে মৃতস্বামীর সঙ্গে আগুনে প্রবেশের মাধ্যমে সকল পাপ নিবারণ হবে এমন উক্তি করেন। সুতরাং পরবর্তী সময়ে যখন সতীপ্রথা প্রাধান্য পায়, তা বেদের মূল ভাবধারার বিপরীতে প্রবাহিত হয়।

সুতরাং বিনির্মাণকারী নারীবাদীরা সতীদাহ সম্পর্কিত উপরোক্ত বহুমুখী ধর্মীয় বিশ্লেষণ গুলিকে সামনে রেখে জোরালো ভাবে দাবি রাখতে পারে যে লিঙ্গগত ধারণা স্থির বা স্থিতিশীল নয়। সমাজের ধ্বজাধারী ধর্ম সংস্কারক সমাজ সংস্কারের নামে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল ভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে। তাই ধর্মীয় ধারণার বিনির্মাণের মাধ্যমে অপসংস্কারের আভরণ উন্মুক্ত করা সম্ভব।

ইসলামে প্রতিফলিত নারীবাদ (Feminism reflected in Islam):

ইসলাম ধর্মের চিরাচরিত ধর্মীয় ব্যাখ্যা থেকে পাওয়া যায় মানব সৃষ্টি প্রাক্কালে আল্লাহ তা আলা আদি পিতা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার পর আদমের নিঃসঙ্গতা দূরীকরণের জন্য তার সহধর্মিনী হিসেবে তার বাম পাজরের একটি হাড় থেকে আদি মাতা হাওয়া কে সৃজন করেন। এ প্রসঙ্গে, হাদীসঃ; সহীহ আল-বুখারী; আ.প্র.; ৩০৮৫, ই.ফা.; ৩০৯৩ থেকে পাওয়া যায়- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা নারীদেরকে উত্তম নাসীহাত প্রদান করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদেরকে নাসীহাত করতে থাক" (*SAHIH AL-BOKHARI (Translated in Bengali)*, 2014)। অতঃপর তাদের থেকে অসংখ্য নরনারী সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি লগ্নে আদি পিতার আবির্ভাব তথা তার দেহাংশ থেকে আদি মাতার আবির্ভাবর এই ধর্মীয় পুরাকথা (Myth) পিতৃতান্ত্রিকতার বীজ বপনের এক প্রাথমিক পদক্ষেপ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আদম এবং হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর কুরআনের সুরা ত্বা-হা - ২০:১১৬ (*The Holy Quran (Bengali Translation)*, 2022; *The Holy Quran (Translated in English)*, 2022) আয়াতে ("যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে অমান্য করল") পাওয়া যায়- আদি পিতা আদমের জ্ঞানের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য ফেরেশতারা যেন তাকে সেজদা করে, আল্লাহর এমন নির্দেশ প্রতিধ্বনিত হলেও আদি মাতার প্রতি এই রূপ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এর কথা পাওয়া যায় না। সুতরাং মানব সৃষ্টি সম্পর্কিত ইসলামীয় এই পুরান কথা সৃষ্টি লগ্নেই পিতৃতান্ত্রিকতার আস্ফালনকে অন্তর্নিহিত করে। বৈপ্লবিক নারীবাদী ধারণায় পুরুষালী বৈশিষ্ট্য সমূহকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে নারীসত্তাকে প্রান্তিকীকরণের যে অভিযোগ করা হয় তা প্রতিষ্ঠিত হয় মানব সৃষ্টির এই পুরাকথার মধ্যে। আবার সুরা হুজুরাত- ৪৯/১৩ ("হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও.....নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন") এবং সুরা নাহল - ১৬/৪ ("তিনি মানবকে এক ফোটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী হয়ে গেছে") (*The Holy Quran (Bengali Translation)*, 2022; *The Holy Quran (Translated in English)*, 2022) আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে আল্লাহ এক পুরুষ ও এক নারী থেকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মানবজাতির সৃষ্টি করেছেন। স্বর্গ থেকে আদম ও হাওয়া বিতাড়িত হওয়ার পর তারা পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং তাদের পুনর্মিলন হয়। পৃথিবীর বুকে তাদের সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়। আয়াতে পাওয়া যায় একফোঁটা বীর্য থেকে মানব সৃষ্টি হয়। সুতরাং ক্রোমোজোম দ্বারা নির্ধারিত মানুষের সেক্স আইডেন্টিটি সম্পর্কিত যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং মানব অপত্য সৃষ্টিতে পুরুষ ও স্ত্রী সত্তার সম জৈবিক ভূমিকা ধর্মীয়ভাবে স্বীকার্য।

বিভিন্ন নারীবাদী ধারণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নারী পুরুষের সেক্স আইডেন্টিটিকে অতিক্রম করে জেন্ডার আইডেন্টিটির মধ্যে বৈষম্য দূর করা। ইসলাম ধর্মে মায়ের যে মর্যাদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত হয়েছে সেখানে দেখা যায় মা-বাবার দ্বৈত ভূমিকা কে যুগপৎ সম্মান জানানো হয়েছে। সুরা লুকমান- ৩১/১৪ ("আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে"), এবং সুরা বনী-ইসরাঈল- ১৭/২৩ ও ২৪ ("তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহা র কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে `উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা", "তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলঃ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন") আয়াত সমূহের (*The Holy Quran (Bengali Translation)*, 2022; *The Holy Quran (Translated in English)*, 2022) ছত্রে ছত্রে পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার, শিষ্টাচার পূর্ণ কথোপকথন, বার্ধক্যে মা-বাবার দেখাশোনা করা ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মা-বাবার পদতলে নতশিরে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে বলার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পরেই পিতা-মাতা উভয়ের সত্তাকে ধর্মীয়ভাবে স্বীকার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে

দেখা যায় পিতা-মাতার মর্যাদা কে বৈষম্যমূলকভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না। বিনির্মাণকারী নারীবাদীদের 'Same right within same situation' এর ধারণা এবং পরিস্থিতি ভিত্তিক উপযোগী অধিকার প্রদানের দাবি উপরোক্ত আয়াতসমূহের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং 'মাতাপিতা' অথবা 'পিতামাতা' ('Motherfather' or 'Fathermother') একটি একক শব্দ হিসাবে পুনর্গঠিত হওয়ার মাধ্যমে মা ও বাবার বাইনারি ধারণার সীমারেখা দূর করার রসদ উপরোক্ত আয়াত সমূহে পরিপূর্ণভাবে বর্তমান আছে। অনেক ক্ষেত্রে যে ধর্মীয় গঠন Gender stereotype কে রূপদান করে বলে মনে করা হয় এক্ষেত্রে সেই ধর্মীয় গঠনকে ব্যবহার করেই ঐতিহ্যগত অনুমান ও অর্থকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব এবং মা-বাবার লিঙ্গগত সমতাকে উপস্থাপন করা সম্ভব।

কন্যা ভ্রুন হত্যা বর্তমান সমাজের একটি জঘন্যতম প্রবণতা, যার বিরুদ্ধে নারী বাদীরা বার বার সোচ্চার হন। প্রি-ইসলামিক সমাজে ভূমিষ্ঠ হওয়া জীবিত কন্যা সন্তানকে অশুভ ভেবে কবর দেওয়া হতো। সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ধারণা বর্তমান সমাজে সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে তা বলা যায় না। কন্যা ভ্রুণ হত্যার অগণিত উদাহরণ সমাজের বুকে ঘটে চলেছে। এই সকল উদাহরণ থেকে বোঝা যায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কন্যা সন্তান হত্যার নির্মম অপরাধ মূলক প্রবণতার ধরন বা অভিমুখ পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। কোরানে উল্লেখিত সুরা শূরা- ৪২/৪৯ ("নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন") এবং সুরা নাহল- ১৬/৫৭ ("তারা আল্লাহর জন্যে কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে-তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্যে ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়") আয়াতে এই ধরনের অপরাধকে সমর্থন করা হয় না। আয়াত গুলির মধ্যে ধর্মীয় ভাবে স্বীকার করা হয় যে কন্যা ও পুত্র সন্তান জন্মানোর পেছনে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন ভূমিকা নেই। এক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে কন্যা সন্তান লাভ অথবা পুত্র সন্তান লাভ এটা ঈশ্বরের দান যা মানুষ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করবে। ধর্মীয় ভাবে কন্যা সন্তানের প্রাপ্তি আল্লাহর পবিত্র দান হিসেবে বিবেচিত হয়। এইরূপ ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে জীববিজ্ঞানের ব্যাখ্যার মূলগত সামঞ্জস্য আছে। জীববিজ্ঞান অনুসারে প্রাকৃতিক নিয়মে জননের সময় পুং গ্যামেট (X ক্রোমোজোম যুক্ত অথবা Y ক্রোমোজোম যুক্ত) এবং স্ত্রী গ্যামেটে (সর্বদা X ক্রোমোজোম যুক্ত) এর মিলন একটি অনিয়ন্ত্রিত জৈবিক ঘটনা। X ক্রোমোজোম যুক্ত পুং গ্যামেট X ক্রোমোজোম যুক্ত স্ত্রী গ্যামেটকে নিষিক্ত করলে কন্যা সন্তান জন্মায়। অপরপক্ষে Y ক্রোমোজোম যুক্ত পুং গ্যামেট X ক্রোমোজোম যুক্ত স্ত্রী গ্যামেটকে নিষিদ্ধ করলে পুত্র সন্তান জন্মায় (Legato, 2020)। সুতরাং উদারনৈতিক নারীবাদীদের তত্ত্বগত ধারণাকে সামনে রেখে কন্যা ভ্রুণ হত্যার অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে এবং হবু মায়ের (Mother to be) উপর মানসিক ও শারীরিক পীড়ন সৃষ্টি করে তাকে কন্যা ভ্রুণ গর্ভপাত করতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে বলিষ্ঠ আইনগত সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা আইন প্রণয়নে কোন প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে না, বরং ইসলাম ধর্মে এইরূপ অপরাধমূলক জঘন্য মনোভাব কে নিকৃষ্ট মানবিকতা বলে বর্ণনা করা হয়।

কোরআনের সুরা রূম-৩ ০/২১ ("আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে") এবং সুরা নিসা- ৪/১৯ ("হে ঈমাণদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহন করা তোমাদের জন্যে হালাল নয়....") আয়াতে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে মহান আল্লাহ প্রতিটি পুরুষের জন্য তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, তিনিই যুগল প্রেমের স্রষ্টা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক দয়া, মায়া-মমতা ও সম্প্রীতির বীজ বপন কারী। নারীর অসম্মতিতে তাকে বিবাহ করা হলে তা কল্যাণ দায়ক নয় এবং ধর্মীয়ভাবে তা বৈধতা পেতে পারে না। ইবনে হাম্বল, নং ২৪৬৯ এবং ইবনে মাজা, নং ১৮৭৩ (*SUNANE IBN MAJA (Translated in Bengali)*, 2001) - এ উল্লেখ আছে বৈবাহিক চুক্তির এই পূর্ব শর্ত পূরণ না হলে মহিলারা তার বিয়ে নাও মেনে নিতে পারে। বুখারী হাদিস ৫২৩৬ (*SAHIH AL-BOKHARI (Translated in Bengali)*, 2014) থেকে পাওয়া যায়- নবীজি (সাঃ) পিতামাতার উদ্দেশ্যে বলেন যে, বিবাহের সময় যুবতী মহিলার কাছ থেকে তাঁর পিতা-মাতাকে অবশ্যই কন্যার সম্মতি নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন লাজুক কোনের নিরব থাকাটাই বিবাহের সম্মতি প্রদান বলে বিবেচিত হবে। তিরমিজ, হাদিসঃ ১১০১ (*Sahih At-Tirmidhi (Translated in Bengali)*, 2010) থেকে পাওয়া যায় অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ হতে পারে না। এক্ষেত্রে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, যেমন- অভিভাবকের উপস্থিতি ছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কা

মহিলা স্বামী নির্বাচন করলে যদি তার ধর্মসম্মত বিবাহ না হয় তাহলে বিবাহ ক্ষেত্রে মহিলাদের নিজস্ব স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ কি আদৌ ধর্মীয়ভাবে স্বীকার্য্য? বল পূর্বক মানসিক চাপ সৃষ্টি করে কোনেকে নিজের মতামত প্রকাশে বাধা দেওয়া হলে, সেই নীরবতা কি কোণের সম্মতি বলে বিবেচিত হতে পারে? এই সকল প্রশ্ন গুলিকে সামনে রেখে অনুধাবন করা যায় বিবাহ ক্ষেত্রে স্বামী নির্বাচনে নারী স্বাধীনতার দিক ইসলাম ধর্মে উল্লেখিত হলেও বাস্তবে তা রূপায়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিসরেই সংকুচিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়ে গেছে। বৈপ্লবিক নারীবাদী ধারণা কে সামনে রেখে বলা যায় পুরুষের নিপীড়নমূলক আগ্রাসী মনোভাবের আবর্তে নারীকে ভীত করে তার নীরব সম্মতি আদায় করিয়ে নেওয়ার এক প্রচ্ছন্ন সুযোগ ধর্মে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নারীরা লাজুক এমন একটি স্টেরিওটাইপ তৈরি করে নারীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার প্রবণতাকে ধর্মের নঞর্থক দিক বলে স্বাধীনকামি নারীবাদীরা অবশ্যই দাবি করতে পারে। তথাপি সাংস্কৃতিক নারীবাদী ধারণা দিয়ে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, এক্ষেত্রে নারীদের সহানুভূতিশীল শান্ত স্বভাবের প্রাকৃতিক গুনের প্রতি ধর্ম গুরুত্ব আরোপ করে মাত্র কিন্তু কোরানে উল্লেখিত আয়াত সমূহে জোরপূর্বক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের অপচেষ্টাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। আয়াতগুলির মধ্যে চিন্তাশীল মানুষের জন্য সংবেদনশীল হওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। কোরআনের সুরা নিসা- ৪:১৯ আয়াতে স্বামী নির্বাচনে নারী স্বাধীনতা খর্ব করা হলে পুরুষের জন্য তা হালাল নয় বলে কড়া মনোভাব পোষন করা হয়েছে। সুরা রূম-৩০/২১(*The Holy Quran (Bengali Translation),* 2022) ("আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে") আয়াতের বিশ্লেষণে দেখা যায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতি বজায় রাখা, শান্তিতে জীবন যাপন করা, উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে উভয় পক্ষের বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ বিচারকের উপস্থিতিতে তা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া, স্বামী- স্ত্রীর বিরোধ সমাধানের মাধ্যমে আল্লাহর আশীর্বাদে উভয়ের মধ্যে প্রেম প্রীতি ও ভালোবাসার সঞ্চার হওয়া ইত্যাদি সৎ উপদেশ তথা নির্দেশ সমূহের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে অটুট রাখতে ইসলাম ধর্ম সদর্থক ভূমিকা পালন করে। আবার সুরা নিসা- ৪/২০ ("যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে?") এবং সুরা নিসা- ৪/১৯ ("হে ঈমাণদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহন করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন") আয়াত (*The Holy Quran (Bengali Translation),* 2022) দুটির মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুটি অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। প্রথমটিতে বলা হয় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের চরম অবনতি অমীমাংসিত থাকলে এবং স্বামী অন্য নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলে প্রথম স্ত্রীকে প্রদেয় মোহর কোনোভাবেই ফেরত নেওয়া যাবে না। অপরপক্ষে দ্বিতীয়টিতে বলা হয় জনসমক্ষে স্ত্রী অশালীন আচরণে লিপ্ত হলে স্বামী যা কিছু স্ত্রীকে প্রদান করে তার একটা অংশ শাস্তি স্বরূপ ফেরত নিতে পারে। এইরূপ স্ববিরোধী নীতি ধর্মীয় অসঙ্গতি কে নির্দেশ করে। মার্কসীয় নারীবাদীরা লিঙ্গ বৈষম্যের জন্য যে অভিযোগে মান্যতা দেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সুরা নিসা- ৪/৩৪ ("পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ") আয়াতের (*The Holy Quran (Bengali Translation),* 2022) মধ্যে উপস্থাপিত হয়। পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এমন উক্তির মাধ্যমে পুরুষেরা শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে এবং মহিলারা শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ধর্মীয় স্বীকৃতি পায়। মার্কসীয় বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী ধর্মে উল্লেখিত এমন অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে নারীরা পুরুষের ব্যক্তিগত মালিকানধীন হয়ে পড়ে। স্ত্রী অবাধ্য হলে স্বামী তাকে সর্বোপরি প্রহার করতে পারে, এমন ধর্মীয় স্বীকৃতি পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের প্রেক্ষাপটকে সুদৃঢ় করে। আবার মারধরের মাধ্যমে স্ত্রী স্বামীর

আনুগত্য স্বীকার করে নিলে অন্য কোন সংকীর্ণ পথ বেছে নিতে নিষেধ করা হয়। এখানেই প্রশ্ন উঠে, শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্ত্রীর আনুগত্য না পাওয়া গেলে আরো নৃশংসতার পথ অবলম্বনে বাধা নেই বলে ধর্ম কি উস্কানি দেয়? সুতরাং ব্যক্তিগত পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন এক রাজনৈতিক খেলার সুযোগ ধর্মীয় ভাবে মান্যতা পায়, যা বৈপ্লবিক নারীবাদী ধারণা অনুযায়ী 'Personal is political' বলে আখ্যায়িত হয়। এ প্রসঙ্গে বুখারী ৫২০৪ (*SAHIH AL-BOKHARI (Translated in Bengali)*, 2014), ইবন হিব্বান ৯/৪৯৯; ৪১৮৯, আবু দাউদ ২১৪৬, এবং ইবন মজাহ ১৯৮৫ (*SUNANE IBN MAJA (Translated in Bengali)*, 2001) থেকে কিছু নমনীয় সদুপদেশ পাওয়া যায়, যেমন- চাকর বাকরদের মতন প্রহার করা যাবে না, ভালো লোক এমন পন্থা অবলম্বন করে না, আল্লাহ এমন শাস্তি দান পছন্দ করেন না। সুতরাং এই আয়াতটি নারীদের সার্বিক মর্যাদা কে ভূলুণ্ঠিত করতে নরমে-গরমে একটি ধর্মীয় প্রয়াস বলে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা অভিযোগ করতেই পারে।

গবেষণালব্ধ প্রধান ফলাফল (Major research findings revealed):

- যেহেতু সময়-দেশ-কাল-সমাজ ও রাজনীতির উপর ধর্মীয় প্রভাব একটি শক্তিশালী অনুঘটক হিসাবে কাজ করে তাই ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সংস্কার ব্যতীত নারীবাদী আন্দোলন পূর্ণতা ও সফলতা পেতে পারেনা। ধর্মীয় ভাষ্য গুলির বিশ্লেষণ ও পারস্পরিক তুলনার সাপেক্ষে এই গবেষণায় প্রতিয়মান হয় যে- ধর্মের মধ্যে নারী শক্তির মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত নয় বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীদের সার্বিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান তথা ক্ষমতায়নের পক্ষে ধর্মীয় প্রেরণা বিদ্যমান রয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী শক্তির প্রতিকি তাৎপর্যও (Symbolic significant) বহু ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।
- ধর্মীয় নারীবাদী দর্শন (Philosophy of religious feminism), ধর্মকে হাতিয়ার করে নারীর ক্ষমতায়নের আন্দোলনকে একটি আদর্শায়িত শক্তিশালী দিশা দিতে পারবে বলে উপলব্ধ হয়। নারীবাদী ধর্মতত্ত্বের (Feminist theology) বিনির্মাণের বলিষ্ঠ দাবির মাধ্যমে রাষ্ট্র তথা সরকার ধর্ম-বর্ণ-জাতি ও লিঙ্গ নির্বিশেষে ন্যায় সঙ্গত বিধি নিয়মের নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে বাধ্য হবে। ফলে উদারনৈতিক নারীবাদী আন্দোলনের মূলগত দাবি 'Principal of Justice'-এর প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে।

ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি সহ উপসংহার (Conclusions with future outlook):

ধর্মতত্ত্ব গত নারীবাদী আদর্শগুলিকে প্রতিষ্ঠা করে তা সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারলে নারীবাদী আন্দোলন অনেক বেশি গতিশীল হবে। কারণ সমাজ জীবনে লিঙ্গ স্টেরিওটাইপ তৈরিতে ধর্মীয় প্রভাব অনস্বীকার্য। এমনকি দেশের রাজনৈতিক পরিকাঠামোও নিয়ন্ত্রিত হয় দেশের ধর্মীয় দর্শন ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে ধর্মীয় আয়াত গুলিকে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নব রূপে বিশ্লেষণের তাগিদ অনুভব করা উচিত ধর্মীয় গুরুদের। এই গবেষণাপত্র ধর্মীয় গুরু তথা রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে নারী প্রসঙ্গে সময়োপযোগী আদর্শ নির্ধারণে অনুপ্রাণিত করবে। ধর্মীয় ব্যাখ্যা কে লিঙ্গ পক্ষপাত দুষ্টুটা থেকে পরিমার্জিত করতে এই গবেষণালব্ধ উপাদান গুলি তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

Bengali:

1. Basu, R. (2012). *Naribad* (2012th ed.). West Bengal state Book Board.
2. Goswami, S. B. (1961). *Atharvaveda (Translated in Bengali)*. Haraf Prakashani. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.454693/page/n4/mode/1up?view=theater
3. *Mahabharata, composed by Maharshi Vedavyasa, Udyoga Parva-13. (Translated into Bengali)* (S. H. S. Bhattacharyya, Trans.; 2nd ed.). (1978). Vishvabani Prakashani, Calcutta.
4. Maitra, Śephālī. (2003). *Naitikatā o nārībāda: Dārśanika prokshitera nānā mātrā*. Niu Eja Pābaliśārsa.

5. *Manu Samhita (Byanganubad)* (B. Shiromani & P. Tarkabhushan, Trans.; 4 th). (1336). Basumati Sahitya Mandir, Satish Chandra Mukhopadhyay. https://archive.org/details/ajoymondol297_gmail_20160623_1852/page/n24/mode/1up
6. *Manu Samhita (Translated in Bengali)* (S. C. Bandyopadhyay, Trans.). (n.d.). Ananda Publisher.
7. *Nari O Communism: Marx Theke Mao, [Women And Communism: From Marx To Mao, Edited by Harry Politt]* (M. Sarkar, Trans.; 3 rd). (2022). Radical, Kolkata.
8. Rahman, M. M. (2021). Begam Rokeyar Nari Unnayan Bhabna: Ekati payalochana. *International Journal of Humanities & Social Science Studies*, *7*(3). https://doi.org/10.29032/ijhsss.v7.i3.2021.01-12
9. *SAHIH AL-BOKHARI (Translated in Bengali)* (A. Kayser, A. Rahman, M. Haque, R. Amin, & A. Khalek, Trans.; Vol. 3). (2014). Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100. https://drive.google.com/file/d/16h5LQDVd9LS1mROsXl4ubXEl4yTM48fV/view
10. *Sahih At-Tirmidhi (Translated in Bengali): Vol. 2 nd* (H. bin Sohrab & S. M. I. M. bin K. Rahman, Trans.; 2 nd). (2010). Hossain Al-Madani Prokashoni, Dhaka, Bangladesh. https://drive.google.com/file/d/160pQuEsYotCBnAaEuxioG51RmZwFoQW7/view
11. Sarkar, K. K. (2018). *Naribad, linga,rajniti O narir khamatayan* (1 st). Avenel press.
12. *SUNANE IBN MAJA (Translated in bengali)* (M. Musa, Trans.; Vol. 2). (2001). Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100. https://drive.google.com/file/d/1PjkeM678Ki3YkSTKscKT40kml9zzMkze/view
13. *The Holy Quran (Bengali translation)* (M. H. Rahman, Trans.). (2022). https://quran.habibur.com

English:

14. Apetrei, S. L. T. (2010). *Women, feminism and religion in early Enlightenment England*. Cambridge University Press.
15. Armstrong, K. (2002). *Islam: A short history* (2002nd ed.). New York: Random House.
16. Astell, M. (2015). *Some Reflection upon Marriage*. University of Illinois Press.
17. Chaudhuri, M. (2015). *The Indian Women's Movement Reform and Revival*. Winshield Press, New Delhi.
18. Dutta, M. N. (1904). *Agni-puranam (Translated in english)* (1 st). Cosmo publication.
19. Elam, D. (2000). Deconstruction and Feminism. In N. Royle (Ed.), *Deconstructions* (pp. 83–104). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-137-06095-2_5
20. *Garuda Purana (Complete English Translation)* (J. L. Shastri, Trans.; 1–3 Volumes In 1). (1957). Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. https://archive.org/details/GarudaPuranaEnglishMotilal3VolumesIn1/page/n329/mode/2up
21. Glazebrook, T. (2002). KAREN WARREN'S ECOFEMINISM. *Ethics & the Environment*, *7*(2), 12–26. https://doi.org/10.2979/ETE.2002.7.2.12

22. Legato, M. J. (2020). What determines biological sex? In *The Plasticity of Sex* (pp. 1–23). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815968-2.00001-3
23. *Manu Samhita: English translation* (M. N. Dutt, Trans.). (1909). Calcutta: Printed and pub. by H.C. Das.
24. Mariana, S. (2006). Mill's Liberal Feminism: Its Legacy and Current Criticism. *Prolegomena*, *5*(2), 179–191.
25. Shastri, J. L., Bhatt, G. P., & Deshpande, N. A. (1956). *Padma Purana, part 10 (Translated in english)* (1 st). Motilal Banarsi Dass Publication. https://archive.org/details/dli.bengal.10689.21961/page/n5/mode/2up
26. Shiva, V. (2002). *Staying alive: Women, ecology and development* (8. impr). Zed Books.
27. *The Holy Quran (Translated in english)* (A. Y. Ali, Trans.). (2022). https://quranyusufali.com/
28. Thompson, D. (1994). Defining feminism. *Australian Feminist Studies*, *9*(20), 171–192. https://doi.org/10.1080/08164649.1994.9994750
29. Vedantaratna, S. M. C., & Tattvabhushan, S. S. (1928). *Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (Byanganubad)*. https://archive.org/details/dli.bengal.10689.17838/page/n7/mode/1up

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 383- 393
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.220

লোকভাষ্যে বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

ড. মোঃ রাজিবুল ইসলাম, *সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ*

Received: 22.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The fundamental structure Bangladeshi society is based on the rural life. The term village is not just a geographical area, it is a historical and cultural concept that has governed the lives, thoughts and values of Bengalis for centuries. Our economy, politics, society and culture have their roots in the villages. For centuries, our rural society was agriculturally dependent, tradition-centered and self-reliant. But over time, the nature of social structure, lifestyle, values and relationships have gradually changed. The spread of education, use of technology, employment abroad, urban communication and the impact of political changes have made today's villages dynamic. The main focus of the present study is to explore how and what's the form of changes has occurred in Bangladesh in the past three decades and its nature.

Keywords: Rural Transformation, Bangladeshi Villages, Modernization Impact, Rural Livelihoods, Socio-cultural Change.

বাংলাদেশ প্রধানত একটি কৃষিনির্ভর গ্রামীণ দেশ। এদেশে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। পরিবর্তনের স্রোত যত দ্রুত নাগরিক সমাজে প্রবাহিত হয় গ্রাম্যসমাজে তা হয় না।[১] গ্রামের সমাজব্যবস্থা মূলত ঐতিহ্যনির্ভর, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক নিয়মকানুনে আবদ্ধ। গ্রামগুলো একসময় ছিল পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। পুরুষেরা মাঠে কাজ করতো এবং নারীরা গৃহস্থালির কাজ ও পশু পালনে সাহায্য করতো। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল দুর্বল, বিদুৎ এবং স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক। গ্রামের প্রায় সব সিদ্ধান্তই ছিল প্রভাবশালী পরিবারগুলোর হাতে এবং সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে ছিল অনীহা এবং ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি কঠোরতা। তবে গ্রামীণ জীবনের এক বিশেষ সৌন্দর্য ছিল পারস্পরিক বন্ধন ও সহযোগিতা দিয়ে- একজন আরেকজনের পাশে থাকা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের ফলে গ্রামীণ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। গ্রামীণ এ পরিবর্তনগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

গবেষণা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি:

গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনের কারণ ও স্বরূপ অনুসন্ধানই বর্তমান গবেষণাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। গবেষণাটি সম্পাদনে বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতি বিচারে প্রবন্ধটি কথ্য ইতিহাসভিত্তিক একটি গুণগত গবেষণা। উদ্দেশ্য

[১] বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, বুক ক্লাব, ঢাকা, পৃ. ৯।

অর্জনে প্রাথমিক ও সহায়ক উপকরণ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রামীণ পরিবর্তনের ধরন জানতে বিভিন্ন বিভাগের ৮টি জেলার (মানিকগঞ্জ, রংপুর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, সাতক্ষীরা, খুলনা, নরসিংদী এবং পাবনা) ২০টি গ্রাম উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাছাই করা হয়েছে। গবেষক ব্যক্তিগত যোগাযোগের পাশাপাশি ১৫ জনের একটি প্রশিক্ষিত উপাত্তসংগ্রহকারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীকর্তৃক কাঠামোবদ্ধ ও মুক্ত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সাধারণত দীর্ঘ সময় একই গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য গবেষণাটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। সময় বিবেচনায় গত দুই দশকে গ্রামীণ পরিবর্তনের কারণ ও স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গ্রামীণ সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তনের কারণসমূহ:

শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিঃ

গ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। এক সময় গ্রামে শিক্ষার হার ছিলো তুলনামূলকভাবে কম, বিশেষ করে নারীদের মধ্যে। কিন্তু গত দুই দশকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। শিক্ষা মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধে পরিবর্তন এনেছে তারা এখন নিজেদের অধিকার, ভোটাধিকার ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। তরুণ প্রজন্ম রাজনীতি, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে। ফলে গ্রামের মানুষ এখন আগের তুলনায় বেশি গণতান্ত্রিক ও যুক্তিবাদী মনোভাব পোষণ করে। শিক্ষা সামাজিক কাঠামোয় এক ধরণের মানসিক বিপ্লব ঘটিয়েছে যা সকল পরিবর্তনের মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। ফুলহরি গ্রামের শিক্ষক মো: হাসান আলী বলেন,

> "আমি এ গ্রামেই জন্মেছি। আগে পড়াশোনার পরিবেশ ছিল না। এখন ফুলহরিতে তিনটি স্কুল, একটি কলেজ আছে। ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনায় আগ্রহী। অনলাইন ক্লাস, মোবাইল, ইন্টারনেট শিক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সচেতন হচ্ছে-অপরাধ, কুসংস্কার কমেছে। আগে মেয়ে শিশুদের বিয়ে হতো অল্প বয়সে, এখন তারা কলেজে যাচ্ছে। আমার মতে পরিবর্তিত জীবন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে শিক্ষার প্রসার ও সচেতনতা বৃদ্ধি।"[২]

যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়ন:

গ্রামের পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি। আগে গ্রাম ছিল অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন, বিশেষ করে বর্ষাকালে যাতায়াত ছিলো কঠিন। এখন সড়ক ও সেতু নির্মাণের ফলে বাজার, স্কুল, হাসপাতাল ও শহরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয়েছে। পাশাপাশি মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক ও ইউটিউবের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের চিন্তা-ধারনায় গভীর প্রভাব ফেলেছে। গ্রামের তরুণরা এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবর জানে, অনলাইন শিক্ষায় অংশ নেয়, এমনকি ডিজিটাল মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতি প্রচার করে। এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন মানুষকে তথ্যনির্ভর, সচেতন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করছে।

প্রবাসী আয় ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি:

গ্রামের অনেক মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কর্মরত। এই প্রবাসী আয়ের মাধ্যমে গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলে গেছে। আগে যে পরিবারগুলো সম্পূর্নরূপে কৃষিনির্ভর ছিল, তারা এখন প্রবাসী রেমিট্যান্সের কারণে স্বচ্ছল জীবনযাপন করছে। এই আর্থিক উন্নয়ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গ্রামে পাকা বাড়ি, দোকানপাট ও আধুনিক বাজার গড়ে উঠেছে। প্রবাসফেরত মানুষ বিদেশের উন্নত চিন্তা ও জীবনধারা নিয়ে এসে গ্রামীণ সমাজে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করেছে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রভাবেও ভূমিকা রেখেছে। সুতরাং প্রবাসী আয় আমাদের গ্রামীণ পরিবর্তনের এক অন্যতম চালিকা শক্তি। সৌদি আরব প্রবাসী মিজানুর রহমান বলেন-

---

[২] সাক্ষাৎকার: মো: হাসান আলী (৪৫), ফুলহরি, শিক্ষকতা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজবাড়ি, ১ অক্টোবর ২০২৫।

"আমি সাত বছর ধরে বিদেশে কাজ করছি। আগে যোগাযোগ মানে ছিল চিঠি। এখন ভিডিও কল। আমি প্রতিদিন পরিবারের সঙ্গে কথা বলি। টাকা পাঠানো সহজ হয়েছে। আমার উপার্জনে পরিবার ভালো আছে। গ্রামের ঘরবাড়ি, শিক্ষা, পোশাক সব বদলে গেছে। আগে মানুষ বিদেশে গেলে কষ্ট পেত এখন অনলাইনে যোগাযোগে মনোবল থাকে। পরিবর্তিত জীবন আমাকে শিখিয়েছে- আধুনিকতা দূরত্ব কমিয়ে দেয়। এখন আমি গ্রামে বিনিয়োগ করছি-এটা পরিবর্তনের সেরা ফল।"[৩]

উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প ও এনজিও কার্যক্রম। ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, টিএমএসএস এর মতো সংস্থাগুলো ক্ষুদ্রঋণ, নারী উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা প্রসারে কাজ করছে।[৪] এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচির মাধ্যমে নারীরা স্বনির্ভর হচ্ছে, দরিদ্র জনগণ আর্থিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছে এবং সামাজিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। সরকারি দিক থেকে বিদ্যুৎ, পানি, স্যানিটেশন, কৃষি সহায়তা ও রাস্তাঘাট উন্নয়নপ্রকল্প গ্রামীণ জীবনে বাস্তব উন্নতি ঘটিয়েছে। ফলে মানুষ শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও উন্নত জীবনধারার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই উন্নয়ন উদ্যোগগুলো গ্রামের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় নতুন ভারসাম্য এনেছে।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ:

১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ এবং পরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হয়েছে। আগে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো কেবল শহরমুখী ছিল কিন্তু এখন গ্রামীণ জনগণই স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারী ও তরুণ প্রার্থীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে, যা রাজনৈতিক সচেতনতার প্রতিফলন। এই বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া মানুষকে রাজনীতির প্রকৃত অভিজ্ঞতা দিয়েছে। তারা এখন ভোটের মূল্য বোঝে এবং প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার দাবি করে। ফলে স্থানীয় রাজনীতি এখন আর কেবল প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণে নেই; সাধারণ মানুষও নীতিনির্ধারণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখছে।

নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রসার:

নারীর উন্নয়ন গ্রামীণ সমাজে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এক সময় গ্রামের মেয়েদের স্কুলে যাওয়া ছিল সীমিত, কিন্তু এখন প্রায় প্রতিটি পরিবার মেয়েদের পড়াশোনায় উৎসাহী। এনজিও, সরকারি সহায়তা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে নারীরা শিক্ষিত ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। তারা শুধু শিক্ষকতা বা হস্তশিল্প নয়, স্থানীয় রাজনীতি ও উদ্যোক্তা কর্মকাণ্ডেও অংশ নিচ্ছে। নারী এখন গৃহের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখছে, যা পরিবার ও সমাজে নতুন ভারসাম্য এনেছে। নারী নেতৃত্বের উত্থান সামাজিক রূপান্তরের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও এনেছে, কারণ এখন মেয়েরা স্বাধীনভাবে নিজের ভবিষ্যৎ গঠনের সুযোগ পাচ্ছে।

গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের প্রভাব:

টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র এবং অনলাইন মাধ্যম গ্রামের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপুল পরিবর্তন এনেছে। আগে গ্রামের মানুষ খবর জানতো ব্যক্তির মাধ্যমে, এখন তারা দেশের ও বিশ্বের ঘটনা মুহূর্তেই জানতে পারে। এই গণমাধ্যম মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সামাজিকভাবে সক্রিয় ও সাংস্কৃতিকভাবে উন্মুক্ত করেছে। তরুণ প্রজন্ম এখন সামাজিক বিষয়ে মতামত দেয়, সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং নানা অনলাইন প্রচারণায় অংশ নেয়। তবে এক্ষেত্রে কিছু

---

[৩] সাক্ষাৎকার: মিজানুর রহমান (৩৬), ফুলহরি, সৌদি আরব প্রবাসী। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ভিডিও কলে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় ২ অক্টোবর, ২০২৫।

[৪] গত ২৫ বছর গ্রামে যেসব পরিবর্তন হয়েছে তারমধ্যে সবচাইতে চোখে পড়ার মতো দু'টি দিক হলো ১. ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ এবং ২. এনজিও কাঠামোর সম্প্রসারণ। ৭০ দশকের শেষ দিকে এবং ৮০ দশকে এনজিওগুলোর বেশি সম্প্রসারণ হয়। আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি* (ঢাকা: মীরা প্রকাশন), পৃ. ১৫।

নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে– যেমন অতি আধুনিকতা ও নৈতিক অবক্ষয়। তবুও বলা যায়, গণমাধ্যম মানুষের চিন্তাভাবনায় বিপ্লব এনেছে, যা গ্রামীণ সমাজকে আধুনিকতার ধারায় নিয়ে এসেছে।

ধর্মীয় শিক্ষা ও সামাজিক সংহতি:

আমাদের গ্রামগুলো ধর্মীয়ভাবে ঐতিহ্যবাহী। ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ এখানকার মানুষের জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। স্থানীয় মসজিদ, মাদ্রাসা ও ওয়াজ-মাহফিল সমাজে ঐক্য, শান্তি ও ন্যায়ের বার্তা নিয়ে আসে। ধর্মীয় আলেম ও সামাজিক নেতারা নৈতিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরায় সমাজে অপরাধ ও নৈতিক অবক্ষয় হ্রাসে কাজ করছেন। ধর্ম মানুষকে ক্রমশ দায়িত্বশীল ও সমাজমুখী করে তুলছে। পাশাপাশি ঈদ, মাহে রমজান ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব সামাজিক মিলনমেলার রূপ নিচ্ছে। ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ সমাজে সংহতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানের মনোভাব জোরদার করছে।

জলবায়ু ও পরিবেশগত প্রভাব:

বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলের জনজীবন প্রকৃতিনির্ভর। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও বন্যা সরাসরি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে। কৃষি মৌসুম ও আয়ের অনিশ্চয়তার কারণে অনেকে বিকল্প পেশা হিসেবে ব্যবসা বা বিদেশে কাজ বেছে নিচ্ছে। এতে অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য এসেছে কিন্তু কৃষিজীবন ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে। হাওরের প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবিকা পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনধারা ও চিন্তাধারায়ও পরিবর্তন এসেছে। এখন গ্রামীণ মানুষ শুধু কৃষক নয়, বরং সেবা, বাণিজ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর পেশায় যুক্ত হচ্ছে। এই পরিবর্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় এক নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে।

প্রজন্মগত ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন:

তরুণ প্রজন্মের জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিকতার প্রভাব বেড়েছে। তারা প্রযুক্তি, ফ্যাশন ও বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত। আগে যেখানে গ্রামের বিনোদন মানে ছিলো যাত্রাপালা, পুতুলনাচ বা পালাগান, এখন তার জায়গা নিয়েছে ইউটিউব, ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। তরুণরা সামাজিক সমস্যার বিষয়ে বেশি সচেতন এবং পরিবর্তনের পক্ষে। তবে একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন ও সংস্কৃতির কিছু দিক হারিয়ে যাচ্ছে। এই প্রজন্মগত রূপান্তর গ্রামীণ সমাজকে আধুনিক করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে ঐতিহ্যের সংরক্ষণ একটি নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

গ্রামীণ সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের স্বরূপ:

পরিববার কাঠামো:

দুই দশক আগেও একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবারের প্রচলন ছিল। দাদা-দাদি, চাচা-চাচী ও সব ভাইবোনেরা একই বাড়িতে বসবাস করতেন। বাবার জমিগুলো ছেলেরা মিলেমিশে চাষ করতেন। বাড়ির সকলে বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তির কথামতো চলতেন। বাড়ির পুরুষেরা বাইরে জমিজমার কাজ করতেন। নারীরা রান্না-বান্না, গবাদি পশু, হাঁসমুরগিরর দেখাশোনা করা, মাড়াইকৃত মৌসুমী ফসল ঘরে তোলা, বাৎসরিক সম্ভব্য ধান সিদ্ধকরণ এবং ঋতুভিত্তিক কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকতেন।[৫] অধিক জমির মালিকরা একাধিক বিয়ে করতেন ফলে পরিবারে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেশি ছিল। সাংসারিক কাজে অধিক ব্যস্ত থাকায় বাড়ির নারীরা ছোট বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পেতেন না। সাধারণত এসব ছেলে-মেয়েরা বেশ বড় না হওয়া পর্যন্ত একসাথেই থাকতেন। যারা পড়াশোনা করতো তারা গ্রামবাসীর বেশ স্নেহ লাভ করতো। কিন্তু অধিক অর্থনৈতিক সচ্ছলতার অন্বেষণ, ব্যক্তি সাতন্ত্রবাদ এবং পেশাগত কারণে মানুষ গ্রাম থেকে শহরমুখী হওয়ায় যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে। বর্তমানেও গ্রামগুলোতে একক পরিবারের

[৫]দলগত সাক্ষাৎকার: মো: মান্নান মিয়া (৭০), দুগলাচরী, কৃষি; রাবেয়া বেগম (৭১), দুগলাচরী, গৃহিনী; কাশেম মন্ডল (৬৫), দুগলাচরী, কৃষি; সেলিম মন্ডল (৬৮), লতিফপুর, কৃষি। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মো: মান্নান মিয়ার বাড়ি, দুগলাচরী, মিঠাপুকুর রংপুর।

সংখ্যা অধিক। মুসলিম পরিবারগুলোতে পৃথক হওয়ার প্রবণতা বেশী।[৬] সাধারণত যে সকল পরিবারের কর্মক্ষম ছেলের সংখ্যা বেশী সেসকল সমাজে একক পরিবার অধিক লক্ষণীয়। চাকুরিরত ছেলেরা বিয়ের পরে স্ত্রীসহ কর্মস্থলে থাকায় একটি নতুন একক পরিবার গড়ে ওঠে অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম উপার্জনকারী এবং গ্রামে বসবাসকারী সন্তান পারিবারিক সম্মতিতে একটি একক পরিবার গড়ে তোলে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস:

পূর্বে গ্রামীণ সমাজে স্তরবিন্যাসের প্রধান ভিত্তি ছিল জমি। যার যত জমি সমাজে তার প্রভাব প্রতিপত্তি তত বেশী ছিল। সারা বছর তিনবেলা খাবারের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকাটা একটা গৌরবের ব্যাপার। 'গোলা ভরা ধান আর গোয়াল ভরা গরু' প্রবাদটি মূলত আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রতিচ্ছবি। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসব পরিবারের উপর নির্ভরশীল ছিল। 'জোতদার', 'তালুকদার' ও ভুইয়া শ্রেণির বিশেষ সম্মান ছিল। সমাজে উক্ত পরিবারের সদস্যদের বিশেষ কদর ছিল। বিচার-সালিশ তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতো। গ্রামে মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা, গোরস্থানসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাদের আর্থিক অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দূর-দূরান্ত হতে পুরুষ শিক্ষার্থীরা এসব বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করতো। হাতে নগদ অর্থ থাকলেও নিজেদের সন্তানদের পড়া-শোনার প্রতি সবিশেষ আগ্রহ ছিলো না।[৭] বাড়িতে বাৎসরিক টাকা কিংবা খাবারের বিনিময়ে একাধিক কাজের লোক থাকতো। পড়াশোনায় অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগী হওয়ায় তারা পরবর্তীতে পিছিয়ে পড়ে। জমির মালিকানার গুরুত্ব থাকলেও ক্রমশ প্রতিপত্তির নতুন মাপকাঠি হলো শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা এবং রেমিটেন্স বা প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ। অতিসম্প্রতি যুক্ত হয়েছে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।[৮]

নারীর অবস্থান:

নারীরা সাধারণত ঘরের কাজ করতো। বর্গাচাষী এবং ভূমিহীন কৃষক পরিবারের নারীরা পুরুষকে মাঠে সহযোগিতা করতো। তবে জমির অবস্থান বাড়ি হতে বেশি দূরে হলে নারীরা সাধারণত যেতো না। গৃহস্থালির কাজ বিশেষত খাবার তৈরি, পশুপালন ও সন্তান লালন-পালনই তাদের প্রধান কাজ ছিল। মাসিক বেতন কিংবা নগদ অর্থ উপার্জনের সুযোগ নারীদের ছিল না। অভিজাত পরিবারের বাড়ির বাইরে যেতো না বললেই চলে। অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো। সমাজে যৌতুক প্রথা প্রচলিত ছিল। বরপক্ষ আর্থিক স্বচ্ছলতায় যৌতুক হিসেবে নগদ অর্থই অধিক পছন্দ করতো। বর্তমানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা এখন শিক্ষিত। শিক্ষা গ্রহণ ও দক্ষতা অর্জন করায় তারা কর্মক্ষম ও অপেক্ষকৃত সচেতন। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও এনজিওর সহায়তায় অনেক নারী উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকের প্রকল্পে গ্রামে অনেক নারী গবাদিপশু পালন, হস্তশিল্প ও ছোট দোকান পরিচালনা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। মেয়েদেরকে অল্প বয়েসে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ছিলো খুব বেশি যা এখন অনেকটাই কমে এসেছে। তবে কনে পক্ষ হতে এখন আর সরাসরি যৌতুক নেওয়া হয় না। যৌতুকের স্থলে উপহার শব্দটি অধিক প্রযোজ্য। গ্রামবাসী মনে করেন, এতে করে কনেপক্ষের উপর চাপ আরো বেড়েছে।

গ্রামীণ রাজনীতি:

[৬] বাবু শৈলেন্দ্রনাথ বাইন (৭৫), ব্যবসা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: হৃদয় বাইন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকারদাতার বাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

[৭] সাক্ষাৎকার: মো: শহিদুল ইসলাম (৫৫), চাকুরি, বরিশাল সদর, বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: ইসরাত জাহান ইথিকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজ বাড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

[৮] সাক্ষাৎকার: মো: রফিকুল ইসলাম (৭০) ফুলচাষী, গদখালী; মো: ওমর আলী (৬৫), গদখালী, ঝিকরগাছা, যশোর। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: রুবাইয়া তাসনিম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকারদাতার বাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

নেতৃত্বের পরিববর্তন: গ্রামে সালিশ বা পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। পঞ্চায়েত অপেক্ষা সালিশ[৯] শব্দটি অধিক প্রচলিত। বিচারের দায়িত্ব ছিল মাতবর বা মাতুব্বর হিসেবে পরিচিত ভূসম্পত্তির মালিক শ্রেণির হাতে। বিচক্ষণতা অপেক্ষা আর্থিক স্বচ্ছলতাই ছিল মাতুব্বর হিসেবে মানার প্রধান নিয়ামক। তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হতো। এই নেতৃত্ব ছিল মূলত সম্মানও প্রথার উপর নির্ভশীল। তাদের জামিদারি, বংশমর্যাদা, ধর্ম, বয়স ক্ষমতার মূল উৎস ছিল কৃষি। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এ রকম একজন মাতুব্বর থাকতেন। সাধারণত তারা নিজ গ্রামের সমস্যাই সমাধান করতেন। তবে দু'চার দশ গ্রামে তাদের নাম-ডাক ছিল। একাধিক গ্রামের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত বিষয়ে মাতুব্বররা একসাথে বসে সমস্যা সমাধান করতেন। সমস্যাগুলো ছিল খুবই সাধারণ যেমন-জমি নিয়ে প্রতিবেশী কিংবা ভাইদের মধ্যে গণ্ডোগল, চুরি, অনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে গিয়ে ধরা পড়া প্রভৃতি। ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করেও একাধিক গ্রামে সংঘর্ষ হতো।

বিগত কয়েক দশকে এ চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আধুনিক আইনি ব্যবস্থার কারণে ঐতিহ্যবাহী সালিশি ব্যবস্থার প্রভাব কমে গেছে। নব্বই-এর দশকের পর থেকেই গ্রামীণ রাজনৈতিক কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে ব্যাপকভাবে। মানুষ এখন ছোটখাটো বিষয়েও ইউনিয়ন পরিষদ বা আদালতের দ্বারস্থ হয় ফলে মাতুব্বর শ্রেণির সেই একচ্ছত্র ক্ষমতা এখন আর নেই। তাদের স্থান দখল করেছে জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতারা।

দলীয় রাজনীতির প্রভাব ও বিভাজন:

পূর্বে রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিল জমিদার ও প্রভাবশালী পরিবাবরের হাতে থাকায় সাধারণ জনগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারতো না বরং নেতাদের অনুসারি হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকতে হতো। গ্রামীণ রাজনীতির সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এখন গ্রামীণ রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পূর্বে এ নির্বাচন যতটা না রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশি ছিল ব্যক্তিত্ব ও পারিবারিক প্রভাবের বিষয় কিন্তু বর্তমানে নির্বাচনে দলীয় প্রতীক গ্রহণের পর জাতীয় রাজনীতি গ্রামে প্রবেশ করেছে।[১০] গণমাধ্যম, টেলিভিশন, টকশো এবং বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে গ্রামের সাধারণ মানুষ এমনকি চায়ের দোকানের আড্ডাতেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিরোধীদলের ভূমিকা সবকিছুই তাদের আলোচনার বিষয়। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে পুরোনো বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্কে ফাটল ধরার উদাহরণও বিরল নয়। বর্তমানে মুরুব্বীদের উপর আস্থা থাকলেও আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তরুণপ্রজন্ম রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। গ্রামীণ রাজনীতি ক্রমশ উন্নয়নমূলক হয়ে উঠেছে। সড়ক, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন রাজনৈতিক প্রচারণার মূল বিষয় হয়ে উঠে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গ্রামগুলো প্রধানত দুটি বা একাধিক রজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তি শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় থাকে না বরং তা সারাবছর সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে।[১১] সরকারি বরাদ্দ, বয়স্কভাতা ও বিধবাভাতা প্রভৃতি সুবিধা এখন অনেকটাই রাজনৈতিক বিবেচনায় বন্টিত হয়। সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে এ সকল বিষয়ে অভিযোগ উঠে যে পূর্বে এগুলো সামাজিক বিবেচনায় বন্টিত হতো। এ সচেতনতা যেমন ইতিবাচক তেমনি এটি গ্রামীণ সমাজে নতুন ধরনের বিভাজন তৈরি করেছে।

অর্থনীতি:

[৯] সালিশ গ্রামের বহু পুরোনো প্রথা। ব্যক্তি মালিকানা, কর্তৃত্ব যতদিন থেকে এসেছে ততদিন থেকেই সম্ভবত সালিশ প্রথা রয়েছে। সালিশ প্রতি সপ্তাহেই গ্রামে একটি দু'টি বসে। সালিশে যেসব বিচার আসে গুলো আপাত দৃষ্টিতে খুবই তুচ্ছ মনে হয়। আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি* (ঢাকা: মীরা প্রকাশন), পৃ. ৪৮।

[১০] সাক্ষাৎকার: শচীন্দ্রনাথ ঘোষ (৬৫), ব্যবসায়ী, চুয়াডাঙা। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: কুমারি টুম্পা ঘোষ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

[১১] দলগত সাক্ষাৎকার: মো: রেজাউল করিম (৬৮), কৃষি, কেল্লাই; মো: ফজলুল হক (৭৫), কৃষি, কেল্লাই; মো: শাহজাদা মিয়া (৭০), গৃহস্থ, ঘিওর। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: রিজওয়ানা কারীম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকারদাতা মো: রেজাউল করিমের বাড়ি, ৫ অক্টোবর, ২০২৫।

যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি হলো তার গ্রামীণ অর্থনীতি। সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনধারা এবং উৎপাদন পদ্ধতিতে এসেছে পরিবর্তন। একসময় যে গ্রামগুলো ছিল মূলত সনাতন ও জীবনধারণ নির্ভর কৃষির উপর নির্ভরশীল তা আজ অধুনিক ও বাণিজ্যিক ও বহুমুখী অর্থনীতির দিকে ধাবিত।

বহুমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তরঃ

গ্রামে আগে সনাতন পদ্ধতিতে চাষ হতো ফলে ফসল উৎপাদন কম হতো। কৃষিকাজে তখন গরু, কাঠের লাঙল ব্যবহার করা হতো। সেচব্যবস্থা ছিল সীমিত ফলে চাষাবাদ অনেকাংশে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। ধান ও পাটের দাম বাজারে সবসময় স্থিতিশীল থাকতো না ফলে কৃষকদের বার্ষিক আয় কম এবং অনিশ্চিত ছিল। কৃষিকাজের বাইরে গ্রামের আয়ের অন্যান্য সুযোগ ছিল খুব সীমিত। ফলে বছরের একটি বড় সময় তাদের হাতে কাজ থাকতো না। মোবাইল ও ইন্টারনেটের মতো প্রযুক্তি গ্রামে পৌঁছায়নি। কৃষি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

সেবা ও শিল্পখাতঃ

গ্রামের মানুষ প্রধানত কৃষিকাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধান, পাট, গম, ডাল ও বিভিন্ন সবজি চাষই ছিল মানুষের প্রধান জীবিকা ও আয়ের উৎস।[১২] কিন্তু বর্তমানে কৃষির পাশাপাশি মানুষ বিকল্প আয়ের পথ খুঁজতে শুরু করেছে। বর্তমানে তারা শুধু কৃষির উপর নির্ভরশীল না থেকে অকৃষিজখাতে পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। গ্রামে ছোট ছোট দোকান, ওয়ার্কশপ, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। কৃষিকাজে উন্নত বীজ, হারভেস্টার ও স্প্রে মেশিন ব্যবহারের ফলে একই কাজে মানুষের সময় কম লাগছে এবং বাকী সময় অন্য কোনো অর্থনৈতিক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারছে। বর্তমানে বিভিন্ন সেবা ও ছোট শিল্পকার্যক্রম তাদের আয়ের নতুন উৎস হয়ে উঠেছে। দোকান, ফর্মেসি, জেন্টস পার্লার, মোবাইল সেবা, পরিবহন এসব সেবাখাত মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও কর্মসংস্থান তৈরি করছে। একই সঙ্গে হস্তশিল্প, সেলাই, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পোল্ট্রি ও দুগ্ধ শিল্পের মতো ক্ষুদ্র শিল্প গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও গতিশীল ও স্বনির্ভর করছে। গ্রামের অনেক যুবক শিক্ষা ও উন্নত জীবিকার জন্য বিদেশ যাচ্ছে। চাকরির জন্য তারা বিভিন্ন নির্মাণ ও সেবাখাতে কাজ করে তাদের অর্জিত অর্থ গ্রামে প্রেরণ করছে। প্রেরিত অর্থদিয়ে তাদের পরিবার উন্নত জীবনযাপন করছে। ঘরবাড়ি নির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, ব্যবসার সম্প্রসারণ করতে পারছে। এ অর্থ শুধু সেই ব্যক্তির পরিবারের অর্থনীতি উন্নত করছেনা। পাশাপাশি সমগ্র গ্রামের অর্থনীতিকে উন্নত করছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণঃ

বর্তমানে গ্রামে নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে বসবাসকারী চাকুরীজীবী নারীরা যেমন আয় করছেন তেমনি তাদের স্বামীদেরও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে সহায়তা করছেন। চাকুরিসুত্রে তারা গ্রামে থাকায় স্বামী-স্ত্রী মিলে স্থায়ী কোনো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে নতুন-নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করছে।

ডিজিটাল সেবা ও প্রযুক্তির ব্যবহারঃ

গ্রামে ডিজিটাল সেবা ও প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করেছে। মোবাইল ব্যাংকিংসহ অন্যান্য অনলাইন লেনদেন, ই-কমার্স, কৃষি অ্যাপ, ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্যসেবা সুবিধা গ্রামের মানুষকে সহজে ব্যবসা ও লেনদেন করতে সাহায্য করছে। এছাড়া প্রযুক্তিচর্চা, তথ্যপ্রাপ্তি এবং আধুনিক কৃষি ও সেবাখাতে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। ফলে গ্রামের অর্থনীতি আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও বহুমুখী হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃতিঃ

[১২] সাক্ষাৎকার: অপু পোদ্দার (৫৬), ব্যবসায়ী, ভওয়াখালী। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: অর্পিতা পোদ্দার মৌ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজ বাড়ি, ১০ অক্টোবর, ২০২৫।

খেলাধুলা:

কয়েক দশক আগে গ্রামে বিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল খেলাধুলা। জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু হলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। স্কুল পর্যায়ে কিংবা গ্রামভিত্তিক ফুটবলে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করতো। বর্ষাকালে উঠতি বয়সের কিশোররা বৃষ্টি-কাদা উপেক্ষা করেই ফুটবল খেলা চালিয়ে যেতো। প্রায় প্রতিমাসেই বিবাহিত এবং অবিবাহিতদের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হতো। অলস সময় কাটানোর জন্য তাস খেলা ছিল জনপ্রিয় মাধ্যম। বাড়িতে কিশোরীরা লুডু খেলতো। পূর্বে গ্রামে লাঠিখেলার ব্যপক প্রচলন ছিল। ঢোলের তালে তালে লাঠি খেলা হতো। এ খেলাতে কখনো কখনো লাঠির পরিবর্তে তলোয়ার ও ঢাল ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে খেলাটির প্রচলন নেই বললেই চলে। তবে মাঝে মাঝে কোনো অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে স্বল্প সময় এই খেলাটি খেলা হয়। এছাড়া আগে সাপ খেলা হতো যা স্থানীয়ভাবে ঝাপান নামে পরিচিত। এই খেলাটিও বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায়। এছাড়া ঘোড় দৌড় আয়োজন করা হতো। বর্তমান সময়ে গ্রামে ক্রিকেট, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল প্রভৃতি খেলা হয়। মাঝে মাঝে বিবাহিত ও অবিবাহিতদের মধ্যে ফুটবল খেলা হয়।[১৩]

টেলিভিশন দেখা ছিল বিনোদনের আরেকটি মাধ্যম। প্রথমদিকে টেলিভিশন ছিল শুধুমাত্র গ্রামের বাজারগুলোতে। লোকজন স্থানীয় বাজারেই টেলিভিশন দেখতে যেতো। পরবর্তীতে গ্রামের সৌখিন ব্যক্তিরা আর্থিক সক্ষমতা সাপেক্ষে টেলিভিশন কিনেছিল। নারী-পুরুষ সকলেই টেলিভিশন দেখতে আগ্রহী ছিল। গ্রামের সকল বাড়িতে টেলিভিশন ছিল না। পুরো গ্রামে কিংবা একাধিক গ্রামে একটি বা দু'টি সাদাকালো টেলিভিশন ছিল। প্রতি শুক্রবার সাধারণত বাংলা সিনেমা হতো। অতি উৎসাহে লোকজন সিনেমা দেখতো। রাতে জনপ্রিয় সিরিজ যেমন-আলিফ লায়লা প্রভৃতি উপভোগ করতো। কোনো বাড়িতে রেডিও ছিল যার মাধ্যমে অডিও বিনোদন গ্রহণ করতো। স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ছিল কল্পনার বাইরে। বর্তমান সময়ে একই পরিবারে একাধিক স্মার্ট ফোন রয়েছে। প্রত্যেক সদস্য তার ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী বিনোদন গ্রহণ করেন।

ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান:

গ্রামের অন্যতম মিলনমেলা হলো শীতকালীন ইসলামী মাহফিল। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণত ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় গ্রামের বাইরে থাকা পরিবারের সদস্য যারা কিনা শিক্ষা কিংবা কাজের উদ্দেশ্যে শহরে ছিল তারাও বাড়িতে এসে ওয়াজ-মাহফিলে যোগ দেয়। ইসলামী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিবহিত মেয়েরা তাদের বর এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে বাবার বাড়িতে আসে। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত দেওয়া হয়।

আগে একাধিক গ্রাম মিলে একটি মাত্র ঈদগাহ ময়দান ছিল। কিন্তু এখন ঈদগাহ ময়দানগুলো বেশ কাছাকাছি। বাৎসরিক মিলনমেলার এ জৌলুস অনেকাংশেই দেখা যায় না। পূজো-পার্বণ উপলক্ষে আয়োজিত মেলাতে হিন্দু-মুসলিম সকলেই একসাথে উপভোগ করে থাকেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিয়েতে মুসলমানরা আগ্রহ সহকারে দেখতে গেলেও মুসলিম বিয়েতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপস্থিত খুবই নগণ্য।

খাদ্যাভাস ও পোশাক পরিচ্ছদ:

গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে পুরুষরা লুঙ্গি, শার্ট পরিধান করে। অপেক্ষাকৃত মুরুব্বিরা সাধারণত লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পড়ে থাকেন। তবে ফতুয়া পড়ারও প্রচলন রয়েছে। গ্রামের কৃষিজীবী পরিবারের পুরুষরা সাধারণত বাড়িতে ও বাইরে বেশিরভাগ সময় লুঙ্গি পড়েন।[১৪] চাকুরিজীবীরা বাড়ি থেকে বের হলে প্যান্ট পড়তেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তরুণরা আগে লুঙ্গি পড়লেও বর্তমানে জিন্স প্যান্ট, টি শার্ট কিংবা আধুনিক ডিজাইনের শার্ট পড়ে থাকেন। গ্রামে বড় হওয়া শিক্ষার্থীরা যারা বর্তমানে পড়াশোনা সংক্রান্ত কাজে শহরে কিংবা বাড়ির বাইরে থাকেন তারা বাড়িতে থাকা ভাই

---

[১৩] সাক্ষাৎকার: মা: রমজান আলী মোল্লা (৭৮), গৃহস্থ, পুষ্পকাঠি; বিজন সরদার (৮০), গৃহস্থ, পুষ্পকাঠি। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: বৃষ্টি রাণী দাস। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ৫ অক্টোবর, ২০২৫।

[১৪] দলগত সাক্ষাৎকার: গোপাল চন্দ্র ঘোষ (৫৮), ব্যবসায়ী, ছনকা; রেজাউল করিম (৫১), ব্যবসায়ী, ছনকা; দীলিপ পরি (৪৫), ব্যবসায়ী, ছনকা। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: তিমন ঘোষ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার দাতা গোপাল চন্দ্র ঘোষের বাড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

বোনের জন্য আধুনিক ডিজাইনের জামাকাপড় কিনে থাকেন। গ্রামীণ নারীরা শাড়ির পাশাপাশি এখন সালোয়ার-কামিজ কিংবা ম্যাক্সি ব্যবহার করেন। গ্রামে বর্তমানে শুধুমাত্র বয়স্ক নারীদের মধ্যেই শাড়ীর ব্যবহার দেখা যায়।[১৫]

খাদ্যাভাসের ক্ষেত্রেও এসেছে ব্যপক পরিবর্তন। একসময় সকালের প্রধান খাবার ছিল ভাত। কৃষক সাধারণত খুব ভোরে আগের রাতের রান্না করা অতিরিক্ত ভাত খেয়েই মাঠে চলে যেতেন। ভাত না থাকলে চিড়া-গুড় কিংবা মুড়ি খেয়ে মাঠে যেত। পরিবারের গৃহিনী কিংবা অন্য সদস্য সকালের নাস্তা নিয়ে আবার মাঠে যেতো। দুপরের খাবার সাধারণত মাঠের কাজ সেরে বাড়িতে এসে খেতে হতো। বেশির ভাগ সময়ই দুপুরের খাবার খেতে খেতে বিকেল হতো। দুপুরের খাবারে সাধ্যমতো ভালো তরকারি থাকতো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা মাছে সীমাবদ্ধ থাকতো। অঞ্চলভেদে গ্রামীণ হাটবারে বাজার করতে হতো। উৎপন্ন শস্যের একাংশ বিক্রি করেই হাটবারে বাজার করা হতো। বাজারের দিন রাতে অপেক্ষাকৃত ভালো রান্না হতো।[১৬]

সকালের নাস্তায় এখন বেশ পরিবর্তন এসেছে। স্বাস্থ্যসচেতন পরিবারগুলো সকালের নাস্তায় ডিম, আটার রুটি, পাউরুটি কিংবা প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার খায়। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ফ্রিজ থাকার কারণে ভাত-মাছের পাশাপাশি মুরগি ও গরুর মাংসের চাহিদা বাড়ছে। কৃষক পরিবারের কর্তা ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে নিকটবর্তী বাজার থেকে ডিম-পরটা কিনে খেয়ে থাকেন। বিকেলে এখন গ্রামে ফাস্টফুডের চাহিদা বেড়েছে। তরুণরা পেশা হিসেবে চটপটি, ফুচকার দোকান দিয়েছে। এছাড়া শিশুদের জন্য নুডলস, চিপস এবং বড়দের মধ্যে গরমের দিনে বোতলজাত পানীয় গ্রহণের পরিমাণ বাড়ছে।[১৭] গ্যাসের চুলা ও উন্নত বাজারজাতকরণের ফলে রান্নার ধরনেরও পরিবর্তন এসেছে। আধুনিকতার প্রভাবে গ্রামীণ জনগণের পোশাক ও খাদ্যাভাস বৈচিত্রময় ও উন্নত হয়েছে।

গ্রামীণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলাফল:

রাজনৈতিক:

গ্রামের রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিবর্তনের ফল সবচেয়ে দৃশ্যমান। আগে গ্রামীণ রাজনীতি ছিলো প্রভাবশালী পরিবারের হাতে সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ ভোট দিলেও সিদ্ধান্তে অংশ নিতে পারতো না। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক সচেতনতা ও শিক্ষা বৃদ্ধির ফলে জনগণ নিজের মতামত প্রকাশে সাহসী হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক। নারী ও তরুণ প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, যা রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকে প্রসারিত করেছে। এতে রাজনৈতিক চর্চা স্থানীয় পর্যায়ে দৃঢ় হয়েছে। মানুষ এখন নেতার কাছে জবাবদিহিতা দাবি করছে, উন্নয়ন প্রকল্পে স্বচ্ছতা বাড়ছে। তবে এর পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনও কখনও দলাদলি ও সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করছে যা গ্রামীণ সম্প্রীতির জন্য চ্যালেঞ্জ।[১৮] তবুও সার্বিকভাবে এই পরিবর্তন রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করেছে।

সামাজিক জীবন:

[১৫] দলগত সাক্ষাৎকার: মোছা: সালেহা খাতুন (৬৯), গৃহিনী, নলকূড়া; আব্দুর রহিম খন্দকার (৭২), গৃহস্থ, নলকূড়া; মো: জাহির শেখ (৭৫), কৃষি, নলকূড়া। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: মিথিলা ইসরাত। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ২২ অক্টোবর, ২০২৫।

[১৬] দলগত সাক্ষাৎকার: ফুলি বেগম (৬০), গৃহিনী, হাবিব নগর; জব্বার সরদার (৭৬), গৃহস্থ, হাবিব নগর; রুস্তম আলী গাজী (৪৫), কৃষক, হাবিব নগর; কামরুল গাজী (৪২) ব্যবসায়ী, হাবিব নগর; শেখ লাকী (৫৫), ইউপি সদস্য। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: জুবায়ের রানা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ১০ অক্টোবর, ২০২৫।

[১৭] সাক্ষাৎকার: শাহজাহান হওলাদার (৫৬), শিক্ষকতা, গৈলা; মো: মনসুর আলী (৫০), কৃষি, গৈলা। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: আশিকুর রহমান। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ১৫ অক্টোবর, ২০২৫।

[১৮] সাক্ষাৎকার: ইদ্রিস আলী (৬০), কৃষি, বরিশাট; খলিলুর রহমান (৬৫), গৃহস্থ, বরিশাট। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: রায়হানা আফরোজ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ১০ অক্টোবর, ২০২৫।

সামাজিক পরিবর্তনের ফলে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা আধুনিক, সচেতন ও সংগঠিত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগের উন্নতির কারণে মানুষের জীবনমান বেড়েছে। আগে যেখানে গ্রামীণ সমাজে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও বৈষম্য ছিলো প্রকট, এখন সেগুলো অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে পারিবারিক সিদ্ধান্তে নারীর ভূমিকা বেড়েছে। সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান মর্যাদা পাচ্ছে। তবে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু নেতিবাচক প্রভাবও এসেছে যেমন-আত্মীয়তার বন্ধন ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রবণতা কিছুটা দুর্বল হয়েছে, মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হচ্ছে। তবুও বলা যায়, এই পরিবর্তনের ফলে একটি উন্নয়নমুখী, সচেতন সমাজ গড়ে উঠছে।

অর্থনৈতিক:

প্রবাসী আয়, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের বিস্তারের ফলে গ্রামের অর্থনীতি নতুন প্রাণ পেয়েছে। কৃষিনির্ভর জীবন থেকে মানুষ এখন ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিক্ষাক্ষেত্র ও সেবাখাতে যুক্ত হচ্ছে। অনেক পরিবার এখন স্বচ্ছল জীবনযাপন করছে। গ্রামে নতুন বাজার, দোকানপাট, স্কুল, পাকা রাস্তা ও মসজিদ গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এই ফলেই দারিদ্র্য ও বেকারত্ব অনেক কমেছে। তবে এর সঙ্গে গ্রামীণ বৈষম্যও কিছুটা বেড়েছে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, আর দরিদ্ররা পিছিয়ে পড়ছে। তবুও সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তন গ্রামের সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করেছে এবং মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে।

শিক্ষা ও সচেতনতা:

শিক্ষার প্রসার গ্রামীণ সমাজে এক বিপ্লব ঘটিয়েছে। শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হার বেড়েছে এবং মেয়েদের শিক্ষায় আগ্রহ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রায় প্রতিটি পরিবার তাদের সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় পাঠাতে আগ্রহী। শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম সমাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে, কেউ শিক্ষকতা করছে আবার কেউ সরকারি চাকরিতে যাচ্ছে। এর ফলে মানুষের মধ্যে অধিকার সচেতনতা, নাগরিক দায়িত্ববোধ ও সামাজিক ন্যায়ের ধারণা বেড়েছে। তবে আধুনিক শিক্ষা ও শহুরে জীবনধারার প্রভাবে কিছু তরুণ গ্রামের ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ছে, যা সাংস্কৃতিক ভারসাম্যের জন্য উদ্বেগজনক। তবুও শিক্ষা গ্রামের উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক ফলাফল হিসেবে বিবেচিত।

সংস্কৃতি:

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গ্রামগুলো এখন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক মিশ্র সমাজে পরিণত হয়েছে। আগে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ছিল পালাগান, বাউল সঙ্গীত, নাট্য আয়োজন ও ধর্মীয় উৎসবকেন্দ্রিক সামাজিক মিলন।[১৯] এখনো সেই ঐতিহ্য রয়ে গেছে, কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যম সংস্কৃতিকে নতুন রূপ দিয়েছে। তরুণরা এখন নিজস্ব সঙ্গীত, ভিডিও ও নাটক তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এতে সংস্কৃতির নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে, তবে পাশ্চাত্য প্রভাবের কারণে কিছু ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। অনেকে স্থানীয় লোকসংস্কৃতিকে গ্রাম্য ভাবছে, যা সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের জন্য চ্যালেঞ্জ। তবুও সার্বিকভাবে বলা যায়, গ্রামের সংস্কৃতি এখন অধিক মুক্ত, অংশগ্রহণমূলক ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে।

ধর্মীয় ও নৈতিক:

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের একটি ভারসাম্য রক্ষা করেছে। আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি শিক্ষা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পেয়েছে। মসজিদ-মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়েছে, ওয়াজ-মাহফিল, ইসলামী বক্তৃতা ও দাওয়াতি কার্যক্রম মানুষকে নৈতিক পথে উৎসাহিত করছে। তবে কিছু তরুণ আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাবে ধর্মীয় চর্চায় অনাগ্রহী হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে নৈতিক সংকটের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ গ্রামের সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নারীর অবস্থান:

[১৯] সাক্ষাৎকার: আব্দুর রহমান (৫০), গৃহস্থ, পুলুরিয়া। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: আশিক হোসাইন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ২৫ অক্টোবর, ২০২৫।

নারী এখন আর শুধু গৃহস্থালির কাজে সীমাবদ্ধ নয় তারা শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও অগ্রগামী। নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের সংখ্যা বেড়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামত সম্মান পাচ্ছে। এতে পরিবারে সমতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ছে। সমাজে নারীর মর্যাদা বেড়েছে এবং শিশুশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সচেতনতায় নারীরা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে কর্মব্যস্ততার কারণে পারিবারিক সম্পর্ক ও ঐতিহ্যবাহী ভূমিকার পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছে। তবুও নারীর উন্নয়ন গ্রামের সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম সফল ফলাফল।

প্রযুক্তি ও যোগাযোগ:

প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গ্রামগুলো এখন ডিজিটাল সংযোগে যুক্ত। মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন কেনাবেচা, অনলাইন শিক্ষা এবং সোশ্যাল মিডিয়া যোগাযোগ মানুষকে সময় ও দূরত্বের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করেছে। তরুণ প্রজন্ম এখন প্রযুক্তিনির্ভর চাকরি ও উদ্যোক্তা কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে। এতে কর্মসংস্থান বাড়ছে, পাশাপাশি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে উঠছে। তবে প্রযুক্তির অপব্যবহার যেমন ভুয়া তথ্য, সময় অপচয় ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতো সমস্যা তৈরি করছে। তারপরও প্রযুক্তি গ্রামের আধুনিকায়ন ও সচেতনতার ক্ষেত্রে এক অনন্য ইতিবাচক ফলাফল এনে দিয়েছে।

পরিবেশ ও জীবিকা:

জলবায়ু পরিবর্তন ও হাওরাঞ্চলের প্রকৃতি গ্রামের অর্থনীতি ও জীবনধারায় প্রভাব ফেলেছে। কৃষি মৌসুমের অনিশ্চয়তা মানুষকে বিকল্প জীবিকায় ঠেলে দিয়েছে, যেমন- ব্যবসা, চাকরি ও প্রবাসে যাওয়া। এর ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী কৃষি সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে মানুষ এখন পরিবেশ সচেতন হয়েছে, বৃক্ষরোপণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে অংশ নিচ্ছে। পরিবেশ সংক্রান্ত এই সচেতনতা গ্রামীণ উন্নয়নকে টেকসই করেছে।

সামাজিক মূল্যবোধে:

আধুনিকতার প্রভাবে মানুষের চিন্তা, আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কেও পরিবর্তন এসেছে। আগে গ্রামীণ সমাজে ছিলো পারস্পরিক সহানুভূতি, অতিথিপরায়ণতা ও সম্মিলিত সামাজিকতা–এখন তা অনেকাংশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে।[২০] তবে একই সঙ্গে মানুষ এখন মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও সামাজিক সমতার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। ন্যায়বোধ, সহনশীলতা ও মানবিকতার ধারণা বেড়েছে। সুতরাং, সামাজিক মূল্যবোধের এই পরিবর্তন একদিকে ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করছে, অন্যদিকে মানবিক সমাজ গঠনের সুযোগ তৈরি করছে।

উপসংহার:

সামষ্টিক আলোচনায় বোঝা যায়, গ্রামীণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারা মূলত সময়ের দাবি ও উন্নয়নের ফলাফল। এই পরিবর্তন গ্রামকে করেছে প্রগ্রতিশীল। গ্রামের মানুষ এখন অধিক সচেতন, সংগঠিত ও আত্মনির্ভরশীল। গ্রামীণ সমাজ একসময় প্রথাগত ধীরগতিও সীমাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে ছিল। পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সমাজের প্রতিচ্ছবি যা জাতীয় রাজনীতি ও বিশ্বায়নের প্রভাব বহন করছে। অধিক উৎপাদিত ফসল এবং রেমিটেন্স গ্রামের গতিপথ নির্ধারণ করছে। অন্যদিকে প্রযুক্তির কল্যাণে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এলেও স্থানীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যাবোধের সাথে আধুনিকতা একধরনের সমন্বয় সাধিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলো গ্রামের জন্য নতুন সম্ভবনা তৈরি করছে তেমনি পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক বৈষম্যের মতো চ্যালেঞ্জও নিয়ে এসেছে। তবে গ্রামীণ কিংবা শহর সকল ক্ষেত্রেই আধুনিকতার এই স্রোতে ঐতিহ্য, মানবিক মূল্যবোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা জরুরি।

---

[২০] সাক্ষাৎকার: আব্দুল মান্নান মোল্যা (৬০), গৃহস্থ, বড়বাড়ি; আব্দুল ছাত্তার বিশ্বাস (৫৫), ব্যবসায়ী, বড়বাড়ি। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: বাপ্পি ইসলাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নিজবাড়ি, ২০ অক্টোবর, ২০২৫।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 394- 401
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.221

গোপভূমের ঐতিহ্যে আল্পনা গ্রাম লবন্ধার

রুদ্রনীল চোংদার, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, গুসকরা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.10.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Dakshina Rarh Bengal was identified as 'Gopbhum' in ancient times. Dakshina Rarh region refers to Ajay in the north, Damodar in the south, Ganga in the east and Santal Pargana in the west. This region is identified as Gopbhum from the habitat of the Gop people. 'Gop' means one who raises cows/Goala. Since the cowherd cow breed has developed in the forested environment of the Ajay-Damodar Doab region, it has become known as 'Gopbhum'. This Gopbhum is rich in archaeological resources and historical monuments. Alpana village Labhandhar under Devshala Panchayat is located in this Gopbhum in district of Purba Bardhaman. Although the village is not very large in size, the entire village has mural paintings of various natural and unnatural subjects of various colors and several temples that are more than three hundred years old, deep forests filled with various trees and shrubs, and this village is home to various animals and birds. The entire village is like a canvas. Coming to such a different environment really fills the mind. Peacocks, sandalwood, partridges, Indian Wolf, hyenas and other species of animals and birds are often seen here. A private organization called Labhandar Annapurna Welfare Association (LAWA) is committed to protecting the village's heritage and jungle habitat.

Keywords: Rarhbhum, Gopbhum, Gopchandra, Mural Painting, LAWA, One story and Two-story Temple, Terracotta

'গোপভূম' বলতে বোঝায় প্রাচীনকালে দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলকেই। মূলত দক্ষিণরাঢ় হল যার উত্তরে অজয় নদ, যা অজাবতী বা ঋজুপালিকা নদী নামেও পরিচিত। গ্রিক ভাষায় অজয় নদের নাম হল আমিস্টিস। দক্ষিনে দামোদর নদ, যা আদিবাসীদের কাছে দেও নদ নামে পরিচিত। তারা মৃতদেহের অস্থি বিসর্জন দিত দেওনদীর পবিত্র জলে। এই দামোদরের তীরেই নব্য প্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র বীরভানপুর অবস্থিত।মোটকথা বর্ধমান জেলার অজয়-দামোদর নদের মধ্যবর্তী বেশ কিছু অংশকেই বলা হয় 'গোপভূম'। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত। দ্বিগবিজয় প্রকাশ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

'অজয়াদ্দক্ষিণে ভাবে শিলাবত্যাশ্চ হুত্তুরে
গঙ্গায়া: পশ্চিমে পারে দারিকোশহি পূর্ববত:'

অর্থাৎ দক্ষিণে অজয় উত্তরে শিলাবতী পশ্চিমে গঙ্গা আর পূর্বে দ্বারকা নদীই হলো গোপভূমের সীমানা।[১] সাধারণত বলা যায় মল্ল রাজাদের (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) বাসভূমি থেকে 'মল্লভূম', সেন রাজাদের বাসভূমি থেকে 'সেনভূম', আর বীর জাতির বাসভূমি থেকে 'বীরভূম' যদি হয়। তাহলে গোপ জাতির বাসভূমি থেকে 'গোপভূম' এভাবে ব্যাখ্যা করা

যেতে পারে। বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়- 'গো' শব্দের অর্থ গরু আর তাদের প্রতিপালন করে যে সম্প্রদায় তাদের 'গোপ' অভিধায় ভূষিত করা হয় এবং তাদের বাসস্থান স্বাভাবিক ভাবেই পরিচিত হয় 'গোপভূম' নামে।[২] বিহারের আদিবাসীদের দেওয়া 'দা-মুন্ডা'/ 'Dah Mondah' (মুন্ডাদের জল) শব্দ থেকে দামোদর কথাটি এসেছে। দামোদরের মোট দৈর্ঘ্য ৫৯২ কি.মি, এর মধ্যে ৩১০ কি.মি পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বিহারের পালামৌ জেলার ছোটনাগপুর পাহাড়ের চান্দওয়া গ্রামের কাছে উৎপন্ন হয়ে দামোদর পুরুলিয়া-পাঞ্চেত অতিক্রম করে বর্ধমানে প্রবেশ করেছে, অনেকবার গতি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দামোদর নদী হুগলি ও হাওড়া জেলায় ঢুকে হাওড়ার গড়ুরমুক হয়ে শিবগঞ্জ গ্রামের কাছে হুগলি নদীতে মিশেছে। দামোদরের তিনটি উল্লেখযোগ্য খাত হল- বাঁকা, খড়ি ও বেহুলা।[৩] বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমা নির্দেশকারী অজয় নদের দক্ষিণ তটভূমিতে অবস্থিত পান্ডবেশ্বর, নবগ্রাম, মঙ্গলকোট, কেন্দুলী, কাটোয়া প্রভৃতি জন-এলাকার মধ্য দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে। অজয় উৎপত্তি বিহারের জামুই জেলায়। এরপর অজয় নদ ঝাড়খন্ড হয়ে পশ্চিম বর্ধমানের চিত্তরঞ্জনের নিকট প্রবাহিত হয়ে নতুনহাটে আরেক নদী কুনুর নদীর সাথে মিলে কাটোয়ায় ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছে।

অতি প্রাচীনকালে অজয়-দামোদরের দোয়াব অঞ্চলের অরণ্য ঘেরা পরিবেশে গোপালক গোপ জাতির বসবাস গড়ে ওঠায় তা 'গোপভূম' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রত্নসম্পদ ও ঐতিহাসিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ এই গোপভূম। এই এলাকায় রয়েছে পান্ডু রাজার ঢিবি, ভরতপুর বৌদ্ধস্তূপ, ইছায় ঘোষের মন্দির, গড় জঙ্গলের মহিষমর্দিনী, কালিকাপুর রাজবাড়ী, বন নবগ্রাম রাজবাড়ি, লবন্ধার আলপনা গ্রাম, অমরাগড়ের মন্দিরসমূহ, দিগনগরের জল টুঙ্গী, অরণ্য সুন্দরী ভালকি-মাচান এবং মন্দিরময় মৌখীরা গ্রাম, দেবী মঙ্গলচন্ডী থান, বৈষ্ণব কবি লোচন দাসের সমাধি, কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের বাসগৃহ, হোসেন শাহী মসজিদ,বিক্রমাদিত্যের ঢিপি, দানেশ মন্দ খাঁয়ের সমাধি প্রভৃতি। নব্য প্রস্তর ও তাম্র প্রস্তর যুগের বিভিন্ন নিদর্শন মিলেছে এই অঞ্চলে। উদাহরণ- নডিহা, বীরভানপুর, মঙ্গলকোট, পাণ্ডুক ইত্যাদি।

খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুত্থানের সময় জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এই সময় রাঢ় অঞ্চলে প্রভাবশালী জমিদার গোপচন্দ্র নিজেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন স্থানীয় জমিদার হয়ে ওঠেন স্থানীয় রাজা। প্রসঙ্গত বলা যায় দুই বর্ধমান জেলা হলো রাঢ়র মূল কেন্দ্র এবং প্রাচীন গোপভূমিরই অংশ।[৪] মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র ছিলেন গোপভুমেরই স্বাধীন নৃপতি। একাদশ শতকে ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ নামে আর এক গোপরাজার সন্ধান পাওয়া যায়। তার রাজধানী ছিল গড়-জঙ্গল। ইছাই ঘোষের সময়েই গোপভূমিতে গোপ ও সদগোপ সম্প্রদায়ের আধিপত্য আরো সুদৃঢ় হয়। ইছাই ঘোষের পর গোপভূমিতে রাজত্ব করেন মহেন্দ্রনাথ। লোকমুখে তিনি 'মাহিন্দী রাজা' নামে খ্যাত ছিলেন।[৫] তাঁর রাজধানী ছিল ভালকি-মাচান। তিনি অমরাগড়কে (মানকরের কাছে) কেন্দ্র করে রাজ্য শাসন পরিচালনা করতেন।

সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলায় মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলায় গোপ রাজত্বের অবসান ঘটে। বর্ধমান রাজবংশের আদি পুরুষ সঙ্গম রায়ের পুত্র আবু রায় ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের তিনটি স্থানের কোতোয়ালি লাভ করেন। পরে আবু রায়ের পুত্র বাবু রায় আরো তিনটি মৌজার সত্ত্ব লাভ করেন বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে। এভাবে অষ্টাদশ শতকে চিত্রসেন ও ত্রিলোকচাঁদের আমলে বর্ধমান রাজাদের ভূ-সম্পত্তির এলাকা এবং তাদের রাজত্বের সীমানা বহু দূর বিস্তৃত হয়। যার মধ্যে গোপরাজাদের স্মৃতি বিজড়িত অমরাগড় বা ভালকি এবং কাঁকসাও ছিল। এই গোপভূমেই অবস্থিত ক্যানভাস তথা আলপনা গ্রাম লবন্ধার। গুসকরা থেকে এই গ্রামের দূরত্ব ৩০ কি.মি এবং মানকর রেলস্টেশন থেকে দূরত্ব ১২ কি.মি। আর দুর্গাপুর থেকে ৩২ কি.মি।

পূর্ব বর্ধমানের লবন্ধার গ্রাম:

আউসগ্রাম ব্লকে অবস্থিত লবন্ধার নামক গ্রামটি। এটি ঐতিহ্যের দিক থেকে অনেক প্রাচীন হলেও বর্তমানে জনপ্রিয়তার কারণ হল গোটা গ্রামই যেন ক্যানভাস তথা রঙিন ছবির গ্রাম। এর বিশেষত্ব হল Mural Painting. আউসগ্রাম হল পশ্চিমবঙ্গের একটি বিধানসভা কেন্দ্র (২৭৩)। এই আউসগ্রাম ব্লকটি ১ নং এবং ২ নং- দুটি ব্লকে বিভক্ত। আউসগ্রাম ১ এর আয়তন হল ২২২.৩৪ বর্গ কিলোমিটার। এই ব্লকের মধ্যে রয়েছে গুসকরা, আউসগ্রাম,বন নবগ্রাম, দীঘনগর, ভোঁতা প্রভৃতি। আউসগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের আয়তন হল ৩৬০.৪৫ বর্গ কিলোমিটার। এর অন্তর্গত

জায়গাগুলি হল- অমরা গড়, দেবশালা, জিজিরা, মোরবাঁধ, এরাল, সর, ভেদিয়া প্রভৃতি। লবন্ধার গ্রামটি দেবশালা পঞ্চায়েত এবং বড়ডোবা মৌজার (২১৬) অন্তর্গত এবং জে এল নং হল ৮০৬. গ্রামের আয়তন খুব বেশি নয়, মাত্র ৮০০-৯০০ মানুষের বাস এবং প্রায় ১৫০ টি পরিবার বর্তমান। গ্রামের মূল আয়ের উৎস হল জঙ্গল। মানুষের মূল জীবিকা হল কৃষি, এছাড়া রয়েছে বিড়ি শিল্প, শালপাতা শিল্প, ঝাঁটা তৈরি, মাটির জিনিস তৈরি ইত্যাদি।

পূর্ব বর্ধমান জেলার 'আলপনা গ্রাম লবন্ধার'। আলপনা গ্রাম বলতে আমরা ঝাড়গ্রাম জেলার খোয়াব গাঁয়ের নাম শুনেছি। তবে আমাদের পূর্ব বর্ধমান জেলার ভেতর যে একটি আলপনা গ্রাম আছে, তা আমাদের মত অনেকেরই অজানা ছিল। আলপনার গ্রাম লবন্ধার হল যুগ যুগ ধরে আদিবাসী মেয়েদের মধ্যে রয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ও ঘর-গেরস্থালি সাজিয়ে তোলার একটা পরম্পরা। লবন্ধার গ্রাম যেন সেই পরম্পরাকেই নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছে। গ্রামের প্রায়শই বাড়িগুলির গায়ে আঁকা অপূর্ব সব ছবি। পথের ধারেও নজর কাড়বে দেওয়াল জুড়ে ছবির ক্যানভাস। সেইসব বুকে করেই এখন লবন্ধার হয়ে উঠছে আকর্ষণের নয়া কেন্দ্রবিন্দু।

লবন্ধার গ্রামের উৎপত্তি নিয়ে তেমন কোন নির্ভরযোগ্য উপাদান পাওয়া যায়না, যা পাওয়া যায় তা হল জনশ্রুতি এবং স্মৃতিচর্চা (Memory Studies)- এই দুটি বিষয়ের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। গ্রামবাসীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, প্রায় তিনশত বছর আগে জীবন বা জেবনা ডাকাত বড়ডোবা অঞ্চলে ঘাঁটি গেঁড়েছিল। কিন্তু সে বুদবুদ এলাকায় চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং তাঁর পূজিত দেবী কালী ঠাকুরকে কেন্দ্র করে লবন্ধার গ্রামে প্রতিবছর মাঘী অমাবস্যায় ডাকাত কালীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পৌষ সংক্রান্তিতে LAWA-র উদ্যোগে ইদানিং প্রত্যেক বছর মাটির তৈরি পুতুলের কর্মশালা আয়োজিত হয়। সেখানে গ্রামের মহিলারা মাটির পুতুলের সাথে সাথে কালীমূর্তি ও তৈরি করে থাকেন। এই ডাকাত কালীকে নিয়ে প্রত্যেক গ্রামবাসীর অনেক বিশ্বাস ও অলৌকিক কাহিনী জড়িয়ে আছে।

যাইহোক, ডাকাতের উৎপাত থেকে বাঁচতে বড়ডোবায় রায় পরিবার একটি পাখিকে ওড়ায় এবং তারা ঠিক করে পাখিটি যেখানেই বসবে সেখানেই নতুন বসতি স্থাপন করা হবে। তখন পাখিটি লবণধার গ্রামের ধর্মরাজ তলায় একটি বড় বটগাছে এসে বসে। সেখানে পরবর্তীতে বন কেটে বসতি স্থাপন করে গ্রামের নাম রাখা হয় নতুনগ্রাম। কিন্তু এই নামে আগেই অনেক গ্রামের নাম থাকায় বিভ্রান্তি এড়াতে পুকুরের পার্শ্ববর্তী থাকায় নাম রাখা হয় 'নবাধার', যা ক্রমে 'লবনধার' নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে।[৬] প্রতিবেশী গ্রামগুলি আবার গ্রামের ভাষায় বলে 'লন্ধে' বা 'নন্ধে' গ্রাম। তবে বর্তমানে গ্রামটি আল্পনা গ্রাম বা art village হিসাবেই খ্যাতি পেয়েছে। তবে এই নাম কে বা কারা দিয়েছে- তাও অজানা গ্রামবাসীদের। সুপ্রাচীন এই গ্রামের চারিপাশ ঘন-জঙ্গল দিয়ে ঘেরা শাল, সেগুন, শিশু, মহুয়া, পলাশ, পিয়াল ও শিমুলের গভীর অরণ্যের চক্রব্যূহ ভেদ করে প্রায় তিন থেকে চার কি.মি ছায়া শীতল ও পল্লী বৈচিত্র্যের পথ পেরিয়ে তবেই নাগাল পাওয়া যায়। লবণধার গ্রামের নামকরণের পিছনে নানা মতানৈক্য থাকলেও প্রকৃতিকে রক্ষা করতে সকলেই বদ্ধপরিকর।

গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষি এবং ধানই হল প্রধান ফসল। এছাড়া গম, সর্ষে, আলু ও তিল চাষ হয়। জমিতে সেচের ব্যবস্থা থাকলেও শীতের মরসুমে জল না মেলায় সারা বছর চাষের কাজ করতে পারেন না গ্রামবাসীরা। পশুপালনও তাঁরা করে থাকেন। তবে গ্রামের আয়ের অন্যতম উৎস আসে জঙ্গল থেকে। শুকনো গাছের ডালপালা জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয় প্রতিটি পরিবারেই মাটির উনুন দেখা যায়। তাছাড়া দশকর্মার দ্রব্য (প্রধানত ত্রিফলা- আমলা, হরিতকি ও বয়রা) এগুলি জঙ্গল থেকেই শহর অঞ্চলে যায় এবং এখানকার অধিবাসীরা বিড়ি, শাল পাতা, কুচির ঝাঁটা, খেজুর পাতার ঝাঁটা প্রভৃতি প্রস্তুত করে সেগুলিকে বাজারজাত করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অধ্যাপক অর্ণব ঘোষের কথায়, গ্রামের বাসিন্দাদের জীবনে জঙ্গলের অবদান অনস্বীকার্য। জঙ্গল থেকে শালপাতা, কেন্দু পাতা (বিড়ি তৈরির পাতা) সংগ্রহ করে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। সর্বোপরি পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে জঙ্গলের অবদানকে অস্বীকার করা যাবে না। এসব কথা মাথায় রেখে ২০২১ থেকে LAWA- র উদ্যোগে প্রতি বছর জঙ্গল বাঁচানোর অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়, যার tagline টি হল- *'বিশ্বকে বাঁচাতে অরণ্য থাকুক মাথাতে'।* বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমের দরুণ পরিচিত কিছুটা হলেও বেড়েছে। বলা দরকার, বেশ কিছুদিনে আগে আউশগ্রাম জঙ্গল এলাকায় আগুন ধরানো নিয়ে বেশ কিছু প্রতিবেদন বেড়িয়েছিল। মূলত মানকর কলেজের অধ্যাপক ড.প্রবীর

কুমার পাল, অর্ণব ঘোষ এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক রাধামাধব মন্ডল প্রমুখ সহৃদয় ব্যক্তিরা এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁদের সহযোগিতায় পরিস্থিতি কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

যুগ ধরে আদিবাসী মেয়েদের মধ্যে রয়ে গেছে ঘর গেরস্থালি সাজিয়ে তোলার একটা পরম্পরা। লবন্ধার যেন সেই পরম্পরাকেই নতুন করে চিনিয়ে দেয়। গ্রামের সমস্ত বাড়িঘরের গায়ে আঁকা অপূর্ব সব ছবি। পথের ধারেও নজর কাড়বে দেওয়ালে দেওয়ালে ছবির ক্যানভাস। সেইসব বুকে করেই এখন লবন্ধার হয়ে উঠছে আকর্ষণের নয়া কেন্দ্রবিন্দু। দূর দূর থেকেও মানুষ আসছেন এই আদিবাসী গ্রাম দেখতে। বরাবরই এ গ্রামের আদিবাসী মেয়ে-বউরা তাঁদের ঘরের আকর্ষণ বাড়াতে ছবি আঁকতেন দেওয়ালে। গ্রামের পথে হাঁটলেই সেই সব মন ভোলানো ছবি হাঁটার গতি কমিয়ে দিত। শুধু আদিবাসীরা নয় এই গ্রামের বাকি অধিবাসীরা এই ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছেন। সম্প্রতি LAWA-র উদ্যোগে বিশ্বভারতী থেকে পেশাদার শিল্পীরা এসে পরের পর ছবি এঁকেছেন এই গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে। অপূর্ব সেই সব সৃষ্টি আলাদা পরিচয় দিয়েছে এই গ্রামের। এদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী নন্দ দুলাল মুখোপাধ্যায়, সুতানু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে গ্রামের মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল যে এখানে ২০২৪ সালের, অক্টোবরে 'জুলোজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'-র (ZSI) উদ্যোগে 'বনশ্রী প্রকল্প' আয়োজিত হয়েছে। যেখানে পরিবেশের পাশাপাশি পশু পাখির সুরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। যার প্রধান ছিলেন Dr. Rajmohana K (Scientist, ZSI & Coordinator, EIACP, ZSI, Kolkata). এছাড়াও গ্রুপে ছিলেন Dr. Kaushik Deuti (Scientist, ZSI), Mr Subhendu Biswas (Sr. Artist, ZSI) এবং Dr.Tridip Kumar Datta (Prg. Officer, EIACP, ZSI, Kolkata). তাছাড়া, কলকাতা, কল্যাণী, রবীন্দ্র ভারতী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অধ্যাপক ও ছাত্র ছাত্রীরা গ্রামে এসেছেন এবং বিভিন্ন কর্মশালায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণও করেছেন।

এযাবৎ LAWA এর উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালা গুলি হল- 'বসে আঁকো প্রতিযোগিতা-জীবনধারায় অরণ্য ২০২৫', 'ওডিসি নৃত্য কর্মশালা', 'দেওয়াল চিত্র অঙ্কন কর্মশালা', 'মাটির পুতুল নির্মাণ কর্মশালা' প্রভৃতি। প্রতিবছর চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজার সময় এখানে দেবী অন্নপূর্ণার পূজোও অনুষ্ঠিত হয়। দেবী অন্নপূর্ণাই গ্রামের প্রধান দেবী এবং গ্রামের মানুষের মূল উৎসব। দীর্ঘ ২৫০-৩০০ বছর ধরে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে মন্দিরটি বর্তমানে নতুনভাবে সংস্কার করে দেওয়াল চিত্র দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, যা এই গ্রামের মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এই পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামে মেলা, যাত্রাপালা, কবিগান ও গ্রামের মানুষদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে। মূলত এইসমস্ত লুপ্তপ্রায় গ্রাম্য অনুষ্ঠান বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। যার জন্য এই লবন্ধার গ্রামের মানুষদের কুর্নিশ জানাতেই হয়। উল্লেখ্য প্রতিবছর বুদ্ধ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত ধর্ম রাজের গাজনও মহা সমারোহে পালিত হয়।

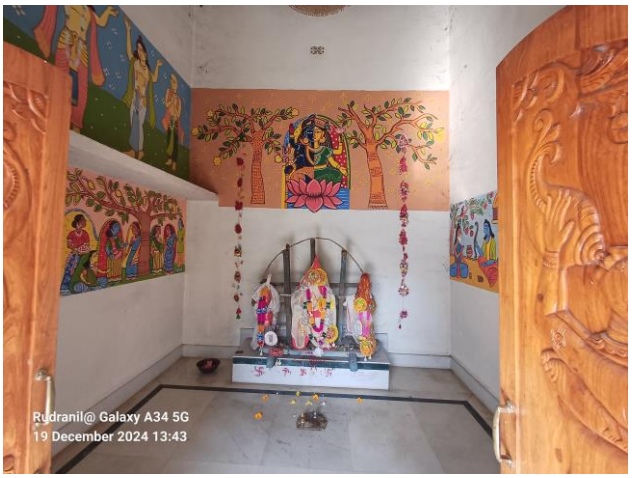

গ্রামের অন্নপূর্ণা মন্দির, চিত্র নিজস্ব

লবন্ধার গ্রামে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পশু পক্ষীর বিচিত্র সম্ভার লক্ষ্য করা যায়। ভিন্ন মরসুমে পরিযায়ী পাখিদের দেখা মেলে। সাধারণত যে সমস্ত পাখিদের দেখা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- Plum Headed Parakeet (লাল মাথা টিয়া), Ashy Prinia (কালচে প্রিনা), Common Snip (কাদা খোঁচা), Indian Nightjar (রাত চরা), Indian Peafowl (ময়ূর), red naped Ibis (কালো কাস্তেচরা), Grey Bellied Cukoo (ধূসর কোকিল), Common Wood shrike (কসাই পাখি), Large Cukoo Shrike, Ashy Wood Swallow (ধূসর আবাবিল), Long Tailed Shrike (লম্বা লেজের কসাই পাখি) প্রভৃতি। এছাড়াও আছে বাবুই, ফিঙে, সাদা পেঁচা, দোয়েল, টিয়া, ময়না ইত্যাদি। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে আছে- হায়না, শিয়াল, ভাম, খটাস, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি। শাল, পিয়াল, বরুণ, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, বট, মহুয়া বিভিন্ন বিচিত্র গাছ পরিবেশকে ছবির মত সাজিয়ে তুলেছে।

ভারত, মিশর, গ্রিস সহ অন্যান্য দেশে প্রাচীন সভ্যতার সময়কাল থেকেই শোনা যায় ভেষজ বা প্রাকৃতিক রঙ এর ব্যবহারের কথা। প্রথম কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হয়েছিল ইংরেজির ১৮৫৭ সালে। প্রাকৃতিক রং সংগ্রহ করার উৎস হল ৩টি- বিভিন্ন গাছের ফুল-ফল, খনিজ পদার্থ ও পোকামাকড়। মূলত লবন্ধার গ্রামে প্রায় বাড়িগুলির

দেওয়ালে যে আল্পনার রং ব্যবহৃত হয়েছে তার বেশিরভাগই প্রাকৃতিক উপায়ে প্রস্তুত এবং কৃত্রিম রং কমই ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বভারতীর কলা ভবনের ছাত্র ছাত্রীরা এবং এই গ্রামের সোমা, পূর্ণিমা, রেখার মত বালিকারা দেওয়ালে আল্পনা আঁকতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। তাদেরই প্রচেষ্টার ফলে গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য আবার ফিরে এসেছে। দেওয়াল আল্পনায় দেখা যায় বনবিবি, শিব, জগন্নাথ-বলরাম-শুভদ্রা, রাধা-কৃষ্ণ, মা দুর্গা ও বিভিন্ন প্রকার পশু-পক্ষী ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী।

১৭৫১ শকাব্দ অর্থাৎ ইংরাজির ১৮২৯ সাল সময়ে লবন্ধারের অধিবাসী ছিলেন সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী রায় পরিবার। সেই সময়ে রায় পরিবারের বড় ছেলে গদাধর রায় তাঁর চার ভাইয়ের নামে নির্মাণ করেন চারটি শিব মন্দির ও একটি বিষ্ণু মন্দির। যদিও গদাধর রায়ের নির্মাণ করার কথা ছিল পাঁচটি শিব মন্দির। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তাঁদের একমাত্র বোনের অকাল মৃত্যুর জন্য সেই মন্দিরের নির্মাণ করা যায়নি, সেই জায়গা আজকের দিনেও ফাঁকা রয়ে গেছে। কালের নিয়মে ও সংস্কারের অভাবে মন্দির গুলোর আজকে জরাজীর্ণ অবস্থা। মূল রাস্তা থেকে একটি ভগ্নপ্রায় দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হয় মন্দির প্রাঙ্গনে। প্রবেশের পরেই ডানদিকে দেখা যায় ত্রিখিলান প্রবেশ পথ যুক্ত দালান মন্দির আকৃতির বিষ্ণু মন্দির। এখানে শালগ্রাম শিলা নিত্য পূজিত হয়। নারায়ণ মন্দিরের তেমন উল্লেখযোগ্য অলংকরণ না থাকলেও খিলানের ওপরে রয়েছে দু একটি পঙ্খের নকশা। নারায়ণ মন্দির থেকে একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে পরপর চারটি শিব মন্দির রয়েছে। মন্দির গুলো কালের নিয়মে শোচনীয় হলেও এখানে রয়েছে বেশ কিছু টেরাকোটা অলংকরণ। শিব মন্দির চারটির কিছু গঠন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মন্দির গুলো চারটে একই আকারের তো নয় এক গঠনশৈলীরও নয়। এখানে চার ভাইয়ের নামে মন্দির গুলো নির্মাণ করা হয়েছে, বামদিক থেকে গোলকেশ্বর, গদাধর, মনিদাক্ষ ও অকুড়েশ্বর। এখানে কেবল মাত্র গদাধর মন্দিরটি দেউল আকৃতির ও অন্যান্য মন্দির তিনটি আটচালা শৈলীতে নির্মিত হয়েছে। মন্দির গুলো পূর্বমুখী। সাধারণ ভাবে মন্দিরের গাত্রে প্রতিষ্ঠা লিপি থাকে কিন্তু এখানে গদাধর মন্দিরের পাদদেশের পাশে রয়েছে ফলক তার থেকেই জানা যায় মন্দিরটি ১৭৫১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮২৯ সালে নির্মাণ করা হয়েছে। হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে আজকের হিসাবে মন্দিরের বয়স

১৯৪ বছর। মন্দির গুলোতে রয়েছে কিছু টেরাকোটা অলংকরণ। ফলক গুলোর মধ্যে দশঅবতার, নানান পৌরাণিক কাহিনী, দেব দেবীদের মূর্তি যেমন রয়েছে তেমনি বাজনা বাজানরত বাদকের চিত্র ও তুলে ধরা হয়েছে এখানে। একটি ফলকে দেখা যাচ্ছে শিশু গনেশ কে কোলে বসিয়ে রেখেছেন মা পার্বতী। অকুলেশ্বর মন্দিরের খিলানের ওপর টেরাকোটা ফলক গুলো দেখে মনে হয় সেই ফলক গুলো সম্ভবত পরবর্তীকালে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি মন্দিরে রয়েছে কালো কষ্টি পাথরের শিব লিঙ্গ। মন্দিরে নিত্য পূজা করা হয়। মন্দির গুলোর আশু সংস্কার প্রয়োজন। যদিও টেরাকোটা মন্দির যথাযথ সংস্কার করতে লাগবে বিপুল অর্থবল।[৭]

পাদটীকা:

১) **রাঢ়ভূম**: ভাষাবিদ প্রভাত রঞ্জন সরকারের মতে ‘রাঢ়’ শব্দটির উৎস প্রোটো-অস্ট্রোএশিয়াটিক ‘রাঢ়’ বা ‘রাঢ়ো’ শব্দ দুটি থেকে, যার অর্থ লাল মাটির দেশ বা ল্যাটারাইট মৃত্তিকার দেশ। যাইহোক রাঢ় বাংলার অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলগুলি হল সম্পূর্ন বীরভূম জেলা, বর্ধমান জেলার মধ্যভাগ, বাঁকুড়া জেলার পূর্ব ও দঃ পূর্ব ভাগ ও পশ্চিম মেদনীপুর জেলার পশ্চিমভাগ রাঢ়ের অন্তর্গত। এছাড়া প্রেসিডেন্সি বিভাগের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অংশ বিশেষ এবং হুগলি ও হাওড়া জেলার সামান্য অংশ রাঢ়ের অন্তর্গত।

২) **গোপভূম**: অতি প্রাচীনকালে অজয়-দামোদর নদের দোয়াব অঞ্চলের অরণ্যঘেরা পরিবেশে গো-পালক গোপ জাতির বসবাস গড়ে ওঠায় তা ক্রমে ‘গোপভূম’ নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। এর সীমানা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার কিছু অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত।

৩) **গোপচন্দ্র**: স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন ‘গোপচন্দ্র’। খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাওয়ার সুযোগে পূর্ব এবং দক্ষিণ বাংলা এবং পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ অংশে তিনি স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া থেকে আবিষ্কৃত ৫টি তাম্রশাসন, বর্ধমান জেলার মল্লসারুলে প্রাপ্ত ১টি এবং ওড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার জয়রামপুরে প্রাপ্ত অপর ১টি তাম্রশাসন থেকে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের তিনজন শাসকের নাম জানা যায়। এঁরা হলেন গোপচন্দ্র,

ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব। সম্ভবত তিনি গুপ্ত সম্রাট বৈন্য গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন।গোপচন্দ্র 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

৪)**Mural Painting**: এর বাংলা অর্থ দেওয়াল চিত্র। মুর্য়াল হল একটি স্পেনীয় শব্দ, যার অর্থ হল প্রাচীর। ভারতে এই চিত্রের সূচনা হয় মুঘল আমলে। বর্তমান গ্রাম বাংলায় আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় দেওয়ালের উপরে বিভিন্ন রঙীন চিত্র অঙ্কন করা আছে।

৫) **লবন্ধার অন্নপূর্ণা ওয়েলফেয়ার আসোসিয়েশন (LAWA)**: এটি একটি স্বেচ্ছা সেবক সংস্থা। বর্তমানে এর কর্ণধার মানকর কলেজের শারীর শিক্ষা বিষয়ক অধ্যাপক অর্ণব ঘোষ। মূলত লবন্ধার অন্নপূর্ণা ওয়েলফেয়ার আসোসিয়েশন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজিত হয়। অরণ্যকে রক্ষা করতে এই সংস্থা বদ্ধপরিকর। এর tagline হল- 'বিশ্বকে বাঁচাতে অরণ্য থাকুক মাথাতে'।

৬) **এক-চালা এবং দো-চালা মন্দির**: বাংলার খড়ো চালের মাটির ঘরের আদলে তৈরী এক শ্রেণীর মন্দিরকে বলা হয় এক-চালা মন্দির। এই শৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চালাটির বাঁকানো শীর্ষ ও কার্নিস। আর সামনে-পিছনে দুটি ঢালু চাল থাকলে তাকে বলা হয় দো-চালা বা এক বাংলা মন্দির।

৭) **টেরাকোটা**: 'টেরা'/Terra (মাটি) আর 'কোটা'/Cocta (পোড়ানো) শব্দ দুটির সমন্বয়ে 'টেরাকোটা' শব্দটি গঠিত হয়েছে, যার উৎস আদতে লাতিন ভাষা (Terracotta)। বাংলায় 'টেরাকোটা' শব্দটির প্রচলন থাকলেও বাংলা ভাষায় একে পোড়ামাটির শিল্প-ও বলা হয়ে থাকে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ:

১) আমার পিতা স্বর্গীয় নব কুমার চোংদার
২) গ্রামেরই বাসিন্দা ও মানকর কলেজের অধ্যাপক অর্ণব ঘোষ।
৩) রায় পরিবারের যিনি মন্দিরের তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন মাননীয়া শ্রীলেখা রায়।
৪) আমাদের কলেজের সহকর্মী পাপু হাজরা, সন্তু নন্দী ও রামকৃষ্ণ মৈত্র।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঘোষ, বিনয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। প্রথম খন্ড, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৩৯-৪৪।
২. ঘোষ, শিবশঙ্কর। গোপভূমের সরূপ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা- ২৯৯-৩০৩।
৩. বন্দোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার। বাংলার নদ নদী। কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৪৭-৫৪।
৪. ঘোষ, বিনয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। প্রথম খন্ড, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৩৯-৪৪।
৫. চট্টোপাধ্যায়, অমর ও পাল, শচীনন্দন। পশ্চিম ও মধ্যরাঢ়ের গ্রামগঞ্জ। রূপনারায়নপুর, পশ্চিম বর্ধমান, যোধন প্রকাশনী, ২০২৩ পৃষ্ঠা- ৭-১১।
৬. মুখোপাধ্যায়, বরুণ। জঙ্গলের কোলে আস্ত আলপনা গ্রাম লবণধার। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই মে ২০২৫।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌনক। আলপনা গ্রাম লবণধার। ০১/০৮/২০২৩, অনলাইন থেকে সংগৃহীত।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 402- 411
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.222

জাওয়া-করম উৎসব: সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

রঞ্জিত কুমার মাহাত, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ওয়াই. বি. এন. ইউনিভার্সিটি, রাঁচি, ঝাড়খন্ড , ভারত*

Received: 26.10.2025; Accepted: 26.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The information was introduced approximately 10 to 15 years ago. The journey of man was also initiated. But social scientists do not have specific evidence as to who or where this historical event occurred. The people of the southwestern border region of Bengal commemorate the memory of that past event of sprouting from a seed, a very amazing and significant event, through their Jawa-Karam festival. According to scientists, women invented agriculture at some point in the past. The role and presence of women in the Jawa-Karam festival also proves this. Not only that, but agriculture and culture also began from this agriculture. This is what human scientists say. The language, literature, music, and dance of Jawa-Karam Geet still retain many memories of that initial phase. There has been no valuable study or research on the Jawa-Karam festival and its rituals to this day. There is no doubt that when the matter is brought to light, all those historical truths will be revealed.

Keywords: Jaowa, Karam, Karam song, Jaowabera, karmati, Stage, Jaowa song and dance

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা লোকসংস্কৃতির এক আশ্চর্য খনি গর্ভ। যে খনি গর্ভ ভরপুর হীরা, মুক্তা, মনি, সোনার মত মহামূল্যবান লোকসংস্কৃতির আকরিক উপাদান দিয়ে। এই সাংস্কৃতিক রত্ন গুলি আদিম, অকৃত্রিম এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির ঐতিহ্যের গরিমায় মন্ডিত, উজ্জ্বল আলোতে আলোকিত। যার সীমাকে যেমন লোকায়ত সীমায় বাঁধা যায় না, তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের সীমাতেও বাঁধা কঠিন। প্রখ্যাত গবেষকগণ এই সংস্কৃতিকে ঝাড়খন্ড সংস্কৃতি, ছোটনাগপুর তথা রাঢ়ের সংস্কৃতি, মানভূম সংস্কৃতি এবং আজকের দিনের অভিধায় পুরুলিয়ার সংস্কৃতি, ঝাড়গ্রাম সংস্কৃতি সুবর্ণরৈখিক সংস্কৃতি, অথবা উত্তর উড়িষ্যার সংস্কৃতি বলে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা বিবাদের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। যুক্তি বার বার খন্ডিত হয়েছে অপর যুক্তির কাছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা অভিধাটিও অবশ্যই এর উর্ধ্বে নয়। তবে তা গবেষণাকে চিহ্নিত করার একটি উপায় বা অবলম্বন মাত্র।

সাম্প্রতিক গবেষণায় গবেষকগণ মনে করেছেন এই সংস্কৃতি ভারতের প্রাগ-ঐতিহাসিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পরম্পরা সঞ্জাত একটি জীবন্ত রূপ। কেবল বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি, কিরীটি মাহাত, সৃষ্টিধর বঁশরিআর, অনাদী মাহাত সহ বহু গবেষক এই কৃষি সংস্কৃতিকে মানব সভ্যতার বিকাশ ও বিবর্তনের সঙ্গে ওতোপ্রোত জড়িত বলেই দাবী করেছেন। এই দাবীর পিছনে যে লোক উৎসবটি প্রধান আলোচ্য বিষয় তা হলো 'জাওয়া-করম' উৎসব। গবেষকগণের দাবী এই জাওয়া-করম হলো মানব সভ্যতার একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি। যা ঘটেছিল কমপক্ষে ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ বৎসর পূর্বে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি হলো কৃষির আবিষ্কার। আর এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই মানুষ একদিন অরণ্য জীবন ও পশুপালন থেকে কৃষি সভ্যতার সূচনা করেছিল। বলা যায় তাই ছিল মানব সভ্যতারও সূচনা। আমরা নিবন্ধে দেখে নেব জাওয়া-করম উৎসবের ঐতিহাসিক সামাজিক এবং সেই আধ্যাত্মিক

তাৎপর্যটির পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপটি, মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্বের কৃষির আবিষ্কার, কে বা কারা করেছিল? অথবা সেটি কোথায় ঘটেছিল, বা আজকের দিনে তার প্রকৃত ধারক বা বাহকই বা কারা, এই সকল প্রাথমিক ও মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পাঠক খুঁজে পাবেন এই নিবন্ধে। কেবল কি তাই? এই নিবন্ধ থেকে গবেষকগণ খুঁজে পাবেন লোক সংস্কৃতি গবেষণারও কিছু মৌলিক সূত্র। লোক সংস্কৃতি কেবল 'লোক' এর সংস্কৃতি নয়, তা একটি ভূখন্ডের সংস্কৃতিও বটে। তাই তার শিকড় থাকে মাটির অনেক গভীরে। তাই মূল ধারার সংস্কৃতি থেকে লোক সংস্কৃতিকে পৃথক করে দেখা কতখানি ভ্রান্তি তা এই নিবন্ধ প্রমাণ করবে। যা এতদিন গবেষণার জগতে ঘটে চলেছে।

জাওয়া-করম শব্দটির পরিভাষা, অর্থ ও তাৎপর্য:

উৎসবটির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে গেলে এর নামকরণ ও জাওয়া-করম শব্দ দুটির বুৎপত্তি অর্থ ও তাৎপর্যটি প্রথমেই অনুধাবন করা জরুরী। উৎসবটি ভারতবর্ষের বিস্তৃত ভৌগোলিক ক্ষেত্র জুড়ে প্রচলিত থাকায় নামকরণের ক্ষেত্রেও এর পারিভাষিক শব্দ গুলির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অঞ্চলভেদে উৎসবটি জাওয়া পরব, করম পরব, ছেল্যা পরব, আবার জাওয়া করম পরব নামেও কথিত হয়ে থাকে। আবার শব্দটি 'জাওয়া' নাকি 'যাওয়া' এ নিয়েও পন্ডিত মহলে বিবাদ রয়েছে। এই বিষয়ে ড. সুধীর কুমার করন এবং ড. বঙ্কিম মাহাত 'জাওয়া' শব্দটির পক্ষে হলেও প্রবীণ ও প্রাতঃ স্মরণীয় গবেষক ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি শব্দটিকে 'যাওয়া' বলে অভিহীত করার পক্ষে মত দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ঝাড়খন্ডী লোক ভাষার গান' গবেষণা গ্রন্থে বলেছেন-

> "শস্যের সমৃদ্ধির কামনার গুঢ় আবেদনই এই গানের উৎস কি না তা নির্ভুলে নির্ণয় করা কঠিন। অনুষ্ঠান সাক্ষ্য দিলেও গানের সূত্র খুঁজে এমন সিদ্ধান্তে নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায়েই নেই।"[১]

তবে বক্তব্যকে প্রাণ পেতে শুনলে এগুলি 'যাওয়ার' গান। পরিচিত পিতৃ গৃহ থেকে স্বাজনহীন স্বামী গৃহের দূর দেশে যাওয়ার বিষন্নতা এদের চোখে মুখে মাখা। অধিকাংশ গানেই আছে বধূ জীবনের কথা ও ব্যথা।

জাওয়া-করম অবিবাহিত মেয়েদের পরব। কিন্তু সদ্য বিবাহিত মেয়েরাও এই পরবে বাপের বাড়িতে যাই ও করম পরবে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে নাচে গানে ভাগ নেই। এইটিই এই অঞ্চলের রীতি। তাই ভাদ্র মাস পড়লেই মেয়েদের মনে বাপের বাড়ি যাওয়ার বাসনা মনে দানা বাঁধে। মনের গোপনে প্রতিদিন তারা প্রতীক্ষায় থাকে দাদা কখন তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসবে। উৎসবের এক দু'দিন পূর্বেই দাদা এসে যায়। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি বা স্বামীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তার বাপের বাড়ি যাওয়া সম্ভব হয় না। গীতেও রয়েছে সেই না যাওয়ার বেদনার কথা--

গীত:

> "ইঁদ-করম লইজকাল্য দাদা আল্য লিতে গো
> শাশুড়ী-ননদী বাদী নাই দিল যাতে।"[২]

ড. সাহা হয়ত এই 'যাওয়া' প্রসঙ্গটি থেকেই জাওয়া-করম উৎসবটির তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন। আসলে কুড়মালি 'জাওয়া' শব্দের অর্থ-তাৎপর্য প্রকৃত ভাবে না জানা থাকায় এই বিভ্রান্তি। আর বিভ্রান্তি পুরো উৎসবটির অর্থ ও তাৎপর্যকেই সম্পূর্ণ ভুল পথে পরিচালিত করে।

ড. বঙ্কিম মাহাত, ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহার বক্তব্যকে অন্তত যুক্তির সঙ্গেই খন্ডন করেছেন। 'ঝাড়খণ্ডের লোক সাহিত্য' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "জাওয়া পরব একটি শস্য উৎসব। জাওয়া শব্দটি 'জাত-ক' শব্দ থেকেই উৎপন্ন। তবে 'জাওয়া' না 'যাওয়া' এ নিয়েও মতভেদ আছে। এ গানে 'যাওয়ার' কোথাই প্রাধান্য পেয়েছে এ কথা ঠিক। তবে ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা যে পিতৃ গৃহ থেকে শ্বশুরালয়ে 'যাওয়ার' কথা বলেছেন মনে হয় তা ঠিক নয়। আসলে ভাদ্র মাসে করম পরবে ঝাড়খণ্ডের শ্বশুর গৃহে বন্দিনী বধূরা পিতৃ গৃহে যাবার ছাড়পত্র পেয়ে থাকে; অবশ্য সব সময়েই যে অনুমতি পেত, তা নয়। নব বিবাহিতা বধূরা ইঁদ করমের দিন গুনে শশুরালয়ে সব দুঃখ কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করে প্রতীক্ষা করে থাক।"[৩] (পৃ-৫৭)

ড. মাহাত জাওয়া শব্দটির তাৎপর্যে 'জাত-ক' শব্দের প্রসঙ্গটি এনেও ড. সাহার 'যাওয়ার' প্রসঙ্গটিকেও মান্যতা দিয়েছেন। আসলে 'জাত-ক' ঘটনাটি আসল এবং এই 'জাত-ক' বা জাওয়া পাতাকে উপলক্ষ করে কোন বিবাহিত মেয়ের বাপের বাড়ি আসার ঘটনাটি এই উৎসবের একটি সামাজিক রীতি বা আচার মাত্র। এই উৎসবের মূল তাৎপর্যটি

যাওয়া বা আসা নয়। মূল জাওয়ার ক্রিয়াটি আমাদের বিবেচ্য হওয়া উচিত। অবশ্য ড. মাহাত এরপর আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনায় বলেছেন-

> "জাওয়ার উপকরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, এ অনুষ্ঠান অঙ্কুরোদগমের অনুষ্ঠান। জাওয়া শস্য কামনার উৎসব, উর্বরতা বাদ বা Fertility cult এর মুখ্য পরিচয়।"[৪] (পৃ-৫৭)

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সংস্কৃতি গবেষকদের মধ্যে বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ড. সুধীর কুমার করনের অভিমত ও যুক্তিটি প্রায় অনুরূপ। 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

> "ধলভূম, মানভূম, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে করম পূজার যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তাতেও শস্যোৎপাদন প্রক্রিয়ার অগ্রাধিকার। উৎসবের কয়েকদিন পূর্বেই মেয়েরা নদী বা খাল থেকে বালি নিয়ে আসে। সেই বাড়িতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় পঞ্চ শস্য। কোন কোন অঞ্চলে আরো বেশি শস্য বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং অপেক্ষা করা হয় চারা গাছের জন্ম লগ্নের জন্য। মানভূমের এই অনুষ্ঠান রীতির নাম 'জাওয়া'।.....বলা বাহুল্য জাওয়া মানেই জন্ম, জাত। এই জাওয়ার দেবতা হচ্ছেন করম গোঁসাই।"[৫] (পৃ-৯৩)

ড. করণের ধারণা ও বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম বা শস্যের জন্ম উৎসব হলো জাওয়া। এটিই উৎসবটির মূল তাৎপর্য তা উভয় গবেষক স্বীকারও করেছেন। বিভিন্ন গবেষকের মতামত প্রসঙ্গটি সমাপ্ত করার পূর্বে আন্তর্জাতিক লোক গবেষক ড. ভট্টাচার্য বলেছেন-

> "বর্ষাকালীন একটি শস্য উৎসবের নাম জাওয়া পরব। ইহা সর্ষের জন্মোৎসব।"[৬] (পৃ-১২১)

এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্ব সম্মত। তাই এই বিষয়ে আর দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু এমন উৎসবের সঙ্গে ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি, দেশ, কাল, আধ্যাত্মিকতা এমনকি মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির সম্পর্ক কি কোনো রয়েছে? নাকি এইগুলি নেহাতেই কোন লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান। আদিম মানুষের খামখেয়ালি কোন বিনোদন পার্বন? আমাদের মতে হাজার হাজার বছর ধরেই যে উৎসব লালিত-পালিত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে উদযাপিত হয় তা নেহাতেই আঞ্চলিক বিনোদন পার্বন হতে পারে না। মাটি, মানুষ, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির নিগুঢ় তাৎপর্য এতে নিহীত থাকবে তা ভাবা যুক্তি সঙ্গত। কেবল তাই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিভিন্ন মানব জাতি গোষ্ঠী, ও সংস্কৃতির মধ্যে অনুরূপ কোন উৎসব রয়েছে কি-না, তাও অনুসন্ধান প্রয়োজন। যেটুকু জানা যায়, তাতে এমন পরিপূর্ণ আচার ও অনুষ্ঠান আর কোথাও নেই, কারও মধ্যেই নেই। আংশিক ও বিকৃত রূপের সন্ধান পাওয়া যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি সুদূর গ্রীস দেশেও। সে বিষয়ে প্রসঙ্গে আমরা পরে যাব। তবে আমাদের দাবি নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত এবং সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকেই ভাবা যায় এই উৎসব হলো এক প্রাগ-ঐতিহাসিক বিশেষ ঘটনার নিশ্চিত স্মৃতি উৎসব। এই বিশেষ ঘটনাটি হলো কৃষির আবিষ্কার। সমাজ বিজ্ঞানীদের অনুমান তা ঘটেছিল ১০ থেকে ১৫ হাজার বৎসর পূর্বে। জাওয়া করম উৎসব ও ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা এখনই যেতে চায় না। এখন আমরা দেখে নেব কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পরম্পরা অনুসারে এটি কিসের উৎসব? প্রথমত: জাওয়া ও করম শব্দ দুটির কুড়মালি ভাষার দৃষ্টিতে অর্থ কি বোঝায়। কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের জি, জঅ, জিউ, জুআন, জওয়ান শব্দগুলি এবং জাওয়া শব্দের অর্থ প্রায় একই। জ বা জওয়া শব্দের অর্থ হয় জীবন, বাঁচা, নতুন চারার উদ্গম বা অঙ্কুরোদ্গম। ইংরেজিতে যাকে Germination বলা হয়। আর করম শব্দের সরাসরি অর্থ হলো কর্ম বা কাজ। আদিম মানুষের কর্ম বা কাজ বলতে একমাত্র কৃষিকেই বোঝাত।

সুপন্ডিত গবেষক গণ উৎসবটি কে শস্যোৎসব বা শস্যের অঙ্কুরোদ্গম উৎসব বলেছেন ঠিকই কিন্তু সেই আচারটি কেবল মাত্র এই অঞ্চলের মানুষেই করে কেন তা তারা ভাবেননি। আমাদের বিশ্বাস এই আচার বা অনুষ্ঠানটি হলো সেই প্রাচীন ঘটনারই স্মৃতি যেদিন মেয়েরা বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের রহস্যটি আবিষ্কার করেছিল ও কৃষির সূচনা করেছিল। এ কেবল কষ্ট কল্পিত কথার কথা নয় বা ভাবনার বিলাসও নয়। সমাজ বিজ্ঞানীদেরই অভিমত হলো মানব সভ্যতার ইতিহাসে কোন একদিন মেয়েরাই কৃষি আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু কে বা কারা এই কৃতিত্বের অধিকারী এর সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিষয়টিকে বিচার করলে বলা যায় যারা আজও সেই স্মৃতি ও আচার-আচরণটি বহন করে চলেছে কৃতিত্বটি দিতে ৩ দেরই।

কেবল কৃষির আবিষ্কারই নয় এই কুড়মালি কৃষি র অন্যতম লোক উৎসব 'সহরই-বাঁদনা' হলো কৃষির সহায়ক শক্তি গরু-কাড়ার সেবা, পূজা, আরাধনার উৎসব। বাঁদনা লোক পুরানে হাল-জোয়াল আবিষ্কার থেকে, গরু-

কাড়াকে নিয়ে চাষের রীতি সমাজে কিভাবে সূচনা ঘটেছিল তার বিবরণ রয়েছে। তাই কৃষি আবিষ্কারের এই পরম্পরাটি যে সমাজে আজও লালিত পালিত হয় স্মৃতি আজও বেঁচে রয়েছে- এমতাবস্তায় জাওয়া-করমকে তাই কৃষি আবিষ্কারের স্মৃতি উৎসব বলে দাবি করাটা অযৌক্তিক হতে পারে না। সে কথা বলা হয়েছে, পরম্পরাগত জাওয়া গীতেও-

গীত:

"পহিলেহিঁ বেটি ছউআঞ পাতি দেলাঞ জাওয়া রে করম চলি আইল।
বসমতা মাঞেক করাঞ বিহিন বুনি দেলা রে করম চলি আইল।
কনে শিখলা আর কাকে শিখাই দেলা রে করম চলি আইল।
বসমতা মাঞেক করাঞ বিহিন বুনি দেলা রে করম চলি আইল।
বহিনে শিখলা আর ভাইকে শিখাই দেল রে করম চলি আইল।
বসমতা মাঞেক করাঞ বিহিন বুনি দেল রে করম চলি আইল।
কাকর করম আর কাকর ধরম রে করম চলি আইল।
বসমতা মাঞেক করাঞ বিহিন বুনি দেল রে করম চলি আইল।
বহিনেকর করম ভাইয়েকর ধরম রে করম চলি আইল।
বসমতা মাঞেক করাঞ বিহিন বুনি দেল রে করম চলি আইল।"[৭]

গীতে অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে উল্লেখিত রয়েছে যে, কোন একদিন এই বসমতা বা পৃথিবী মায়ের কোলে বীজ বপন করেছিল মেয়েরাই। আর সেই শিক্ষাটি তারা শিখিয়ে দিয়েছিল ভাইদের। কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সমাজ নয়, সমগ্র মানব সমাজের তাৎপর্যটি নিহিত রয়েছে এই জাওয়া গীতে। আর মানুষ শস্য চারা গুলিকে ধনদেবী, আর করম বৃক্ষের পূজা আরাধনা থেকেই শুরু করেছিল প্রকৃতি পূজার।

শুরু হয়েছিল আধ্যাত্মিকতারও। করম ও ধরম মানব সভ্যতাকে দুটি মহত্ত্বম শব্দ ও দর্শন, উপহার দিয়েছিল এই কৃষি সংস্কৃতি এবং কৃষি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন উৎসব জাওয়া-করম।

উৎস ও ইতিহাসের অনুসন্ধান:

জাওয়া-করম উৎসবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যটি ভাবার চেষ্টা করেছেন গবেষকগন। সে চেষ্টা কিছু সফল কিছুটা অসফল তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু জাওয়া করমের উৎস, উদ্ভব ও ইতিহাস প্রসঙ্গটি সেভাবে ভাবেননি কেউই। আসলে এটিকে একটি ক্ষুদ্র জনপদের আদিম অশিক্ষিত মানুষের লোক মানস চর্চার অঙ্গ ও ফসল হিসেবেই মনে করেছেন। কিন্তু এই উৎসবগুলি যে নৃ-বিজ্ঞানের অংশ ও তাৎপর্য বহন করে চলেছে এমনটি ভাবেননি কেউই। এই প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের বিশিষ্ট লোক গবেষক কিরীটি মাহাত ব্যতিক্রমী ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন মানভূম কালচারাল আকাদেমি প্রকাশিত

> "মানভূমের জাওয়া করম পুস্তিকায় তিনি যা বলেছেন তা হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হল 'মানব ইতিহাসে কৃষির আবিষ্কার ছিল যুগান্তকারী ঘটনা। বলতে গেলে মানব সভ্যতার সূচনা ঘটে সেখান থেকেই। কৃষ্টি ও সংস্কৃতিরও জন্ম কৃষি থেকে সে কথা স্বীকার করেছেন সমাজ বিজ্ঞানীগণ। কৃষ্টি শব্দটি নাকি কৃষি শব্দ থেকেই এসেছে। কিন্তু এই বিশ্বে কৃষির সূচনা কোথায় হয়েছিল বা কে এর স্রষ্ঠা এর উত্তর দিতে পারেননি সমাজ বিজ্ঞানীগণ। কিন্তু ধারণা ও অনুমানের কথা তথা প্রাসঙ্গিতাকে ভিত্তি করে পন্ডিত গবেষকগণ যা বলেছেন তাও ভেবে দেখার বিষয়।"[৮] (২২ পৃষ্ঠা)

জাওয়া উৎসবের ভৌগলিক পরিধি:

আজকের দিনে জাওয়া-করম উৎসবের মূল কেন্দ্রভূমি হলো দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা, উত্তর উড়িষ্যা সহ সমগ্র ঝাড়খন্ড, ছত্রিশগড়, উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, দিনাজপুর, মালদা, দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের কিছু অংশ আসাম এবং বাংলাদেশ। এই বৃহত্তর অঞ্চলে শুধুমাত্র জাওয়া-করম উৎসব পালিত হয় না, উৎসবের রুপটিও একই। এর কারণ যারা এই উৎসব পালন করে তারা বেশির ভাগ মানুষ রাঢ়-ঝাড়খন্ড ছোটনাগপুর থেকে চলে যাওয়া অভিবাসী মানুষ। যারা দু-শত আড়াই শত বৎসর পূর্বে এ অঞ্চল থেকে দেশান্তরীত হয়েছিল। এই উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে তারা আজও ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পালন করে চলেছে। কিন্তু এতো গেল আজকের দিনের ভৌগোলিক পরিসীমাটি। কিন্তু প্রাগ-

ঐতিহাসিক কালেই এই উৎসবটি যে ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আফগানিস্তানের আমুদরিয়া-সিরদরিয়া থেকে মেহরগড়, কুরুম নদী থেকে সিন্ধু-সরস্বতীর অববাহিকা অঞ্চলেই যে প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল এমন অনুমান করা যেতেই পারে। ড. অতুল সুর মনে করেছেন কৃষির সূচনার সময় কালেই শিবের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু সেই স্থানটি কোথায় তা তিনি বলেননি। অমিশ ত্রিপাঠি তাঁর The Immortal of Meluha গ্রন্থে বলেছেন মেহেরগড়ে শিব প্রথম তার বসতি স্থাপন করেন।

প্রাচীনকালেই এই কৃষি সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল প্রায় সমগ্র ভারতে। তাই সমগ্র ভারতেই এক সময় মহা সাড়ম্বরেই উদযাপিত হতো এই জাওয়া করম উৎসব। বিভিন্ন অঞ্চলে আজও তার স্মৃতি বেঁচে রয়েছে এমন ইঙ্গিত করেছেন প্রখ্যাত পন্ডিত ক্ষিতিমোহন। তিনি তাঁর 'ভারত পরিক্রমা' গ্রন্থে বলেছেন-

> "..... তাহার পর পঞ্চমী হইতে সপ্তমীর মধ্যে নারীরা গাহিয়া বাজাইয়া নদীতে যাইয়া স্নান করিয়া নদীর মাটি লইয়া আসেন, তাহা পাত্রে রাখিয়া সপ্ত ব্রীহি দিয়া অঙ্কুর উদ্গম পর্যন্ত ভিজা কাপড়ে ঢাকিয়া রাখেন। ..... পাঞ্জাবে লোড়ি, গুজরাটে গবরা, হিন্দুস্থানী দেশে কজরী রূপে আছে। ধানের বীজ বুনিয়া তাহার নতুন শীষ লইয়া উৎসব করাতেই বোঝা যায়, এক সময় ইহা প্রাকৃত জনগণের মধ্যে নব ধান্য উদ্গমের সঙ্গে জড়িত ছিল।..... সুর নব অঙ্কুরের ন্যায় হরিদ বর্ণ। ভনিতা ও হরি হরি। বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের সর্বত্র এই উৎসব আছে। নাই কেবল এই সরস সজল বাংলা।"[৯] (পৃষ্ঠা - ৩৯)

পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই এই উৎসবের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। বিষয়টি অনেক অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। কুড়মি অন্যতম প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ট জনজাতি সাঁওতালদের জাতির উদ্ভব ও দেশান্তরের যে পুরা কাহিনী রয়েছে তাতেও বলা হয়েছে একদিন সাসাংবেড়ায় মারন্ডি বংশের লোকেরা করম ডাল মাটিতে পুঁতে, হাঁড়িয়া খেয়ে মনের আনন্দে নাচ গান করেছিল। কিন্তু বলা যেতেই পারে আজও নির্ধারিত হয়নি এই সাসাংবেড়া দেশ বা জায়গাটি কোথায়। কিন্তু এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় জাওয়া ও করম ডাল পোঁতার বিষয়টি অতি প্রাচীন এবং ভৌগোলিক পরিসরেও বহুদূর বিস্তৃত।

ড. সুধীর কুমার করনও অনুরূপ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে বলেছেন-

> "উত্তর বিহারের সারন জেলায় ব্রতচারিনীগন ভাদ্রপদী শুক্লপক্ষের একাদশীতে কর্মাধর্মার ব্রত পালন করে থাকে।"[১০] (পৃঃ ৯৫)

কৃষি বিষয়ক যে কোন পরব পালি বা লোক উৎসব সারা ভারতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে তা থাকায় স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়টি এইখানেই সীমাবদ্ধ নয়। এর বিস্তৃতি ও ছায়া লক্ষ্য করা যায় সুদূর ইউরোপের গ্রীস দেশেও। এই প্রসঙ্গটির উত্থাপন করেছেন পুরুলিয়ার বিশিষ্ট গবেষক ড. নিমাই কৃষ্ণ মাহাত তাঁর 'মানভূমের কৃষি সংস্কৃতি' নিবন্ধে। তিনি বিখ্যাত পন্ডিত J.G. Frazer এর 'The Golden Bough' গ্রন্থে Garden of Adonis অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। বিবৃত বক্তব্যটি এই রকম-

> "..... Baskets of pots filled with earth, in which barely lettuces, fennel and various kinds of flowers were sown and tended for eight days, chiefly or exclusively by women, fostered by the Suns heat, the plants shoot up rapidly, but having no route they withered as rapidly ways, and at the end of 8 days were carried out with the image of the dead Adonis and flung with them into the Sea or into the Sprins."[১১] (পৃঃ ৪৪)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানভূম অঞ্চলের করম তথা জাওয়া পার্বনের সঙ্গে গ্রীসের 'Garden of Adonis' পার্বনের মূলগত সাদৃশ্য একই।

সুতরাং এও বলা যায় এটি হলো জাওয়া-করমের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র বা বিস্তৃতির একটি বড় প্রমাণ। উপরোক্ত আলোচনা থেকে অন্তত: এটুকু বোঝা যায় বিষয়টি কেবলেই দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলা ঝাড়খন্ড ক্ষেত্রের মধ্যে উৎসবটি সীমাবদ্ধ নয়। তবে ক্ষিতিমোহন সেনের পর্যবেক্ষণ অনুসারেই উত্তর ভারত, বৃহত্তর মধ্য ভারত এবং পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই লোক উৎসবটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই কৃষি সংস্কৃতি মানুষ জন যেখানেই রয়েছেন,

সেখানেই জাওয়া-করম আজও অনুষ্ঠিত হয়। Golden Bough এর বিবরণ থেকেও বোঝা যায় কৃষি আবিষ্কারের কৃষিবিদ্যা যেমন সারা ইউরোপ এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল তেমনি কৃষি বিষয়ক বিশ্বাস, সংস্কার, ভাষা, শব্দ, পরিভাষা, নেগ-নেগাচার, পরব পালি গুলিও ছড়িয়ে পড়েছিল এই অনুমান করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ দক্ষিণ ভারতের 'পঙ্গোল' উৎসবের কথা বলা যেতে পারে যা হুবহু সীমান্ত বাংলার বাঁদনা পরবের সঙ্গেই মিলে যায়।

আসলে মানব সভ্যতার এই বীজ অঙ্কুরোদ্গম ও কৃষি আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিটি ভারত বর্ষ এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল ইউরোপেও। Garden of Adonis অনুষ্ঠানটি তারই সুনির্দিষ্ট প্রমাণ। সম্ভবত এই ঘটনাটি ঘটেছিল কুরুম থেকে সিন্ধু-সরস্বতীর অববাহিকা অঞ্চলেই ইতিহাসের কোন প্রাচীন মুহূর্তে। অমিশ ত্রিপাঠির দাবি মেহরগড়েই শিব প্রথম তার ঘাঁটি তৈরী করেন। এই দাবিটির পক্ষেই পৃথিবী বিখ্যাত মানব বিজ্ঞানী লুইস হেনরি মর্গান মত প্রকাশ করেছেন তাঁর 'এনসিয়েন্ট স্যোসাইটি' গ্রন্থে যে ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা, ভারত ও এশিয়ার স্টেপ অঞ্চল সমূহে; পশুকে পোষ মানানোর ফলে এক নতুন জীবন যাত্রা শুরু হয়।

কুড়মালি কৃষি উৎসব বাঁদনা লোক পূরান কথাতে, কৈলাস থেকে শিবের আগমন এবং গাই-গরুকে ঘরে ঘরে দিয়ে কৃষি কাজের যে সূচনার কাহিনী রয়েছে গবেষকদের কথা তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। যদিও বিশিষ্ট ধর্মগুরু পন্ডিত আনন্দ মুর্তিজি ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতির আনুমানিক কাল ৭৫০০-৮০০০ বছর। তাঁর কথায় পশ্চিম রাঢ়ে হাল বলদের সাহায্যে এরা কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন বলে অন্যেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মহাত্মন বলে সম্বোধন করতেন যা পরবর্তীকালে শব্দটি হয়ে দাঁড়িয়েছে মাহাত। কুড়মি মাহাত গোষ্ঠীর সভ্যতা অন্ততপক্ষে ৭০০০ বছরের প্রাচীন। কৃষির আবিষ্কার ও কৃষি সভ্যতা বিকাশে কুড়মি সহ এই অঞ্চলের বিভিন্ন জনজাতি গুলির অবদান রয়েছে এই সকল বক্তব্য থেকে তা বোঝা যায়।

জাওয়া-করম পরবের নেগ-নেগাচার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সংস্কার:

জাওয়া-করম পুরোপুরি একটি কৃষি উৎসব। এই উৎসবের পুর্ণ এক্তিয়ার ও অধিকার মেয়েদের। বিশেষ করে অবিবাহিত কুমারী মেয়েদের। তবে বয়স্ক ও প্রবীণ নারীরাও এতে পূর্ণ সহযোগিতা করে এবং নানাভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। ছেলেদের বা পুরুষের কোন ভূমিকা এই উৎসবে নাই তা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়। ভাদর বা ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে করম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব সৃষ্টির উৎস যেমন সূর্য তেমনি সমাজ ও সংস্কৃতি সৃষ্টির জননী হলো নারী। আদিম মানুষের প্রাথমিক যে দুটি কামনা; নারীর অন্তরে স্থান পেয়েছিল তার একটি অবশ্যই সন্তান এবং অপরটি শস্য। আমাদের বিশ্বাস সন্তান যেমন নারীর দিয়ে ছিল মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, তেমনি নারীই দিয়েছিল শস্য। তার শ্রেষ্ঠ প্রমান এই জাওয়া-করম উৎসব।

লক্ষণীয় বিষয় এই উৎসব কুমারী মেয়েদের এবং জাওয়ার সমস্ত নেগাচার তাদের জন্যে হলেও এই জাওয়া চারা গুলিকে তারা নিজে সন্তান বলেই মনে করে। এবং পুরো ৭ দিন বা ৯ দিন সন্তানের লালন-পালনে মা যে বা যেমন আচার-আচরণ নিয়ম-কানুন মেনে চলে-করমরিতা ও তাই পালন করে। তাই যারা জাওয়া পাতে তারাকে বলা হয় জাওয়ার মাঞ। আর এইরকম পালন করার জন্য বলা হয় করমতি। এই কুমারী মেয়েরাই যে কোন একদিন বীজ থেকে অঙ্কুর বা জাওয়া সৃজনের বৈজ্ঞানিক সত্যটি আবিষ্কার করেছিল তার প্রমাণ এই জাওয়া মাঞ বিশেষনটি। একটি কুমারী মেয়েকে মা বলার তাৎপর্যটি এই অতীত সৃষ্টি বা বীজ থেকে চারা জন্ম দেওয়ার ইঙ্গিতটিই নিহিত রয়েছে। তাই জাওয়া-করমের নেগ-নেগাচার গুলি হলো সম্পূর্ণ একটি সন্তানবতী মায়ের নেগ-নেগাচার। একটি জাওয়া বা চারার সঙ্গে তার সম্পর্ক মা ও সন্তানের। এখানে উদ্ভিদ ও শস্যের নয়। এরপর আমরা দেখে নেব সেই পালনীয় নেগ-নেগাচার গুলি কেমন।

নেগ-নেগাচার:

১। একাদশী তিথি থেকে ৭ দিন বা ৯ দিন পূর্বেই জাওয়া উঠা বা জাওয়া পাতা অনুষ্ঠানটি হয়। ঐদিন মেয়েরা উপবাসী থেকে দলবেঁধে ঘাটে গিয়ে এই জাওয়া পাতার কাজটি করে।

২। প্রথমে তেল সাবান ব্যবহার না করে পূর্ব দিকে মুখ করে এক ডুবে স্নান করতে হয়।

৩। এরপর ভিজে কাপড়ে তেল হলুদ বাঁটা ও দাঁতন কাঠি রেখে আঁজলা জল দিয়ে সূর্য দেবতা এবং পূর্বপুরুষ কে স্মরণ ও প্রণাম করতে হয়।

৪। ঘাট থেকে বালি সংগ্রহ করে বাঁশের তৈরী ডালাতে ভরতে হবে।

৫। বালি দেয়া হলে ৯,৭,৫ বা ১১ প্রকারের শস্য বীজ তাতে পুঁতে দিতে হবে।

৬। এরপর জাওয়া ডালির উপরে বা বীজের উপরে হলুদ জল ছিঁটে দেয়া হয়।

৭। যেটি মূল বা প্রধান ডালা তার মধ্যিখানে একটি ধানের গাছি পুঁতে দিতে হয়।।

৮। অন্য ডালা গুলি ছোট ছোট শালের ডাল পোঁতার নিয়ম।

৯। মাহামাঞ ও সূর্য দেবতাকে ঝিঙা পাতার উপর হলুদ বাঁটা ও দাঁতন দিয়ে গড় করতে হয়।

১০। জাওয়া পাতার পর ঘাটের পাড়ে পরিষ্কার একটি জায়গাতে সমস্ত ডালা গুলিকে একসাথে গোল করে রেখে তার চারিদিক ঘিরে মেয়েরা হাত ধরা ধরি করে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত ক্রমে জাওয়া গীত ও জাওয়া নাচ নাচতে হয়। কেউ কেউ বলেন আঢ়াই পাক নাচার নিয়ম আবার এই নিয়মের ভঙ্গও দেখা যায়। অর্থাৎ এমন মনের আনন্দে যতক্ষণ খুশি মেয়েরা গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে।

১১। এরপর গ্রামের চারিদিকে যে সকল গ্রাম দেবতারা অধিষ্ঠান করেন সেখানেও জাওয়া ডালি নিয়ে যাওয়া হয় ও গীত নৃত্য পরিবেশন করার নিয়ম। তবে সকল থানে না হলেও গরাম ও জাহিরা থানে তা করা বাধ্যতা মূলক। এরপর গ্রামে প্রবেশ করে যেখানে প্রতিদিন নাচের জন্য আখড়া তৈরী করা হয় সেখানে কিছু ক্ষণ নেচে ডালা গুলি বাড়ির ভিতরে ঘরের মেঝেতে পিঁড়ির উপরে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়।

জাওয়ার প্রকারভেদ:

অঞ্চল ভেদে কিছু পার্থক্য থাকলেও জাওয়া মোটামুটি পাঁচ প্রকারের হয়। যেমন- ১। সাঁচি জাওয়া, ২। মাচি জাওয়া, ৩। গরাম জাওয়া, ৪। বাগাল জাওয়া, ৫। বন জাওয়া।

সাঁচি জাওয়া: সাঁচি কথাটি এসেছে সম্ভবত সচ বা সাঁচা শব্দ থেকে। কুড়মালি ভাষাতে সাঁচা শব্দের অর্থ প্রকৃত সত্য বা মূল। এই জাওয়ার গুরুত্ব সবার উপরে মান্যতাও সবার উপরে। ৯ বছরের কম বয়সী মেয়েরা এই জাওয়া পাতায়। এই জাওয়া করম ঠাকুর ও সূর্যদেবতাকে নিবেদন করা হয়। সাঁচি জাওয়া রাখা হয় কোঠা ঘরে কিম্বা কোন সুরক্ষিত গুলুঙ্গিতে।

মাচি জাওয়া: মাচি জাওয়া যে কোনো বয়সী কুমারী মেয়ে অথবা বিবাহিত অপূত্রক মহিলাগনও এই জাওয়া পাতাতে পারে। একে সাধারণ জাওয়া বলা হয়। সাধারণত স্বামীর মঙ্গল কামনায় এই জাওয়া পাতা হয়।

বন জাওয়া: বন জাওয়ার অর্থ হলো পুরো প্রকৃতি অর্থাৎ বসমতা মাঞ, পাহাড় পর্বত, নদী নালা, ক্ষেত-বাইদ, বন জঙ্গল ও আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র সবার উদ্দেশ্যে এই জাওয়া পাতা হয়। বাঁশের ডালা এর জন্য প্রয়োজন হয় না। সাধারণত শাল পাতার বঁহতা বা পাত্র তৈরী করে এই জাওয়া পাতা হয়। এর পিছনে যেমন প্রকৃতিকে খুশি ও আরাধনার বিষয়টি রয়েছে, তেমনি প্রকৃতি দেবতার কাছে বেশি ফসল কামনা ও এর পিছনে কারণ রয়েছে।

গরাম জাওয়া: গরাম দেবতা হলেন গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। তিনিই গ্রামের সবকিছুর রক্ষা কর্তা, পালন কর্তা। জমি জঙ্গল, রোগব্যাধি, মড়ক, বা অন্য সবকিছু বিপদ থেকে তিনি গ্রামকে বাঁচান। তাই তার উদ্দেশে দেওয়া হয় এই জাওয়া। শাল পাতা দিয়ে তৈরি খলা বা দনায় বালি এবং বীজ দিয়ে এই জাওয়া তৈরী করে গরাম দেবতার থানে তা রেখে দেওয়া হয়।

বাগাল জাওয়া: গ্রামের গরু কাড়া যারা কৃষি কাজে ব্যবহার হয় বা কৃষির সহায়ক শক্তি, তাদের দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণ করে বাগাল বা রাখাল। তিনিও দেবতা হিসেবেই গণ্য হন। বাগাল জাওয়া তারেই উদ্দেশ্যে করা হয়। শাল পাতার খালা বা দনা দিয়ে তার নিবেদন। মাঠে ঝোপ ঝাড়ের ভিতরে জাওয়া পাত্রটি রেখে দেওয়া হয়। আসলে গোরইয়া গুঁসাইকে খুশি করাও এর উদ্দেশ্যে।

জাওয়ার মাঞ বা করমতিদের পালনীয় নিয়ম বিধি:

১। বাসি টক দই জাতীয় খাবার নিষিদ্ধ। লোক বিশ্বাস এই জাতীয় খাবার খেলে জাওয়া ঢালিতে চারায় ছাতি বা ছত্রাক রোগ হয়। জাওয়া চারা গুলি এর ফলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

২। বেশি ঝাল জাতীয় খাবার বারন। সমাজে বিশ্বাস রয়েছে যে, ঝাল খাবার খেলে চারাগুলি ঝলসে যায়।

৩। খাওয়ার সময় বেশি গরম খাবার খাওয়া বারণ। গরম খাবার যেমন মুখ পোড়ায় তেমনি চারাগুলিও পুড়ে যেতে পারে।

৪। এই অঞ্চলের খাবারের সঙ্গে শাক বা শাগ তরকারি একটি নীত নৈমিত্তিক খাদ্য। কিন্তু করমতিদের তা বারণ। বিশ্বাস রয়েছে এতে চারাগুলির রং শাকের মতো হয়ে যায়। কিন্তু নিয়ম রয়েছে জাওয়ার রং হবে হলুদ। এজন্য শাক নিষিদ্ধ।

৫। মাছ-মাংস খাওয়া বারণ। মাছ-মাংস গুরু পাক খাদ্য। তাই সাবধানতা। করমতিদের অবলম্বন হওয়া চলবে না। পেট খারাপের ও ভয়। আসলে মাঞের শরীর অসুস্থ হলে তার প্রভাব সন্তানের উপর পড়বেই তাই এই সতর্কতা। করমতির শরীর খারাপ হলে চারাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সতর্কতা তাই সবকিছুতে।

৬। গুড় খাওয়া বারণ। গুড় খেলে পিঁপড়ে পতঙ্গের আগমন স্বাভাবিক এবং তা চারাকে খেয়ে ফেলবে বা ক্ষতি করবে।

৭। পড়া জিনিস তা যে কোন প্রকার হোক সে খাদ্য খাওয়া ও নিষিদ্ধ। কোন জিনিস পুড়ে গেলে যেমনটি হয় বা রং ধারণ করে মানুষের বিশ্বাস রয়েছে চারা গুলিও পুড়ে যাওয়ার মতো হয়।

৮। ঝগড়া করা কিম্বা মুখে অশোভন, ও আমার্জনীয় কথা বলাও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে সদা সর্বদা তাদের সচেতন থাকতে হয়। বিষয়টি একেবারেই মনস্তাত্ত্বিক। তা জাওয়া ডালির চারা গুলিতে কিভাবে তার প্রভাব পড়ে তা অনুসন্ধান কষ্টসাধ্য। কিন্তু উদ্ভিদের বাঁচা ও বৃদ্ধির উপর সংগীতের প্রভাব যে বিজ্ঞান সম্মত তা আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। কৃষি সংস্কৃতির মানুষের তা কিভাবে জানা বা বোধগম্য ছিল হাজার হাজার পূর্বেই তা বিস্ময়ের বিষয়। এর থেকে বোঝা যায় কথা, শব্দ, সুর তথা মনের ভাব যে উদ্ভিদের উপর ক্রিয়া করে তা বাস্তব সম্মত এবং বিজ্ঞান। জাওয়া চারা গুলি তাদের শস্য সন্তান কিন্তু পরবর্তী জীবনে তারাই যখন মা হবে তখন তার প্রভাব যে সন্তানের উপর পড়বে তা তাদের স্মরণে থাকবে। সুন্দর ও উন্নত সন্তানের জন্য যা বড়ই প্রয়োজন। জ্ঞান ও মানস চর্চার কোন পর্যায়ে উঠলে এইগুলি সমাজে রীতি নিয়ম হয়েছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আজকের সুসভ্য শিক্ষিত সমাজেও তা বিস্ময়ের বস্তু।

৯। কেবল ঝগড়া বা কলহ নয় রাগ বা অভিমান ও বারণ। চারা গুলির উপর তার প্রভাব পড়ে পড়ে মানুষ মনে করে।

১০। বাঁধে বা পুকুরে ডুবদিয়ে স্নান করা নিষিদ্ধ। করম পূজার দিন পর্যন্ত এই নিয়ম মেনে চলতে হয়। লোক বিশ্বাস এতে জাওয়ার চারা পচে-গলে যায়।

১১। পেছনে চুল খোলা অবস্থায় পেছন শুয়ে স্নান করা যায় না। এতে নাকি চুলের মতোই চারাগুলিও হয়ে পড়ে।

১২। গামছা দিয়ে চুল ঝাড়াও বারণ। গামছা দিয়ে চুল ঝাড়া হলে যেমন অনেক চুল ঝরে পড়ে তেমনি জাওয়া চারা গুলির পাতাও ঝরে পড়ে।

১৩। দেবস্থানে, ভিজা মাটিতে এবং যেখানে সেখানে পায়খানা করা একেবারে নিষিদ্ধ। সবদিক থেকেই চারাগুলির অমঙ্গল হয়। ভেজা মাটিতে পায়খানা করলে যেমন ভুসকা উঠে লোক রিসার্চ চারা গুলিতেও অনুরূপ ভুসকা উঠে যাবে। এবং চারা গুলিকে নষ্ট করে দেবে। তাহলে প্রশ্ন কিভাবে তারা পায়খানা করে। কারণ আজকের দিনের মতো পাকা টয়লেট তো সে যুগে ছিল না? তার উপায় স্বরূপ পায়খানা করতে গেলে পলাশ, শাল অথবা বড় আকৃতির কোন গাছের পাতা সংগ্রহ করে তাতে পায়খানা করে থাকে।

করম ডাল গাড়া ও করম পূজা:

জাওয়া-করম উৎসবের একটি মহত্বপূর্ণ আচার বা অনুষ্ঠান হলো করম রাজার পূজা। করম রাজা অর্থে করম ডালের পূজা। যে গাছ থেকে ডালটি সংগ্রহ করা হয় সেই গাছটিকে পূজার পূর্ব দিনেই গ্রামের লায়া আমন্ত্রণ জানাই। এই আমন্ত্রণের রীতিটি হলো করম গাছের গোড়ার গুঁড়ি, সিঁদুর, কাজল দেওয়া। এছাড়া আতপ চালের গুড়, ঘি, মধু সহযোগ ভোগ নিবেদন করা। এবং প্রদীপ দেওয়া। পূজার দিন বাজ-বাজনা সহকারে গিয়ে গাছের গোড়ায় পুজো করে দুটি ডাল কেটে নিয়ে আসবেন। ডাল পূজার আখড়া যেখানে ঠিক করা হয় সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দুটি গর্ত করে ডাল দুটি পাশাপাশি পুঁতে দেয়া হয়। ডাল দুটি কার কার প্রতীক এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন সূর্য ও বসমতা মায়ের প্রতিক কেউ বলেন বুঢ়া বাপ এবং মাহা মায়ের প্রতীক।

করমতিরা একটি করে বাঁশের তৈরী ডালাতে তাদের পূজার সারভার বা সামগ্রী নিয়ে সন্ধ্যায় করম আখড়ায় এসে উপস্থিত হয়। এবং ডালকে বেষ্টন করে ডালের চারিদিকে বসে। সারাদিন তারা উপাস থাকে। সন্ধ্যায় স্নান করে তাল

তোলে আসে। লায়া এক এক ঝাড় বা গোষ্ঠীর মেয়ে বউদের একসঙ্গে বসিয়ে পূজা করে। পূজার পর মেয়েরা করম ডালকে প্রণাম ও কোল-আঁকড় (আলিঙ্গন) করে। করমতি মেয়েটি নিজের ভাইয়ের বাহুতে সুতোতে কাঁখনা ঘাস ও জাওয়া চারা বেঁধে দাগা বেঁধে দেয়। এবং করম ঠাকুরের কাছে গীতে গীতে প্রার্থনা করে বলে- 'আপন করম-ভাইয়ের ধরম'।

গীত:

"দেহু দেহু করম রাজা দেহু আশিসরে
ভইআ মর বাঢ়ত লাখ বরিস রে
দেবোঁ তো করমতি দেবো আশীষ গো
ভইআ তর বাঢ়ত লাখ বরিস।"[১২]

করম ডাল পূজার মধ্যে কয়েকটি গভীর তত্ত্ব নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। জাওয়া-করম যদি হয় কৃষির সূচনার স্মৃতি উৎসব তাহলে করম ডালের পূজা আরাধনা প্রকৃতি পূজার আদিম নিদর্শন বলে ভাবা যেতে পারে। মানব সভ্যতায় আজ যতগুলি ধর্ম মত ও সম্প্রদায় রয়েছে তার আদি হলো প্রকৃতি পূজা। এই আদিম কৃষি উৎসবটি তার প্রথম নিদর্শন বলে অনুমিত হয়।

ইঁদ ও ইঁদ পূজা: জাওয়া-করম পরবের শেষ পর্বটি হলো ইঁদ পূজা। দ্বাদশী তিথিতে বিকাল বেলা বহু গ্রামে ইঁদ টাঁইড়ে ইঁদ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। একটি লম্বা বাঁশের ডগায় ছাতার কাঠামোতে সাদা কাপড়ের থান দিয়ে তা ঢাকা থাকে। ইঁদ ডাং এর গোড়ার দিক মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে ঢুকিয়ে দিয়ে স্থানীয় গ্রামের মাহাত, মড়ল রাজা এবং উপস্থিত জনতা হাতে হাত মিলিয়ে দড়িতে টান দিয়ে ইঁদ ডাঁগকে আকাশে তোলা হয়। লায়া ইঁদ দেবতাকে পূজা দেয় সেই ডালের গোড়ায়। সমবেত জনতা ইঁদ দেবতার কাছে শস্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে জোড় হাতে প্রণাম জানাই। আর করমতী মেয়ে তাদের জাওয়া ডালির কিছু চারা সঙ্গে নিয়ে আসে এবং ইঁদ দেবতার দিকে আকাশে ছুঁড়ে দেয়।

কিন্তু কে এই ইঁদ দেবতা? এই নিয়ে পন্ডিত মহলেও বিবাদ ও বিতর্কের শেষ নেই। বেশির ভাগ পন্ডিত মনে করেন এটি ইন্দ্রধ্বজের পূজা অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা আরাধনার প্রতীক। এক সময় ভারতের বৃহত্তর অংশে এই পূজার প্রচলন ছিল। কিন্তু তাদের বিষয়টি একেবারেই লৌকিক এবং করম ডালের মতো এটিও প্রকৃতি পূজা। আর এই ইঁদ রাজা ইন্দ্র নন তিনি হলেন প্রকৃতির রাজা সূর্য। কারণ 'ভারতের দেব-দেবী' গ্রন্থে হংশ নারায়ণ ভট্টাচার্য সূর্যের ১০৮ নামের একটি নাম কে ইঁদ বলেছেন।

কৃষি সংস্কৃতির আদিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের কোন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নেই। সম্পর্কটি সূর্যের সঙ্গে। শস্যের উৎপাদন ও মঙ্গল কামনায় বৃষ্টির দেবতা সূর্যের কাছে পূজা আরাধনা ইঁদ পূজা বা পরবের মূল তাৎপর্য। লোক উৎসবের সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যটিকে উপেক্ষা করে ব্যাখ্যা বিপথে পরিচালিত করতে বাধ্য।

স্পষ্টতঃ সে কথায় বলে গেছেন আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যা নিধি তার 'পূজা পার্বণ' গ্রন্থে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তার 'পূজা পার্বণ' গ্রন্থে। তিনি ইঁদকে ইন্দ্র ধ্বজের পূজা বলেই মনে করেছেন। পঞ্জিকাতে 'শক্রোত্থান' নামে এর অভিধা। এই বিশেষ তিথিতে ইঁদ পূজার কারণ ও তিনি নির্দেশ করেছেন জ্যোতিষের প্রমাণ সূত্রে। কোন এক কালে জৈষ্ঠ মাসের শুক্ল নবমীতে মহা বিষুব হয়েছিল। তার তিন মাস তিন তিথি পরে ভাদ্র মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে সূর্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়েছিল। (ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য)

বিভিন্ন রাজারা একে কেন্দ্র করে ইন্দ্রধ্বজ পূজা উৎসব আয়োজন করেছিলেন। এই ভাবেই ইঁদ ইন্দ্রধ্বজে রূপান্তরীত হয়েছিল। আসল তাৎপর্যটি সূর্যের দক্ষিণায়নের যাত্রা। তার স্মৃতি ও পূজা হলো ইঁদ অর্থাৎ সূর্যের পূজা। যার উত্তরায়ণ যাত্রার পর্বটি হলো আখান। কৃষি উৎসব গুলির তাৎপর্য সবই জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান আধারিত এবং সম্মত। তাই সেভাবেই তার ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। আসল তাৎপর্যটি হারিয়ে গেলে, সংস্কৃতির চেতনা ও শিক্ষাও বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

তথ্যসূত্র:

১. সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ। ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান গ্রন্থ (মুদ্রিত)। প্রকাশনী মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা-১, ১৩৭৮, পৃ. ১৮।
২. ক্ষেত্র, সমীক্ষা। পুনুড়িয়া নগেন, বয়স ৭০, টিমাংদা, কোটশীলা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
৩. মাহাত, ড. বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য (মুদ্রিত)। প্রকাশনী বানী শিল্প, ১৯৭৮, পৃ. ৫৭।
৪. মাহাত, ড. বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য (মুদ্রিত)। প্রকাশনী বানী শিল্প, ১৯৭৮, পৃ. ৫৭।
৫. করন, ড. সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোকযান। করুনা প্রকাশ, ১৪০২, পৃ. ৯৩।
৬. করন, ড. সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোকযান। করুনা প্রকাশ, ১৪০২, পৃ. ১২১।
৭. ক্ষেত্র, সমীক্ষা ও মাহাত সরস্বতী। বয়স ৩৫, উশিড, চেলিয়ামা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
৮. মানভূম কালচার একাডেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০২৩, পৃ. ২২,২৯।
৯. সেন, ক্ষিতিমোহন। ভারত পরিক্রমা (মুদ্রিত)। প্রকাশনী পুনশ্চ, ২০০৪, পৃ. ৩৯।
১০. করন, ড. সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোকযান (মুদ্রিত)। পৃ. ৯৫।
১১. মাহাত, নিমাই কৃষ্ণ। মানভূমের কৃষি সংস্কৃতি। J.G. Frazer, The Golden Bough. পৃ. ৪৪।
১২. মাহাত, কিরিটি। জাওয়া ডালি। মুলকী কুড়মালি ভাখি বাইসি (মুদ্রিত), ২০২৪, পৃ. ৩৪।

আকর গ্রন্থ:

১. করন, ড. সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোকযান। করুনা প্রকাশ, ১৪০২।
২. মাহাত, ড. বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য (মুদ্রিত)। প্রকাশনী বানী শিল্প, ১৯৭৮।
৩. সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ। ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান গ্রন্থ (মুদ্রিত)। প্রকাশনী মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা-১, ১৩৭৮।

অন্যান্য ঋণ:

১. মাহাত, কিরিটি। জাওয়া ডালি। মুলকী কুড়মালি ভাখি বাইসি (মুদ্রিত), ২০২৪।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 412- 424
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.223

যদুবংশ: বিভ্রান্ত সময়ের যাপিত যৌবন

ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী, *সহকারী অধ্যাপক, শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.10.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bimal Kar wrote the novel *Yaduvansha*, set in a turbulent period in the 20th century; this work is a culmination of the love, frustration, conflict and vacillation of the youth of the sixties. The intricate characters actually reflect the multifaceted voices of that time. Despite the negativity, the characters cannot be denied, but rather a sense of compassion is aroused towards them. Bimal Kar's presentation makes the reader empathize with those characters.

Keywords: Bimal kar, *Yaduvansha,* The sixties in Bengal, Emerging youth, Love and lovelessness, Positivity

১

মহাভারতে যদুবংশের বিনাশ হয়েছিল মুষলপর্বে। গান্ধারীর অভিশাপের আড়ালে সেই ঘটনার প্রাকৃত কারণ ছিল ভিন্ন; যাদবদের অভ্যন্তরীণ 'তুচ্ছ কলহ' পরিণত হয়েছিল 'ঘোরতর আত্মযুদ্ধে'। *পাঞ্চজন্য* উপন্যাসে গজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছিলেন—

> "তাঁর নিজের বংশের এ পরিণাম তিনি জানতেন, এতটা জানতেন না। নারী ও সুরায় উন্মত্ত হয়ে উঠল তারা। সর্বজনসমক্ষে সর্বক্ষণ সুরাপান করতে লাগল। আহোরাত্র সুরাপান, মাংসাহার ও স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক যৌনসম্ভোগে রত রইল। শ্রদ্ধেয়দের অবজ্ঞা করতে লাগল, যা শুভ ও হিতকর তা উপেক্ষা করল। শুধু তাদের দেহটাই নয়— মনে হল তাদের আত্মা-মনও নানাবিধ পাপ ও ব্যসনে ডুবে গেছে, তা থেকে উঠে আসার আর কোন আশা নেই।"[১]

কৃষ্ণ বা বলরামের প্রয়াণের পর যদুবংশের মহিলাদের উদ্ধারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বয়ং অর্জুন। কৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্নী, পৌত্র বজ্র, যাদবংশের বহু নারী এবং বৃদ্ধদের নিয়ে পার্থ যাত্রা করেছিলেন দ্বারকা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে। কিন্তু সময়ের মার সেই কাজের অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছিল। পঞ্চনদ প্রদেশের কাছে গিয়ে যখন তারা পৌঁছয়—

> "সেখানকার আভীর দস্যুগণ যাদবনারীদের দেখে লুব্ধ হয়ে যষ্টি নিয়ে আক্রমণ করলে। অর্জুন ঈষৎ হাস্য করে তাদের বললেন, যদি বাঁচতে চাও তো দূর হও, নতুবা আমার শরে ছিন্ন হয়ে সকলে মরবে। দস্যুগণ নিবৃত্ত হল না দেখে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব নিলেন এবং অতি কষ্টে জ্যা রোপন করলেন, কিন্তু কোনও দিব্যাস্ত্র স্মরণ করতে পারলেন না। তিনি এবং সহগামী যোদ্ধারা বাধা দেবার চেষ্টা করলেও দস্যুরা নারী হরণ করতে লাগল, কোনও কোনও নারী স্বেচ্ছায় তাদের কাছে গেল। অর্জুনের বাণ নিঃশেষ হলে তিনি ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন, কিন্তু সেই ম্লেচ্ছ দস্যুগণ তাঁর সমক্ষেই বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় সুন্দরীদের হরণ করে নিয়ে গেল।"[২]

মহাভারতের এই ঘটনার মিথকেই উপন্যাসের নামকরণে ব্যবহার করে বিশ শতকের ছয়ের দশকের বিভ্রান্ত যুবসমাজের ছবি আঁকলেন বিমল কর তাঁর *যদুবংশ*-এ। এই প্রসঙ্গে লেখক নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> "যদুবংশের ধ্বংস হয়েছিল নিজেদের মধ্যে বিবাদ করেই। সেভাবেই তো এরা নিজেদের নষ্ট করেছে। সব দিক থেকে তারা অধঃপতিত হয়ে গিয়েছিল— সোসালি এবং পলিটিক্যালি। কৃষ্ণের পায়ে একটা তির এসে বিঁধল ওটা গল্প, আসলে নিজেদের ভিতরেই তারা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।"[৩]

যদুবংশ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ছ'য়ের দশক। আমরা যদি সেই কালপটভূমির দিকে তাকাই, তাহলে চোখে পড়বে, ছ'য়ের দশক সূচনার প্রাক্‌লগ্নেই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছে খাদ্য আন্দোলন— এরই সঙ্গে হরতাল এবং আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বহু মানুষ; ভুখা মিছিল ও ময়দানে কৃষক সমাবেশ। চলে আসে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ এবং ভাষা আন্দোলন। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর উদ্বাস্তুর আগমন ঘটে। শুরু হয় ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ— অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও রেলভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা বাংলা জুড়ে প্রতিবাদ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত-চীন যুদ্ধের কারণে কমিউনিস্ট পার্টিতে যেমন বিভাজন ঘটে, অন্যদিকে শুরু হয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ১৯৬৭ সালে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিম-বাংলার বিধানসভায় জাতীয় কংগ্রেসের বদলে প্রথম সরকার গঠন করেছে যুক্তফ্রন্ট। সাহিত্যে আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল হাংরি আন্দোলন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিও প্রস্তুত। মোটামুটি এই রকম সময়ে লিখছেন বিমল কর তাঁর *যদুবংশ* উপন্যাস। এই উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত প্লটে মফঃস্বল অঞ্চলের কয়েকটি ছেলের বিভ্রান্ত যাপনের বাস্তব ছবিই তুলে ধরেছিলেন ঔপন্যাসিক। বিমল করের কথাসাহিত্যের প্রয়োগশৈলীর আলোচনা প্রসঙ্গে সুমনা দাস সুর লিখেছিলেন—

> "স্বাধীনতা উত্তরকালে পঞ্চাশের দশকের বিভ্রান্ত সময়ে, স্বপ্নভঙ্গের কালপর্বে একদিকে ভঙ্গিসর্বস্বতা, অন্যদিকে পলিটিক্যাল সিনিসিজম্-এর দিকে ঝোঁক দেখা দেয় যখন মাঝারি মানের লেখকদের মধ্যে, তখন বাঙলা কথাসাহিত্যে হাল ধরেন দুজন প্রতিভাবান লেখক— একদিকে সমরেশ বসু অন্যদিকে বিমল কর। পাশাপাশি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরীর নামও স্মরণীয়। তীব্র, তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতা, অভিজ্ঞ শল্যবিদ্-এর দক্ষতায় বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ব্যবচ্ছেদ করে অন্তর্গত কোনো সত্যের নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশনায় সমরেশ বসু অসামান্য।... এর বিপরীতে বিমল কর তাঁর গল্প উপন্যাসে সম্পূর্ণ এক অন্যভুবন গড়ে তোলেন। অবশ্য বিমল কর বাস্তব সচেতন নন এমন কথা ভাবা ভুল, বরং তিনি গভীরতর অর্থে সংবেদনশীল। তবে শীতের ভোরের কুয়াশার মতো তাঁর কাহিনি এবং চরিত্রদের ঘিরে থাকে এক মিস্টিক রোমান্টিক বলয়। তাঁর অধিকাংশ রচনাই বাস্তবের মাটি ছুঁয়ে ডানা মেলে দার্শনিক উপলব্ধির আকাশে। বিমল করের ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গি কখনোই চিৎকৃত আত্মঘোষণায় উন্মুখ নয়; বরং তাঁর হার্দ্য, মরমী কণ্ঠস্বর; সরল অনাড়ম্বর বাচনভঙ্গি কখনো কখনো ছলনা করে পাঠককে। একমাত্র মনযোগী পাঠেই বোঝা যায় জীবনকে আতস কাঁচের তলায় ফেলে দেখার কী সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শাণিত আঙ্গিক সচেতনতা আত্মগোপন করে আছে তাঁর আপাত সহজ রচনাগুলির গভীরে।"[৪]

আলোচ্য *যদুবংশ* উপন্যাস সম্পর্কেও এই বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

২

উপন্যাসটির সূচনা বর্ষার প্রেক্ষাপটে— কালপটভূমি দীর্ঘ নয়, শরতেই উপন্যাসের সমাপ্তি। এরই মাঝে সময়ের স্বর ও পথভ্রষ্ট যুবসমাজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। পাশাপাশি সমাজ এবং রাজনীতিকেও উপেক্ষা করেননি লেখক। নয়নাদের বাড়ি ও তাঁর আশপাশের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানাচ্ছেন— 'পাড়াটা ছোট, বাসিন্দারাও অতি সাধারণ। দু-পাঁচটা একতলা পাকাবাড়ি, কায়ক্লেশে খাড়া করা কয়েকটা মাঠকোঠা, বাকি কিছু বস্তি ধরনের বাড়ি। পাড়ার আশেপাশে এখনও ঝোপঝাড়, ডোবা, এবড়ো-খেবড়ো জমি, মরচে-ধরা ভাঙা টিনের বেড়া দেওয়া কাঠগুদাম। শহরের বিজলিবাতি গলি পর্যন্ত এসেছে, ঘরদোরে যায়নি। এই কাঁচা রাস্তাতে আলো আসার কথা ছিল না, নিতান্ত সূর্যর বাবা কামাখ্যাবাবু, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। ভোটের আগে সদলবলে ডুবতে ডুবতে কথা দিয়েছিলেন রাস্তার পিচ আর আলো, আর নালি-নর্দমা সাফের ব্যবস্থা করে দেব, সেই দেওয়া কথা রাখতে গোটা চারেক ফালতু পুরানো পোস্ট এনে এদিকে বসিয়ে দিয়েছেন; কাঁচা ব্যবস্থায় কটা বাতিও মাথার ওপর ঝোলে। মাসের

মধ্যে পাঁচ-সাতদিন হয়তো দুএকটা বাতি জ্বলে, বাকি জ্বলে না।' রাজনীতির কৌশলী রূপের পাশাপাশি আছে ব্যর্থ যৌবনের বিকৃত প্রতিক্রিয়া। তাই বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে গভীর রাতে রাস্তার বাল্‌ব গুলতি দিয়ে মেরে ফাটিয়ে দেয় সূর্য। এই বিদ্রোহ শুধু আলোর বিরুদ্ধেই নয়, কীটদ্রষ্ট এবং মূল্যবোধের অবনমন ঘটা সমাজের বিরুদ্ধেও। তবে সেই যুবকদের আচরণ ও যাপন, সবই সেই ভ্রান্ত জীবনবোধের কেন্দ্রে।

বাংলা উপন্যাসকোশ গ্রন্থে *যদুবংশ* উপন্যাসের পরিচয়ে এরকম লেখা হয়েছে—

> "উপন্যাসের নায়ক গণনাথ, তাকে কেন্দ্র করে সমকালের বেকার যুবকদের চিত্র এঁকেছেন লেখক। মফঃস্বল শহরের এই যুবকেরা হল দারোগার ছেলে বুললি, পিতৃহীন কৃপাময়, বেকার অভয় ও মাতৃহীন সূর্য— এই চারজন। স্বাধীনতা পাবার পরে বিশ বছর কেটে গেছে, নিভে গেছে সাধারণ মানুষের সব আশার আলো, দেশের রাজনীতিতে ক্রিমিনালাইজেশন প্রবল হয়ে উঠেছে। গণনাথ এদের মধ্যে এক আশ্চর্য জীবনের, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহিত জীবনাচরণের ও সত্যের প্রতীক চরিত্র, যে বিবেকের তীব্র তাড়নায় আফিং খেয়ে আত্মহনন করে, তাকে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যায় সবাই। বেকার, একান্ত সাধারণ, পরোপকারী গণনাথ হয়ে ওঠে অবক্ষয়িত যুগের বিবেক।"[৫]

শুধু গণনাথ বা গণাদা-ই নয়, তার বিপ্রতীপে অবস্থান করছে যে চরিত্রগুলো, তারাও স্পষ্ট করে দেয় যুগের অবক্ষয়ের স্বরূপ। সবচেয়ে বড় কথা গণনাথকে কেন্দ্র করে যে চারটি চরিত্রের বিকাশ, তাদের আত্মক্ষয়ের কারণ কেবল 'সামাজিক, পারিবারিক ও পরিবেশগত কারণেই ঘটে না— ব্যক্তিগত মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বেদনার কারণে ঘটে থাকে'— একথাও স্বীকার করে নিতে হয়।

৩

চারটি চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই যার পরিচয় দিতে হয়, সে সূর্য— মাতৃহীন এই যুবকের পরিবার বলতে বিপত্নীক পিতা, বিধবা দিদি ও দুটি ভাগ্নে। আপাতভাবে মাতৃহীন ভায়ের কাছে বড় দিদি তো মাতৃসমা হয়ে ওঠে, কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি দেখি। বিজয়া ও সূর্যর একেবারে অহিনকুল সম্পর্ক, সেখানে স্নেহ-মমতার লেশ মাত্র নেই, হিংসা-দ্বেষ এবং এবং পারস্পরিক আক্রমণ চলে অনুক্ষণ। দিদির সাজপোশাকও সহ্য করতে পারে না সূর্য— 'জামাইবাবু বেঁচে থাকার সময়েও দিদি মাথায় কাপড় দিত না। বাপের বাড়িতেই আজন্ম কাটল। বিয়ের পরও, হয়ত তাই। এই বাড়িটা দিদির বাপের বাড়ি, তার স্বামী সেই বাড়িতেই থেকে গেল বলে যেন দিদি তার বাপের বাড়ির কর্তৃত্ব ও অধিকার বরাবরই দেখিয়ে গেছে।' দিদিও ভাইকে 'হারামজাদা', 'ছোটলোক','অসভ্য', 'জানোয়ার'— কিছু বলতেই বাকি রাখে না। তাই দিদির মধ্যে স্নেহশীলা মূর্তি নয়, বরং বিজয়ার ঘন ভুরু, কপালের খাঁজ, পুরু ঠোঁট আর তাতে লালচে বাসি দাগ বিরক্তি জাগায় সূর্যর মনে। দিদিকে মনে মনে 'খচড়ি মাগী' বা 'কুত্তি' বলতে পারে সে।

সূর্য দেখেছে তার, দিদির এবং বাবার- তিনজনের চোখের তলায় কালচে দাগ- অবশ্য মৃত মায়ের চোখের তলায় যেমন দাগ ছিল কিনা সে মনে করতে পারে না। মা তার কাছে স্বপ্নের মত- ছেলের স্বপ্নে মা তো আসেনও। হয়ত সময়ের এই সঙ্কট থেকে মনে মনে সূর্য মুক্তি পেতে চায় মা কে কল্পনা করে। একসময় তার জীবনেও তো ছিল প্রাণময় কৈশোর, সজীব প্রেম- একদিন সন্ধের পর- ভয়ঙ্কর শীতে, মেলায় টিনের সিনেমাঘরে যখন 'দেবদাস' দেখানো হচ্ছে, 'সূর্য আর সুমি- দুই ভলেন্টিয়ারসূর্যের গরম কোটের তলায় মাথা ঢেকে কোটের দুটো লম্বা হাতা দুজনের দুপাশে কানের মতন ঝুলিয়ে 'দেবদাস' দেখছিল। দেখতে দেখতে বিশ্বসংসার ভুলে গিয়েছিল সে, মনেও ছিল না মেয়েদের দিকে একটা কাঠের সরু বেঞ্চিতে বসে আছে। বই শেষ হয়ে যাওয়ার পর সুমি চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'তোর কোটের ঝাপটা লেগে আমা চোখ কেটে গেছে', জবাবে সূর্য বলেছিল; 'তোর চুলের ক্লিপে আমার খোঁচা লেগেছে চোখে'। তারপর 'এ ওকে মিথ্যুক বলল, ও অন্যকে 'মিথ্যুক' বলল। তারপর ভিড়ের মধ্যে দুজন দুজনকে ধরে হারিয়ে গেল'।

এছাড়াও সূর্যের আরেকটি স্নেহের জায়গা আছে- দিদির ছোট ছেলে ছোকনু। পোলিওর কারণে সে একটা পা টেনে চলে। ছোকনুর অবস্থা দেখে সূর্য দিদির ওপরেই ক্ষেপে যায়- 'দিদি বরাবর অনেক লটপট করেছে, করে যাচ্ছে। এত পাপ শালা ভগবান সইবে কেন? কিন্তু বেচারি ছোকনুর কপালেই ...' পরক্ষণেই তার মনে হয়েছে- 'সে যখন মরে যাবে তখন, এই বাড়ি টাড়ি, টাকা-পয়সা, যেখানে যা কিছু থাকবে তার থাকবে, সব ছোকনুকে দিয়ে যাবে। শুধু ছোকনুকে।' অবশ্য ছোকনুর দাদাটিকে সূর্য সহ্য করতে পারে না। তার চোখ মুখ, হাবভাব কথা বলার ভঙ্গি সবকিছুই

বিজয়ার মতো- ভাগ্নের 'রোয়াব' দেখে 'একদিন একটা লাথি মেরেছিল সূর্য, ছিটকে গিয়ে বাগানে পড়েছিলো হারামজাদা'। ছোকনুর প্রতি আছে তার মায়া, ছলাফেরা নিয়ে সাবধান ও করে বালকটিকে। খেলনা বন্দুক তাক করেও খেলাছলে গুলি ছুড়তে পারে না সূর্য— মনে হয় 'সাহেবদের কবর খানার মাথায় পোঁতা ছোট্ট ক্রুশের মতো দাঁড়িয়ে আছে ছোকনু'।

মা যেমন সূর্যর কাছে স্বপ্ন, তেমনি তার হিংস্রতার অন্তরায় হয়ে এসেও দাঁড়ায়। বাবার অবস্থান সূর্যের জীবনে একেবারে ভিন্ন। শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই এতটুকু— বাবার কাজকর্মের সরাসরি সমালোচনা না করলেও, সেসবের প্রতি বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই। যদিও মন্দ কাজের সমালোচনা করা বা নীতির প্রশ্ন তোলার মতো নৈতিকতার ধার ধারে না সূর্য। মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে ভোটে দাঁড়ালে, বাবার বিরুদ্ধে যখন বিরোধীদল খোল-করতাল বাজিয়ে ছড়া গেয়ে যায়, তখন সূর্যর হাসি পায়; ঘৃণাও জাগে— যখন মনে পড়ে রাস্তার শৌচালয়ে বাবার বিরুদ্ধে সাঁটা পোস্টারের কথা। সে ভাবে— 'এ শহরে বাবার সুনাম কিছু নেই। রাস্তায়, ঘাটে, দোকানে লোকে গালাগাল দেয়। বাবার ওপর লোকের কী আক্রোশ ও ঘেন্না। তবু বাবা জিতে যায়, বাবার সম্মান মর্যাদা টিকে থাকে। কী আশ্চর্য।' সূর্যের মনে কিন্তু ঘৃণা আছে, আর তাই অভয় তাকে 'দিলদারের বাচ্চা' বললে সে ক্ষেপে ওঠে। অথচ সূর্যকে অনুভূতিহীন বলা যায় না। নিজের ঘরের আসবাবপত্র দেখতে দেখতে তাই তার মনে হয়— 'এত জিনিসের সঙ্গে তার প্রয়োজনের শেষ নেই, বাড়ির জিনিস বাড়িতে থাকবে'। নিজেকেও তার ওই অপ্রয়োজনীয় আসবাবগুলোর মতোই মনে হয়েছে 'তাকেও যেন রেখে দেওয়া হয়েছে'।

বুললির পারিবারিক প্রেক্ষাপট বেশ গোছানো— যেখানে আছে স্বচ্ছলতা। বাবা পুলিশের দারোগা, মা-ও আছেন। দাদা চাকরির কাজে বাইরে, বউদি অবশ্য শ্বশুর-শাশুড়ি ও দেবরের সঙ্গেই থাকছে। কিন্তু পারিবারিক শান্তি সেখানেও অনুপস্থিত; শাশুড়ি ও পুত্রবধূর নিত্যকলহ। এসবের অবশ্য একটু পূর্বইতিহাসও আছে। বুললির দাদা সাধন, মৃদুলাকে বিয়ে করেছিল বাড়ির অমতে। মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও বুললির বাবা এই বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ বিয়ের আগেই সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছিল মৃদুলা— 'কিন্তু যার জন্য এত, সেই খোঁড়া গর্তটাই বুজে গেল। বউদির পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল কিছুদিন পরেই।' এই ঘটনাটা ইচ্ছাকৃত কিনা বুললি জানে না। যদিও এই গর্ভপাতের বিষয়টি বুললির মা বিশ্বাস করে না, আর 'বিশ্বাস করে না বলেই মা'র সন্দেহ এবং রাগ আরও বেশি বউদির ওপর। ঘেন্নাও। যে জীবহত্যা করেছে তাকে মা কিছুতেই সুনজরে দেখবে না।' যার ফল 'নিত্য ঝগড়া, রোজই মার মুখ গম্ভীর, প্রত্যহ মা ছেলের বউকে খেঁতলাচ্ছে।'শুধু এই নয়, আরও গূঢ় কারণ ঢাকা পড়ে আছে— মৃদুলার স্বামী ছেড়ে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে থাকার ভিন্ন হেতুও খুঁজে পেয়েছে বুললি। চাকরিতে বাবার অবসর নেবার সময় হয়েছে— মাস কয়েক পরেই প্রচুর টাকা আসবে তাঁর হাতে। নিজেদের জন্য বাড়িও তৈরি হবে। সাধন এসব বুঝেই বউকে পাঠিয়ে দিয়েছে বাবা মায়ের কাছে, পাছে হকের জিনিস হাতছাড়া না হয়। দাদার মানসিকতা উপলব্ধি করেছে বুললি- 'অন্তত চোখের সামনে বউদি থাকলে বাবা বা মা তাদের বাড়ির অন্য ভাগীদারকে মনে না করে পারবে না।' প্রথমদিকে শাশুড়ির অনুগত হয়ে থাকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই 'আদিখ্যেতা' ধরে ফেলতে দেরি হয়নি বুললির মায়ের— 'শত হলেও গুহমশাইয়ের স্ত্রী, দারোগার গিন্নি, ওসব চোরের মন সহজেই বুঝতে পারে।'

উপন্যাস থেকে জানা যায়, বাকি তিন বন্ধু এবং তুলসী স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হলেও, বুললি কলেজে গেছে শুধু বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। তাই বি.এ. পাশ বউদির 'চালিয়াতি' আর বাপের বাড়ি সম্পর্কে 'বড় বড় কথা' একেবারেই সহ্য করতে পারেনি। বরং সে লক্ষ্য করেছে— 'বউদি ঠিক যখন তাকে সভ্যতার লেকচার মারছে তখন নিজেই বুক থেকে আঁচল খসিয়ে বসে ব্লাউজের বোতাম নখ দিয়ে খুঁটছে, বা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, পা দুটো হাঁটু থেকে তোলা, পায়ের কাপড় গড়িয়ে পড়েছে।' তবুও দেবর-বউদির মধ্যে সখ্যও ছিল, কিন্তু 'সভ্যতা-ভদ্রতা' নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বুললি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেনি, মুখের ওপর বড় বউদিকে বলে ফেলেছে—

- 'ভদ্রলোকের বাড়ির বি.এ. পড়া ছুঁড়ি তো নই গো, শিখব কোত্থেকে।'
- 'তোমার বাপের বাড়ির ভদ্দরলোকেরা তো নিজের মেয়ে বোনকে রাস্তায় ছেড়ে লেলায়। যেমন তোমায় লেলিয়েছিল।'

সূর্য যেমন দিদির মুখে শুনেছিল, বুললিকেও তার বউদি বলেছে— 'ছোটলোক। লোচ্চা, লোফার কোথাকার'। অবশ্য বুললিও চুপ থাকেনি, বড় বউদির গায়ে হাত না তুললেও 'এক থাপ্পড়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব' কিংবা 'শালা বেজন্মার বংশ' বলেই ফেলে।

মোটামুটি মেয়েদের প্রতি ষাটের বিভ্রান্ত যুবসমাজের মানসিকতা ধরা পড়ে বুললির আচরণে। বউদির তোয়ালে, বালিসের ওয়াড়, রুমাল, গেঞ্জিগুকাতে দেওয়া 'দেখতে দেখতে সে হাতের পাম্প অন্যমনস্কভাবে চাপছিল, খুলছিল, আবার চাপছিল'। বুললির মেজাজ 'খিঁচড়ে' থাকার প্রসঙ্গে সূর্যও একবার বলেছে— 'সেই দেখেছিলি নাকি?' নয়নাদের বাড়িতে গণনাথের থাকার প্রসঙ্গেও বুললি বলেছে— 'তিন তিনটে ছুঁড়ি নিয়ে বাড়ি করে বসে আছে। আমাদের একটা করে দিক না মাইরি।' অথবা যমুনা সম্পর্কে— 'মেজকিটার খুব টোল আছে' অথবা গণনাথের ওপর চড়াও হবার দিনে নয়নার 'বেয়াড়া বুকে' চোখ পড়েছে তার। লুক স্টোর্সে গিয়েও সূর্য বা বুললির চোখ পড়ে মেয়েদের অন্তর্বাসে। সূর্য অশ্লীল শারীরিক ইঙ্গিত করে বলেছে— 'ওই যে রবারের বাটি, তোর বিয়েতে তোর বয়কে ওই একজোড়া প্রেজেন্ট করবো'। সেইসব জিনিসে চোখ বুলিয়ে বুললির দীর্ঘশ্বাস— 'মেয়েদের এত কিসিমের আছে মাইরি, আমাদের শালা কিছু নেই'। ভারী চেহারার মাদ্রাজি মহিলা টিকিট কালেক্টরকে দেখে অভয়ের সঙ্গে বুললির কদর্য রসিকতা— 'ও হাসে কী করে মাইরি, ওপন হয় কী করে?'

এই উদ্ধত রাগী বুললিও সম্পূর্ণ মমত্বহীন নয়। তাই যখন অভয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে বিষয়টা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে যা যায়, ঠিক তখনই অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে বুললি— 'উটের মতো গলা বাড়িয়ে অভয়ের গালের পাশে নাক বরাবর শব্দ করে একটা চুমু খেল। তারপর হেসে বলল, 'শালার মান হয়েছে, লে রে কিস দিয়ে দিলুম, মান ফান মুছে ফেল! চল!...' বুললির সারল্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে অভয়ের সূত্রে, তেমনই তার প্রেমিক সত্তার প্রকাশ অভয়ের বোন আভাকে কেন্দ্র করে। সবার অলক্ষ্যে 'দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একেবারে আচমকাই আভার পিঠ জড়িয়ে কাছে টেনে নিল, নিয়ে টপ করে একটা চুমু খেয়ে ফেলল। চুমু খাবার পর সরে এসে নিজের ঠোঁট চুষতে চুষতে কেমন হয়ে গেল। ভীষণ একটা আবেগ যেন মুখে।'— আপাতভাবে মনে হতেই পারে এ তার অবদমিত কামের তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ, অন্তত বুললির আচরণের গতিপ্রকৃতি সেই ইঙ্গিতই দেয়। আভার সঙ্গে তার গভীর প্রেমের অবকাশ লেখক দেখাননি; কিন্তু বুললির অর্থহীন জীবনও যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে যখন সে লুক স্টোর্সে যায় অন্তর্বাস দেখতে বা অশ্লীল বই কেনার উদ্দেশ্যে নয়, আভার জন্য সোয়েটারের ডিজাইনের বই কিনতে। উপন্যাসের শেষে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় অভয় এবং অন্যান্যদের সামনে সরাসরি নিজের ভালোবাসার কথা স্বীকারও করে।

বুললি বা সূর্যর থেকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার অভয়— এই অভিমান কেবল নিজের মধ্যে পুষে রাখেনি, তার বিভিন্ন কথা ও আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন অর্থনৈতিক সংকট যুবসমাজের মেরুদণ্ড কিভাবে ভেঙে দিয়েছিল তার প্রমাণ মেলে অভয় চরিত্রের পরিকল্পনায়। 'জেনারেশন গ্যাপ'-এর ছবিও ধরা পড়েছে অভয়ের বক্তব্যে— 'আমার বাবা মাইরি এ সংসারে মা ছাড়া কাউকে জানে না। চাকরি করে আর ঘুমোয়। যা কিছু বলা-টলার সব মা'র সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তাই হয় না বড় একটা।' এই দূরত্বের কথা বুললিও স্বীকার করেছে। বাকিদের অবস্থাও একই। অভয়ের মা তো সূর্যের মায়ের মত স্বপ্ন নয়, তাই সংসার ও সন্তানদের প্রতি তিতিবিরক্ত হয়ে সকালবেলাই বেকার ছেলের উদ্দেশে বলে দেয়— 'লজ্জা করে না তোদের, একটা মানুষ আগুনের আঁচে রক্ত শুকিয়ে পয়সা আনছে আর তোরা খাচ্ছিস-দাচ্ছিস ঘুরে বেড়াচ্ছিস। নেমকহারাম নচ্ছার কোথাকার। এসব শুয়োরের জাত আবার মানুষ পেটে ধরে। মরগে যা—।' দিদি-বউদি-মা, সম্পর্ক যাই হোক, তাদের ব্যবহার মোটামুটি একই রকম, কোনো স্নেহ-মমত্বের অবকাশ নেই সেখানে। অথচ এই অভয়ের মা, বুললি-সূর্য বা কৃপাময়ের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ বজায় রেখে মিষ্টিমুখ করায়। অথচ ছেলে সামান্য সাইকেল সারানোর জন্য টাকা চাইলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, রোজগারের খোঁটা দেয়।

এই পরিবেশ ও প্রতিক্রিয়া অভয় চরিত্রে দীনতার সঙ্গে যুক্ত করে আক্রোশ— তাই কখনো সূর্য বা কখনো বুললির সঙ্গে সংঘাত ঘটে। অর্থনৈতিক অসাম্য নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয় নিজের মনে। বার বার তার চোখে পড়ে 'ওদের বাপের মর্যাদা আর টাকার গরম'। আবার এই রাগ সরিয়ে বন্ধুদের ভালোওবাসে। তবে— 'সূর্য আর বুললির চেয়ে কৃপাময়কে আরও বেশি নিজের বলে মনে হয়। দুঃখের সময় কৃপাময় তার যত আপন, সূর্যরা তত নয়। আবার এও সত্যি, সূর্য বা বুললির অভাব তার পক্ষে অসহ্য। না, চা সিগারেট বা মালের জন্য নয়, মমতার জন্য, বন্ধুত্বের জন্য'। এই সাহচর্য

তার একান্ত কাঙ্ক্ষিত, না হলে তার নিজের সাথী বলতে তো সেই 'হাড়গোড় ভেঙে যাওয়া মানুষের মতো' সাইকেলটা। চাকরির জন্য চারু দত্তের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে অপমানের সম্মুখীন হতে হয়। এই সব প্রত্যাখ্যান আর অপমানে ভরা জীবনে চলতে গিয়ে অসামাজিক কাজ করে ফেলে সে, কখনো সিদ্ধি খেয়ে যমুনার গালে ঠোনা মেরে মেয়েদের বিষ নজরে পড়ে, কখনো স্টেশন চত্বরে কোনো মেয়েকে দেখে শিস দিয়ে গণাদার থাপ্পড় খায়।

চার বন্ধুর মধ্যে অনুভবী মন কৃপাময়ের— সে কিছুটা শান্ত-স্থিতধী। অনেক উত্তপ্ত পরিস্থিতি তার মধ্যস্ততায় স্বাভাবিক হয়েছে। কৃপাময়ের পারিবারিক অবস্থাও খুব স্বাভাবিক নয়। তার বিধবা মা বদ্ধ পাগল— 'ঘরে শিকল দিয়ে রাখতে হয়'। মায়ের এই পরিণতির কারণ সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল কৃপাময়। পারিবারিক আভিজাত্যের আড়ালে যে কত সংকীর্ণতা লুকানো আছে তা সে বোঝে— বোঝে 'নোংরামি' আর 'নিষ্ঠুরতা'— 'মাকে ওরাই পাগল করেছে। ঠাকুমা, বাবা, কাকারা, পিসিরা। মা'র সর্বস্ব ওরা শুষে নিয়ে, মার শেষ সম্বল স্বামীটিকে গলা পর্যন্ত সংসারের নোংরা মাটিতে পুঁতে দিয়ে দেখিয়েছে মা কত অসহায়।' নিঃস্ব রিক্ত সেই মহিলা শেষ আশ্রয় নিয়েছিল ধর্মকর্মে, যা তাঁকে পরিণত করেছে মানসিক প্রতিবন্ধীতে। অন্যদিকে 'তার ছেলে এই সংসারে আবর্জনার মতো বেড়ে উঠতে লাগল'। কৃপাময়ের অবস্থা বাড়ির অবৈধ সন্তানের মতো। তার দিদির বিয়ে হয়েছিল আগেই, সেখান থেকে কিছুটা স্নেহ পেয়েছিল বটে, কিন্তু দিদিও মারা গেছে অকালে।

নিঃসঙ্গ কৃপাময় অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে হাহাকার করে কাঁদে আর দেখে বাড়ির মানুষদের স্বার্থপরতা— সে জানে, 'এ বাড়ির ভিত, দেওয়াল, কড়িবরগা আর পুরানো যত আসবাবপত্র আচার-বিচার— সমস্ত কিছুর মধ্যে বাইরে বাইরে একটা শোভা আছে, ভার আছে, পুরানো গন্ধ আছে; নয়তো আর কিছু নেই। বাবাকে এরা যন্ত্রণা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রতারণা করে মেরেছে। এরা কেউ স্বার্থপর, কেউ অকৃতজ্ঞ, কেউ অর্থপিশাচ, চরিত্রহীন, কেউ সাবধানী, সতর্ক, শঠ।' অথচ সে দেখেছে খুড়তুতো ভাই দিব্যেন্দু কলেজের ক্যান্টিনে বন্ধুদের সঙ্গে চা-ডিম খেতে খেতে বাড়ির জন্য নিজের বাবার 'কন্ট্রিবিউশন'-এর গল্প শোনায়; অসুস্থ জ্যেঠিমা সম্পর্কে মিথ্যে বলতেও তার বাধে না। দিব্যেন্দুর বোন বীথি 'চুপ শয়তান', বাইরে মনে হবে তার শিক্ষা-দীক্ষা উপচে পড়ছে, অথচ কৃপাময় নিজের চোখে তাকে যেমন ছোটকাকীমার দেরাজ থেকে টাকা চুরি করতে দেখেছে,তেমনই দেখে অন্ধকারে সিঁড়ির তলায় 'মামাতো ভাইয়ের আদর খেতে'।

পরিবারে কৃপার প্রতি একমাত্র যে সদয়, তার ছোটকাকীমা, ছোটকাকার দ্বিতীয় পত্নী প্রতিমা। প্রথম পক্ষের সুন্দরী-অহংকারী স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়ে সন্দেহজনকভাবে মারা যায়। দ্বিতীয়-স্ত্রীকে ছোটকাকার পছন্দ হয়নি— 'কোত্থেকে একটা কালো মুখ্যু মেয়েকে জোগাড় করে এনেছিস? আমাদের বাড়িতে এসব রাস্তার ভিখারি মানায় না।' সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার স্পষ্ট প্রকাশ আছে এই নারীভাবনায়। তবে কৃপাময় বোঝে— 'ছোটকাকার বউ-টউ তেমন দরকার ছিল না, মেয়েছেলের দরকার ছিল মাঝেমাঝে; সেই দরকারটা ছোটকাকা বাইরে থেকে মিটিয়ে আসে তা আজকাল বোঝা যায়। মদ-টদও বেশ খায়। আর টাকা টাকা করে ছোটকাকা পাগল। ওকালতি করছে, ট্যাকসি কিনে ভাড়া খাটাচ্ছে, বেনামা জমি কিনে কিনে রাখছে। টাকার নোংরায় গলা ডুবিয়ে বসে আছে কাকা।' দাম্পত্য জীবনে প্রতিমার এই শূন্যতা তাকে কৃপাময়ের কিছুটা কাছে এনে দিয়েছে। দুজনের বয়সের পার্থক্যও খুব বেশি নয়, সম্পর্কের মধ্যেও আছে স্বাচ্ছন্দ্য। এমনকি দেওঘরে দীক্ষা নিতে যাবার জন্য প্রতিমা সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছে কৃপাময়কেই। 'কৃপাময়ের ব্যাঙ্ক'-ও ছোটকাকিমা, প্রতিমাই তাকে হাতখরচা যোগায়। অবশ্য প্রতিমা নিজেই কোনোদিন এই পথ বন্ধ করে দেবে, এই ভেবে কৃপা আগেই নিজেকে 'অ্যালুফ' করে নিয়েছে, তার মনে হয়েছে— 'নিজের তো কেউ না, কাকী। আজ ভাল মুখ করছে কাল খারাপ মুখ করতে পারে। কী দরকার।' সংসারে পড়ে আছে কৃপা শুধু আসুস্থ মায়ের জন্যই, মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে তারও মুক্তি এই পরিবার থেকে।

৪

বিমল কর ও সমকালীন ঔপন্যাসিকদের প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন—

> "... ভারসাম্যের বিচলন, মূল্যবোধের বিনষ্টি, সুস্থ জীবনবোধের অবসান, অবক্ষয়ের প্রতিষ্ঠা, বিপর্যয়ের বিজয়, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে বাংলার অর্থনৈতিক রাজনীতি মহিমার অবসান; এই পটভূমিতে আলোচ্যমান উপন্যাস লেখকেরা চোখ মেলে তাকিয়েছেন, দেখেছেন ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি, অবাক মেনেছেন ভাগ্যের পদাঘাতে নৈরাশ্যের লগুড়াঘাতে।"[৬]

এই ভাবনা বিমল করের *যদুবংশ*উপন্যাসের পরতে পরতে মিশে আছে। যুগের অবক্ষয় এবং তার মূর্ত রূপ— চার চরিত্রের মাঝে আদর্শ ও বিবেকের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলে গণনাথ। সামাজিক সম্মান, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং শারীরিক সুস্থতা— কিছুমাত্র তার নেই। অন্যের আশ্রয়ে সে বাস করছে। রুজি-রোজগার প্রায় বন্ধ। অথচ জীবন তো সে এইভাবে শুরু করেনি; অভয়ের বক্তব্য থেকে জানা যায়— '... স্কুলে পড়ার সময় থেকে গণাদার কী প্রশংসা শুনেছি। কাজের ছেলে, ভালো ছেলে, পরোপকারী ছেলে। সেই ছেলে মাইরি কী মাতব্বর হয়ে উঠল। আমাদের এনিথিং লিডার গণাদা।' কিন্তু নিজে আত্মসুখী হতে পারেনি বলেই 'এক কথায়' পাওয়া রেলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল গণনাথ। দেশের স্বাধীনতা নিয়েও ভাবনা চিন্তা ছিল, তাই পরাধীন দেশে শাসকের চাকরি করতে চায়নি। মানুষটার মধ্যে আছে এক শান্ত ও সমাহিতভাব— গায়ের রঙ মাঝারি, চোখ-নাক বড়, মাথার কোঁচকানো চুল রুক্ষ— 'চোখের দৃষ্টি এবং হাসি দুই-ই কেমন শান্তশিষ্ট, মোলায়েম।'

পেটে আলসার— মেসবাড়ি ছেড়ে থাকছে নয়নাদের বাড়িতে। তিন বোনের সংসারে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো গণনাথের অবস্থানকে লোকে দেখে কুঞ্চিত কটাক্ষে। এই চার বন্ধুর দল প্রথমদিকে আকার ইঙ্গিতে আভাস দিলেও পরে স্পষ্টভাবেই অসম্মান করেছে গণাদাকে। গণাদা নিজেও বোঝে একসময় ছেলেগুলো তাকে ভালোবাসলেও, পরিস্থিতির বদল ঘটেছে- 'সেই সম্মানের ও ভালোবাসার সামান্য অবশিষ্ট আছে হয়ত'। গণনাথও বদলেছে, তবু নিজের আদর্শবোধ থেকে সরে যেতে পারেনি। সূর্য নিজের বাড়ির সোনার পঞ্চপ্রদীপ তাকে বিক্রী করতে দিলেও, বাড়ির সেই ঐতিহ্যকে সে বিক্রী করতে পারে না গণনাথ। নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে সূর্যকে একসময় প্রদীপটি ফিরিয়ে দেবে ভেবেছিল। এই প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বিমল কর জানিয়েছেন—

> "...যদুবংশে একটা পঞ্চপ্রদীপ ছিল যেটা ওল্ড ভ্যালুজ-এর প্রতীক। ছেলেগুলো সেটা জানতো না। অবশ্য তখনও পর্যন্ত ওরা টোটালি ডেস্ট্রয়েড হয়নি। কিছু গুড সেন্স তখনও ওদের মধ্যে কাজ করছিল। সেই জন্যই গণনাথকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় সূর্য কাঁদছে— বলছে, আমরা তোমাকে মারিনি গণাদা। তাদের মধ্যে শুভ কোন চেতনা তখনো ছিল।"[৭]

গণাদা এই শুভ চেতনারই প্রতীক— তাই যমুনা চরিত্রের নানা ত্রুটি দেখেও প্যারাটাইফয়েড থেকে সেরে ওঠার পরেও অর্থিকভাবে বিপর্যস্থ মানুষটা তার পথ্যির ত্রুটি রাখে না। নয়নার সঙ্গে তার এক অদ্ভুত সহজ-সম্পর্ক, ঠাট্টা করে নয়নাকে 'বড়দি' বলে গণনাথ। আবার গননাথই নয়নাকে যৌবনে একসময় বাঁচিয়েছিল যখন সে গণনাথেরই মেসের একটি ছেলের সঙ্গে 'কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি'-র ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল। বহুদিন পরে অসুস্থ গণনাথকে নয়না নিজের বাড়িতে রাখতে চাইলে, আপত্তি করেনি সে— কারণ তার কাছে জীবন অনেক বড়। হয়ও সেও পাপকেই ঘৃণা করে, পাপীকে নয়। তাই নয়না যখন নিজের বোন যমুনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মসুখী মানসিকতার কথা বলে, গননাথের উত্তর— 'সুখের মুখ দেখার আশাসবাই করে নয়না। সংসারের এটাই নিয়ম। যমুনার নিজের একটা আশা থাকতে পারে। তাতে দোষের কী?'

বিমল করের *দংশন* উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে শচীন দাশ লিখেছেন—

> "... সময় ও সমাজকে বাদ দিয়ে যে উপন্যাসের আখ্যান তৈরি সম্ভব নয়, এ তত্ত্ব বিমলদা নিজেও বিশ্বাস করতেন। ফলে সময় ও সমাজের বহির্বাস্তবতা তার মননেও ছায়া ফেলেছে। কিন্তু ফেললেও তিনি যেহেতু আদ্যোপ্রান্ত একজন আত্মমুখী মননের কারবারী সেহেতু বহির্বাস্তবের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও জটিলতাই তাঁর সাহিত্যে বড় বেশি আশ্রয় নিয়েছে। এবং যতটা সেখানে মন ও মননের দ্বন্দ্ব ও জটিল-আবর্ত থাকে ততটা আর বাইরের ঘটনাপ্রবাহ সেখানে তোলে না।"[৮]

সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে লেখার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট যোগ প্রসঙ্গে বিমল কর নিজেও *দেওয়াল* ও *যদুবংশ* উপন্যাসের উল্লেখ করেছিলেন। এই সমকালীন রোগজর্জর সময়ের মাঝে শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও প্রাণপণ সুস্থ চেতনাকে টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে গণনাথ। অকপট এই চরিত্র নিজের কোনো দুর্বলতাকে আড়াল করেনি। উদ্ধত চার যুবকের সামনে স্বীকার করেছে— 'আমার সেই শ্রীবৎস রাজার অবস্থা, শনিতে ধরেছে'। তবুও সূর্যর দেওয়া প্রদীপ বিক্রী করেনি, কিন্তু শনির প্রকোপ এড়াবে কী করে! যমুনা সেই জন্মসুখী প্রদীপ বেচে নিজের সুখের সন্ধানে চলে গেছে, আর গণাদা মার খেয়েছে উন্মত্ত সূর্যদ-বুললির হাতে। শেষ পর্যন্ত মিথ্যে চুরির দায়ে নির্মম অপমানের ভার আর সহ্য করতে পারেনি, আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেছে সে।

গণনাথকে আক্রমণ করলেও, অপরাধবোধ থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় উদ্দেশ্যহীনভাবে। অভয়, গণনাথের আত্মহত্যার খবর নিয়ে এলে, সূর্য মনে মনে কেবলই এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করেছে। এমনও ভেবেছে— 'গণাদার যেরকম হাল হয়ে এসেছিল, তার ওপর তিন তিনটে মাগী সামলানো, তাতে আফিং টাফিং হয়ত চালাচ্ছিল গণাদা, তারপর বাড়িতে তিন তিনটের সঙ্গে নিশ্চয় লড়ালড়ি হয়েছে; রাগের মাথায় বেশি খেয়ে ফেলেছে; ফেলে একেবারে খালাস হয়ে গেছে।' কিন্তু নিজের দায়কে তো সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেনি সূর্য— 'গণাদা তাদের জন্যই আফিং খেল না তো!... মনে পড়ার পরেই সূর্য মাথা নাড়ল, না— না, তাদের জন্য কেন খাবে!' অপরাধবোধ কিংবা গণাদার প্রতি চাপা পড়া ভালোবাসা তাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল শ্মশানে। গণাদার মৃতদেহ চারবন্ধুর কাঁধে— তখনও তাদের মনে চার বন্ধুর আর্তি— 'গণাদা আফিং খেয়েছে। কেন শালা, আফিং কেন? ... আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করলে তুমি! কেন? প্লে করলে?'— এভাবেই বুকফাটা 'ছেলেমানুষি কান্না গোঙাতে গোঙাতে বেরিয়ে এল'।

৫

যদুবংশ উপন্যাসের প্রকাশ ১৯৬৮। ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাস থেকে পরের বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত *দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল রমাপদ চৌধুরীর *এখনই*। দুটি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট প্রায় এক— তাই একটি উপন্যাসের প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে চলে আসে আরেকটি উপন্যাস। দুটি উপন্যাসই চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। তপন সিংহের পরিচালনায় 'এখনই' মুক্তি পায় ১৯৭১ সালে; তিন বছর পরে পার্থপ্রতিম চৌধুরী নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র 'যদুবংশ'। দুটি উপন্যাসে যুবসমাজের 'অন্তর্দহন' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "তারা এক সুরে বেজে উঠলেও বিষণ্ণতা অথবা অন্য কোন ভাবনার তরঙ্গ ভেসে যেতে থাকে, লীন হয়ে যেতে থাকে একাকীত্বে। সমাজ তাদের অধঃপতন-বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ি হলেও আত্মধ্বংসের দায়ভার রয়ে যায়। তাদের নিষ্ক্রিয়তা, পরিস্থিতির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ, গণনাথের সঙ্গে তীব্র বিবাদে লিপ্ত হয়ে গণনাথকে প্রহার— নষ্ট সময়ের চিহ্নায়কগুলিকে ধারণ করে তারা হয়ে ওঠে যদুবংশ— এভাবেই মহাভারতের যদুবংশের অনুষঙ্গকে জীবনোপলব্ধির গভীরতায় সমকালীন তাৎপর্যে গেঁথে নেন বিমল কর। যদুবংশ-এ একদিকে প্রদীপকে ঘিরে গড়ে তোলা পুরানো তথা ঐতিহ্যের প্রতি নির্বোধ তাৎপর্যহীনতাকে প্রকটিত করে শেষপর্যন্ত বোধের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন ইঙ্গিতে-দ্যোতনায়। উপন্যাসটিতে অনুপুঙ্খ-বর্ণনা যুবকদলের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতাকে প্রকাশ করেছে এবং এগুলোই তাঁদের বেঁচে থাকার আশ্রয় হয়ে উঠেছে।"[৯]

এই সংবেদনশীলতাকে চিনিয়ে দেবার জন্যই বোধহয় লেখক তুলসী চরিত্রটিকে নিয়ে এসেছেন। পিনকির দেশী মদের ঠেকের চেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান সূর্যদের এককালের সহপাঠী তুলসীর। পড়াশোনা, আচার-ব্যবহার, মূল্যবোধ— সবদিক থেকেই চার যুবকের চেয়ে বিপরীতে তার অবস্থান। তবুও অসহায়-অসুস্থ তুলসীর কাছে ছুটে যায় চারজনেই, কিন্তু এও বোঝে— 'তুলসীটার আলাদা রাস্তা... ওর রাস্তা এটা নয়'।

একলা রুগ্ন শরীর নিয়ে রাস্তা হাঁটে তুলসী— শরীর ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। তবু তার মধ্যে আছে আত্মসম্মান। বাবার উদাসীনতা আর সৎমায়ের অবহেলা ছেড়ে নিজেই এককামরা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মারও খেয়েছে সে। তুলসীর শান্ত-সংযত আচরণকে সূর্য যতই 'মাগিগিরি' বলুক, ছেলেটির গুণগুলোকে অস্বীকার করতে পারে না। তুলসীর ওপর অন্যায় আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে সূর্য-বুললি বেপরোয়া হয়ে ওঠে, আবার তারা শান্ত হবার পর তুলসীও মিশে যায় তাদের সঙ্গে— 'দড়ির খাটিয়ায় পাঁচজন গায়ে গায়ে, এ ওর পিঠ, ও এর পেটে হেলে ঝুঁকে শুয়ে বসে আছে... খুব ঘনিষ্ট, অন্তরঙ্গ, গভীর হয়ে পাঁচ বন্ধু জড়াজড়ি করে বিছানায় বসে, দড়ির খাটিয়াটা ঝুলে গেছে।'

তুলসী পড়াশোনায় ভালো, বি.এসসি পাশ করে শহরে পড়াশোনা করতেও গিয়েছিল। তুলসীর অভিজ্ঞতার সূত্রে লেখক নগর জীবনের কপটতাকে তুলে ধরেছেন। 'বাংলাদেশে ওরকম কবি আর জন্মায়নি'— তেমনই এক ব্যক্তিকে অসহায় তুলসী পঁচিশ টাকা ধার দিয়েছিল বিপদের সময়, দুবছর পার করেও সেই টাকা আর ফেরৎ আসে না। এই টাকা দিয়ে তৈরি হয় শরীর, শরীরের জেল্লা আর চরিত্র— 'বিলেতি মাল খাওয়ালে একরকম হয়, দিশি খাওয়ালে একরকম হয়, কবিতা গল্প ছেপে দিয়ে একরকম হয়, বেশ্যাবাড়ি নিয়ে গেলেও।' ক্ষেত্র বিশেষে এবং স্বার্থ অনুযায়ী একই মানুষের কণ্ঠস্বর যায় বদলে— 'কোনও পুরানো নামকরা কবির বাড়ি গেলে গলার ভয়েস হিজ মাস্টার্স ভয়েস,

সাহিত্যিকের দাদার কাছে গেলে, মাইরি বলছি, একেবারে তেলাতেলা, কবিতা পাঠ করার সময় নাদ ওঠে, মালখানায় রিয়েল ভয়েস, মেয়েদের কাছে বাটা শু...' তুলসীর বক্তব্য থেকেই সাহিত্য-জগতে 'হিপোক্রেসি'র চরম উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। যেখানে গ্রামের ছেলে নিজের কবিতার বই প্রকাশের আনন্দে মদের দোকানে ১২২টাকা খরচ করে 'সেলিব্রেট' করে 'মদের দোকানে বসে নবীন কবি যত প্রশস্তি পেল তার কয়েক টুকরো যদি সত্যি হত তবে ওই কবি ক্ষণজন্মা পুরুষ বলতে হবে'। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে সেই স্তাবকবৃন্দের ভাষায় প্রশস্তি তো দূরে থাক, শালীনতার মাত্রাও সেখানে থাকে না। তুলসীর মনে হয়েছিল— 'ওরা আড়ালে পরস্পরকে কুকুরের মতো কামড়াবে, দল বাঁধতে পারলে ঘেউ ঘেউ করে, একে অন্যের কুৎসা রটায়, প্রশস্তি গাইবার জন্য ভাড়াতে গাইয়ে রাখে।' এদের কাছ থেকে সরে, নিজের স্বপ্ন মুছে ফিরে গিয়েছিল নিজের রোহভূমিতে, হয়ত এইসব কপটতা দেখে সূর্য-বুললি-অভয়-কৃপাময়কে অনেক স্বাভাবিক মনে হয়েছিল তার।

তুলসী বিশেষ মেধাবী না হলেও পড়াশোনার প্রতি ছিল তীব্র আগ্রহ। ইচ্ছে ছিল 'অ্যাস্ট্রোনমি' নিয়ে পড়াশোনায়। সেই উদ্দেশ্যে নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে কলকাতায় গেলেও আবার ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু সেই তুলসীর শারীরিক অসুস্থতার কারণে সামান্য টিউশনিও জোটে না— প্রাইভেট টিউটরের ক্যারেকটার সার্টিফিকেটের পাশাপাশি হেলথ-সার্টিফিকেটও দাবি করে গার্জেন। পরিবার-পরিজনের কাছেও সে প্রায় অপাংক্তেয়। তবু ষষ্ঠীর দিন 'নতুন মা'-র জন্য সামান্য শাড়ি কিনে বাড়ির পথে যায়— সামান্য কিছু দেওয়ার এই কর্তব্যটুকু সে অস্বীকার করতে পারে না— যা দেখে কৃপাময়ের মনে একই সঙ্গে আনন্দ-বেদনা-মমতা জেগে উঠেছিল। তুলসীর প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুমনা দাস সুর লিখেছেন—

> "তুলসী ফিরে আসে তার নিজের জায়গায়। কিন্তু সূর্যদের দলের একজন হয়ে যায় না। কেননা একদিকে ঘৃণা ও অন্যদিকে ঔদাসীন্যের মাঝে এই যুবকদের যে নিষ্ক্রিয় টিকে থাকা— সে পথ তুলসীর নয়। পরিবারের সান্নিধ্য থেকে সরে এলেও সে নিজেই নিজের খুঁটিতে বাঁধা। এই অস্থির সময়ে অবক্ষয়িত সমাজে বাস করেও সে স্বপ্নভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট নয়... তুলসীর জন্য সুস্থতর কোনো পৃথিবীর ছবি হয়ত আঁকেন না বিমল কর, কিন্তু তার অশক্ত শরীর এবং শক্তিশালী মন নিয়ে বেঁচে থাকা এক বিকল্প পথের সন্ধান দেয়।"[১০]

৬

নরনারীর তথাকথিত সাধারণ প্রেম বা স্বাভাবিক দাম্পত্যের ছবি *যদুবংশ*উপন্যাসে লেখক দেখাননি। যে কটি নারী চরিত্রকে এঁকেছেন, সময়ের ক্ষয় গ্রাস করেছে তাদেরও। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় সূর্যের দিদি বিজয়ার কথা— হিংসুটে-স্বার্থপর চরিত্র। ভাইকে আঘাত করতে গিয়ে বেলটের আঁকশি লেগে নিজের হাতই রক্তাক্ত হয়ে যায়, আবার সেই ভাইকে জুতো ছুঁড়ে মারতেও পিছপা হয় না। বিবাহ থেকে বৈধব্য— সবটুকু সময়েই সে থেকে গেছে বাপের বাড়িতে। যুবক ভাইয়ের সঙ্গে বিছানায় মারামারি খামচাখামচি করেছে, যে আচরণ একজন পরিণত বয়সের মহিলার পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

এ হেন বিজয়ার গোপন প্রেম চলে ধনচন্দ্রের সঙ্গে— বেলফুলের মালা গেঁথে প্রেমিকের হাতে দেয়। তবে এর পিছনে শুধু প্রেম নেই, বিজয়ার স্বার্থও আছে। বাবার তৈরি করার নতুন বাড়িটি সে নিজের নামে করতে চায়, আর তাই সেক্ষেত্রে দালাল হিসেবে ব্যবহার করেছে ধনচন্দ্রকে। বিজয়ার এই স্বার্থপরতাই সূর্যকে আরও দূরে ঠেলে দেয়— দিদির গায়ে 'পচা বিড়ালের' গন্ধ পায়। তার সাজগোজেও শালীনতার অভাব চোখে পড়ে— 'জামার পাশ দিয়ে বিশ্রীভাবে নীচের জামার ফিতে বেরিয়ে রয়েছে। চল্লিশ বছর বয়সেও দিদি মেয়েদের হালকায়দার নীচের জামা পরে, কখনও কখনও দুপুরের দিকে জামার বদলে শুধু ওইটে পরে গায়ে আঁচল জড়িয়ে থাকে বলে সূর্যর বিশ্রী লাগে।... দু-দুটো ছেলে দিদির অথচ এসব শৌখিনতা ও নোংরামি দেখলে কে বলবে দিদির দুটো বাচ্চা।' বিজয়ার যৌনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অন্যভাবেও, তার অশ্লীল বইয়ের সংগ্রহ সম্পর্কে সচেতন সূর্য— 'এই সব বই বিজয়া অনেক দিন থেকে রেখে দিয়েছে। কী করে এসেছিল তা বিজয়াই জানে। কতভাবে জোগাড় করেছে; স্বামীকে দিয়েও আনাত।' নারীর যৌনপ্রবৃত্তিকে বিমল কর অস্বীকার করেননি। তাই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *দেওয়াল*-এও দেখা যায় মোহিতবাবুর বিধবা মেয়ে মিনাক্ষ্মী অকৃষ্ট হয়ে পড়ে দুর্বিনীত ও আত্মসুখপরায়ন বাসুর। যৌনতা নারী ও পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি, তবে বিজয়ার মধ্যে দিয়ে তা যেভাবে প্রকাশিত, সেখানে সংযমের অভাবকেই লেখক নির্দেশ করেছেন।

মালা চরিত্রের পটভূমি আলাদা হলেও সংযমের অভাব সেখানেও প্রকট। সূর্যর দূর সম্পর্কের মাসি— যদিও তাকে 'মালাদি' বলে ডাকে কিংবা সম্বোধন এড়িয়ে যায়। মালা চাকরি করে— একই বাড়িতে তার সঙ্গে থাকে অধ্যাপিকা জয়ন্তী। ঘরের বাইরে থেকে মালা ও জয়ন্তীর কথাবার্তা তাদের সমকামী সম্পর্কের শুধু ইঙ্গিত নয়, স্পষ্ট প্রমাণ দেয়। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত উপন্যাসে সমকামিতা প্রসঙ্গ একালের পাঠককেও চমকিত করে। মনে রাখতে হবে তখনও সমকামকে কেন্দ্র করে *চাঁদের গায়ে চাঁদ*, *অনিকেত* বা তথ্য সমৃদ্ধ উপন্যাস *হলদে গোলাপ* কিংবা *মায়ামৃদঙ্গ* লেখা হয়নি। আবার এও মনে রাখা দরকার যীশুখ্রিস্ট্রের জন্মের দুশো বছর আগে লেসবস দ্বীপে জন্মেছিলেন গ্রীক কবি স্যাফো— যাঁর কবিতায় প্রথম 'সমকামিতার বার্তা' পাওয়া যায়। এছাড়াও আলোচ্য উপন্যাস প্রকাশের প্রায় দেড় দশক আগে বাংলা সাহিত্যেই পাওয়া যায় কমলকুমার মজুমদারের 'মল্লিকা বাহার' গল্প। সেখানে মল্লিকা এককালে শিশির বা অঞ্জনার ভাইয়ের প্রেমের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলও। কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়ার পর যখন নিজে থেকেও ব্রজ বা আনন্দর কাছে গেছে, মল্লিকার প্রতি পুরুষেরা বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। শেষ পর্যন্ত শোভনার স্পর্শেই 'দিব্য উষ্ণতা' পেয়েছিল মল্লিকা—

> "... শোভনা তার হাত দুটো ধরে টেনে আপনার কাছে আনল, কাঁচের চুড়ি ভেঙে টুকরো, ভাঙার শব্দ এতই অল্প যে লোক জড়ো করল না অথচ বিজ্ঞরা বলবেন প্রয়োজন ছিল। শোভনা আপনার মধ্যে মল্লিকাকে এনেছে, সোহাগ করে মালা পরিয়ে দিয়েছে, সে মালা তার কণ্ঠে বিলম্বিত, চুম্বনে চুম্বনে শোক ভুলিয়ে দিয়েছে।"[১১]

শরীর নিয়ে খেলার পাশাপাশি সূক্ষ্ম মান-অভিমানও লেগে থাকে মালা ও জয়ন্তীর মধ্যে। দুই স্বাবলম্বী নারীর এই যৌথ যাপন সমাজের প্রতি এক তীব্র বিদ্রোহও বটে। আর সূর্য বা সূর্যের মতো ছেলেরা, যাদের কাছে নারীদেহ মাত্রি পুরুষের ভোগের সামগ্রী, তারা মেয়েদের এতখানি যৌন-স্বাধীনতা সহ্য করতে পারবে কেন! তাই স্বপ্নে দেখে— 'মালাদি আর জয়ন্তী জড়াজড়ি করে তার চারপাশে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে আর সূর্য হাতে তালি মারছে, ক্লাউনের পোশাক তার। সূর্য ছড়ির বেঁকানো মাথা দিয়ে একবার এর গলাটা টেনে এনে চুমু খাচ্ছে, একবার ওর গালে। ওরা সূর্যকে শুধু হাসাচ্ছে। অবশ্য শেষে সূর্য দেখেছিল মালাদি তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে শরবত খেতে দিল, শরবতটা সূর্য খেল না, না খেয়ে মালাদির বুকে ঢেলে দিল, দিতে ব্লাউজ ভিজে গিয়ে ব্লটিং পেপারের মতো চুপসে গেল। ঠাস করে চড় মারল মালাদি, সঙ্গে সঙ্গে সূর্য মালাদির পেছনে এক লাথি।' মনে রাখতে হবে, বিমল কর, মালা বা জয়ন্তীর মধ্য দিয়ে গভীর প্রেম-মনস্তত্ত্ব তুলে ধরতে চাননি; বিশেষত মালার আচার-আচরণ, ভাষা প্রয়োগ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও নানা ইঙ্গিতে তার চারিত্রিক বিকৃতিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাই সাম্প্রতিক কালে লেখা হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তের *প্রেম সমকামী*উপন্যাসের একেবারে শেষে লেখা—

> "হয়তো প্রত্যেক মানুষের মনেই সমকামিতা গোপনে লুকিয়ে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে পেলে অন্তত কিছু সময়ের জন্য তা প্রকাশ পায়। প্রেম সমকামী।"[১২]

এই ভাবনার বিকাশ *যদুবংশ*-এ সম্ভব নয়। তাই বিজয়ার প্রতি যে ক্ষোভ সূর্য সরাসরি প্রকাশ করে মালার প্রতি অনুরূপ ভাবনাই স্বপ্নে ভিন্ন রূপ নিয়েছে।

২০১২ সালে *বহুমাত্রিক পত্রিকা*-য় প্রকাশিত একটি লেখায় উষসী চক্রবর্তী জানাচ্ছেন—

> "কোনও বিসমকামী মহিলা যদি একলা single থাকা পছন্দ করেন, তাহলেও কিন্তু মূলস্রোত সমাজ তার এই একলা বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে যথেষ্ট অস্বস্তিতে থাকে।... তাকে হয়ত আপাত শহুরে লোকজন সরাসরি কিছু বলে না, কিন্তু তার প্রতিও মূলস্রোত সমাজের একটা গেজ (Gaze) থাকে, অনুচ্চারিত প্রশ্ন থাকে যার মধ্যে সেও খুব একটা স্বস্তি বোধ করে না। অনেক সময় দেখা যায় যে মূলস্রোতের এই গেজ (Gaze) এর মধ্যে থাকতে থাকতে সে একলা বোধ করছে, নিজেকে 'মিসফিট' ভাবছে এবং মানসিক অবসাদের স্বীকার হচ্ছে।"[১৩]

এ প্রসঙ্গে নয়না ও তার পরিবারের উল্লেখ করা যায়। যদিও সেই অভাবের সংসারে 'মানসিক অবসাদে'র অবকাশ নেই, কিন্তু অন্যের দয়ায় মাঠকোঠায় তিনবোনের জীবনযাপন খুব স্বাভাবিক ছিল না। এর প্রমাণও আছে। কিছুটা ভয় বা আতঙ্ক থেকেই নয়না, গণনাথকে নিজেদের সংসারে এনেছিল। অবশ্য নয়নার পূর্বজীবনও মসীলিপ্তই বলা যায়। রমাপদ চৌধুরীর কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে বিজয় কুমার দত্ত লিখেছেন—

> "বিমল কর-এর গল্প উপন্যাসের স্মরণীয় চরিত্রগুলির ভিত্তি হ'ল তাদের স্মৃতি। এবং কী বিচিত্র বর্ণনায়— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অতীত জীবন পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয় গোপন ব্যাধির ক্রমউন্মোচনের মতো, বহুকাল সঞ্চিত জ্বালা-ক্ষোভ-দুঃখের অধোস্বচ্ছ প্রকাশের মতো। স্মৃতি সতত সুখের— এই প্রবচনের মূর্তিমান প্রতিবাদের মতো এই সব চরিত্রগুলি পাঠকের মস্তিষ্কে বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে।"[১৪]

একথা ভীষণভাবে সত্যি নয়না প্রসঙ্গে। তার বিপত্নীক বাবা ছিল পঙ্গু, অথর্ব এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। সংসারের জোয়াল তার কাঁধে উঠেছে অনেক আগেই। 'সেলাই দিদি'র চাকরি নিয়ে বিয়ে করার সুযোগ বা পরিস্থিতি কোনোটাই তৈরি হয়নি— 'সেই দুঃসময়ে যে কীভাবে জল গড়িয়েছে ভাবলে ভয় করে! সে কী কাদাটে নোংরা জল, বাড়ি ভাড়া জোটেনি, দুবেলা দুমুঠো ডালভাতের সংস্থান করতে পারেনি নয়না, দু'বোনে ভাগাভাগি করে একই শাড়ি-সায়া পড়েছে, একটি চটি দু'বছর চালিয়েছে।' নানা প্রতিকূলতার মাঝেও মায়ের মতো বোনেদের আগলে রেখেছিল। সেজন্য অন্যের অনুগ্রহ নিতেও হয়েছে। পাল কোম্পানির মেজবাবু ছিলেন বিপত্নীক, সেই 'রোগা, রুক্ষ, বেপরোয়া, দাম্ভিক' মানুষটার নজর পড়েছিল 'নয়নার মত কালো-কুচ্ছিত সেলাই দিদি'র ওপর। নয়না অনুমান করেছিল, নিজের পরিবারের প্রতি মেজবাবুর ছিল 'গোপন আক্রোশ ও দুঃখ'। নয়নার সঙ্গে তার 'শোয়া-বসা'য় কোনও আড়াল রাখেননি মানুষটি— 'নয়নাকে মেজবাবু পালন করেছে'। সামাজিক কুৎসায় নয়নার চাকরি গেলেও নিরাশ্রয় হতে হয়নি তাদের। লোকালয়ের একপাশে, নতুন বসতির মাঠকোঠায় থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল তিনবোনের। মেজোবাবুর মৃত্যুর পরেও সেখানেই থেকে গেছে, শুধু কিছুটা নিরাপত্তা ও নির্ভরতার তাগিদে গণনাথকে রেখেছে নয়না।

সাধারণভাবে ভাইবোনদের জন্য বড়দিদির আত্মত্যাগ— বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে এমন চরিত্র বিরল নয়। আশাপূর্ণা দেবীর *বালুচরী*উপন্যাসের মন্দা কিংবা শক্তিপদ রাজগুরুর 'চেনামুখ' গল্পের নীতা (পরে চলচ্চিত্র ও উপন্যাস রূপে *মেঘে ঢাকা তারা*), দিব্যেন্দু পালিতের 'মাছ' গল্পের নিরুপমা অথবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মধুবন্তী' গল্পের জয়া— এদের থেকে বেশ কিছুটা দূরেই নয়নার অবস্থান। যেমন গণনাথের মেসের জগন্নাথের সঙ্গে নয়নার সম্পর্ক, চলত উপহার দেওয়া ও বিনিময়ে শীতের দুপুরে ফাঁকা মেসে নরনারীর মিলন। বিবাহের প্রতিশ্রুতি ছাড়াও নয়না পেত পাঁচ টাকার নোট। কিন্তু মেসের ঠাকুরের মাধ্যমে লোক-জানাজানি হয়ে গেলে, সেই কেলেঙ্কারি থেকে নয়নাকে উদ্ধার করে গণনাথ— 'এসব লজ্জা-টজ্জা, বা সেই বয়সের বোকামি, ভুল, লোভ বেশিদিন থাকেনি। কারই বা থাকে। জীবনে আরও কত বড় ঘটনা ঘটল, কত রকমের মোড় খেল, কত দুঃখ আঘাত লজ্জা এল— জগন্নাথের কথা আর কেউ মনে রাখল না। নয়নাও নয়।' তবু সে রক্ত-মাংসের সজীব মানুষ, সংসারের ভারে ক্লান্ত হয়; দুঃখ-কষ্টের মাঝে ভেবে ফেলে- 'যমুনা একটা ছেলেছোকরা জুটিয়ে চলে যাক'।

গণনাথের সঙ্গে তার সম্পর্ককে বোধহয় 'বন্ধুত্ব' শব্দেই প্রকাশ করা যায়। সেই সম্পর্কে কিন্তু কালিমা নেই। বিমল কর যে আদর্শকে গণনাথ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তার স্পর্শ পেয়েছিল নয়না। সেই মানুষটিকেই যখন যমুনা চরম বিপাকে ফেলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে, সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছে নয়না। কৃপাময়ের কথায়— 'নয়না খুব কান্নাকাটি করছিল। দেখে যা কষ্ট হচ্ছিল...' আর গণনাথের শবদেহের সঙ্গে নয়নার যাত্রা— 'মিলের নোংরা কাপড়, আলুথালু চুল পিঠের পাশ দিয়ে আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছে, হাতে একটা লণ্ঠন'। বিভ্রান্ত সময়ের মাঝেও কিছু মূল্যবোধ ধরা আছে হয়তো ওই আলোটুকুতেই।

উপন্যাসে নয়নার ছোটবোন রত্নাকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া না হলেও, মেজবোন যমুনার সামান্য উপস্থিতি উপন্যাসের পরিণতিকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। তার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সময়ের ব্যাধি অনেকাংশেই প্রকট হয়ে উঠেছে। বহু পুরুষ তার আশেপাশে ঘোরাফেরাও করে। 'ওয়াগান ব্রেকার' মোহিতের সঙ্গে যমুনা চলে যাবে, নয়না এমন আশাও মনে মনে পোষণ করেছিল। কিন্তু 'যমুয়া যায়নি, তার অনেক আশা। সে স্কুল থেকে পাশ করেছে, তার চেহারা ভাল, রং ফরসা, কায়স্থ ঘরের ভদ্র মেয়ে, সে আকাশের চাঁদ না হলেও অন্তত ভালো গাছের ফলটি পেড়ে খেতে চায়।' এই চরিত্রটি অনিবার্যভাবে মনে করায় *মেঘে ঢাকা তারা* উপন্যাসের নীতার বোন গীতাকে। রোজগেরে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সংসারের আয় যাবে কমে, এই আতঙ্কেই মা কদম্বিনী, বড় মেয়ে নীতার প্রেমিক সনতের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল মেজ মেয়ে গীতাকে। অবশ্য গীতার চরিত্রের মধ্যে ছিল তেমনই প্রবৃত্তি— সাজগোজ, অন্যজগতের নেশা, হাসি, স্পর্শ তার মনে 'আদিম তৃষা' জাগায়, আবার অনবধানে সনতের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—

> "গীতা মাথায় একরাশ চুল খুলে বিনুনি বাঁধছিল, গায়ের কাপড়চোপড়ও ঠিক নেই, মায়ের ডাকে দরজার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল। এভাবে আদুর গায়ে সে সনতের সামনে বের হতে লজ্জা বোধ করে। লাল হয়ে যায় কপোল, আয়ত দু'চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে কি এক রঙিন আবেশের গাঢ় ছায়া।"[১৫]

সনৎও হারিয়ে যায় সেই আবেশে— নীতা তার কাছে 'কঠিন সংগ্রামমুখর জীবনের একটা বাহ্যিক রূপ মাত্র'; আর গীতা হল 'তৃপ্তির জন্য' 'শান্তির সন্ধান'। কিন্তু সনতকে পেয়েও গীতার 'নেশার আকর্ষণ কমে যায়'— মনে আসে 'স্তিমিত ভাটার টান'। দুজনের মাঝে অলক্ষ্যে 'নীতার নিঃশব্দ সঞ্চরণ' রয়ে যায়। সুখের সমস্ত উপকরণ পেয়েও সুখী হতে পারেনি আত্মসুখী-স্বার্থপর গীতা। *যদুবংশ*-এ যমুনাও আত্মসুখের টানে ঘর ছেড়েছে। যমুনা রোজগেরে মেয়ে, তবুও তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নয়না বোনের চারিত্রিক অসংযম বুঝতে পারে। উপন্যাসের প্রধান দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে আছে যে জন্মসুখী প্রদীপ, সেটিও যমুনা চুরি করেছে বলেই অনুমান করা যায়। কারণ প্রদীপ খুঁজে না পেয়ে সূর্যদের হাতে গণনাথ মার খাবার পরেই সে বাড়ি ছাড়ে। অথচ এই যমুনার সুস্থতার জন্য সবচেয়ে বেশি ভেবেছিল গণনাথ। কৃতজ্ঞতা বা সহানুভূতির ছিটেফোঁটাও যমুনার মধ্যে নেই।

৭

শুধু যুবসমাজের নয়, এক ভ্রষ্ট সমাজের সামগ্রিক ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। তাই সূর্যর বাবা কামাখ্যাবাবু, যিনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, বুললির বাবা পেশায় দারোগা— কাউকেই সৎ মানুষ বলা যায় না। অভয়ের বাবা সামাজিকভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত না হলেও পারিবারিক ক্ষেত্রে তার অবস্থান সঠিক নয়, একথা বলাই যায়। আর কৃপাময়ের পরিবারের ছবি তার চোখ দিয়েই পাঠক দেখে নেন— 'মেজকাকা হল স্বার্থপর, কৃপণ, আত্মসুখী। সেজকাকা কলকাতায় গিয়ে ডাক্তারি পড়ল, পরে হাসপাতালের মেয়ে বিয়ে করল তারপর তার অংশের প্রাপ্য টাকা বুঝে নিয়ে কলকাতায় ডিসপেনসরি খুলে প্র্যাকটিস করতে লাগল।' ছোটকাকার চরিত্রও তথৈবচ। শুধু পরিবার নয়, চারুবাবুর কাছে অভয়ের জন্য একটা চাকরির কথা বলতে গিয়ে অপদস্ত হতে হয়েছিল চারবন্ধুকে। তাই তাদের আচরণে ব্যক্তিগত দ্বিধাদ্বন্দ্ব, টানাপোড়েনের সঙ্গে মিশে গেছে সমকালীন সমাজ-পরিবার-পরিস্থিতি। কারণ তারাও প্রাণময় হয়েই বাঁচিতে চেয়েছিল; যাদের প্রতিটি বাক্যে অশ্লীল শব্দ আর কুৎসিত ইঙ্গিতের প্রাচুর্য তাদের মধ্যেও ছিল সুস্থ সংস্কৃতি চেতনা— 'তাদের একবার কনসার্ট ক্লাব হয়েছিল, তাতে অভয় বাঁশি, কৃপাময় গিটার, বুললি অ্যাকরভিয়ান, আর সূর্য ম্যাকারস বাজাত। তাদের বাজনা শেখাত মোহনমাস্টার। মোহনমাস্টার কলকাতা চলে গেছে। তার আগেই কনসার্ট ক্লাব ভেঙে গিয়েছিল।... সেই গৎটাও মনে পড়ল বুললির; তারা বাজাত: 'সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব আমরা ভাঙি কূল...'। সুস্থ সংস্কৃতির ভেঙে পড়া ও বাংলা উপন্যাসে সেই প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "লক্ষহীন অসংগঠিত যুবসম্প্রদায় সাংস্কৃতিক কোন নেতৃত্ব পেল না কোথাও। যুদ্ধের সময় গণনাট্য সংঘ প্রমুখ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে লোক-জীবনের বেগবতী ধারাকে জানবার জন্য যে আগ্রহ সঞ্চারিত হল, অতি রাজনৈতিকতা ঘূর্নাবর্তে তা যেমন সংগঠনের দিক দিয়ে হারিয়ে গেল, তেমনি নানা দিক থেকে আহত লোক-জীবনের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ছন্দও ব্যহত হল গভীরভাবে। কলকাতায় পল্লী-সাংস্কৃতিক মেলা, রেডিওতে ভাটিয়ালির মতো কলকাতার পক্ষে মনোজ্ঞ হল মাত্র— আর কিছু নয়।... কোনোটাই রসপিপাসার সঙ্গে যুক্ত হল না।"[১৬]

পাঞ্চজন্য উপন্যাসের শেষে গজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীকৃষ্ণের যাদবকুল সম্পর্কে লিখেছিলেন—

> "মহাসতী জননী গান্ধারীর অভিশাপ তাঁর বংশে সফল হয়েছে, কিন্তু সেইখানেই তার অবসান ঘটেনি। যুগ থেকে যুগান্তরে, শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে এই অভিশাপ এদেশের আকাশ-বাতাস-মৃত্তিকায় লেগে থাকবে, অনাগত বহুশত বৎসর ধরেই অভিসম্পাত বহন করতে হবে— এই দেশকে, এই জাতিকে। কুরুবংশনাশের জন্য যারা দায়ী তারা কেউ বেঁচে থাকবে না সত্য কথা— কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত থাকবে। পিতৃপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে উত্তরপুরুষদের— বংশানুক্রমে। তাঁর— তাঁদের পাপের ঋণ শত-শতাব্দীতেও শেষ হবে না।"[১৭]

বিমল কর অবশ্যই এই অভিশাপ, নিয়তি বা কর্মফলবাদে বিশ্বাসী হয়ে *যদুবংশ*উপন্যাস লেখেননি। কিন্তু 'সময়ের ছিন্নমস্তা রূপ' যেন বার বার স্মরণ করায় সেই অমোঘ নিয়তিকে। আসলে লেখক সমাজের অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিনষ্টিকেই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে জীবন সম্বন্ধে তৈরি হয়েছে আগ্রহশূন্যতা। সেই প্রেক্ষাপটকে আশ্রয় করেই বিমল করের 'যদুবংশ'-এ বাস্তবতার পথ ধরে হতাশা-নৈরাশ্য, ক্ষোভ আর বিষণ্ণতার বোঝা নিয়ে চলে আসে ভ্রষ্ট সময়ের যুবসমাজ।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার। পাঞ্চজন্য। মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯৪, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৪৫২।
২. বসু, রাজশেখর। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নব্যস কৃত মহাভারতের সারানুবাদ। এম.সি. সরকার, ১৪২০, কলকাতা, পৃ. ৬৭৫-৬৭৬।
৩. দাস সুর, সুমনা । বিমল করের কথাসাহিত্য। এবং মুশায়েরা, ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ৩৮০।
৪. তদেব, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯।
৫. দাশগুপ্ত, রাহুল। বাংলা উপন্যাসকোশ। প্রতিভাস, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৬।
৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে। দে'জ, ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ৩৭৯-৩৮০।
৭. দাস সুর, সুমনা। বিমল করের কথাসাহিত্য । প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮১।
৮. দাশ, শচীন। সময়ের অসুখ ও বিমল করের দংশন' (প্রবন্ধ)। শুভশ্রী, ভালোবাসা: বাংলা কথাসাহিত্যে পর্ব ২, ১৪১৬, পৃ. ১০৯।
৯. মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী। 'এখনই এবং যদুবংশ: ভিন্ন নির্মাণে যুবসমাজের অন্তর্দহন' (প্রবন্ধ)। উজাগর। রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা, ১৪২০, পৃ. ৩৭৯-৩৮০।
১০. দাস সুর, সুমনা । বিমল করের কথাসাহিত্য। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।
১১. মজুমদার, কমলকুমার। গল্পসমগ্র। আনন্দ, ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ৬৫।
১২. দাশগুপ্ত, হিমাদ্রিকিশোর। প্রেম সমকামী। প্রিয়া বুক হাউস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১৩৫।
১৩. চক্রবর্তী, উষসী। মেয়েঘেঁষা লেখারা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ৫৮।
১৪. দত্ত, বিজয়কুমার। 'আর্ত হৃদয়ের রূপকার: বিমল কর রমাপদ চৌধুরী' (প্রবন্ধ)। উজাগর। রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
১৫. রাজগুরু, শক্তিপদ। মেঘে ঢাকা তারা। অমৃতধারা, ১৯৬২, কলকাতা, পৃ. ৪২।
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। নতুন সাহিত্য ভবন, ১৩৬৮, কলকাতা, পৃ. ৩৪৫।
১৭. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার। পাঞ্চজন্য। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩।

আকর গ্রন্থ:

১. কর, বিমল। যদুবংশ। উপন্যাস সমগ্র ৩। আনন্দ, ২০০০, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. কর, বিমল কর। দেওয়াল। আনন্দ, ১৯৮৯, কলকাতা।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যসের ধারা। মর্ডান বুক এজেন্সি, ১৯৮৪, কলকাতা।
৩. দত্ত, সন্দীপ। বাংলা কবিতার কালপঞ্জি (১৯২৭-১৯৮৯)। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, ১৯৯৩, কলকাতা।
৪. মিত্র, সরোজমোহন। বাংলার গল্প ও ছোটগল্প। প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১১, কলকাতা।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 425- 430
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.224

পাতা থেকে পর্দায়: বাংলা সিনেমায় নারী চরিত্রের বিবর্তন

ড. সোমা ব্যানার্জি, *সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, নুর মোহাম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
অমৃতা চক্রবর্তী, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, নুর মোহাম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.11.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The main objective of this research paper is to show how the role of women in Bengali cinema, especially the female characters of stories taken from literature, has been portrayed in Bengali cinema. Here, the main emphasis is given to films based on Bengali literature. Bengali literature is traditionally full of strong, fearless, rebellious and self-confident female characters full of individuality. The main aim of this work is to discuss how the oppressed and struggling female characters created by Ashapurna Devi and Mahasweta Devi, starting from the restrained, calm but determined female characters of Rabindranath and Sarat Chandra, have been adapted to entertainment. While transforming the character into a film, the director's ideas, perspectives and the audience's needs radically change the characters.

In classic Bengali cinema, it can be said that even in the golden era of Uttam-Suchitra, female characters were limited to ideal stereotypes. The characters were focused on the role of ideal lover, wife, and responsible daughter, simple or sacrificial mother. That is, male-dominated values were given priority. In such a situation, directors like Satyajit Ray, Mrinal Sen, Ritwik Ghatak brought a revolution by breaking the norms and rules of mainstream cinema. They focused on women's freedom or finding their identity by pointing a finger at social thinking. This study basically compares how different are the characters shown in the cinema from the characters described in literature and how true are they socially, has the creativity of the cinema been able to retain the original nature of the entertainment style of literature? In short, the subject of this research paper is that Bengali literature and Bengali cinema complement each other. The literary characters portrayed in Bengali cinema act as a social mirror, which reflects the place and role of women in our current society.

Keywords: Bengali literature, Bengali cinema, Evolution of women

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়েই সৃজনশীল মাধ্যম। প্রথমটি প্রবীণ ও দ্বিতীয়টি নবীন। চলচ্চিত্র অর্থাৎ চলমানজীবন। সাহিত্যিকের খেলা শব্দ নিয়ে আর চলচ্চিত্রকারের ভূবন ক্যামেরা, লাইট, দৃশ্য, সঙ্গীত। অভিনয় যার মুখ্য মাধ্যম। বাংলা সাহিত্যের বিশাল গল্প, চরিত্র এবং বিষয়বস্তুর ভাণ্ডার চলচিত্র নির্মাতাদের প্রথমদিন থেকেই আকর্ষণ এবং অনুপ্রেরণার কেন্দ্রস্থল। কারণ, উপন্যাস বা ছোটগল্পগুলো কেবল কাব্যিক ভাষা এবং প্রতীকবাদে সমৃদ্ধ নয় বরং তাদের সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং মানসিক বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত। গবেষণাভিত্তিক সার্ভে

অনুযায়ী সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মধ্যে চলচ্চিত্রের প্রভাব জনমানসে বেশি। বইপড়া রুচিশীল বইপ্রেমী মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও চলচ্চিত্রের বিস্তার সর্বস্তরে। একটি সহজ উদাহরণ দিলে বিষয়টি আর পরিস্কার হয়ে যাবে। নয়ের দশকে রামানন্দ সাগরের 'রামায়ণ' বা 'মহাভারত' দেখার জন্য দূরদর্শনের সামনে সকাল ৯ টার সময় গ্রাম, শহর নির্বিশেষে যে পরিমান মানুষ অধীর উৎসাহে বসে থাকত সেই পরিমান উৎসাহ কিন্তু 'রামায়ণ' বা 'মহাভারত' পাঠে দেখা দুর্লভ। আসলে চলচ্চিত্র একই সঙ্গে audio-visual বলে জনমানসে প্রভাব বেশি। চলচ্চিত্র একই অঙ্গে চলমান, দৃশ্যমান এবং ভাষা সম্বলিত। ১৬৬০ সালের দিকে গ্লাস সাইড দিয়ে ম্যাজিক ল্যান টার্ম দেখানোর মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্রের প্রস্তুতি শুরু হয় বিশ্বে। পরবর্তীকালে সফল ভাবে প্রদর্শিত হয় ১৮৯৬ সালে থিয়েটারস্কোপ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে।

সাহিত্যের ভাষা, বাক্য বা শব্দ যখন পর্দার চরিত্রের মুখের সংলাপ হয়ে শোনা বা দেখা যায় তা হয় হৃদয়স্পর্শী। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের এই ক্রমাগত আদান-প্রদান ঐতিহ্য এবং রূপান্তর উভয়েরই একটি শক্তিশালী দর্পণ হিসেবে কাজ করে। সময়ের সাথে সাথে বাংলা চলচ্চিত্রে নারীর চিত্রায়ন উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে, যা সাংস্কৃতিক ভাবধারা, মূল্যবোধ, লিঙ্গগত গতিশীলতা এবং নারীর অগ্রাধিকারের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। প্রথম দিকে চলচ্চিত্রের নারী চরিত্রগুলো কেবলমাত্র আদর্শিক ভুমিকায় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সামাজিক এবং মানসিক নবজাগরণনের পর, সমান্তরাল/ আর্ট সিনেমাগুলো এই নির্দিষ্ট স্টেরিওটাইপ ভাবধারাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে আত্ম-অধিকারবোধ সামাজিক চেতনা সম্পন্ন নারীদের চিত্রিত করা শুরু করে। এই গবেষণা পত্রটির মূল উদ্দ্যেশ হল সাহিত্যের আভিযোজনে চলচ্চিত্রের নারী চারিত্রগুলি কী ভাবে নির্মিত হয় তা বিশ্লেষণ করা। বড় পর্দায় আদর্শ ঘরোয়া স্ত্রী থেকে স্বাধীনচেতা বিদ্রোহী স্ত্রীর যে অবতারণা তা নিয়ে আলোচনা করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণাটি তুলে ধরার চেষ্টা করছে সাহিত্য ও সিনেমা কিভাবে একসাথে বাঙালি সমাজে প্রচলিত লিঙ্গগত নিয়মগুলিকে প্রতিফলিত করে এবং প্রতিমুহূর্তে চ্যালেঞ্জ করে।

বাংলা চলচিত্র এবং বাংলা সাহিত্য:

এবার আসি বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। বাংলা চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের পথচলা হাত ধরাধরি করে। চলচ্চিত্রে সাহিত্যের ছায়া মানেই মানব মনের সাথে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক যা বাংলা চলচ্চিত্রেকে বিনোদনের থেকেও বেশী একটি শৈল্পিক মাধ্যমে রূপান্তরিত করেছে।

১৯১৯-১৯৩০ সাল বাংলা চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ। ১৯১৯ সালের ১লা নভেম্বর মুক্তি পেল কর্নওয়ালিস থিয়েটারে প্রথম বাংলা নির্বাক চলচ্চিত্র ম্যাডান কোম্পানির 'বিল্বমঙ্গল'। পরিচালক হীরালাল সেন। ১৯৩১ সালে ১১ এপ্রিল অমর চৌধুরী পরিচালিত মদন থিয়েটার কোম্পানির প্রযোজনায় সৃষ্ট প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্যের সবাক চলচ্চিত্র 'জামাই ষষ্ঠী'।এরপর যে সময়টা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সেটি হল ত্রিশের দশক। ১৯৩০ সালে বীরেন্দ্রনাথ সরকারের পরিচালনায় জন্ম নিল 'নিউ থিয়েটার্স'। বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মেলবন্ধনে বীরেন্দ্রনাথ সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর লক্ষই ছিল সাহিত্য প্রধান সিনেমা নির্মাণ। ছোটো থেকেই দেশ-বিদেশের সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। 'নিউ থিয়েটার্স' প্রযোজিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলি হল 'দেনাপাওনা' (১৯৩১), 'নটীর পূজা' (১৯৩২), 'দেবদাস' (১৯৩৫)। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় 'নটীর পূজা' যার নির্দেশনায় ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সঙ্গীত পরিচালনায় কবির সকল গানের কাণ্ডারি দীনুবাবু। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার বাংলা চলচ্চিত্রের আবির্ভাব কালে বাংলা সাহিত্য কিন্তু নাবালক দশা অতিক্রম করে রীতিমতো সাবালক।

একটু পিছিয়ে যায়, সাল ১৯২২; একটি নয়, দুদুটি নির্বাক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সুত্রপাত হল বাংলা সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়নের। একটি এপ্রিল মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস অবলম্বনে 'বিষবৃক্ষ' এবং সেপ্টেম্বরে মুক্তি পেল শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে 'আঁধারে আলো'। প্রথমটির পরিচালক শিশির ভাদুড়ি ও দ্বিতীয়টির পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র। ১৯৩৫ সালে প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাস অবলম্বনে 'দেবদাস' কে প্রথম বাংলা মেগাহিট সিনেমা বলা যায়। এর নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রমথেশ বড়ুয়া, পার্বতী যমুনা বড়ুয়া এবং চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবতী দেবী। 'দেবদাস' অবলম্বনে ৫টি ভাষায় ১৬টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। এখান থেকে উপলব্ধি করা যায় 'দেবদাসে'র জনপ্রিয়তা।

১৯৯০ সাল পর্যন্ত বেশিরভাগ বাংলা চলচ্চিত্র বানিজ্যিক বা শিল্পসম্মত উভয় ধারার মূল ভিত্তি ছিল বাংলা সাহিত্য। সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে ঋত্বিক ঘটক, মৃনাল সেন, তপন সিংহ, তরুন মজুমদার, অগ্রদূত, অজয় কর, অরুন্ধতী দেবী প্রমুখেরা চলচ্চিত্রের প্লট হিসেবে সাহিত্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় মুক্তি পেল বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী' অবলম্বনে 'পথের পাঁচালী'। প্রকৃতির সন্তান অপু, দুর্গার জীবনের নানা বাঁক। বিশ্বসিনেমার ইতিহাসে যার নাম খোদিত। সাহিত্যের দর্পণে চিত্রায়িত হয় সমাজ ও সমাজসংলগ্ন মানুষের জীবনবেদ। সেই সাহিত্য কীর্তিকে জলজ্যান্তভাবে দৃশ্যমান করেছেন পরিচালকেরা নিজস্ব সৃষ্টিশীলতাই। তপন সিংহের 'অতিথি', তরুন মজুমদারের 'বালিকা বধূ', সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর', অরুন্ধতী দেবীর 'দীপার প্রেম', অজয় করের 'সপ্তপদী'-তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। তখন ছিল বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগ। ভাবে ভাষায় আখ্যানে সমৃদ্ধ সাহিত্যকেই পরিচালকেরা বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের সৃজনশীলতার প্রকাশ হিসেবে। এতে তাঁরা ব্যবসায়িক দিক থেকে যেমন সফল হয়েছিলেন তেমনি শিল্পীসত্ত্বার প্রকাশেও সমালোচকদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র অভিযোজনে নারী:

একথা বললে অত্যুক্তি হয়না যে বাংলা সাহিত্য জগতে নারী মহিমান্বিত, যেখানে নারী একটি কেন্দ্রীয় ও গরিমাময় স্থানে অবতীর্ণ। বইয়ের পাতা থেকে সিনেমার পর্দায় এই যাত্রা পথে উঠে আসে তাদের ধারাবাহিক প্রেম, ত্যাগ, বিদ্রোহ, নীরবতা ও শাক্তির ইতিকথা। রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্ট নারী চরিত্র যেমন— 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, 'নষ্টনীড়' এর চারুলতা, 'ঘরে-বাইরে' র বিমলা বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জটিল এবং বৈচিত্র্যময় নারী চরিত্র। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এই সকল নারী চরিত্রের নীরব বিদ্রোহ, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং আত্মমর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যা দর্শকেরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মিলিয়ে নিতে পারে। একইভাবে, শরৎচন্দ্রের নায়িকারা যেমন 'পরিণীতা' র ললিতা, 'দেবদাসে' র পারো আর চন্দ্রমুখী, 'শ্রীকান্ত' র রাজলক্ষ্মীদের সম্মুখীন হতে হয়েছে সামাজিক সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার টানাপোড়েনে। এই চরিত্রগুলোর সিনেমাটিক উপস্থাপনা তাদের সংগ্রামী মানসিকতা এবং নৈতিক প্রত্যাশাগুলিকে এক অন্য মাত্রায় পরিচালিত করে।

তাছারাও, বাঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভুতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেদের লেখনীতে নারী মনের ব্যথা-বেদনার, প্রেম-ভালোবাসা, খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। পরবর্তী কালে সিনেমার মাধ্যমে এই সকল লেখকদের লেখনী সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে দাগ কেটে দেয়। চরিত্রগুলি বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসে পর্দায় আরও জীবন্ত ও বাঙময়ী হয়ে ওঠে। পর্দার বাইরের মানুষগুলো সেখানে নিজেদের খুঁজে পায় এবং জনমানবে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।

আরও সমসাময়িক সময়ে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, তিলোত্তমা মজুমদার, শঙ্কর, স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রমুখের কলমে উঠে এসেছে এমন নারী চরিত্র যারা নগর, জটিল এবং আধুনিক সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিনিধি। তাদের অনেক কাজ সিনেমার অভিব্যক্তি পেয়েছে, সাহিত্য নির্ভর সিনেমাগুলোকে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা এবং রুপোলী পর্দায় নারীর প্রতিনিধিত্বে নতুন স্তর যুক্ত করেছে।

এই আধুনিক সাহিত্যকর্মগুলিকে চলচ্চিত্র নির্মাতারা চলচ্চিত্রায়িত করেন, যেখানে নারীর অস্তিত্ব, কর্তৃত্ব, পরিচয়, যৌনতা, প্রাতিরোধ, প্রতিবাদ এককথায় কোনো দেবীত্ব নয়; প্রকাশিত হয় তার রক্ত মাংসের মানবীসত্ত্বা। মূল বিষয়বস্তুকে অক্ষুণ্ণ রেখে সময় ও সমাজের সাথে তাদের অভিযোজিত করা হয়। আশাপূর্ণা দেবী এবং মহাশ্বেতা দেবীর নারীরা শক্তিশালী সিনেমার আখ্যানকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন, প্রান্তিক এবং পুনর্গঠিত- গ্রামীণ নারী, উপ-বয়স্ক ব্যক্তিত্ব এবং দৈনন্দিন বিদ্রোহীদের কণ্ঠস্বর ও ভাবমূর্তি প্রদান করে চলেছেন। এই চরিত্রগুলি সাহিত্য থেকে সিনেমায় রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে অনিবার্যভাবে পরিবর্তন ঘটে: কিছু দিক দৃশ্যমান এবং নাটকীয় প্রভাবের জন্য প্রসারিত করা হয়, কিছু পরিবর্তন করা হয় দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী, আবার কিছু দিক বর্ণনামূলক কাঠামোর সাথে মানানসই করে সৃজন করা হয়। ক্লাসিক সাহিত্য চলচ্চিত্রের পর্দায় হয়ে ওঠে মানব জীবনের বেদ। এভাবেই বোঝা যায়, সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র উভয়েই শব্দ এবং পর্দা দুই এর মাধ্যমে সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে রীতিনীতি অর্থাৎ সামগ্রিকতাকে যেমন প্রতিফলিত করছে তেমনি অহরহ সমাজের রঙিন কার্পেটকে সারিয়ে নগ্ন সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ ও করছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী নায়িকা থেকে মহাশ্বেতা দেবীর আধুনিকা নারী চরিত্র, সিনেমার মাধ্যমে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। পরিবর্তিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে চলচ্চিত্র নির্মাতারা যখন এই সকল নারীদের সংগ্রাম এবং আকাঙ্ক্ষাকে পুনর্ব্যাখ্যা করেন, তখন পর্দায় তাদের উপস্থিতি আরও প্রাসঙ্গিক ও স্তরীভূত হয়ে ওঠে। প্রাথমিক দশকগুলিতে, বিশেষ করে মূলধারার বাংলা সিনেমার মধ্যে, নারী চরিত্রগুলি প্রায়শই আদর্শিক ভূমিকায় সীমাবদ্ধ ছিল— কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রী বা ভগিনী, আত্মত্যাগী মা বা রোমান্টিক নায়িকা হিসাবে চিত্রিত হয়েছিল, যা ঐতিহ্যবাহী লিঙ্গ প্রত্যাশাকে শক্তিশালী করেছিল।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে আমরা সকলেই কমবেশি পরিচিত। আর সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' সিনেমায় কাশবনের মধ্যে দিয়ে অপু-দুর্গার দৌড়ানো, সামনে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার দৃশ্য বাঙ্গালীর কাছে এক নস্টালজিয়া। সিনেমার শুরুতেই ভাঙা দালানে চাঁদনী রাতে ইন্দির ঠাকরুন ওরফে চুনিবালা দেবী 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে' গানটি গায়। এই গান যেন শুধু ইন্দির ঠাকরুন নয়; প্রতিটি মানবের জীবনের চরম সত্যকে ব্যক্ত করে। জীবনের বহুপথ পার করে ইন্দির ঠাকরুন শুনতে পায় মৃত্যুর ডাক! বিভূতিভূষণ আর সত্যজিৎ, সিনেমা আর সাহিত্য কোথায় যেন মিলে মিশে এক হয়ে যায়। আর জেগে থাকে 'পথের পাঁচালী'। সত্যজিতের আরো একটি সাহিত্য নির্ভর সিনেমা 'চারুলতা' (১৯৬৪)। অবলম্বন রবিঠাকুরের 'নষ্টনীড়' গল্প। চলচ্চিত্রটি মানব সম্পর্কের জটিলতা ও নারী চরিত্রের আত্ম আবিস্কারে অনুরণিত হয়। সাহিত্যাশ্রায়ী চলচ্চিত্রের মূল কথা হল মূল গল্পের 'থীম' অটুট রাখা। সত্যজিৎ এক্ষেত্রে একশো শতাংশ সফল। পরিচালক খুব সুন্দর ভাবে সাহিত্য ও সিনেমার সম্পর্ককে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। যেমন, 'নষ্টনীড়' গল্পের পরিণতিতে বিচ্ছেদকে কীভাবে দেখানো যেতে পারে সে সম্পর্কে সত্যজিৎ বলেছেন:

> "এ দৃশ্যে তাই হাত মেলাতে পারেনা। ভবিষ্যতে মিলবে কি? জানিনা। জানার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথও জানার প্রয়োজন বোধ করেননি। আজকের মতো ঘর ভেঙে গেছে, ছেলেমানুষি কল্পনার জগত থেকে রূঢ় বাস্তব জগতে নেমে এসেছে দুজনেই। এটাই বড়ো কথা। এটাই নষ্টনীড়ের থীম।"[১]

গল্পকারের ভাবনার প্রতি সততা বজায় অবশ্যই চলচ্চিত্রকারকে রাখতে হবে। না হলে, দুজনের ভাবনার মাঝে দূরত্ব তৈরি হবে। যা কখনোই কাম্য নয়।সত্যজিতের মতো মৃণাল সেন সেভাবে সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্রের জন্য খ্যাত নন। যদিও তাঁর পরিচালিত 'ভূবন সোম' (১৯৬৯) যাকে বাংলা সিনেমার নতুন দিশারী বলা যায় তা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুলের উপন্যাস সম বড়ো গল্প 'ভূবন সোম' অবলম্বনে নির্মিত। 'সচিত্র ভারত' নামে শারদীয়া পত্রিকায় ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। ভূবন সোম যখন প্রথম গৌরীকে দেখলেন সেই দৃশ্যটি বনফুল এইভাবে তুলে ধরেছেন:

> "মেয়েটা সড়াৎ করে চড়ে পড়ল মোষটার পিঠে। কোন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার অত তাড়াতাড়ি ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারতনা। ভূবন সোম অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। মহিষমর্দিনীর কথা চণ্ডীতে পড়েছিলেন, আজ স্বচক্ষে দেখলেন।"[২]

পর্দায় প্রায় অনুরূপ দৃশ্যটিকে পরিচালক তুলে ধরেছেন। কারণ উভয়ের ভাবনাই যে ছিল এক। সত্তরের দশকের শেষে আমরা দেখতে পেলাম মৃণালের চলচ্চিত্র জীবনের একটি পরিবর্তন। ১৯৭৯ সালে 'একদিন প্রতিদিন' এ ন্যারেটিভ ফর্মে ফিরে এলেন। অন্বেষণ করলেন জীবনের ফাঁকফোকর। চিত্রনাট্য পরিচালক রচনা করেছিলেন। সিনেমা, সাহিত্য ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। কোন শিল্পই জীবন নিরপেক্ষ নয়।কথায় বলে literature divorced from life is no literature at all. Art for art's sake এর পরিবর্তে বলতে হয়:

> "শুনহ মানুষ ভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার ওপরে নাই" (চন্ডীদাস) ।

সিনেমা, সাহিত্য এভাবেই যুগযুগান্ত ধরে সমাজ সংলগ্ন মানুষের কথা বলে নিজস্ব ভাষায়। হয়তো প্রকাশ আলাদা কিন্তু উদ্দেশ্য এক।

ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮) সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' গল্প অবলম্বনে নির্মিত। এ এক না মানুষী প্রেমের গল্প। গল্পের নায়ক বিমল এবং নায়িকা তাঁর পুরনো ট্যাক্সি 'জগদ্দল'। নতুন যুগে সে সত্যিই জগদ্দল। ভীষণ বেমানান। তবু বিমল তাকে যত্ন করে, সাজিয়ে দেয়, তোয়াজ করে। তার শুষ্ক মরুসম জীবনে জগদ্দলই একমাত্র আপনজন;

কাছেরজন— একমাত্র ভালোবাসা। চেতন ও অচেতনের এই প্রেমময় সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই যখন বিমল মাটিতে বসে জগদ্দলের গায়ে পরম ভরসায় গা এলিয়ে গান করে। সারা পৃথিবীকে জানাতে চায় জগদ্দলই তার আশ্রয়, বন্ধু, ভালবাসা, প্রেম। বিশ্বের কাছে নিছক একটা পুরানো অকেজো গাড়ি। কিন্তু বিমলের কাছে? যন্ত্র হয়ে ওঠে অযান্ত্রিক প্রেমের পৃথিবীতে। সুবোধ ঘোষের 'বিমল' এবং ঋত্বিকের 'বিমল' এক সুত্রে বাঁধা পড়ে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয় ও পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের অসামান্য পরিচালনায়।

আরো দুই বরেন্য পরিচালক তপন সিংহ এবং তরুন মজুমদার। উভয়েই সাহিত্যাশ্রিত চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী এবং পথিকৃত। তপন সিংহ পরিচালিত 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' (১৯৬২) দেখে স্বয়ং ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। আর তরুন মজুমদার মানেই সাহিত্যাশ্রিত সিনেমা ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সার্থক প্রয়োগ। 'পলাতক', 'বালিকা বধূ', 'ঠগিনী', 'সংসার সীমান্তে', 'গণদেবতা'— তালিকা অগণন। তরুন মজুমদার স্টার সিস্টেমকে ভেঙে গল্পকে প্রাধান্য দিলেন। যেমন, মনোজ বসুর 'আংটি চাটুজ্জের ভাই' গল্প অবলম্বনে 'পলাতক' (১৯৬৩) যেখানে নায়ক অনুপকুমার কৌতুক অভিনেতা হিসেবে পরিচিত এবং সেই সময় উত্তমকুমার নামক একজন স্টারের জন্ম কিন্তু বাংলা সিনেমায় হয়ে গেছে। তরুন মজুমদার বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মনোজ বসু, বিমল করের লেখার চলচ্চিত্রায়ন বেশি করেন। এমনকি তাঁর পরিচালিত 'ভালোবাসার বাড়ি' (২০১৮) এই প্রজন্মের ঔপন্যাসিক প্রচেত গুপ্তর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত।

এটা ঠিক চলচ্চিত্রের রূপায়ন সাহিত্যিকের বা সাহিত্যানুরাগীর মনের মতো নাও হতে পারে; চলচ্চিত্র রূপে সফল হলেও। আসলে এটা মেনে নিতে দ্বিধা নেই সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়েই স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম। তাই দুজনেই দুজনকে গ্রহন করবে আপন স্বাতন্ত্র অটুট রেখে। প্রাবন্ধিক পবিত্র সরকার এই প্রসঙ্গে বলেছেন:

> "শেষ পর্যন্ত এই কথাটা হয়তো স্বীকার করে নিতে হবে যে, চলচ্চিত্র আর সাহিত্যের মধ্যে একটা অনুবাদ সম্পর্ক চিরকাল থাকবেই। অনুবাদ বলতে আমরা আক্ষরিক অনুবাদ বোঝাচ্ছিনা, বোঝাচ্ছি এক ধরনের জন্মান্তর।"[৩]

বলা যেতে পারে সাহিত্যের নবজন্ম হয় চলচ্চিত্রের হাত ধরে অর্থাৎ বলতে পারি Transcreation।

উপসংহার:

বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের যাত্রা একটি দুরূহ এবং ক্রমবিবর্তনের প্রকাশ যা তৎকালীন বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন মাত্র। সাহিত্য ও সিনেমা উভয়ই সাংস্কৃতিক আয়না হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। পৃষ্ঠা এবং পর্দায় নারীর চিত্রায়ন কখনই নিরপেক্ষ ছিল না, না আছে। এই চিত্রায়ন বিভিন্ন সামাজিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতাদর্শগুলোকে কিন্তু উপেক্ষা করতে পারে না। মূল ধারার সাহিত্য নির্ভর বাংলা সিনেমার নারী চরিত্ররা আইকনিক বা রোলমডেল হয়ে উঠলেও কমার্শিয়াল বা বানিজ্যিক সিনেমাগুলিতে প্রায়শই নারীকে পণ্যে পরিণত হতে হয়েছে। একথা অস্বীকার করা যায়না। সেখানে নারীদেহকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পণ্যের সামগ্রীতে পরিণত করেছে। এই পণ্যীকরণ বাংলার শিল্প বা সাহিত্যে কোনমতেই কাম্য নয়।

মনে রাখতে হবে সাহিত্যের ভাষাকে চলচ্চিত্রে রূপদানের জন্য সবার আগে দরকার এমন ব্যক্তির যিনি সাহিত্য ভাবনায় সমৃদ্ধ ও অনুভূতিশীল। সেম কাইন্ড অফ পারসেপশন এর যোগ্য। যিনি গল্পের অক্ষরের দিকে না তাকিয়ে তাকাবেন গল্পকারের মূল ভাবনার দিকে। নিউ থিয়েটার্সের উদ্যোগে সাহিত্য নির্ভর বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের যে পথচলা শুরু হয়ে ছিল তা এখনো ক্রমবিদ্যমান। কখনো তা হয় সুনীলের কাকাবাবুকে সামনে রেখে, কখনো শরদিন্দুর ব্যোমকেশ, সত্যজিতের ফেলুদা কিম্বা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন। উল্লিখিত উদাহরণগুলি প্রতিটি গোয়েন্দা কাহিনী একথা ঠিক কিন্তু সাহিত্যনির্ভর তো! এর বাইরেও বাংলা সাহিত্য ও সিনেমার একসাথে চলার নিদর্শন রয়েছে। আসলে বাঙালী দর্শক এবং পরিচালক উভয়ের কাছেই সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের আবেদন শাশ্বত।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, সত্যজিৎ। বিষয় চলচ্চিত্র, অষ্টম মুদ্রণ ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স পৃ. ৯৯।
২. বনফুল। ভূবন সোম। ডি. এম লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ পৌষ, ১৩৬৩।
৩. আচার্য, নির্মাল্য ও পালিত, দিব্যেন্দু। শতবর্ষে চলচ্চিত্র। ২০২৪, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১৬৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. পত্রী, পূর্ণেন্দু। সিনেমা সংক্রান্ত। জানুয়ারি ২০২০, Generic Publisher.
২. চক্রবর্তী, পিনাকী। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নিউ থিয়েটার্স। ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স।
৩. দাসগুপ্ত, চিদানন্দ। বাংলা সিনেমা ও তার ইতিহাস। ২০০২, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১২০-১৪৫।
৪. রায়, সত্যজিত। Our Films Their Films. (বাংলা অনুবাদ সংস্করণ), ২০০৪, কলকাতা, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, পৃ. ৪৫-৭০।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 431- 441
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.225

সাবেকি ভূরাজনীতি: ভূরাজনীতির সাবেকি চিন্তাবিদ এবং তাদের তত্ত্বের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা

সৌমেন মণ্ডল, *রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শিশুরাম দাস কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.10.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

To properly understand international politics or international relations, it is necessary to have a basic idea of geopolitics. This article primarily analyzes the concept of geopolitics and explores the ideas of prominent theorists in the field. It provides a brief introduction to the geopolitical thoughts of Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén, John Mackinder, Karl Haushofer, Alfred Thayer Mahan, and Nicholas Spykman. These theorists integrated geographical concepts with politics in their theoretical frameworks. The article explains how knowledge of geography enhances the study of politics and international relations, making it more relevant and practical. It also discusses how a state can play an active role in international politics due to geographical variations such as location, environment and resources. Geopolitical theorists have outlined how nation-states can influence international politics by developing their land and naval power. Additionally, the article addresses the concept of the Heartland and its significance in international relations. Finally, it describes how this theory influenced power competition and the balance of power in international politics during World War II and the Cold War.

Keywords: Geopolitics, geographical organism, Heartland, pivot area, sea power, Rimland

ভূরাজনীতির ধারণাটি খুব বেশি প্রাচীন নয়, উনবিংশ শতকের একেবারে শেষের দিকে ভূরাজনীতি ধারণার উদ্ভব হয়। প্রাথমিক পর্বে এই বিষয়টিকে কেবলমাত্র যুদ্ধ কৌশলের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও সেই সময় ভূরাজনীতির ধারণা কোনো পাঠ্য বিষয়েই স্থান পায়নি, সময়ের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভূরাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে ভূরাজনীতির ধারণা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়। বস্তুত প্রাথমিক অবস্থায় শাস্ত্র হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় আদর্শবাদী ধ্যানধারণা অধিক প্রাসঙ্গিক থাকায় সেই সময় ভূরাজনীতির ধারণা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় স্থান করে নিতে পারেনি, পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় বাস্তববাদী মূল্যবোধ প্রাসঙ্গিকতা লাভ করলে ভূরাজনীতির ধারণা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় স্থান পায়। মূলত উনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় কালে ভূরাজনীতির ধারণা বিকাশ ও বিস্তার লাভ করে এবং সেই সময়ে প্রত্যক্ষভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভূরাজনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তবে দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্যক্ষভাবে সাবেকি ভূরাজনীতি তত্ত্বের চর্চা সেইভাবে না হলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের সঙ্গে ভূরাজনীতির তত্ত্বের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত প্রাথমিক অনুমান এবং পদ্ধতিগত

আলোচনার ক্ষেত্রে এই দুই তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। সাবেকি বাস্তববাদী তত্ত্ব অনুসারে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল একটি নৈরাজ্যের ক্ষেত্র যেখানে স্বার্থান্বেষী জাতি রাষ্ট্র গুলি পরস্পরের সঙ্গে ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় সদা লীপ্ত' (Kenneth Waltz, pp. 120)। ঠিক একইভাবে সাবেকি ভূরাজনীতির তত্ত্ব গুলিও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রতিযোগিতার কথাই বলে। এই তত্ত্বের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ই হল ভৌগোলিক উপাদানের ওপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা।

'ভূরাজনীতি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন সুইডিশ ভূবিজ্ঞানী রুডলফ জেলেন ১৮৯৯ সালে। ভূরাজনীতি এ ধারণাটি 'ভূগোল' তথা 'মানবিক ভূগোল' (Human Geography) সেখান থেকে 'রাজনৈতিক ভূগোল' এবং পরবর্তীতে ভূরাজনীতির জন্ম হয়েছে। ভূরাজনীতির ইংরাজি প্রতিশব্দ হল 'Geopolitics' এটি এসেছে জার্মান শব্দ 'Geopolitike' থেকে। ইংরাজিতে 'Geopolitics' শব্দটি দুটি শব্দের মিলিত রূপ 'geo' এবং 'politics'— 'Geo' অর্থাৎ ভৌগোলিক উপাদান যার মধ্যে রয়েছে সেই দেশের অবস্থান, আয়তন, পরিধি প্রভৃতি এবং 'Politics' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয় ক্ষমতা, প্রভাব, আধিপত্য বা ঐ ভৌগোলিক উপাদানের ওপর গড়ে ওঠা রাজনীতি। একটি দেশের ভৌগোলিক উপাদান ও তার পাশাপশি সেই দেশের ক্ষমতা, সামর্থ্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তার চর্চাই করে ভূরাজনীতি। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে ভৌগোলিক উপাদান যেমন— অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা কেমনভাবে অর্থনীতি ও প্রযুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এগুলির দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্তরে সম্পর্ক ও ক্ষমতা প্রতিযোগিতা কিভাবে বিবর্তিত হয় সে বিষয়ে আলোচনা করে ভূরাজনীতি। তবে ভূরাজনীতির সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত পার্থক্য গড়ে উঠেছে এর একক কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ভূরাজনীতির বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভূরাজনীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন— হাউসোফারের মতে 'geopolitics as an ambitious science: geopolitics is the new national science of the state', হ্যাগানের মতে 'geopolitics is a contemporary rationalization of power politics', রুডলফ জেলেনের মতে ভূরাজনীতি হল 'the theory of the state as a geographical organism or phenomenon in space'. (Hu Zhiding, and Lu, Dadao, pp. 1773) আবার এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুসারে ভূরাজনীতি হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্ষমতা প্রতিযোগিতার ওপর ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব। লঙ্গম্যান ইংলিশ ডিকশনারি অনুযায়ী দেশের অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জনসংখ্যা ইত্যাদি রাজনীতির ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলে তার অধ্যয়ন হল ভূরাজনীতি। ভূরাজনৈতিক তাত্ত্বিকগণ ভূরাজনীতির আলোচনায় ইতিহাস এবং ভূগোলের জ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন— অ্যালফ্রেড থায়ার মাহান, জন ম্যাকাইন্ডার, জেবিগ্নিউ ব্রেজেন্সকি প্রমূখ ভূরাজনীতির তাত্ত্বিকগণ ভূগোল ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোকে ভূরাজনীতির ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূরাজনীতি বিদেশ নীতি চর্চার একটি বিশেষ পদ্ধতি রূপে কাজ করে এবং রাষ্ট্রীয় আচরণকে বিশেষভাবে অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও অনুমান করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন সময়ে তাত্ত্বিকগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভূরাজনীতির তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপন করেছেন, আলোচনার সুবিধার্থে ভূরাজনীতির ধারণাকে তিন ভাগে বিভাজিত করা যেতে পারে—

১. মহাদেশীয় শক্তির ধারণা (Concept of Continental Power)
২. সামুদ্রিক শক্তির ধারণা (Concept of Sea Power)
৩. উপদ্বীপীয় শক্তির ধারণা (Concept of Peninsula Power)

ভূরাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়ই হল 'মহাদেশীয় শক্তির' ধারণা। রাষ্ট্রের জৈব মতবাদ অর্থাৎ ভূখণ্ডের বিকাশ, বিস্তার ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতা এখানকার প্রধান আলোচ্য বিষয়। মহাদেশীয় শক্তির ধারণা প্রদানের ক্ষেত্রে জার্মান স্কুলের তাত্ত্বিকদের অবদানই বেশি। মহাদেশীয় শক্তির ধারণায় উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিকগণ হলেন— ফ্রেডরিখ রাটজেল, রুডলফ জেলেন, হ্যালফোর্ড জন ম্যাকাইন্ডার, কার্ল হাউসোফার প্রমুখ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কেনো কেবল মাত্র কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র বেশি শক্তিশালী এবং কিভাবে একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে সে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এই তাত্ত্বিকগণ। ভূরাজনৈতিক তত্ত্বে 'মহাদেশীয় শক্তি' ধারণার পাশাপাশি ব্রিটিশ ও আমেরিকান স্কুলের তাত্ত্বিকদের হাত ধরে 'নৌশক্তি' ধারণার বিকাশ ঘটতে থাকে যাদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন— অ্যালফ্রেড থায়ার মাহান, জুলিয়ান করবেট প্রমূখ। এদের মতে পৃথিবীর উন্মুক্ত জলরাশির ওপর যে দেশের আধিপত্য যত বেশি হবে সেই দেশই বিশ্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে বিশেষভাবে সক্ষম হবে। এছাড়া

বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী পর্যায়ে 'উপদ্বীপীয় শক্তি' ধারণার জন্ম হয় যার প্রধান প্রবক্তা হলেন আমেরিকান স্কুলের তাত্ত্বিক নিকোলাস স্পাইকম্যান। যে সকল বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ধ্রুপদী ভূরাজনীতির তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তার ঘটিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে আলোচনা করা হল—

১. মহাদেশীয় শক্তির ধারণা:

১.১ ফ্রেডরিখ রাটজেল (Friedrich Ratzel, ১৮৪৪-১৯০৪):

জার্মান ভূবিজ্ঞানী ফ্রেডরিখ রাটজেলের প্রধান চর্চার বিষয় ছিল রাজনৈতিক ভূগোল ও নৃকূল বিদ্যা। তিনি রাজনৈতিক ভূবিদ্যার জনক হিসাবেও পরিচিত। তার লেখা প্রবন্ধ Laws on the spatial growth of states, ১৮৯৬ এবং তার বিখ্যাত গ্রন্থ political geography, ১৮৯৭ থেকে আমরা তার ভূরাজনীতির ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। তিনি তার আলোচনায় ভূগোলের ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার মতে ভূগোলকে পরিহার করে সমাজ বিজ্ঞানের চর্চা অর্থহীন, যে সমস্ত তাত্ত্বিকরা ভূগোলের গুরুত্বকে অস্বীকার করে তাদের তত্ত্বের নির্মাণ করেন সে সকল তত্ত্বের ভিত্তি হল শূন্যে অবস্থানের মতোন। রাটজেলের মতে ভূগোলের সাহায্যে সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা একটি মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং ভূগোলের যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান লাভ করতে পারি। তিনি তার আলোচনায় রাষ্ট্রের আচরণকে আরও সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে চর্চার প্রয়াস করেন। রাটজেল সামাজিক ডারউইনবাদ ও পরিবেশ কেন্দ্রিক নির্ণয়বাদের জন্মদাতা। তিনি রাষ্ট্রের জৈব মতবাদের পাশাপাশি 'লেবেন্সরাম ও অটারকি' (Lebensraum and autarky) এই দুই ধারণার উপস্থাপন করেন। লেবেন্সরাম হল একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা অঞ্চল যার বিস্তারের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের পরিধির বিস্তার বা বৃদ্ধি ঘটে, আর অটারকির ধারণাটি আত্মনির্ভরতা বা স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। তার মতে রাষ্ট্র হল জৈবিক সত্ত্বার অনুরূপ যার একটি জীবনচক্র রয়েছে, যেখানে— রাষ্ট্রের জন্ম আছে, পরিপূর্ণতা আছে, অবক্ষয় আছে এবং অবশেষে মৃত্যু আছে। একটি জৈবিক সত্ত্বার জীবিত থাকতে যেমন খাদ্যের প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে দরকার হয় খাদ্যের বা পুষ্টির আর রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী তুলনামূলক কম শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভূখণ্ড অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই খাদ্যের চাহিদাকে পরিপুর্ণ করে। তার মতে প্রতিটি রাষ্ট্র প্রাকৃতিক আইন বা জৈবিক আইন অনুযায়ী আচরণ পালন করে এবং নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখে, যে রাষ্ট্র এরূপ আচরণে ব্যার্থ হয় সেই রাষ্ট্রের দ্রুত অবক্ষয় ঘটে। তিনি তার চিন্তায় জনগণ এবং জাতিকে (race) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার মতে একটি জাতিই তার ভূখণ্ডের জন্য রক্ত ঝরায় এবং এমন এক সময় আসে যখন জাতি ও রাষ্ট্র একে অন্যের পরিপূরক হয়ে ওঠে তাই তার কাছে জাতিহীন রাষ্ট্রের ধারণা একেবারেই অর্থহীন, যেমন জার্মান ছাড়া জার্মানি কিংবা ফরাসী ছাড়া ফ্রান্সের ধারণা অর্থহীন। তার সময়ে অটোভন বিসমার্কের নেতৃত্বে ১৮৭১ সালে অখণ্ড জার্মান গঠিত হয় এবং তিনি জার্মানকে একত্রীত রাখতে তার ভূরাজনীতিক তত্ত্বের উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে ১৯৩০ এর দশকে নাজি বিস্তারকে বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই তত্ত্বের ব্যবহার করা হয়। হিটলার এই তত্ত্বকে ব্যবহার করে জার্মান পার্শ্ববর্তী দেশ গুলিকে আক্রমণ করেন এবং জার্মান জাতীয়তাবাদের বিস্তার ঘটান।

১.২ জন রুডলফ জেলেন (Johan Rudolf Kjellen, ১৮৬৪-১৯২২):

রুডলফ জেলেন ছিলেন একজন সুইডিশ ভূবিজ্ঞানী ও সাথে সাথে একজন রাষ্ট্রনীতিবিদ। তিনিই প্রথম ১৮৯৯ সালে 'ভূরাজনীতি' এই শব্দের উদ্ভাবন করেন। তিনি রাটজেলের রাষ্ট্রের জৈব মতবাদ দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন এবং রাষ্ট্রের এই জৈবিক তত্ত্বের ধারণাকে আরও সুসংবদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী উপায়ে আলোচনা করেন। রাটজেলের রাষ্ট্রের জৈব তত্ত্বকে অনুসরণ করে জেলেন বলেন 'রাষ্ট্র হল একটি জৈবিক এবং ভৌগোলিক সত্ত্বা'। জেলেনের লেখা 'The State as a Life form' শীর্ষক গ্রন্থ ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় যা জার্মানে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি মনে করেন রাষ্ট্র হল একটি গতিশীল সত্ত্বা যা বিকাশের সাথে সাথে নিজের ক্ষমতাকে ও বৃদ্ধি করে। তিনি সাংস্কৃতিক বিস্তারকে রাষ্ট্রীয় বিকাশের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, তার মতে যে রাষ্ট্রের সংস্কৃতি যত বেশি গৌরবময় এবং উন্নততর সেই রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে তত বেশি শাসন ক্ষেত্রের পরিসীমা বৃদ্ধি করার অর্থাৎ সেই রাষ্ট্র তত বেশি পরিমাণ ভূখণ্ডের ওপর নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। উন্নত সংস্কৃতি খুব স্বাভাবিক ভাবে নিজ ভূখণ্ডের সীমানা অতিক্রম করে অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে নিজ প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। আর এইভাবে সংস্কৃতি রাষ্ট্রের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং অন্য ভূখণ্ড অধিগ্রহণকে বৈধতা দেয়। জেলেন তার

ভূরাজনৈতিক তত্ত্বে রাটজেলের জাতির ধারণার থেকে সংস্কৃতিকেই রাষ্ট্রের ঐক্যের ক্ষেত্রে অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের শক্তিশালী হয়ে উঠতে প্রধানত পাঁচটি অঙ্গের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন—

১) ক্রাটোপলিটিক (Kratopolitik) বা সরকারের পরিকাঠামো ২) ডেমোপলিটিক (Demopolitik) বা দেশের জাতিগত উপাদান ৩) স্যোসিওপলিটিক (Sociopolitik) বা সামাজিক কাঠামো ৪) ওয়েকোপলিটিক (Oekopolitik) বা অর্থনৈতিক উপাদান যা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নির্ণায়ক ৫) জিওপলিটিক (Geopolitik) বা ভৌগোলিক উপাদান। ১৯১৭ সালে জেলেন আরও কিছু ধারণার অবতারণা করেন— প্রথমত, রাইস (Reich) এই ধারণাটি লেবেন্সরাম ধারণার সাথে সম্পর্কিত। এই ধারণার মধ্য দিয়ে তিনি ভূখণ্ড রক্ষার্থে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রস্তুতের কথা বলেন যা পরিচালিত হবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্থা দ্বারা। দ্বিতীয়ত, ভল্ক (Volk) এই ধারণাটি জাতির ধারণার সাথে যুক্ত, কিভাবে একটি নৃকুলগত জাতি অন্য জাতি গোষ্ঠী থেকে উচ্চতর তার আলোচনা করেন। তৃতীয়ত, হাওসাল্ট (Haushalt) এই ধারণাটি ভূখণ্ডের দখল ও নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত। চতুর্থত, জেসেলসাফট (Gesellschaft) যা রাষ্ট্রের সংস্কৃতি ও জনসংখ্যার সাথে সম্পর্কিত। এই ধারণা গুলি জার্মানিকে বিশ্ব ক্ষমতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এবং পরবর্তীতে ইটালি ও জাপান একইভাবে এই ধারণা গুলিকে গ্রহণ করেছিল।

১.৩ হ্যালফোর্ড জন ম্যাকাইন্ডার (Halford John Mackinder, ১৮৬১-১৯৪৭):

ম্যাকাইন্ডার ছিলেন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও একই সাথে ধ্রুপদী ভূরাজনীতির একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ম্যাকাইন্ডারকে ভূরাজনীতি ও ভূকৌশলের জনক হিসাবে অভিহিত করা হয়। তিনিই প্রথম যথাযথভাবে ভূরাজনীতির ধারণাকে তাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত করেন। তার মতে ভূরাজনীতি হল রাজনীতির ওপর ভূগোলের প্রভাব- কেমনভাবে ভূখণ্ড, দূরত্ব, পরিবেশ, জলবায়ু প্রভৃতি বিষয় রাষ্ট্র ও সাথে সাথে জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কিত আলোচনা। তিনি ইতিহাস এবং ভূগোলের যৌগিক সম্পর্কের নিরিখে বিশ্ব রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে ভৌগোলিক বৈচিত্রের কারনেই এথেন্স সামুদ্রিক শক্তি এবং স্পার্টা স্থলশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ম্যাকাইন্ডার মনে করেন যে বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে সব সময় স্থলশক্তির সাথে নৌশক্তির দ্বন্দ হয়েছে এবং স্থলশক্তিই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তিনি মূলত স্থলশক্তির ওপরই অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন, তার মতে স্থলশক্তির মাধ্যমে নৌশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তিনি ভূরাজনীতির ধারণাকে নৃকুলগত (Ethnocentric) বা আঞ্চলিক চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত করে এক সার্বিক রূপ প্রদানের চেষ্টা করেন। তার প্রধান দুটি লক্ষ্য ছিল প্রথমত, ব্রিটেনে ভূগোলকে স্বতন্ত্র 'বৈজ্ঞানিক' শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা ও দ্বিতীয়ত, সমগ্র বিশ্বে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখতে এক সুসংহত তত্ত্বের নির্মাণ করা।

বিশ্ব ক্ষমতা সম্পর্কে ম্যাকাইন্ডারের প্রাথমিক অনুমানকে দুটি পর্বে বিভাজিত করা যায়, প্রথম পর্ব ছিল ১৯০০ দশকের শুরু থেকে ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত। এই সময় তিনি মনে করতেন কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের নেতৃত্বে জার্মানি হল ক্ষমতাশীল ও আক্রমণাত্মক একটি রাষ্ট্র এবং এই জার্মানিই ভবিষ্যতে বিশ্ব শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। দ্বিতীয় পর্ব, ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত, এই পর্বে তিনি তার উপলব্ধির পরিবর্তন করেন, দুই বিশ্বযুদ্ধে জার্মানের পরাজয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে তিনি মনে করেছিলেন যে ভবিষ্যতে ইউরেশিয়াতে সোভিয়েত ইউনিয়নই সর্বাধিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। ম্যাকাইন্ডার তার ভূরাজনৈতিক তত্ত্বকে সময় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন করেন, তিনি যথাক্রমে ১৯০৪ সালে পাইভোট অঞ্চলের (pivot area) ধারণা, ১৯১৯ সালে Heartland বা হৃদভূমির ধারণা এবং ১৯৪৩ সালে মিডল্যান্ড বেসিন (Midland basin) -এর ধারণা প্রদান করেন। ১৯০৪ সালে 'The geographical pivot of history' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি তার ভূরাজনৈতিক তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন এবং বলেন যে, ভবিষ্যতে ইউরেশিয়া হয়ে উঠবে সমগ্র বিশ্ব নৌশক্তির কাছে অজেয় এক অঞ্চল। ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা এই তিন মহাদেশকে যুক্ত করলে একটি বিশাল স্থলভাগের জন্ম হয় যা পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের দুই তৃতীয়াংশ। এই বৃহৎ অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি হল— উত্তর থেকে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপকে নিয়ে গঠিত বিশাল সমতলভূমি, পূর্ব ইউরোপ ও সাইবেরিয়া অঞ্চল, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বে মৌসুমি অঞ্চল। ১৯০০ সালের পরবর্তীকালে এই অঞ্চলটি উৎপাদন, বাণিজ্য ও তিন মহাদেশের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল তাই ম্যাকাইন্ডার বিস্তির্ণ এই ভূখণ্ডকে বিশ্ব রাজনীতির 'pivot area' বলে উল্লেখ করেন।

১৯১৯ সালে তার 'Democratic ideals and reality' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি নতুন ভাবে বিশ্ব রাজনীতিকে উপস্থাপন করেন। আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া বা আফ্রো-ইউরেশিয়ার বিস্তির্ণ ভূ-ভাগকে তিনি বিশ্ব দ্বীপ বা 'World Island' নামে আখ্যায়িত করেন। এই বিশ্ব দ্বীপের কেন্দ্রস্থ অঞ্চল যা তিনি তার পূর্ববর্তী থিসিসে 'পাইভোট অঞ্চল' হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন সেই পাইভোট অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে ঐ অঞ্চলকে তিনি 'Heartland বা হৃদভূমি' হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই হৃদভূমি আবৃত রয়েছে পশ্চিমে ভল্গা নদী, পূর্বে সাইবেরিয়া, উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর, দক্ষিণে হিমালয় পর্বতমালা দ্বারা অর্থাৎ হৃদভূমিকে কেন্দ্র করে প্রাকৃতিক এক আবরণ তৈরি হয়েছে যে আবরণ ভেদ করে হৃদভূমিকে দখল করা বিশ্ব শক্তির কাছে কঠিন কাজ। হৃদভূমিকে ঘিরে পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীন এই অঞ্চল গুলি মিলিত ভাবে এক অন্তর্বেষ্টনী তৈরি করে আর এই অঞ্চলের পশ্চিমে ইংল্যান্ড ও পূর্বে জাপান এই দুই দ্বীপ (outlying island) অবস্থান করছে। এছাড়া উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার দক্ষিণাংশ এবং অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে বহির্বেষ্টনী গড়ে উঠেছে। তার ভূরাজনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী এই আবৃত হৃদভূমির একমাত্র প্রবেশ পথ হল পূর্ব ইউরোপ 'Eastern gate is the only key to control heartland' (H. Mackinder. 1904, pp. 424) তাই তিনি হৃদভূমি দখলের পূর্ব শর্ত হিসাবে পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ম্যাকাইন্ডার তার The Geographical Pivot of History, 1904 শীর্ষক গ্রন্থে বিখ্যাত উক্তি প্রদান করেন 'Who rules East Europe commands the Heartland; who rules the Heartland commands the world island; who rules the world island commands the World' অর্থাৎ যে পূর্ব ইউরোপকে শাসন করবে সে হৃদভূমিকে নিয়ন্ত্রণ করবে, যে হৃদভূমি শাসন করবে সে বিশ্ব দ্বীপকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং যে বিশ্ব দ্বীপকে শাসন করবে সে সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

১৯৪৩ সালে জার্মান শক্তি পরাজিত হলে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইউরেশিয়া অঞ্চলের ভবিষ্যতের ক্ষমতা বলয় হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। জার্মানের পতনের পর সোভিয়েত ইউনিয়নই হল বৃহৎ স্থলশক্তিধর দেশ। এই সময় তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৩ সালে তার লেখা 'The round world and the wining of peace' নামক গ্রন্থে 'মিডল্যান্ড বেসিনের' ধারণা প্রদান করেন। তার মতে পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্তকে ঘিরে মিডল্যান্ড বেসিন গঠিত হবে। এই পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলিতভাবে সোভিয়েত শক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম। এই মিডল্যান্ড অঞ্চলের দেশ গুলির মধ্যে ভৌগোলিক উপাদান, উন্নয়নের মাত্রা ও সাংস্কৃতিগত সাদৃশ্য গড়ে উঠেছিল। সাথে সাথে উৎপাদন ক্ষমতা, সামরিক শক্তি এবং সামুদ্রিক ও আকাশ পথে যোগাযোগ এই অঞ্চলে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বলা যেতে পারে যে এই অঞ্চলটি নতুন সম্ভাবনাময় শক্তি হিসাবে বিশ্ব রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করছিল, আর তাই তিনি এই অঞ্চলটিকে নতুন ক্ষমতা বলয় হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই পর্বে তিনি মনে করেন বিশ্বে একটি মাত্র ক্ষমতা নয় বরং দুটি ক্ষমতা কেন্দ্র থাকবে একটি ইউরেশিয়ার হৃদভূমি যার নেতৃত্ব দেবে সোভিয়েত রাশিয়া এবং ওপর দিকে মিডল্যান্ড বেসিন যার নেতৃত্ব দেবে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই তত্ত্বের অনুমান সত্য প্রমাণিত হয় যখন ঠাণ্ডাযুদ্ধ পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবিলা করতে মার্কিন নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে উত্তর আটলান্টিক রাষ্ট্র জোট বা NATO গঠিত হয়।

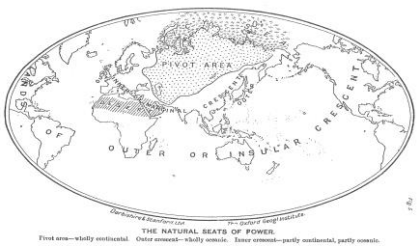

ম্যাকাইন্ডারের পাইভোট এলাকা, চিত্র-০১

(Source: https://ericrossacademic.wordpress.com/2015/03/05/of-heartlands-and-pan-regions-mapping-the-spheres-of-influence-of-the-great-powers-in-the-age-of-world-wars/ accessed on 10 Sep 25)

১.৪ কার্ল হাউসোফার (Karl Haushofer, ১৮৬৯-১৯৪৬):

মেজর জেনারেল অধ্যাপক ডঃ কার্ল হাউসোফার ছিলেন জার্মান সামরিক আধিকারিক, রাজনীতিবিদ এবং ভূরাজনীতির একজন মূখ্য প্রবক্তা। হাউসোফার জার্মান চিন্তাবিদ রাটজেলের রাষ্ট্রের জৈব তত্ত্বের ধারণা, জেলেনের অটারকির ধারণা ও ম্যাকাইন্ডারের 'Geopilitical pivot of History' দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি তার ভূরাজনীতির তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তার মতে ভূরাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হল রাজনৈতিক ভূবিদ্যা, তিনি ভূরাজনীতিকে 'new national science of the state' বলে উল্লেখ করেন। হাউসোফার লেবেন্সরামকে সংজ্ঞায়িত করেন এইভাবে যে "রাষ্ট্রের অধিকার ও প্রধান কর্তব্য হল তার জনগণের প্রয়োজনীয় ভূখণ্ড ও সম্পদের বৃদ্ধি ঘটানো আর এর জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে ন্যায় যুদ্ধ করার" (Klaus Dodds, 2010, pp. 78)। জেলেন যেভাবে অটারকির ধারণা প্রদান করেছিলেন তিনিও অটারকির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আত্মনির্ভরতাকে চিহ্নিত করেন। এছাড়া প্যান অঞ্চলের ধারণা যার মধ্যে দিয়ে তিনি বলেন একটি রাষ্ট্র একই জনজাতি ও একই সংস্কৃতিযুক্ত অঞ্চলে নিজের বিস্তার ঘটাবে। ভূরাজনীতিক তত্ত্বে হাউসোফারের নিজস্ব অবদান হল তার গতিশীল সীমান্তের ধারণা। তার সময়ে রাষ্ট্রের স্থায়ী ও স্থিতিশীল সীমান্তের ধারণার বিপরীতে তিনি যুক্তি প্রদান করেন যে রাষ্ট্র গুলি লেবেন্সরাম, অটারকি ও প্যান অঞ্চলের ধারণার মধ্য দিয়ে সীমান্তের সদা বিস্তার ঘটাবে। তার মতে সীমান্ত হল এক জৈবিক সত্ত্বা যা সদা গতিশীল ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। তিনি ম্যাকাইন্ডারের হৃদভূমির ধারণাকে তার তত্ত্বের কেন্দ্রীয় উপাদান বলে মনে করেন। এই হৃদভূমিই জার্মানির কাছে প্রয়োজনীয় লেবেন্সরাম, অটারকি ও প্যান অঞ্চলের সাফল্য এনে দেবে। হাউসোফার তার ভূরাজনৈতিক তত্ত্বে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেন—

১) একটি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক থেকে অবশ্যই আত্মনির্ভর হবে এবং যা তাকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

২) জার্মান একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র, এর লক্ষ্য হল বিশ্বে তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাওয়া। জার্মান জাতিই ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বকে উচ্চতর সভ্যতা ও শান্তি উপহার দেবে।

৩) যেখানে জার্মান ভাষা, জার্মান জাতি ও জার্মান অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চল গুলিকে একই ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেমন— অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, রাশিয়া, তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র (ইস্টোনিয়া, লাটিভিয়া, লিথুয়ানিয়া) এবং সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি।

৪) যদি জার্মানি বিশ্বের সর্ববৃহৎ দ্বীপ আফ্রো-ইউরেশিয়া অঞ্চলের ওপর আধিপত্য কায়েম করতে পারে তবে সে অজেয় সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং সে সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

৫) আন্তর্জাতিক সীমান্ত জার্মানের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে পরিবর্তীত হতে পারে।

তিনি সমগ্র বিশ্বকে তিনটি প্যান অঞ্চলে ভাগ করেন— প্রথমত, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ বা অ্যাঙ্গলো আমেরিকান জোট যার নেতৃত্ব দেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয়ত, ইউরোপ, আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া যার নেতৃত্ব দেবে জার্মান। তৃতীয়ত, ভারত, চীন, জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া যার নেতৃত্ব দেবে জাপান। আর এই সমস্ত প্যান অঞ্চলের নেতৃত্বে থাকা দেশ গুলি এই অঞ্চলের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ও একাধিপত্য বিস্তার করবে। ১৯৪০ সালে হাউসোফার জার্মানের মিউনিখে একটি ভূরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যেখানে তিনি এবং তার সহকারীরা প্রচুর ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেন যা পরবর্তীকালে জার্মানের ভবিষ্যৎ কৌশলি পদক্ষেপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিফ কাউন্সিল ১৯৪৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতিতে বলেন 'হিটলারের ইন্টেল্যাকচুয়াল গডফাদার হলেন কার্ল হাউসোফার, তার চিন্তাধার ও মতাদর্শই হিটলারের বৌদ্ধিক জ্ঞানের উৎস। ভূরাজনীতি নিছকই কোনো অধীতব্য তত্ত্ব নয় বরং এটি ইউরেশিয়ার হৃদভূমি দখলের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর ওপর জার্মানের আধিপত্য বিস্তারের এক সুচারু পরিকল্পনা' (The Dmon of Geopolitics: How Karl Haushofer Educated Hitler and Hess by Holger H. Herwig, 2016, pp. 49)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নীতির ফলে সৃষ্ট গণহত্যার জন্য হাউসোফারকেই দায়ী করা হয়। হাউসোফারের পূর্ববর্তী রাটজেল, জেলেন বা ম্যাকাইন্ডার প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ ভূরাজনীতিকে একটা ধারণা হিসাবে চর্চা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন কিন্তু হাউসোফারই প্রথম যিনি ভূরাজনীতিকে তাত্ত্বিক স্তর থেকে প্রত্যক্ষভাবে বাস্তব রাজনীতিতে প্রয়োগ করেন এবং ভূরাজনীতিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কৌশলে ব্যবহার করেন।

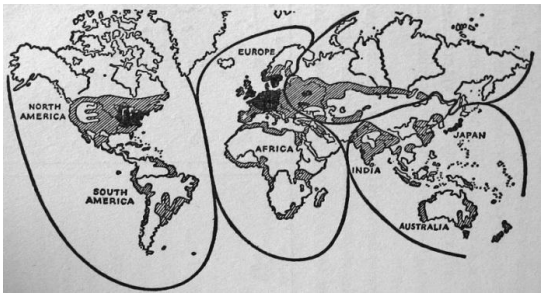

হাউসোফারের প্যান অঞ্চল, চিত্র – ০২

(Source: https://ericrossacademic.wordpress.com/2015/03/05/of-heartlands-and-pan-regions-mapping-the-spheres-of-influence-of-the-great-powers-in-the-age-of-world-wars/ accessed on 10 Sep 25)

২. সামুদ্রিক শক্তির ধারণা:

২.১ অ্যালফ্রেড থায়ার মাহান (Alfred Thayer Mahan, ১৮৪০-১৯১৪):

থায়ার মাহান ছিলেন একজন আমেরিকান নৌসেনাধ্যক্ষ এবং naval war college- এর অধ্যাপক। Blue Water School- এর তাত্ত্বিক মাহান আধুনিক নৌ ইতিহাসের জনক হিসাবে পরিচিত। তিনি যুদ্ধ নীতি ও যুদ্ধ কৌশলের ক্ষেত্রে পার্সিয়ান জেনারেল কার্ল ভোন ক্লসউইথজের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়া সামুদ্রিক শক্তি ও সামুদ্রিক কৌশলের ধারণা গ্রহণ করেছিলেন ফরাসী জেনারেল এন্টোনি হেনরি জমিনির লেখালিখি থেকে। তার সমসাময়িক ভূরাজনীতিজ্ঞদের মতো তিনিও মনে করতেন, যা নিজ রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য উপযোগী তা সমগ্র মানব সমাজের জন্য কল্যাণকর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পশ্চিমি তাত্ত্বিকগণ সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে নৌতত্ত্বের নির্মাণ ও উন্নতির প্রয়াস করেন যাদের মধ্যে মাহানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মূলত ইতিহাসের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তার ভূরাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তোলেন। তার মতে কোনো দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের থেকে সেই দেশের সমুদ্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বেশি ফলদায়ক, কারন সামুদ্রিক যোগাযোগের মধ্য দিয়েই এক রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। নৌপথে আধুনিক যুদ্ধের সূচনা হয় ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, ১৮৯৮ সালে স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধ এবং ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। মাহানের নৌশক্তির ধারণার জন্ম হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ প্রজাতন্ত্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেনের যুদ্ধ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে নৌযুদ্ধের ইতিহাস থেকে। তার মতে ব্রিটিশ নৌবাহিনী ফরাসী শক্তিকে পরাজিত করতে পেরেছিল তার প্রধান কারন, ব্রিটেন ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ এবং শক্তিশালী অবরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তার মতে নৌ অভিজান সবসময় যুদ্ধ পরিকল্পনা ও অবরোধ গড়ে তুলে জয় লাভ করা যায়। মাহান বিশ্বাস করতেন যে শান্তিকালীন পর্বে রাষ্ট্রের উচিৎ উৎপাদন ও জাহাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং অধিক পরিমানে বৈদেশিক সম্পদ অর্জন করা। তার মতে একটি দেশের জাতীয় ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশ বিশ্ব সামুদ্রিক পথের ওপর কতটা কর্তৃত্ব দখল রাখতে পেরেছে তার ওপর। আমেরিকান নৌসেনাধ্যক্ষ মাহান ১৮৯০ সালে 'The influence of sea power upon history 1660-1783' এবং ১৮৯২ সালে 'The influence of sea power upon the French revolution and empire 1793-1812' এই দুই গ্রন্থ রচনা করেন যা সেই সময়কার ভূরাজনীতি ও ভূকৌশলগত আলোচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। মাহান তার এই দুই গ্রন্থে মুলত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সফল নৌশক্তিধর দেশ গুলির ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন— যে রাষ্ট্র সমুদ্রের ওপর যত বেশি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে সেই রাষ্ট্রই বিশ্ব রাজনীতিতে তত বেশি ক্ষমতার অধিকারী হবে।

মাহান একটি দেশের সমুদ্র শক্তি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ছয়টি শর্তের কথা বলেন—

১) সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান।
২) প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও অনুকূল জলবায়ু এবং উন্মুক্ত উপকূলবর্তী স্থলভাগ, যেখান থেকে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।
৩) বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড।
৪) অধিক জনসংখ্যা যা ভূখণ্ড রক্ষায় সহায়ক।
৫) সমুদ্র ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা।
৬) এমন একটি জাতীয় সরকার যার সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তারের বাসনা ও আগ্রহ রয়েছে।

মাহান তার 'Influence of sea power upon history' গ্রন্থে ব্রিটিশ নৌশক্তির উত্থান এবং সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার ও বাণিজ্যিক প্রগতির ইতিহাসকে বর্ণনা করেন। তার মতে ব্রিটেনের ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে ব্রিটেন উন্মুক্ত একটি রাষ্ট্র যার চারিদিকেই জলরাশি। তিনি উল্লেখ করেন যে বিট্রেনের রয়্যাল নেভি পৃথিবীর সমগ্র গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ যেমন— সুয়েজ খাল, এডেন, আলেকজেন্ড্রিয়া, জিব্রাল্টার প্রণালী, ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর সাগর এছাড়াও ভারত, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং পশ্চিম গোলার্ধে ফকল্যান্ড ও ওয়েস্টইন্ডিজ প্রভৃতি অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তুলে এই সমস্ত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর একাধিপত্য কায়েম করেছিল। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। রাশিয়া সেই সময় আফগানিস্তান ও পার্সিয়ার মধ্য দিয়ে ভারত মহাসাগরে, দক্ষিণ-পূর্বে মাঞ্চুরিয়া হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে এবং সুদূর পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়াতে নিজের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস করেছিল। মাহানের মতে এশিয়া হল ব্রিটিশ নৌশক্তি এবং রাশিয়ান স্থলশক্তির মধ্যে প্রধান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। তিনি মনে করেন নৌশক্তির দ্বারা কেবল মাত্র রাশিয়ার প্রান্তীয় অঞ্চলে আক্রমণ করা যাবে, কিন্তু রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে অবরুদ্ধ করতে হলে ব্রিটিশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রয়াস করতে হবে। এইরকম প্রয়াস আমরা ঠাণ্ডাযুদ্ধ পর্বে NATO ও ANZUS জোটের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করেছি। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রভাব কমতে থাকে এর পাশাপাশি অপর দিকে জার্মানির সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পর্বে মাহান তার বিশ্ব ক্ষমতার ধারণাকে সংশোধন করেন ও রাশিয়ার বদলে জার্মানকে ভবিষ্যতের বিশ্ব স্থলক্ষমতা হিসাবে বিবেচনা করেন। তিনি মনে করেন জার্মান শিল্প, কলকারখানা, রেল যোগাযোগ ও বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি লাভ করেছে এবং জার্মানের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সামরিক ও বাণিজ্যিক আদান প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মতে স্থলশক্তি হিসাবে জার্মানের বিস্তার ঘটলেও নৌশক্তি রূপে জার্মান কখনোই সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না তার প্রধান কারন হল জার্মানির ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা। ব্রিটেনের মতো উন্মুক্ত জলরাশি জার্মানির নেই, জার্মানের কেবল মাত্র উত্তরে উন্মুক্ত জলরাশি রয়েছে এবং জার্মানি সেনাকে আটলান্টিক মহাসাগরে পৌঁছাতে হলে ব্রিটেনের চোক পয়েন্ট উত্তর সাগর এবং ইংলিশ চ্যানেলে প্রবেশ করতে হবে আর এই অঞ্চল গুলিতে ব্রিটেনের একাধিপত্য কায়েম রয়েছে। তবে জার্মান যদি এই অঞ্চলে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভিকে পরাজিত করতে পারে তাহলে সে সমগ্র ইউরোপ তথা গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে। মাহানের এই তত্ত্ব অনুযায়ী দুই বিশ্বযুদ্ধেই আমরা দেখেছি এই অঞ্চলে নৌশক্তিধর ব্রিটেনের সাথে স্থলশক্তিধর জার্মানির যুদ্ধ হয়েছে। মাহানের মতে জার্মানের সম্মুখে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সুদূর ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ব্রিটেনকে জোট করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভৌগোলিক অবস্থানের কারনে বিশ্ব রাজনীতির সুবিধাজনক একটি অঞ্চলে রয়েছে। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত এলাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আর এই উন্মুক্ত অঞ্চলে অবস্থানের কারনে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে সংযোগের বিশেষ সুবিধা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। তাই মাহান মনে করেন ভৌগোলিক অবস্থান, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিপুল সামরিক শক্তিতে বলীয়ান আমেরিকা যে কোনো মূহুর্তে ইউরেশিয়াকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। আর তার এই অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ব্রিটেনসহ সম্পূর্ণ মিত্রশক্তি যুদ্ধ সরঞ্জাম থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী প্রেরণ সমস্ত ক্ষেত্রেই মার্কিন মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল।

৩. উপদ্বীপীয় শক্তির ধারণা:

৩.১ নিকোলাস জন স্পাইকম্যান (Nicholas John Spykman, ১৮৯৩-১৯৪৩):

নিকোলাস স্পাইকম্যান ছিলেন আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বাস্তববাদী তত্ত্বের একজন প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মাহানের সমুদ্রশক্তি ও ম্যাকাইন্ডারের স্থলশক্তির ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং এই দুই তত্ত্বের সমালোচনার মধ্য দিয়ে তার উপদ্বীপীয় শক্তির ধারণা উপস্থাপন করেন। তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় ভূগোলের জ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন যে বিদেশ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাদান হল সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান। স্পাইকম্যান তার তত্ত্বে ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে তিন প্রকার রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন—

প্রথমত, আবদ্ধ রাষ্ট্র (Land locked states) যেমন— আফগানিস্তান, সুইজারল্যান্ড, নেপাল, প্রভৃতি রাষ্ট্র।
দ্বিতীয়ত, দ্বীপ রাষ্ট্র (Island states) যেমন— ব্রিটেন, জাপান, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র।
তৃতীয়ত, উপকূলবর্তী রাষ্ট্র (Coastal States) যেমন— ভারত, পাকিস্তান, ইরান, ইতালি প্রভৃতি রাষ্ট্র।

স্পাইকম্যান ১৯৪২ সালে তার লেখা 'America's strategy in world politics: The United States and the balance of power' গ্রন্থে ম্যাকাইন্ডারের পৃথিবীর বিভাজনকে গ্রহণ করেন এবং তার তত্ত্বে এর ভিন্ন নামকরণ করেন— প্রথমত, হৃদভূমি (Heartland), দ্বিতীয়ত, অন্তর্বেষ্টনী যার তিনি নামকরণ করেন রিমল্যান্ড (Rimland), তৃতীয়ত, বহির্বেষ্টনী যার নামকরণ করেন দূরবর্তী দ্বীপ ও মহাদেশ (offshore island and continents) এর মধ্যে রয়েছে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ, ব্রিটেন, জাপান এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল (উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা) যা তিনি নতুন বিশ্ব বা new world বলে উল্লেখ করেন। ম্যাকাইন্ডার তার হৃদভূমির তত্ত্বে যে অন্তর্বেষ্টনীর উল্লেখ করেছিলেন অর্থাৎ ইউরোপ এবং এশিয়ার যে অঞ্চল হৃদভূমিকে বেষ্টন করে রয়েছে সেই অঞ্চল হবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় এক অঞ্চল বা 'Zone of inactivity' পক্ষান্তরে নিকোলাস স্পাইকম্যান তার ভূরাজনৈতিক তত্ত্বে ইউরোপ এবং এশিয়ার এই অঞ্চলকে রিমল্যান্ড বলে অভিহিত করেন এবং তিনি এই অঞ্চলকে অধিক সক্রিয় অঞ্চল বা 'Zone of activity' বলে উল্লেখ করেন।

তার মতে স্থলশক্তি সম্পন্ন হৃদভূমি এবং সামুদ্রিক শক্তিসম্পন্ন বহির্বেষ্টনীর মধ্যবর্তী রিমল্যান্ড হল বিস্তীর্ণ নিরপেক্ষ এক অঞ্চল আর এই অঞ্চলই ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূখ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। তিনি রিমল্যান্ডকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তার কারন হল এই অঞ্চলের অবস্থান, জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামুদ্রিক যোগাযোগ এবং শিল্প ও উৎপাদনের উন্নতি। তিনি মনে করেন কোনো একক শক্তি দ্বারা রিমল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, স্থলশক্তি ও সমুদ্র শক্তির মিলিত প্রচেষ্টায় রিমল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে ইউরেশিয়াতে রিমল্যান্ড অঞ্চলের ওপর আধিপত্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই নৌশক্তি ও স্থলশক্তিধর রাষ্ট্র গুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হয়েছে। এই রিমল্যান্ড অঞ্চলে রাশিয়া তথা কোনো একক শক্তি যাতে একাধিপত্য কায়েম করতে না পারে তার জন্য এখানে প্রতিযোগিতা হয়েছে এবং ব্রিটেনের দ্বারা ক্ষমতা ভারসাম্য তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্পাইকম্যানের উল্লেখযোগ্য উক্তি হল 'যে রিমল্যান্ডকে শাসন করবে সে ইউরেশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে, যে ইউরেশিয়াকে শাসন করবে সে সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে' (The Geography of Peace by Nicholas J. Spykman, 1944, pp. 126)। তিনি স্থলশক্তি ও নৌশক্তি দুটিকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে তার তত্ত্ব রচনা করেন। তার মতে আধুনিক কালে একক শক্তি দ্বারা কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয় স্থল ও নৌশক্তির মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই একটি রাষ্ট্র বিশ্বে আধিপত্য গড়ে তুলতে পারে।

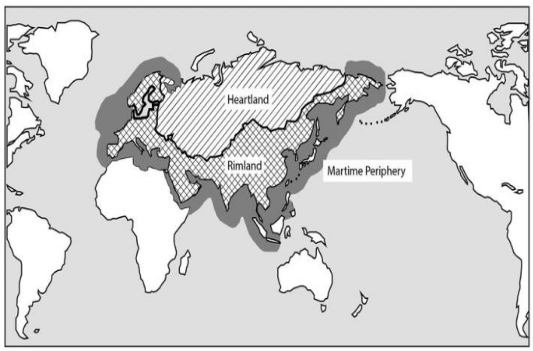

ম্যাকাইন্ডারের হৃদভূমি ও স্পাইকম্যানের রিমল্যান্ড, চিত্র – ০৩

(Source: https://www.researchgate.net/figure/Spykmans-rendition-of-Mackinders-World-Island-from-The-Geography-of-the-Peace_fig3_344819817 accessed on 10 Sep 25)

ভূরাজনীতির আলোচনায় এ সকল তাত্ত্বিকদের পাশাপাশি হেনরি কিসিংগার (Henry Kissinger), জেবিগ্নিউ ব্রেজেন্সকি (Zbigniew Brazezinski), জর্জ কেন্নান (George F. Kennan) প্রমূখ তাত্ত্বিকগণ আধুনিক কালে ভূরাজনীতির তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন। তবে সাবেকি ভূরাজনীতির তত্ত্বে এসমস্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিস্থিতি বা ভৌগোলিক অবস্থানকেই একামাত্র মানদণ্ড হিসাবে তাত্ত্বিকরা বিবেচনা করেছেন কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চরিত্রের বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। ভৌগোলিক উপাদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রের অর্থনীতি, বিদেশ নীতি, কূটনীত, প্রাযুক্তিক কলাকৌশল, উৎপাদন ক্ষমতা, সামরিক সম্ভার প্রভৃতি বিষয় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ও আধিপত্য বিস্তারের পথকে প্রশস্ত করে। Aerial Warfare বা আকাশপথে যুদ্ধ কৌশল, পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রের আবিষ্কার আজ ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতাকে দূর করেছে। সাবেকি ভূরাজনীতির এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করে কিছু তাত্ত্বিক ভূরাজনীতির নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন যা 'Criitical Geopolitics' বা 'সমালোচনাধর্মী ভূরাজনীতি' নামে পরিচিত আবার অনেকে একে 'উত্তর আধুনিক ভূরাজনীতির তত্ত্ব' বলেও উল্লেখ করেন। হেনরি লেফেভরে (Henri Lefebvre), ডেভিড হার্ভে (David Harvey), জন অ্যাগ্নিউ (John Agnew), স্টুয়ার্ট করব্রিজ (Stuart Corbridge), সাইমন ডলবি (Simon Dalby), জিরার্ড টোল (Gerard Toal) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ সবেকি ভূরাজনীতির যে 'Space বা স্থান' কেন্দ্রিক সনাতনী ব্যাখ্যা তা থেকে বেরিয়ে এসে তারা এই 'স্থানের' বহুত্ববাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাদের মতে 'স্থানের' ধারণা ব্যাক্তি উপলব্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ১৯৯৮ সালে অ্যাগ্নিউ তার 'Geopolitics; revisioning world politics' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে সাবেকি ভূরাজনীতির প্রবক্তারা সমগ্র বিশ্বকে একটা 'চিত্র' হিসাবে কল্পনা করেছেন এবং নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের নিরিখে ভূরাজনৈতিক তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছেন। তার মতে সাবেকি তত্ত্বের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত রাজনীতি রয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে নিজ জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করার। তাই তিনি মনে করেন যে একটি মানচিত্রের ওপর ভিত্তি করে সমগ্র বিশ্ব রাজনীতির সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা কখনোই সম্ভব নয়। সমালোচনাধর্মী ভূরাজনীতির তাত্ত্বিকগণ ভূরাজনীতিকে বিদেশ নীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার নিরিখে এবং সাহিত্য ও ডিসকোর্স (Discourse) বা ভাষাশৈলীর মধ্য দিয়ে আলোচনার প্রয়াস করেন। ডিসকোর্স যেমন— বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, মানচিত্র, নথিপত্র, গণমাধ্যমের প্রতিবেদন, চলচ্চিত্র, রাষ্ট্রপ্রধানদের বক্তৃতামালা প্রভৃতি বর্তমান ভূরাজনীতির ব্যাখ্যায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। বিষয়বস্তুগত আলোচনার ভিন্নতার কারনে সমালোচনাধর্মী ভূরাজনীতির মধ্যেও বিভিন্ন ধারা গড়ে উঠেছে যেমন— জনপ্রিয় ভূরাজনীতি (Popular Geopolitics), কাঠামোগত ভূরাজনীতি (Structural Geopolitics), প্রায়োগিক ভূরাজনীতি (Practical Geopolitics), নিয়মনিষ্ঠ ভূরাজনীতি (Formal Geopolitics) অর্থাৎ সবেকি ভূরাজনীতির যে তাত্ত্বিক কাঠামো ও আলোচনা পদ্ধতি তা থেকে বেরিয়ে এসে এসমস্ত তাত্ত্বিকগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে ভূরাজনীতিকে চর্চা করেছেন এবং ভূরাজনীতির আলোচনাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন।

References:

1. Agnew, John. Geopolitics: re-visioning world politics. Second edition, Routledge, London, 2003.
2. Banerjee, Jyotirmoy. Strategic Studies. Allied publishers limited, Kolkata, 1998.
3. Cohen, Saul Bernard. Geopolitics: the geography of international relations. Second edition, Rowman & Littlefield, New York City, 2009.
4. Dodds, Klaus. Classical geopolitics revisited. Oxford Research Encyclopedia of International Studies, 2010. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.379
5. Gokmen, Semra Rana. Geopolitics and the study of international relations. School of Social Scienes, Middle East technical university, 2010. https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12612289/index.pdf
6. Kelly, Phil. Rescuing Classical Geopolitics Separating Geopolitics from Realism. International Institute for Global Analyses, 2019.
7. Mackinder, Halford. J. The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal, vol. 23, 1904, pp. 421-437. http://www.jstor.org/stable/1775498
8. Mahan, Alfred Thayer. Retrospect and Prospect: Studies in International Relations Naval and Political. University Press, Jhon Wilson & Son, Cambridge, U.S.A, 1902.
9. Waltz, Kenneth. Theory of Internatonal Politics. Waveland press, U.S.A. 1979, pp. 120-122.
10. Zhiding, Hu, and Dadao, Lu. Re-interpretation of the classical geopolitical theories in a critical geopolitical perspective. Journal of Geographical Sciences. 26, 2016, pp. 1769–1784. https://doi.org/10.1007/s11442-016-1357-1

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 442- 449
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.226

জ্ঞান সাধনা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও প্রচার-প্রসারে উবায়দুল হক (রহ.)-এর ভূমিকা

মোঃ কামাল উদ্দিন, *প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আতাকরা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, লাকসাম, কুমিল্লা বাংলাদেশ*

Received: 10.10.2025; Accepted: 11.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Those who have acquired mastery in their own language and have contributed to Islamic education by acquiring mastery in Arabic literature and Qur'an Hadith and Islamic science among the few Muslim scholars in Bangladesh Maulana Ubaidul Haque Jalalabadi (R.) is one of them. For the purpose of the donation program for the wide spread and promotion of education He chose the teaching as noble profession and devoted himself to this profession. After completing his studies at Darul Uloom Deoband, he came to Dhaka to and started teaching at Dhaka's Bara Katra Hosania Ashraful Uloom Madrasah. Maulana Ubaidul Haque (R.) spoke out against fraud of the East India Company. He insisted the importance of acquiring Islamic education to keep the East India Company alert in this regard by portraying deception scenario to the nation and he inspired the Bengali nation to observe Islamic education and culture. He studied the book regularly and used to write new Khutba in Arabic on Fridays and Eids. He was honest and brave. He used to give contemporary speeches in Khutba. He did not care about anyone. Maulana Ubaidul Haque (R.) was honored by various national and international organizations and institutions during his half-century-long career. His thoughts and actions on religion and education will give inspiration to people of all classes.

Keywords: Pursuit of knowledge, expansion of education, religion, basic education, Islamic culture

প্রত্যেক জাতি, গোষ্ঠী, সমাজ ও দেশে যুগে যুগে বহু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা প্রকৃতিগতভাবেই আর্বিভূত হন জাতীয় চিন্তা-চেতনা বিকাশের কর্ণধার, জাতীয় সংহতি ও এর ভিত্তি সুদৃঢ় করার চিন্তানায়ক হিসেবে। বাংলাদেশে যে ক'জন মুসলিম মনীষী নিজস্ব ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করার সাথে সাথে আরবী ভাষায় সাহিত্য ও কুরআন হাদীস তথা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পান্ডিত্য অর্জন করে ইসলামী শিক্ষায় অবদান রেখে গেছেন, তন্মধ্যে ঢাকা আলীয়া মাদরাসার ভূতপূর্ব মুহাদ্দিস মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী (র) অন্যতম। বহু গুণেগুণান্বিত, বহু বিশেষণে বিশেষিত এ মহান ব্যক্তি একাধারে ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, সমাজ সংস্কারক, জাতীয় সংকটে সর্বশ্রেণির মানুষের ভরসাস্থল ও ধর্মীয় ব্যাপারে কারো অনুরাগ-বিরাগের পরোয়া না করে সত্যের উচ্চারণে সঠিক সিদ্ধান্তে দ্ব্যর্থহীন। বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ কৃতিত্বের এই মহান জ্ঞান-সাধক জীবনের প্রতিটি অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করে মুসলিম সমাজের নিকট যে অগাধ কীর্তি রেখে গেছেন তার বিচার বিশ্লেষণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা যুগাবে। এ মনীষী জ্ঞান সাধনা, শিক্ষা বিস্তার, ধর্ম প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামী সংস্কৃতির

বির্ণিমাণে যে অতুলনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা উপস্থাপন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করাই আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য।

সমকালীন শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, বিরল প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী মাওলানা উবায়দুল হক (র.) ২ মে ১৯২৮ খৃ. মোতাবেক ১৩৩৫ ব. ১৪ বৈশাখ শুক্রবার[১] সিলেট শহর থেকে প্রায় ৭৪ কি.মি. দূরে কুশিয়ারা নদীর কূল ঘেঁষে গড়ে উঠা ঐতিহ্যবাহী গ্রাম বারোঠাকুরিতে[২] জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবের সাতটি বছর বাড়িতে বাবা-মার সাথে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। অষ্টম বর্ষে পিতা তাঁকে মাদরাসায় প্রেরণ করেন। শৈশবেই পিতা-মাতার কাছে তাঁর হাতে খড়ি হয়। অতপর তাঁর পিতা তাঁকে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করান। মোটকথা মাওলানা উবায়দুল হকের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় নিজ বাড়িতে পিতার কাছে। এরপর তিনি সিলেটের বিয়ানিবাজার থানাধীন মাওলানা আশরাফ আলী থানভি (১৮৫৭-১৯৩৯খৃ:) (র.)- এর খলীফা মাওলানা আতহার আলী (র.) প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে চলে যান। তথায় তিনি মাওলানা শামসুল হক শাহবাগী (র.)- এর নিকট ফার্সি-ভাষা, সাহিত্য, 'কারিমা পান্দেনামা' ও মিজান মুনশাইব ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি হবিগঞ্জে মাওলানা মুদাসসির ও মাওলানা মুন্সির আলী (র.)– এর কাছে গিয়ে কিছুদিন প্রাইভেট লেখাপড়া করেন।[৩] তাঁরা উভয়ে ছিলেন দেওবন্দ থেকে উত্তীর্ণ বিশিষ্ট আলিম। অতপর মাওলানা উবায়দুল হক (র.) পিতার প্রতিষ্ঠিত মুনশী বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত আয়ারগাঁও মাদরাসায় কিছুকাল পড়াশুনা করেন।

মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে[৪] গমন করেন এবং ১৯৩৪ সালে কাফিয়া জামাতে ভর্তি হন। তিনি দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রেকর্ড পরিমান নম্বর লাভ করে দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস খ্যাতি অর্জন করেন।[৫] হযরত মাওলানা উবায়দুল হক (র.) হিজরী ১৩৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে হাদীস, ১৩৬৭-১৩৬৮ শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে তাফসীর এবং ১৩৬৮-১৩৬৯ শিক্ষাবর্ষে ফনূনাতের কিতাব হেদায়া আখেরাইন, কাযী মুবারক, সদরা, তাসরীহ, উকলীদাস ও তাওযী ইত্যাদি কিতাব অধ্যয়ন করেন। তিনি যাদের নিকট শিক্ষা ও জ্ঞানের গভীরতায় বিমুগ্ধ হয়ে এক বিজ্ঞ ও দক্ষ আলেম হিসেবে গড়ে উঠেন এবং যাদের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসিন শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ হোসাঈন আহম্মদ মাদানী, আল্লামা ইব্রাহীম বালিয়াবি, আল্লামা এজাজ আলী আমরুহি, আল্লামা ফখরুল হাসান, আল্লামা আব্দুশ শুকূর দেওবন্দী, হাফেজ আব্দুল জলীল, মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ. মাওলানা আব্দুল খালেক, মিয়াজি মুহাম্মদ সাঈদ গাঙ্গোহি, হাবিবুল্লাহ বিহারি (র.) প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য[৬] দারুল উলূম দেওবন্দে তাঁর যে সব সহপাঠী ছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন মাওলানা সাইয়েদ আসআদ মাদানী, মাওলানা সালেম কাসিমী, মাওলানা অহীদুয যামান কীরানবী, মাওলানা মুহাম্মদ তাহের (কলিকাতা), মাওলানা হামেদ মিয়া, মাওলানা আবুহাসান, মাওলানা মোহাম্মদ মুস্তফা আজমী, শায়খুল হাদীস মরহুম মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমেদ কুমিল্লায়ী, মাওলানা আবুল হাসান যশোরী, মাওলানা নূরুল ইসলাম চাটগামী, মাওলানা রহমতউল্লাহ সিলেটী, মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ কাসিমী বিহারী ও মাওলানা আনওয়ারুল হক কাসিমী প্রমূখ।

---

[১] সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, (মাওলানা আব্দুর রহীম ইসলামাবাদী, লিখিত প্রবন্ধ-অনন্য ব্যক্তিত্ব খতীব মাওলানা উবায়দুল হক) স্মরণ সংখ্যা বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২৬,২০০৭ পৃঃ২১।

[২] বারোঠাকুরির নামকরণ প্রসঙ্গে গবেষকরা গায়েবী দিঘিতে প্রাপ্ত শিলালিপির কথা বলে থাকেন। এই গ্রামের গায়েবী দিঘির কারামতির কথা এখনও স্থানীয় মুরুব্বিদের মুখে শোনা যায়। যেমন, এখনো অনেকে বিশ্বাস করেন যে, গ্রামের দরিদ্র মানুষের কোনো অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে হাড়ি-পাতিল প্রয়োজন হলে তা গায়েবি দিঘি থেকে পাওয়া যেতো। অনুষ্ঠান শেষে তা দীঘির পাড়ে রেখে দিলে আবার চলে যেতো। আরো জানা যায় এ গ্রামে একসময় হিন্দু-বৌদ্ধ বারোজন ঠাকুরের বসতি ছিলো। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে এই অঞ্চলের এ বারোজন বৌদ্ধ ঠাকুর এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে এই গ্রামের নাম বারোঠাকুরি। সৈয়দ মবনু, মাওলানা উবায়দুল হক জীবন কর্ম, সালেহীয়া পাবলিকেশন্স, রে প্রিন্টার্স ঢাকা ২০০৮ পৃ.০২)

[৩] জুবাইর আহমদ আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত, আকাশ ছোঁয়া মিনার, (মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী লিখিত প্রবন্ধ-আমার জীবনের একটি অধ্যায়) খতীব (রহ) স্মরণে মাদরাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুর, ঢাকা ২০০৮, পৃ.১৪।

[৪] দারুল উলূম দেওবন্দ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

[৫] জুবাইর আহমদ আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত, আকাশ ছোঁয়া মিনার, (মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী লিখিত প্রবন্ধ-আমার জীবনের একটি অধ্যায়), খতীব (রহ) স্মরণে মাদরাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুর, ঢাকা ২০০৮, পৃ.১৪।

[৬] প্রাগুক্ত-পৃ.২২

শিক্ষা সমাপ্ত করে জাতির সার্বিক অধঃপতন লক্ষ্য করে মাওলানা উবায়দুল হক (র) প্রথমেই ইসলামী শিক্ষার আলো বিস্তারকেই সবার্ধিক প্রাধান্য দেন। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও প্রচারের দানের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নিয়ে এ পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশোনা শেষে ঢাকাস্থ বড় কাটরা হোসানিয়া আশরাফুল উলূম মাদরাসায় মুহতামিম হযরত মাওলানা আবদুল ওহাব পীরজী হুযুরের আগ্রহে এবং দারুল উলূম দেওবন্দে খ্যাতিমান উস্তাদগণের পরামর্শে বড় কাটরা মাদরাসায় শিক্ষকতার জন্য ঢাকায় আগমন করেন। এ মাদরাসায় তিনি হিজরী ১৩৭৯ থেকে ১৩৮২ পর্যন্ত বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ ও বায়যাবী শরীফ প্রভৃতি কিতাব পড়ান। হযরত পীরজী হুযূর এক পত্রে মাওলানা উবাদুল হকের তৎকালীন শিক্ষকতার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেন। তিনি শিক্ষকতার চতুর্থ বছর হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে বোম্বাই পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে সে বছর তাঁর হজ্ব করা হয়নি। অবশেষে তিনি শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাঈন আহমদ মাদানী ও শায়খুল আদব হযরত মাওলানা এজাজ আলীসহ অন্য উস্তাদগণের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে দেওবন্দে গমন করেন। হযরত শায়খুল আদব তাঁকে উত্তর প্রদেশেস্থ শাহাজানপুরের এক মাদরাসায় শিক্ষকতার জন্য পাঠিয়ে দেন। সেখানে কিছু দিন শিক্ষকতা করার পর হযরত শায়খুল আদব এজাজ আলী তাঁকে ডেকে পাঠান। অত:পর তাঁকে হযরত মুফতী শফী সাহেব প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে করাচীর দারুল উলূম মাদরাসায় পাঠানো হয়। তিনি সেখানে শিক্ষাবর্ষ ১৩৭৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৩ সনে আবূ দাউদ শরীফ ও হেদায়া আখেরাইন ইত্যাদি কিতাব অধ্যয়ন করেন। সে সময়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির প্রচার সম্পাদক নিযুক্ত হন। পশ্চিম পাকিস্তানে তখন নেজামে ইসলাম পার্টির মধ্যে একটি চেতনামুখর পরিবেশ গড়ে উঠে।[৭] অতপর ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা আলীয়া মাদরাসা সিনিয়র শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ক্রমান্বয়ে প্রভাষক, পরে সহকারী অধ্যাপক (তাফসীর), তারপর এডিশনাল হেড মাওলানা এবং হেড মাওলানা পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ২ মে ১৯৮৫ সালে মাদরাসা-ই-আলীয়ার শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৮] দীর্ঘ সময়ের শিক্ষকতা জীবনে তাঁর নিকট অনেক জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থী ইসলামী শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শিষ্যের সংখ্যা কত তা নির্ণয় করা দুরহ্। তাঁর বিশেষ কয়েকজন শিষ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- আল্লামা মুহাম্মদ তক্বী ওসমানী (সাবেক চিফ জাস্টিস, পাকিস্তান), আল্লামা মুহাম্মদ রাফী ওসমানী (মুহতামিম, দারুল উলূম করাচি) মাওলানা নুরুল ইসলাম (সাবেক মন্ত্রী), মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (সাবেক শিল্পমন্ত্রী), ড.এ.কে.এম মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক ড.আ খ ম ওয়ালি উল্লাহ (সাবেক ডিন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), ড. আনোয়ারুল কবীর (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), ড. সুলাইমান (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া) প্রমূখ। ১৯৮৪ সালে ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদরাসার হেড মাওলানা থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতিব পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি জাতীয় মসজিদের এই মেহ্রাবকে পরিণত করে তুলেছিলেন বিবেক ও অভিভাবকের এক আস্থার মঞ্চ ও দৃঢ়তাপূর্ণ মসনদে।[৯] প্রায় দুই যুগেরও বেশী সময় উক্ত পদে আসীন ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দিতে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে সৌদি আরব, মিশর, ইরাক, ইরান, কুয়েত, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরক্কো, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া. সিঙ্গাপুর, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন।[১০] শিক্ষকতাকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক সকলেরই তিনি ছিলেন প্রিয়পাত্র।[১১] হজরতের ছেলে মাওলানা শহিদুল হক বলেন-

---

[৭] এজিএম জয়নাল, পারিবারিক জীবনে খতীব (র) আল্লামা খতীব স্মরণ সভা বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, জাকিগঞ্জ, সিলেট, ১৪ জানুয়ারী ২০০৮, পৃ.৪৫-৪৬।

[৮] জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত, প্রথম খতীব মাওলানা আব্দুর রহমান বেখুদ (১৯৬৩-১৯৬৪)।

[৯] সপ্তাহিক মুসলিম জাহান, (মাওলানা রুহুল আমিন খান, জাতীয় খতীব মাওলানা উবায়দুল হক রহ লিখিত প্রবন্ধ- মাওলানা উবায়দুল হক (রহ), স্মরণ সংখ্যা বর্ষ-১৭, সংখ্যা- ২৬,২০০৭, পৃ.-৫০।

[১০] সপ্তাহিক মুসলিম জাহান, (ড. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন লিখিত প্রবন্ধ-খতীব মাওলানা উবায়দুল হক (রহ) সময়ের নির্ভীক কণ্ঠস্বর), স্মরণ সংখ্যা, বর্ষ-১৭, সংখ্যা-২৬, ২০০৭, পৃ.৩৯।

[১১] সপ্তাহিক মুসলিম জাহান, (মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, লিখিত প্রবন্ধ- সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা রাখতেন) স্মরণ সংখ্যা, বর্ষ-১৭, সংখ্যা-২৬, ২০০৭, পৃ.১১।

"আব্বা আমাদেরকে থানভি (র) কিতাব থেকে বলতেন, মানুষ দুনিয়াকে যতো ছোটো বা সংক্ষিপ্ত মনে করবে তাতে সে অনেক আনন্দ অনুভব করবে এবং এই নশ্বর পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই অতি তুচ্ছ বলে মনে হবে।"[১২]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আধুনিক শিক্ষা (পাশ্চাত্য শিক্ষা) বিস্তারে মনোনিবেশ করে মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্য ঢঙ্গের কালচারে অণুপ্রবেশ ঘটায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের চেতনাকে মুসলমানদের কাছ থেকে পৃথক করে ফেলা।[১৩] মাওলানা উবাদুল হক (র.) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এহেন প্রতারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। জাতির কাছে প্রতারণার চিত্র তুলে ধরে এ ব্যাপারে তাদেরকে সজাগ রাখতে ইসলামী শিক্ষা অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। আর বাঙ্গালী জাতিকে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি এর অংশ হিসেবে হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়নের গুরুত্ব বুঝাতে প্রচেষ্টা চালান। হাদীসের সনদ[১৪] মতন[১৫] আসমাউর রিজাল[১৬] জারাহ[১৭],তা'দীল[১৮] প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নিরঙ্কুশ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ধর্ম প্রচার ও প্রসারে উবায়দুল হক (র)- যে ভূমিকা রেখেছেন বিভিন্ন লেখনি তার মধ্যে অন্যতম। তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে:

- আজহারুল আজহার শরহে নুরূল আনওয়ার। এটি নুরূল আনওয়ারের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ, টীকা-টিপ্পনি। ভূল সংশোধন ও প্রয়োজনীয় উদাহরণ দলীল-প্রমাণর মাধ্যমে অত্যন্ত চমৎকারভাবে এ গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত হয়েছে।
- নাশরুল ফাওয়া'ইদ খোলাসায়ে শারহিল আকা'ইদ: এটি শরহে আকাইদের সারসংক্ষেপ।
- আস-সেকায়া আশ-শারহিলবেকায়াঃ ফিকহ্শাস্ত্রের উপর এটি একটি অনুবাদগ্রন্থ।
- তারিখে ইসলামঃ দুই খন্ডে সমাপ্ত কিতাবখানা ইসলামের এক পরিপূর্ণ ইতিহাস। প্রথম খন্ড ৩৮০ পৃষ্ঠা, ২য় খন্ড ৫৮৭ পৃষ্ঠা।
- সিরাতে মোস্তফাঃ মহানবী (সঃ) এর জীবনী গ্রন্থ।
- তাহসীলুল কাফিয়াঃ আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র।
- কোরাআনে হাকিম আওর হামারি জিন্দেগিঃ এটি একটি রেডিও কথিকার সংকলন বা সমষ্টি।

হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও তিনি লেখালেখির মতো চিন্তাশীল ও সময় সাপেক্ষ পথে দ্বীনি খেদমত করে অমর হয়ে রয়েছেন। এমন সৌভাগ্যশীল মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশী জন্মায়নি।[১৯] তিনি এক অনুপম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সারাটি জীবন "দাঈ ইলাল্লাহ্'র কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখে ছিলেন। পারিবারিক সূত্র থেকে এক তথ্যে জানা যায়, হযরত হাফেজ্জি হুজূর (র.) তাঁকে বায়'আত ও খিলাফত দান করেছেন।[২০] তবে তিনি হাফিজ্জী হুজূরের খলীফা ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[২১]

---

[১২] আশরাফ আলী থানবী, মালাকাতে হেকমত কে আবী তা'বি ইবাদাতি তালিকাতে আশরাফিয়াহ মাকতাবা উসমানিয়া দিল্লী, ১৯৫৬, পৃ.৭৬.

[১৩] ড. আব্দুল করীম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ.-১৫০)

[১৪] হাদীস র্বণনাকারীর ধারাবাহিকতা সনদ নামে অভিহিত। মাওলানা নূর হোসেন আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা, এমদাদিয়া প্রেস-১৯৭৫) পৃ.-৩ ২য় মুদ্রণ।

[১৫] সনদ বর্ণনা করার পর যে মূল হাদীসটি উল্লেখ করা হয় তার নাম মতন।

[১৬] হাদীস বর্ণনাকারীর সমষ্টি রিজাল নামে অভিহিত। যে শাস্ত্রে বর্ণনাকারীগণের জীবন ইতিহাস আলোচনা করা হয় তার নাম রিজাল শাস্ত্র। নূর হোসেন আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা, এমদাদিয়া প্রেস-১৯৭৫ ২য় মুদ্রন), পৃ.৪।

[১৭] এমন বিশেষ জ্ঞান যার দ্বারা বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করে হাদীস বর্ণনাকারীর সমালোচনা করা হয়। (মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ইসলামী ফাউন্ডেশন-১৯৮৬) পৃ.-৫৭০।

[১৮] তা'দীল শব্দের অর্থ সামঞ্জস্য বিধান করা। পরিভাষায় বর্ণনাকরীগণের পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান করার পদ্ধতির নাম তা'দীল। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত.-পৃ.-৫৭২।

[১৯] জুবাইর আহমদ আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত, আকাশ ছোঁয়া মিনার, (মাওলানা উবায়দুল হক রহ লিখিত প্রবন্ধ, আমার জীবনে একটি অধ্যায়), খতীব (রহ) স্মরণে মাদরাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুর, ঢাকা ২০০৮, পৃ-৬০-৬১।

[২০] সপ্তাহিক মুসলিম জাহান, (মাওলানা মহীউদ্দিন রব্বানী লিখিত প্রবন্ধ-উবায়দুল হক সাহেব স্মৃতির আয়নায়), স্মরণ সংখ্যা বর্ষ-১৭, সংখ্যা- ২৬, ২০০৭, পৃ.-৫২।

[২১] সৈয়দ মবনু, মাওলানা উবায়দুল হকের জীবন কর্ম সালেহীয়া পাবলিকেশন্স, রে প্রিন্টার্স ঢাকা ২০০৮, পৃ. ১৭-১৮।

খ্যাতিমান লেখকদের রচিত গ্রন্থ ও তাদের প্রজ্ঞাগত দৃষ্টি ভঙ্গির উপর তাঁর অনেক পড়াশোনা ছিল। যে কারণে কোনো শরী'আত বিষয়ে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। দীর্ঘ ২৩ বছর জাতীয় মসজিদের খতীব হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর প্রতিটি খুতবাই ছিল জাতির জন্য দিক নির্দেশনামূলক এক নতুন খোরাক। ভক্ত অনুরক্তদের দৃষ্টিকটু কোনো আচরণ ধরাপড়লে তিনি তাৎক্ষণিক সংশোধন করতে দ্বিধা করতেন না। যে কোন মানুষকে আপন করে নেয়ার গুণ ছিলো তাঁর সহজাত।[২২] তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা ও পরিচালক। তিনি প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়বস্তু সর্বদা গুছিয়ে রাখতেন। সাধারণ মুসল্লিদের সুবিধার্থে জুমার নামাজের পর সময় দিতেন, বিশিষ্টজনদের কথা বা প্রশ্নাবলি অতিগুরুত্বের সাথে শুনতেন এবং সঠিক ও সহজ ভাষায় জবাব দিতেন।[২৩] তিনি তার সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে কখনো বিবৃতি দেননি। সমালোচনার জবাবে সমালোচনাও করেননি। তাঁর অফিসে বা বাসায় কেউ গেলে তিনি যথোপযুক্ত সম্মান দিতেন। খতীব সাহেবের জীবনের সর্বশেষ দুটি বড় কৃতিত্ব হলো-১. আকিদায়ে খতমে নবূওয়াতের হেফাজত আন্দোলনের নেতৃত্বদান, ও ২. ইসলামী ব্যাংক ও বীমার ধারণা জাতির সামনে তুলে ধরা।

ইসলামী শিক্ষা মুসলমানদের মৌলিক শিক্ষা। ওয়াহীর মাধ্যমেই ইসলামী শিক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত[২৪] আরবী ভাষা-শিক্ষায় যে সব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তন্নধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি হল। (১) তারঁবীয়া, (২) ত'ালীম (৩) তাদবীর (৪) ত'াদীব (৫) তাদরীস।[২৫]

ইসলামী শিক্ষার তিনটি মৌলিক বিষয় ১. আল-কুরআন ২. আল-হাদীস ৩. আল-ফিকহ। খতীব (র) উল্লেখিত বিষয়সমূহের প্রতি গভীর আগ্রহ পোষণ করতেন এবং এ বিষয়গুলোর বিকাশে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। খতীব সাহেব (র) কুর'আন ও হাদীসের ভিত্তিতে সরকারী ও বেসরকারীভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে আরবি শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে এক সারিতে এনে সকলকেই আর্দশ মানবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা চালান। তাঁর মতে, একজন ধার্মিক লোক ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে।[২৬] ঢাকায় মাদরাসা ফয়জুল উলূম একটি বেসরকারী অবৈতনিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এটি সঠিক ইসলামী শিক্ষা প্রসারে রত থেকে দীনের হেফাজত এবং সহীহ্ ইসলামী আকীদা প্রতিষ্ঠায় নিবিষ্ট ও ভূমিকা পালন করে আসছে। মাওলানা আবদুল্লাহ্ (র)-এর হাতে ১৩৯৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৫ ঈসায়ী সনে এ মাদরাসা শুভ সূচনা হয়। ১৯৮৫ সন থেকে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন হযরত মাওলানা উবাদুল হক সাহেব (র)। মাদরাসাটি বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত-এর শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারেও তিনি অবদান রেখেছেন। আর এ জন্য বলতেন তারা যেন বেহেশতী জেওর বেশী বেশী পড়ে। কেননা এতে অনেক বিষয় সহজভাবে কুরআন ও হাদীস দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদেরকে উর্দু বেহেশতী জেওর পড়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জামেয়া দারুল মা-আরিফ আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শূরা কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ্য সদস্য ছিলেন। জামেয়া তাঁর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় ভালোই চলতো। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার উপর তিনি বেশ গুরুত্বারোপ করেন। প্রতিদিন সকাল ৮-১০টা পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিতব্য মৌলিক বা অনুবাদিত কোন কিতাবের সম্পাদনা রিভিউ করতেন অথবা এমদাদিয়া লাইব্রেরীর কোন কিতাব সম্পাদন করতেন। নিয়মিত পত্রিকা পড়তেন। প্রতি বুধবার আসরের সময় তেজগাঁও রেলওয়ে স্টেশন মসজিদে যেতেন এবং বাদ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত কুরআন শরীফের তাফসীর উপস্থাপন করতেন। আজিমপুর ফয়জুল উলূম মাদরাসায় বাদ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত বুখারী শরীফের প্রথম খন্ডের সবক পড়াতেন। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, দারুল উলূম হাটহাজারী, দরগাহ

---

[২২] সপ্তাহিক মুসলিম জাহান (মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম লিখিত প্রবন্ধ স্মৃতির আয়নায় আল্লামা খতীব মাওলানা ইবায়দুল হক রহ) স্মরণ সংখ্যা বর্ষ-১৭, সংখ্যা- ২৬, ২০০৭, পৃ.-৪৭।

[২৩] জুবাইর আহমদ আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত, আকাশ ছোঁয়া মিনার, (মাওলানা আতাউল হক লিখিত প্রবন্ধ- মাওলানা উবায়দুল হক রহ), খতীব রহ. স্মরণে মাদ্রাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুর, ঢাকা-২০০৮, পৃ.- ৩৫০-৩৫১।

[২৪] আল- কুরআন, ৯৬:১

[২৫] ক) তাঁরবীয়া- পালন, লালন পালন করা, পরিচর্যা, শিক্ষাদান (খ) তা'লীম- শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, উপদেশ, নির্দেশাবলী (৩) তাদবীর- প্রশিক্ষন, চর্চা, অনুশীলন, (৪) তাদরীস- পাঠদান, শিক্ষাদান, পড়ানো। উক্ত শব্দগুলো দ্বারা শিক্ষা ও তার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল-ম'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১১শ সংস্করণ, ২০১২। পৃ: ২৬৬, ২৭০, ২৯৩।

[২৬] সপ্তাহিক মুসলিম জাহান, (মাওলানা মহিউদ্দিন রব্বানী লিখিত প্রবন্ধ- উবায়দুল হক সাহেব (রহ)স্মৃতির আয়নায়), স্মরণ সংখ্যা, বর্ষ-১৭, সংখ্যা-২৬, ২০০৭) পৃ.-৫২

মাদরাসা সিলেটসহ বহু কওমী মাদরাসার মজলিসে শুরার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে গেছেন। এছাড়া তিনি জামেয়া ইমদাদিয়া কিশোগঞ্জ ও মাদরাসা কাসেমুল উলূম কুমিল্লার মজলিসে শুরার সভাপতি এবং জাতীয় শরী'আ কাউন্সিলের ছিলেন আজীবন চেয়ারম্যান। একটি বিশেষ মহল যখন এদেশের উলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী দলকে জঙ্গিবাদ হিসেবে রূপায়িত করার চক্রান্ত করেছিল তখন তিনি উলামা ও জনতাকে নিয়ে তা সফলভাবে মোকাবেলা করেন। ২০০৭ সালের পবিত্র রমজান মাসে দৈনিক প্রথম আলোতে মহানবী (সাঃ) ও রমজানের সংযম নিয়ে যে ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন ছাপা হয়, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অবমাননাকারীদের ক্ষমা চাইতে এবং সম্পাদক মতিউর রহমানকে তওবা করতে বাধ্য করেন। তাঁর এ সাহসী ভূমিকা গোটা জাতির নিকট প্রশংসিত হয়। কারো অনুরাগ বিরাগের পরোয়া না করে সাহসিকতার সাথে সত্যের উচ্চারণে তিনি নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল দ্ব্যর্থহীন। ধর্মের নামে অধার্মিক আচরণ ও যে কোন প্রকার হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁর নিরাপস শক্ত অবস্থান তাঁকে জাতীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করে।

তিনি প্রতিদিন নিয়মিত কিতাব অধ্যয়ন করতেন জুমা ও ঈদে নতুন খুতবা নিজে আরবীতে লিখে প্রস্তুত করতেন। তিনি সৎ সাহসী ছিলেন। তিনি খুতবাতে যুগোপযোগী বক্তব্য দিতেন।কারো ও পরোয়া করতেন না। তাঁর সাহসী উচ্চারণের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল:

ক. ১৯৯১ সালে সবদলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপির সাথে জোট বেঁধে ১৮টি আসন নিয়ে মওদূদী চিন্তা ধারার ধারক-বাহক জামায়তে ইসলামী সরকারের সমর্থকদলে পরিণত হয়। বৃহৎ শরীক দল হিসেবে সরকারের উপর তাদের রয়েছে যথেষ্ট প্রভাব। এমনি সময়ে কাদিয়ানীদের প্রকাশিত কুরআন মজীদের অনুবাদ বাতিলের দাবীতে উবায়দুল হক সাহেব (র) জাতীয় প্রেস ক্লাবে ২৮ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এতে একজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, কিছুদিন পূর্বে আরেকটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মওদূদী সাহেবকৃত আল কুরআনের তাফসীরের যে অপব্যাখ্যা রয়েছে আহলে হাদীসরা এ দাবী করেছে, এ বিষয়ে আপনার মতামত কি? উত্তরে তিনি বলেন, দুটোই বিকৃতি। তবে মওদূদী ইসলামের লেজ কেটেছেন আর কাদিয়ানীরা মাথা কেটেছে।

খ. ১৯৬৯-৭০ সালে তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'কুরআনে হাকীম আওর হামারে যিন্দেগী' নামক কুরআন বিষয়ক অনুষ্ঠানে হযরত মাওলানা উবায়দুল হক (র) উর্দু ভাষায় নিয়মিত কথিকা পাঠ করতেন। এ সব কথিকায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাধান প্রদানের চেষ্টা করেছেন।

ইসলাম একটি জীবন দর্শন। এ জীবন দর্শন মানুষের বৃত্তিসমূহ পরিচর্চার ধারা ও পদ্ধতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় তাই ইসলামী সংস্কৃতি।[২৭] খতীব সাহেবের ছেলের ভাষ্য অনুযায়ী 'সিলেটের জাকিগঞ্জ বারোঠাকুরী থেকে ঢাকার আজিমপুর পর্যন্ত সবাই মাওলানা উবাদুল হক সাহেবের সুন্নত বিশিষ্ট সংস্কৃতির দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন।[২৮] পবিত্র সুন্নাহ যে ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম উৎস সে প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন "হে নবী আপনার নিকট কিতাব প্রেরণ করেছি যাতে করে আপনি মানুষের নিকট এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও শিক্ষা তুলে ধরেন।" [২৯] খতীব সাহেব জুমার দিনের প্রস্তুতিতে ব্যক্তিগত জীবনের রুটিন আতর মাখা, টুপিও পাওহাবী পরিধান করতেন। তিনি কওমী ও আলীয়ার পারস্পারিক দ্বন্দকে দূরীকরণে ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি কওমীপন্থী ও আলীয়াপন্থীদের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করে ইসলামী সংস্কৃতিকে সহজ ভাবে উপস্থাপন করেন। তাই জীবন র্চচার ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি চায় পরিশীলিত জীবন চর্চা। আচার ব্যবহারে ভদ্রতা ও নিপুণতা অর্জনের

[২৭] মতিউর রহমান মল্লিক, সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি স্মারক প্রবন্ধ (জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২, জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ ঢাকা,- ২০০২) পৃ.-১১১।

[২৮] জুবাইর আহমদ আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত, আকাশ ছোঁয়া মিনার, (মাওলানা শহীদুল হক লিখিত প্রবন্ধ- আব্বাকে যেমন দেখেছি), খতীব রহ. স্মরণে, মাদ্রাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুর ঢাকা-২০০৮, পৃ-২১২।

[২৯] সূরা আন-নাহল-৪৪।

উপর গুরত্বারোপ করেন। তিনি মেয়েদেরকে ছলিক্বা[৩০] অর্জনে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেন। তিনি আচার-ব্যবহারে ভদ্রতা ও নিপুণতা অর্জন এবং গৃহস্থ বিষয়ক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার শিক্ষা গ্রহণের প্রতি নারীদেরকে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলতেন- যে নারী ছলীক্বা জানে না, তাকে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। মানুষ তাকে ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে যে ছলীক্বা জানে সে সম্মান ও স্নেহ পেয়ে থাকে-লোকে তার তারিফ করে। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন তার জন্য অবধারিত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ছলীক্বা অর্জিত হয় না। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার মাধ্যমেই তা শিখতে হয়। অকুতোভয় এ মর্দে মুমিন-মুজাহিদ, সত্য প্রকাশ ও প্রসারে অকুণ্ঠ, হক্বের আওয়াজ বুলন্দ করার নির্ভীক নকিব, সর্বজন শ্রদ্ধেয় সর্বজনমান্য আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক (রহ) ৬ অক্টোবর ২০০৭ মোতবেক ২৩ রমজান ১৪২৮ হি. শনিবার আজিমপুরে নিজ বাসভবনেই ইফতার করেন। ধানমন্ডির তাঁর এক ঘনিষ্ঠজনের বাসায় রাতে খাবারের দাওয়াত ছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষে সেখান থেকে বাসায় ফেরার সময় হঠাৎ করে তিনি গাড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রাত অনুমানিক পৌনে এগারটা গ্রীণ রোডের ল্যাব এইড ক্লিনিকে তাঁকে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকদের ধারণা মতে, তিনি পথেই পরম প্রিয়তম মহান প্রভূর নিবিড় সান্নিধ্যে চলে যান। খতিবের ইন্তেকাল, জাতি হারালো একজন অকৃত্রিম অভিভাবক।[৩১] শোকবার্তায় সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বলেন,

> "বাংলাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম উবায়দুল হক আমৃত্যু ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যে দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা এ দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে বলে আমি মনে করি। তিনি বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব হিসেবে প্রায় দুই যুগ ধরে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদান এবং দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মরহুম উবায়দুল হক আন্তর্জাতিক ইসলামী অঙ্গনেও একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রখ্যাত এ আলিমের ইন্তেকাল দেশ একজন বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদকে হারালো।"[৩২]

সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেন,

> "বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও আমাদের বায়তুল মুকাররাম জাতীয় মসজিদের সম্মানিত খতীব মাওলানা উবায়দুল হক এর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর এ মৃত্যুতে জাতি একজন বিশিষ্ট আলেম ও মুরব্বীকে হারালো। তাঁর তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টবাদী খুতবা জাতীয় জীবনে ইসলামের মূল্যবোধকে সমুন্নত করেছে। আমি ও আমার পরিবার তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ্ যেন তাঁর পরিবারকে এই শোক বহনের ক্ষমতা দান করেন এবং আমাদের এই শুণ্যতা পূরণের তাওফীক দান করেন।"[৩৩]

আকবর হাশেমী রাফসানজানী, শোকবার্তায় বলেন,

> "এ মহান আলেমের ইন্তেকালে আমি বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম এবং এ দেশের মুসলিম জনগণের প্রতি বিশেষ করে তাঁর পরিবার পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি"[৩৪]

---

[৩০] ছলীক্বা অর্থ প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়া, নিজ দায়িত্ব মনে করে ঘরের প্রতিটি কাজ সম্পাদন করা। অন্যের দিকে তাকিয়ে বসে না থাকা, ঘরের ছোট বড় সবার প্রতি লক্ষ্য রাখা, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ঘরের প্রতিটি বস্তু যথাস্থানে হেফাযতের সাথে রাখা, ছোট-বড় সবার মেজাজ মর্জি বুঝে খাবার-দাবার পরিবেশন করা ও তাদের অন্যান্য চাহিদার প্রতি নজর রাখা, সকলের প্রতি নিবেদিত থেকে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করা। কারো সাথে রাগ ও অহংকারসুলভ আচরণ না করা, বড়দের সেবা ও সম্মান করা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটানো। মোট কথা, ছলীক্বাসমৃদ্ধ মেয়ে সব সময় সুখে থাকবে, অন্যের সন্তুষ্টি পাবে। তার ঘর বেহেশতের নমুনা হবে। এসব বিষয় নিছক বই-প্রস্তক এবং কিতাব পড়ে অর্জণ করা যায় না। চিন্তা ও বৃদ্ধির সমন্বয়ে কাজ করতে হয়। অন্যের ব্যবহার ও আচার-আচরণ থেকে শিখতে হয়।

[৩১] দৈনিক নয়া দিগন্ত, খতীবের ইন্তেকাল জাতি হারালো একজন অকৃত্রিম অভিভাবক, সম্পাদকীয় ঢাকা , অক্টোবর ২০০৭, বর্ষ-৮, সংখ্যা- ২৪৫, পৃ.৬।

[৩২] সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ. ঢাকা, দৈনিক ইনকিলাব-৭-১০-২০০৭, পৃ.১১

[৩৩] "দৈনিক ইনকিলাব" ৭/১০/২০০৭, পৃ.১১

[৩৪] সভাপতি: রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান। ইনকিলাব ০৭/১০/২০০৭, পৃ.১১

মাওলানা উবায়দুল হক (র.) অর্ধ-শতাব্দব্যাপী কর্ম মুখর জীবনে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন। তিনি ১৯৫৬ ও ১৯৫৮ সালে মাদরাসা আলীয়া ঢাকা হতে 'জমিয়তে লিসানুল কুরআন' পাকিস্তানের অধীনে অধিষ্টিত আরবী বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সৌদি আরবের মজলিশে শুরা কর্তৃক স্বর্ণপদক লাভ করেন। জাতীয় সিরাত কমিটি কর্তৃক ২০০৪ সালে সেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। কুরআন শিক্ষা সোসাইটি থেকে ২০০৫ সনে নগদ ৫০,০০০ টাকা বিশেষ পুরুষ্কার প্রাপ্ত হন। এছাড়া আরো অনেক দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা থেকে সম্মানজনক সনদ, ক্রেস্ট, পদক ও খেতাব লাভ করেন।[৩৫]

উপসংহারঃ

খতীব মাওলানা উবায়দুল হকের জীবন পরিক্রমা ধর্মচিন্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনাই বলা যায়, জীবন, চিন্তাধারা ও সৃষ্টি কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সমাজের আত্মিক ও জাগতিক পরিশীলিত পথ প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর জীবন যেমন একদিকে আর্দশের, তেমনি তাঁর ধর্ম ও শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা-চেতনা ও কর্মধারা যুগযুগ ধরে সকল শ্রেণির মানুষকে অনুপ্রেরণা দান করবে। মোট কথা-মাওলানা উবায়দুল হক (র.) ছিলেন বাহরুল উলূম (মহাজ্ঞানী), সমকালীন শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ভাষাবিদ, প্রতিবাদী কণ্ঠ, বিরল প্রতিভা ও সাহিত্যের অধিকারী একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁর জীবন-কর্ম জাতি যত বেশী চর্চা করবে ততবেশী উপকৃত হবে।

[৩৫] জুবাইর আহমদ আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত, আকাশ ছোঁয়া মিনার, (মাওলানা আতাউল হক লিখিত প্রবন্ধ- জীবন গড়ার কারিগর), খতীব রহ, স্মরণে মাদ্রাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.-৩৪১

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 450- 457
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.227

ব্রাত্য বসুর ‘রুদ্ধসংগীত’: প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বয়ান

রবিউল সেখ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 01.10.2025; Accepted: 11.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Dr. Bratya Basu Roychowdhury's anti-establishment tone is an important aspect of his writings. His plays have come up with a direct protest against contemporary times and contemporary politics and institutions. We will see the manifestation of Bratya Basu's protest narrative in his protest narratives in plays like 'Ruddha Sangeet' and 'Winkle Twinkle'. In the 'Ruddha Sangeet' play, on the one hand, the government-institution's conflict with the artist and the artist's self-esteem has taken place side by side. Bratya Basu's anti-establishment tone against the empowerment of the ruling government has taken place in this work. This article examines Bratya Basu's protest narrative by analyzing the politics reflected in his prose, essays, interviews and other theater personalities' praise and criticism of his political plays.

Keywords: Anti-establishment voices, Empowerment politics, Artist struggles, Government repression, us-them politics

ব্রাত্যব্রত বসু রায়চৌধুরী— যিনি সাধারণত ব্রাত্য বসু নামেই খ্যাত। ড. ব্রাত্য বসু একাধারে নাটককার, অভিনেতা, মঞ্চ পরিচালক, চলচ্চিত্র পরিচালক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক এবং রাজনীতিবিদ। ব্রাত্য বসু কলেজে পড়বার সময় বামপন্থী আন্দোলনের একটা আলট্রা লেফট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেটা খুব কম সময়ের জন্য, তারপরেই সেই সংগঠন ছেড়ে দেন। ব্রাত্য বসু ছাত্র বয়স থেকে সি পি আই এম করাকে অপছন্দ করতেন। ব্রাত্য তাঁর নাটকে বামপন্থাকে সমালোচনা করলেও বামপন্থার আদর্শকে নয়। ব্রাত্যর বাবা-মা গণনাট্যের সদস্য, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তবে প্রত্যক্ষ পার্টির সদস্য ছিলেন না।

নয়ের দশকে রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে একটা শূন্যতা বা সংকট তৈরি হয়। যা রাজনীতির পালাবদলের সূচনাপর্ব ধরা যেতে পারে। সাতের দশকে রাজনৈতিক পালাবদল দেখা গেছিল। তবে সেই প্রতিবাদ আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক দলের বক্তৃতায় নয়, অনেক নাট্যদলের নাটকেও ফুটে উঠেছিল। নয়ের দশকে দেখা যায় নাট্যকর্মীরা মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিবাদ করলেও তাঁদের নাট্যক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। নয়ের দশকের প্রতিবাদী নাটকের শূন্যতা পূরণে ব্রাত্য বসুর রাজনৈতিক নাটকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রাত্য বসু তৃণমূল রাজনীতিতে আসেন থিয়েটার দল থেকে ব্রাত্য হয়ে। তিনি তৃণমূল সভায় গেছেন বলে থিয়েটার থেকে তাঁকে ব্রাত্য করা হয়। যে থিয়েটার দলগুলি তাঁর নাটক করত তাঁরা জানিয়ে দেন তাঁরা তার থিয়েটার করবে না। ব্রাত্যর ‘পেজ ফোর’, ‘কৃষ্ণগহ্বর’— নাটকের শো বন্ধ হয়ে যায়। চতুরঙ্গ নাটকের বিজ্ঞাপন থেকে থেকে তাঁর নাম সরিয়ে দেওয়া হয়। ব্রাত্যর নামে অভিযোগ আনা হয়, তিনি রাইটিস্ট, দক্ষিণপন্থী— তাই থিয়াটার দলগুলি তাঁর সঙ্গে থিয়েটার করতে পারবে না।

ব্রাত্য বসু রাজনীতিতে প্রবেশের আগে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। বামপন্থী রাজনীতির সমালোচক হিসেবে, তিনি পশ্চিমবঙ্গ বাম সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। নন্দীগ্রাম আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন ব্রাত্য। ২০১১-এ উত্তর চব্বিশ পরগণার দমদম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে সিপিএম মন্ত্রী গৌতম দেবকে পরাজিত করেন। এই নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় তাঁকে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা। ২০১৬-এর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের পর ব্রাত্য বসুকে পর্যটন, বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং বায়ো-টেকনোলজি, তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণাল্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য জয়ের পর, ব্রাত্য বসুকে পুনরায় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

ব্রাত্য বসুর লেখায় প্রতিষ্ঠান বিরোধী প্রতিবাদী স্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'আজকের প্রতিবাদ: গণতন্ত্রের নতুন মানচিত্র' গদ্যের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরলে তাঁর প্রতিবাদী সত্তার একটা পরিচয় পাওয়া যাবে—

> "আমার অধিকার আছে সরকারের বিপক্ষে যাবার। আমার অধিকার আছে সরকারের বিপক্ষে কথা বলার। আমার অধিকার আছে কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে না থেকেও নিজের মতামত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার। একেই গণতন্ত্র বলে। আমাকে তাই শেখানো হয়েছিল। শেখানো হয়েছিল, 'তুমি আমার সঙ্গে নেই মানেই তুমি আমার বিরুদ্ধে—এই ঘোষণাকে স্বৈরাতন্ত্র বলে জানতে।"[১]

এই ন্যারেটর সত্তার প্রকাশ আমরা দেখবো তাঁর 'রুদ্ধসংগীত', 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'-এর মতো নাটকের প্রতিবাদী বয়ান নির্মাণে। ব্রাত্য বসুর প্রতিবাদী সত্তা সম্পর্কে কবি জয় গোস্বামীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> "দেবব্রত বিশ্বাসের জীবন নিয়ে যে নাটক লিখেছেন ব্রাত্য বসু ও নতুন নাট্যদল গঠন করে তার যে প্রযোজনা করেছেন সেটি প্রবল আলোড়ন ফেলেছে দর্শকসমাজে, বাংলার খ্যাতনামা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা অনেকেই সেখানে স্বনামে উপস্থিত, চরিত্র হিসেবে এবং বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতারাও নিজ নিজ পরিচয়েই মঞ্চে এসেছেন এই নাটকে, কোনও ছদ্মবেশের আড়াল দরকার হয়নি।"[২]

প্রতিষ্ঠান কোনো মূল্যেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মেনে নিতে পারেন না। কংগ্রেস থেকে বামফ্রন্ট সরকার থেকে মা-মাটি-মানুষের সরকার তার ব্যতিক্রম নন। কংগ্রেসের নকশাল বিদ্রোহ দমননীতির পরই আমরা দেখবো সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম বিদ্রোহ দমনে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা। আরও পরে আমরা দেখবো, জনগণের প্রতিবাদ দমনে ক্ষমতাসীন মা-মাটি-মানুষের সরকারের পুলিশের লাঠি বর্ষণ, কাদানে গ্যাসের ব্যবহার। 'রুদ্ধসংগীত' নাটককের সময়কাল ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৯। ব্রাত্য বসুর মতে:

> "এই থিয়েটারে বলা হয়েছে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত তিরিশ বছরের বাঙালি জীবনের গল্পকে, যেখানে বহু সত্যিকারের গুণী কৃতী বাঙালি শিল্পীর জীবন সময়ের মোহানায় একাকার হয়ে গেছে।"[৩]

রুদ্ধসংগীত নাটকে একদিকে শিল্প-শিল্পীর প্রতি সরকার-প্রতিষ্ঠানের বিরোধ, অন্যদিকে শিল্পীর আত্মমর্যাদা পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। এই নাটকে শিল্পীর বিরোধ মূলত আমরা তিনটি দিকে দেখতে পাবো। প্রথম বিরোধ শিল্পীর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির। দ্বিতীয় বিরোধ শিল্পীর সঙ্গে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের। তৃতীয় বিরোধ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে শিল্পীর। ব্রাত্য বসু এক সাক্ষাৎকারে এই নাটকটি সম্পর্কে বলেন:

> "এই নাটকটির মূল কথা হল ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক; সেটা বাঙালি সমাজে কীভাবে এসেছে। তার তুলনামূলক বিচার, অর্থাৎ শিল্পীর দিক থেকে কীভাবে, সেটা দেখা হয়নি এবং এই সূত্রে বাঙালি শিল্পীর সঙ্গে তিনটি প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। (ক) শিল্পীর সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক, অর্থাৎ দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি, ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বা সলীল চৌধুরীর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি। (খ) শিল্পী এবং তাঁর নিজস্ব শিল্প সংগঠন, এবং তিনি যদি কোনো থিয়েটারের মানুষ হন, তাহলে থিয়েটারের মানুষ এবং তাঁর দল। এক্ষেত্রে দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড। এবং (গ) শিল্পীর সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক। এক্ষেত্রে দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষের সম্পর্ক।"[৪]

এই তিন বিরোধ ও শিল্পীর লড়াই, শিল্পীর আত্মমর্যাদার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নাটকটি অবলম্বনে দেখে নেওয়া যাক।

প্রকৃত শিল্পী তাঁর শিল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের দাদাগিরির ক্রিটিসাইজ করবেন এটাই স্বাভাবিক। ব্রাত্য বসুর মতে:

> "প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক কালে যাঁরা অন্যস্বর তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের সংকট নিজের নিজের মতো করে অমোঘ থেকেছে চিরকাল। রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান বা পার্টি তাঁদের মধ্যে সন্ত্রাস চালিয়েছে নানা কায়দায় নানান পন্থায়।"[৫]

যে-সব সৎ শিল্পীরা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বর তুলে ধরেন পার্টি বা দলের কাছে তাঁরা ব্রাত্য। সমস্ত ধরনের সুবিধা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়। এমনকি, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাঁদেরকে কোনো সম্মাননা দেওয়া হয়না। কখনো তাঁদের নির্বাসিত করা হয়, কখনো তাঁদের লেখা ব্যাণ্ড করা হয়। তাঁদেরকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিয়ে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়। তবুও কী প্রতিষ্ঠান, সরকার, প্রকৃত আর্টিস্টের বাণী রুদ্ধ করতে পারেন? না, পারেন না। অ্যারিস্টটলকে রাষ্ট্র বিচার নামক প্রহসনের দ্বারা কালকুঠরিতে বন্দি করে হেমলক পান করিয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। তাতে অ্যারিস্টটলের বাণীকে, শিল্পকে কী রুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল? অসুস্থ পাবলু নেরুদাকে চিলির সামরিক প্রধান অগুস্ত পিনোশের ভাড়াটে ডাক্তার টক্সিস ব্যাক্টেরিয়াল ইনজেকশন দিয়ে হত্যা করেছিলেন। তাতে কী পাবলু নেরুদার সাহিত্যকে রুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল? বলশেভিক কবি মায়াকোভস্কিকে স্তালিনের সরকার গুলি করে মেরেছিলেন। তাতে মায়াকোভস্কির সাহিত্য রুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল? রাষ্ট্রবিরোধী থিয়েটারি বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে মায়ারহোল্ডকে স্তালিনের রুশ পুলিশ প্রথমে গ্রেপ্তার তারপর অকথ্য নির্যাতন এবং গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ স্বীকার করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে ফ্ল্যাটে ঢুকে কুপিয়ে হত্যা করেছিলেন। এসবেও শিল্পীর প্রতিবাদী সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছিল?[৬] 'রুদ্ধসংগীত' নাটকটি দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনীমূলক নাটক নয়। এই নাটকটি সম্পর্কে ব্রাত্য বসু বলেন:

> "এই বিশেষ নাটকটির মাধ্যমে কিন্তু আমি এক প্রসিদ্ধ সংগীত শিল্পীর নিছক জীবনগাথা বর্ণনা করতে চাইনি। বরং বলা যেতে পারে আমার তরফে এই নাটক যেন নিজের মতো করে গড়ে তোলা একটা যুক্তিতর্ক আর গপ্পো। যেখানে কিছু চরিত্রকে কেন্দ্র করে দেশকালের একটা বিশেষ স্থানাঙ্ক যেন জনসমক্ষে এসে গেল।"[৭]

আর সেই দেশকালের স্থানাঙ্ক ধরতে গিয়ে চলে আসে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের সংলাপ। সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মিলনে পার্টি সম্পাদক অজয় ঘোষ যখন বলেন: "সংস্কৃতি-ফংস্কৃতি নিয়ে এখন আমাদের ভাববার সময় নেই।"[৮] কিংবা, পার্টির সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের মতান্তর হলে প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং নিরঞ্জন ঘোষকে জ্যোতি বসু যখন বলেন: "বিষয়টা কীভাবে ট্যাকেল করবেন সেটা আপনারাই স্থির করুন। কারণ আমি আবার কালচার ফালচার ভাল বুঝি না।"[৯] 'সংস্কৃতি'-র সঙ্গে 'ফংস্কৃতি'-ই হোক কিংবা 'কালচার'-এর সঙ্গে 'ফালচার' অথবা 'নাটক'-এর সঙ্গে 'ফাটক'-ই হোক তা যে আসলে শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি সুপ্রয়োগ নয় তা বলাই বাহুল্য। তাঁদের এই বিকৃতি শব্দ প্রয়োগ এটা বুঝিয়ে দেয়, আমরা ক্ষমতাসীন, তোমরা এবং তোমাদের শিল্প আমাদের থেকে নিচে। ওসব নিয়ে ভাববার সময় আমাদের নেই। তোমরা মাইনরিটি।

সলিল চৌধুরীর কিছু গানকে পার্টি নিষিদ্ধ করেন। 'গাঁয়ের বধূ'-কে গণনাট্য সংঘে নিষিদ্ধ করা হয়। সত্যেন দত্তের 'পালকির গান'-কে প্রতিক্রিয়াশীল বলা হয়। সলীল চৌধুরীর 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে' গানটিকে পার্টির নেতারা প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দেন। কেন?, না, এই গানের মধ্যে আছে 'হায়, বিধি বড়ই দারুণ'। অর্থাৎ তিনি একজন কমিউনিস্ট হয়েও ঈশ্বরবাদ বা ভাগ্যবাদ প্রচার করেছেন এই গানে। তবে 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে' গণনাট্যের মঞ্চে হতে পারে, কেননা সেটা প্রচলিত গান। সলিল চৌধুরীর গান বিচার করবার জন্য একটা বিচারক মণ্ডলী বসানো হয়, তাঁদের রিপোর্ট এর ভিত্তিতে তাঁর গান অনুমোদন পাবে। বলাই বাহুল্য, পার্টির আমব্রেলার আওতাভুক্ত বিচারকমণ্ডলীর রিপোর্ট পার্টির অনুগামীই হবে। সলিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, সে ইনডিসিপ্লিন। সলিল চৌধুরীর পালটা জবাব:

> "আমি নাকি ইনডিসিপ্লিনড। কার ডিসিপ্লিন? পার্টির? কে পার্টি? ওই কতগুলো মুখ? দ্রুত আমার মোহ চলে যাচ্ছিল।... ওদের বোঝাতে পারি না কোটি কোটি ভারতবাসী নির্ভুল সুরে হয়তো অসাধারণ গান গায় কিন্তু মহম্মদ রফি বা লতা মঙ্গেশকর একজনই হয়।"[১০]

দল বা পার্টির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে মৌলিক শিল্পীর শিল্প, রচনা মাত্রই ইনডিসিপ্লিন। প্রতিক্রিয়াশীল। প্রতিবিপ্লবী। রাষ্ট্রবিরোধী।

প্রতিষ্ঠান অথবা পার্টি শিল্পীর মৌলিকতাকে সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন, মৌলিক শিল্প মাত্রেরই একটা শক্তি আছে, যা শাসকদলের স্বরূপ জনগণের কাছে তুলে ধরতে পারে। এই নাটকে দেবব্রত বিশ্বাস সেই ধ্রুব সত্যকে তুলে ধরেছেন:

> "পৃথিবীর কুনোকালে কুনো দেশে ওই তোমরা যারে কও এস্টাব্লিশমেন্ট, প্রতিষ্ঠান— তা কুনোদিন একটা জিনিস সহ্য করে নাই। তা হইল অরিজিন্যালিটি— মৌলিকতা। সত্যকারের আর্টিস্টের ওই এক দুষ—তারে মানুষ ভয় পাবাই। সে তো যা চিরাচরিত, তাকে ভাইঙ্গ্যা দিতে আসছে। তারে আটকানোর চেষ্টা হইবই। একথা পরে তুমি তোমার জীবন দিয়া বুঝবা।"[১১]

এ কথা শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস বলেছেন আর এক শিল্পী ঋত্বিক ঘটককে। ছাব্বিশ বছরের ঋত্বিক ঘটক যখন চল্লিশ বছরের দেবব্রত বিশ্বাসকে বলেন, একমাত্র তাঁদের পার্টিই (কমিউনিস্ট পার্টি) সমষ্টির অনুভবকে একত্র করে প্রকাশ করতে পারে। পার্টির প্রতি ঋত্বিকের এই ধারণাকে দেবব্রত বিশ্বাস 'উইশফুল থিঙ্ক' বলেছেন। ঋত্বিক ঘটক তাঁদের পার্টির ভালো কাজের একাধিক উদাহরণ দেন— বিড়লাদের বিরুদ্ধে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ, বিধান রায়ের গভর্নমেন্টের করাপসন-পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দেবব্রত বিশ্বাস তুলে ধরেন চিরন্তন সত্য, ক্ষমতা লাভের পর তাঁদের (ঋত্বিকদের) পার্টি যে জনগণের উপর স্বৈরাচারি হবেনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। ক্ষমতাসীন পার্টির প্রতি বিরোধী দলের প্রতিবাদ, বিরোধিতা— সবই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার তাগিদেই। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁদের আর কোনো প্রতিবাদ থাকেনা, তাঁদের আলাদা করে চেনাই যায়না। এ প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসুর মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ:

> "স্বাভাবিকভাবে প্রতিবাদ দেখা যায় বিরোধীপক্ষের, বিরোধীপক্ষ ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে প্রকাশ্যে আসবেন বলে। ফলত প্রতিবাদ নেই, নেই কোনো প্রতিষ্ঠানবিরোধী স্বর। আছে কিছু পাবার আশায় অথবা কিছু পেয়ে গদ্গদ কিংবা নীরব সমর্থন।"[১২]

এই সত্য শিল্পী ঋত্বিক ঘটক পরে বুঝতে পারেন। যখন তাঁর বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির কমিটি একাধিক অভিযোগ আরোপ করেন। এ প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসুর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> "সত্যিই আমাদের পিতৃসম এই মানুষগুলি, তাঁদের ব্যক্তিগত দোষগুণ সবকিছু নিয়ে একসময় বিশ্বাস করেছেন এই পার্টিই একমাত্র তাঁদের ভালোবাসবে, যত্ন করবে, তাঁদের কাজ মানুষের সামনে তুলে ধরবে। আর অচিরেই তাঁদের সেই বিশ্বাস ভেঙে গেছিল, ছুরি খেয়েছিলেন পিঠে তাঁরা সবচেয়ে বেশি। ফলে কেও তাঁরা ও পার্টিতে আর থাকতে পারেননি।"[১৩]

প্রতিষ্ঠান অথবা পার্টি সব সময় নিজের প্রভুত্ব বজায় রেখে চলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। সবকিছুকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। সমস্যা দেখা যায় সেখানেই, যখন কোনো শিল্পী তাঁদের হ্যাঁ-তে হ্যাঁ না মেলান। তখন সেই শিল্পীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন নানান অভিযোগ এনে সেই শিল্পীকে এবং তাঁর শিল্পকে ব্রাত্য করা হয়। ব্রাত্য বসু এই সত্যকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন:

> "আমরা যতই কামু-কাফকা-সার্ত্র বা লেনিন-স্তালিন-মাও বা রবীন্দ্রনাথ আওড়াই আমাদের অধিকাংশই ভিতরে ভিতরে এক গোঁড়া অন্ধকূপের বাসিন্দা। দুর্ভাগ্যের কথা হল আমাদের এখানে কমিউনিস্ট নামধারী আদতে একটি আঞ্চলিক, ভোটসর্বস্ব, ক্ষমতালিপ্সু, সিন্ডিকেট করে দল চালানো ও আসলে যৌথতার নামে ব্যক্তির অহং দম্ভ ও মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদকে কায়েম করতে চাওয়া কিছু মানুষ এই মনটাই পার্টিসর্বস্ব রাজনীতির নামে বয়ে নিয়ে এসেছেন বছরের পর বছর। তাঁদের আসলে কোনোদিন সাংস্কৃতিক নীতিই ছিল না কোনোকালে, তাঁরা কে যোগ্য কে অযোগ্য কোনোদিনই বোঝেননি, শুধু তাঁবেদার আর স্তাবকদের প্রশ্রয় দিয়েছেন, কিছু না কিছু পাইয়ে দিয়েছেন, প্রতিটি মাধ্যমে কী গানে কী কবিতায় কী থিয়েটারে চিরকাল মধ্যমেধাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। যে যত তাঁবেদার তাঁর তত নম্বর।"[১৪]

ঋত্বিক ঘটকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রিভিয়াস্সিয়াল কমেটির পক্ষ থেকে তাঁকে জিজ্ঞসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বলা হয়— তিনি পারিজাত বসুকে ব্যবসায় নামিয়ে আর্থিক

প্রতারণা করেছেন। এছাড়াও শৈলেন পেন্টারকে বাধ্য করা হয় ঋত্বিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে, বিরোধীপক্ষের থেকেও তাঁর বিরুদ্ধে বক্তব্য নোট নেওয়া হয়। ঋত্বিক ঘটক এসবের কারণ জানতে চাইলে নির্মল ঘোষ বলেন—

> "পার্টি মেম্বার যদি ব্যক্তিজীবনে কোনও গন্ডগোল করে থাকেন তবে প্রয়োজনে আমরা শ্রেণীশত্রুদের থেকেও জবানবন্দি নিতে পারি।"[১৫]

কোনো শিল্পী যদি নিজের সৃষ্টির দ্বারা, শিল্পের দ্বারা পপুলারিটি অর্জন করেন তা পার্টির ক্রিয়েটিভিটিহীন সদস্যের কাছে চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। ঈর্ষাবশত জনপ্রিয় সেই শিল্পীকে নিচে নামানোর জন্য শিল্পীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়:

> "যার যেটা প্রিয় কাজ সেটা করতে দেওয়া হবে না, তাঁর সম্পর্কে নীরব হয়ে যাওয়া, শিল্পীদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পাগলামো ও ছেলেমানুষি ও খামখেয়ালিপনাকে শয়তানি ও বদমাইশি বলে লেবেল লাগানো ও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, অনুভূতিকে সম্পূর্ণ অসাড় করে দেওয়া, জীবনে একা করে দেওয়া, অনুগত ও বাধ্য না হলে উদ্ধত ও দুর্বিনীত বলে স্ট্যাম্প লাগিয়ে দেওয়া, প্রতিক্রিয়াশীল বলা... তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ব্যক্তিগত কুৎসা যে অমুক চোর, তমুকে কামুক—ইত্যাদি ইত্যাদি।"[১৬]

এভাবে কালে কালে টার্গেট করে একে একে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ব্রাত্য করা হয়। উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল, 'তিনি সি পি আই এর এজেন্ট'। সলিল চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল— 'গ্রামোফোন কোম্পানির ধর্মঘট ভাঙায় সলিলের হাত আছে।' ঋত্বিক ঘটক এ-সব প্রতিপ্রশ্ন তোলায় প্রমোদ দাশগুপ্তের মতো বাহুবলি নেতা তাঁকে বলেন 'ট্রটস্কির দালাল' (বেঁকিয়ে কথা বলা অর্থে), আবার সাবধানও করেন— 'আপনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন ঋত্বিক। ভদ্রভাবে কথা বলুন।' এ যেন পার্টির তর্জনিসংকেত মেনে চলার হুমকি। এ সম্পর্কে কবি জয় গোস্বামী যথার্থই বলেছেন:

> "এ হল ঈর্ষার আর এক রকম প্রকাশ অর্থাৎ আমি নেতা। তুমি কবি-সুরকার-গায়ক-পরিচালক যে-ই হও, তুমি আমাদের অধীনে থাকবে।"[১৭]

নিরঞ্জন সেন, নির্মল ঘোষ, প্রমোদ দাশগুপ্তরা হাই ক্রিয়েটিভ অবশ্যই মৌলিক শিল্পীর বিরুদ্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে, তাতে সাদা কালো কিছু মিশিয়ে মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করেন। দেবব্রত বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, সুভাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা কমিউনিস্ট পার্টি এক সময় ত্যাগ করেন।

ক্ষমতাসীন পার্টি ক্ষমতার কোহলে উন্মত্ত হয়ে আরও ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠবার প্রয়াস চালাতে থাকেন। একদিকে যেমন মৌলিক শিল্পী-সাহিত্যিকদের যেনতেন প্রকারে দল থেকে ব্রাত্য করেন, অন্যদিকে পার্টির প্রচার ও মতাদর্শ জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য একশ্রেণির অনুগত শিল্পীদের দলে টানেন। যাঁরা তাঁদের লেখায় পার্টির ইস্তেহার তুলে ধরবেন, বিনিময়ে তাঁরা পাবেন উচ্চ পদ, মোটা অনুদান। গিভ টেক অ্যাণ্ড পলিসি। তৈরি হয় 'আমরা-ওরা'র রাজনীতি। নাটকের মধ্যে প্রমোদ দাশগুপ্তের কথায় তা স্পষ্ট:

> "একটা সাদা পাতা নাও তো। মাঝখান থেকে মুড়ে দু'ভাঁজ কর। বাঁদিকে ওপরে লেখো আমরা, ডানদিকে ওরা। আমাদেরও তো কবি সাহিত্যিক আছে না কি? তবে? ওদের এবার একটু বলো-টলো। বুঝতে পেরেছ? তালিকাটা হোক— তারপর দেখছি। তবে একটা কথা তোমার ঠিক। আমিও ভাবছি। কী করে নিজেদের গণমাধ্যম তৈরি করা যেতে পারে। দেখা যাক।"[১৮]

লক্ষ করবার বিষয়, অনুগত শিল্পীদের দ্বারা তৈরি করা হবে গণমাধ্যম, একটা পপুলার মাস মিডিয়া। যেখানে অনুগত শিল্পীদের দ্বারা নিজেদের কথা তুলে ধরতে পারবেন। অধ্যাপক মলয় রক্ষিত তাঁর সংস্কৃতির অসুখ-বিসুখ গ্রন্থে 'আমরা-ওরা' রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন:

> "শাসকের কুখ্যাত ঘোষণা— 'ওরা তিরিশ, আমরা দুশো পঁয়ত্রিশ'— এর থেকেই জন্ম নিল ভিন্নতর এক রাজনৈতিক ডিসকোর্স, যেখানে বাইনারি শুধু আমরা ওরা-য় নয়, বাইনারি দেখা দিল তথাকথিত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধীজীবীদের মধ্যেও। বাম-শিল্পনীতির পক্ষে দাঁড়িয়ে সরকারকে সমর্থন করলেন সরকারপন্থী একদল বুদ্ধীজীবী। অন্যদিকে শাসকশিবির ছেড়ে বেরিয়ে এলেন অনেকেই যাঁরা সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম গণ-আন্দোলনের সামনের সারিতে দাঁড়ালেন।"[১৯]

যে সব শিল্পীরা দলের আনুগত্য মেনে চলতেন না তাঁদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র ভিত্তিহীন অভিযোগ, ব্রাত্য করা হত তাই-ই নয়, কীভাবে যন্ত্রণাবিদ্ধ করা যায় তারও প্ল্যান করা হত। প্রমোদ দাশগুপ্ত যখন বলেন:

> "হ্যাঁ মেয়ারহোল্ড[২০]। ওকে স্তালিন যা করেছিলেন বা ওর বউকে— চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছিল না? গুলি করে মারাই ঠিক। আর যাই হোক পৃথিবী থেকে অন্তত কিছু আবর্জনা কমত।"[২১]

প্রতিষ্ঠানের প্রবল নিয়ন্ত্রণ সংস্কৃতি জগতের সর্বস্তরেই কায়েম ছিল। কী নাটক, কী কবিতা, কী সংগীতের ধারা— স্বতন্ত্র শিল্পী মাত্রই এক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের কালাকানুন, প্রতিষ্ঠান কমেটির রিপোর্ট ছিল বিধিলিপির মতো। কোনো শিল্পী সেই বিধিলিপি মেনে না চললে তিনি অপর। তাঁর শিল্প-ও অপাংক্তেয়। ইতিহাসের বুকে সাক্ষ্য রেখে যাওয়া এমন এক নিঃসঙ্গ শিল্পী হলেন দেবব্রত বিশ্বাস। শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি সম্পর্কে বলেন:

> "নাটকটিতে প্রতিষ্ঠান বা 'এস্টাব্লিশমেন্ট' এর সঙ্গে শিল্পী ও তার সৃজনের একটি মৌলিক ও স্থায়ী বিরোধকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।"[২২]

দেবব্রত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে না ভিড়িয়ে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন জনপ্রিয় এক পাবলিক প্ল্যাটফর্ম। তিনি নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান, তাঁর কোনো প্রতিষ্ঠানের দরকার পড়ে না। এ প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু যথার্থই বলেছেন:

> "দেবব্রতর জীবনবৃতান্তে খুব ভাল করে অবগাহন করলে দেখা যায়, যেহেতু তিনি ক্ষমতাবৃত্তের বাইরের লোক হিসেবেই থেকে গেলেন, ক্ষমতার চর্চা নিয়ে মস্তিস্কটি ঘামার্ত করলেন না, ফলে একেবারেই নিজস্ব গঠনরীতি এবং নিটোল একটি নিঃসঙ্গতা সম্বল করে থেকে গেলেন অনেকটাই কর্ণের মতই।"[২৩]

এখানেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর বিরোধ। সারাজীবন যিনি রবীদ্রসংগীত চর্চায় ব্যয় করেছিলেন, এমন এক মহারথির দুটি গানকে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড অনুমোদন দেননি—

> মাননীয় শ্রী দেবব্রত বিশ্বাসের দুটি গান আমরা মনোনীত করতে পারছি না। প্রথমটি হল 'এসেছিলে তবু আসো নাই'— এটিকে নতুন করে রেকর্ড করতে হবে কারণ বারবার বলা সত্ত্বেও এতে যথেচ্ছ যন্ত্রসংগীত ব্যবহার করা হয়েছে যার জন্য এটি একদিকে যেমন কানে প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে, তেমনি রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়ে উঠছে। দ্বিতীয়টি হল 'মেঘ বলেছে যাব যাব'— এটিতে কুৎসিতরকমের মেলোড্রামাটিক গলা ব্যবহার করা হয়েছে। যন্ত্র সংগীতের ব্যবহারও প্রথমটির অনুরূপ।[২৪]

বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড থেকে দেবব্রত বিশ্বাসকে এই চিঠি লেখা হয় ১৯৬৪ সালে। তখন কেন্দ্র ও রাজ্য কংগ্রেসের শাসনে। তারপর ১৯৬৯-তে তাঁর দুটি গান আবার বিশ্বভারতী অনুমোদন দেননি। ১৯৭১-তে তাঁর কিছু গান অনুমোদন পায়নি।

বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের দেওয়া চিঠিটির শব্দবন্ধের দিকে তাকানো যাক। প্রথম গানটি মনোনীত করতে না পারার কারণ, 'বারবার বলা সত্ত্বেও' সেটিতে নাকি 'যথেচ্ছ যন্ত্রসংগীত' ব্যবহার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে যে আরো কয়েকবার জানানো হয়েছিল, শিল্পী যে সেটা শুনেননি সেটা জানানোর মধ্যে ঔদ্ধত্য লক্ষ করবার মতো। একজন শিল্পী সংগীতে কেমন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন তা প্রতিষ্ঠানের বুলেটিন কমিটি মেপে দেবেন। বুলেটিন কমিটির নির্দেশ অমান্য করলে তা অনুমোদন করা হবে না। বুলেটিন কমিটির নির্দেশ অমান্য করে যথেচ্ছ যন্ত্রসংগীত ব্যবহারের ফলাফল কী হতে পারে? তা নাকি 'কানে প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে' এবং রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষেও 'অত্যন্ত ক্ষতিকর'। অর্থাৎ শুধু ধাক্কা নয়, 'প্রবল ধাক্কা', ক্ষতিকর নয়। তার থেকেও বেশি 'অত্যন্ত ক্ষতিকর'। আর দ্বিতীয় গান 'মেঘ বলেছে যাব যাব'— গানটিতে নাকি 'কুৎসিত মেলোড্রামাটিক গলা ব্যবহার করা হয়েছে'। ক্ষোভের, আক্রমণের ধরনটা লক্ষ করবার মতো। গানটি মেলাড্রামাটিক নয়, গলাটি মেলোড্রামাট্রিক, তাও নয়, কুৎসিত মেলোড্রামাটিক। একজন যথার্থ আর্টিস্টকে কতটা নিকৃষ্টভাবে আক্রমণ করা যেতে পারে সুপরিকল্পিত ভাষা ব্যবহারের এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। দেবব্রত বিশ্বাসের মত একজন 'অরিজিন্যাল' শিল্পীর ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের সুপারিশ মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। দেবব্রত বিশ্বাস বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে গিয়ে জানতে পারেন, বুলেটিন কমিটি ক্ষমতার আজ্ঞাবহ— 'আমরা মশাই হুকুমের আজ্ঞাবহ'। ক্ষমতাসীন পার্টির হুকুমই হচ্ছে বুলেটিন কমিটির রিপোর্ট। দেবব্রত বিশ্বাস

বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তাঁদের জন্য সংগীত রেকর্ড করা বন্ধ করে দিলেও, সংগীতকে তিনি ছাড়েননি। রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল হাসপাতালের বেডে শুয়েও সুচিত্রা মিত্রকে শুনিয়ে দেন তাঁর পরিকল্পনার কথা—

> "হইতে পারে আমি এখন অসুস্থ। হইতে পারে আমি এখন গান রেকর্ডিং করতাছি না, পাবলিকলি অ্যাপিয়ারও তেমন কইর‍্যা করি না কিন্তু গান গাওয়া আমার বন্ধ হইব না। দরকার পড়লি গোটা পশ্চিমবঙ্গ ঘুইর‍্যা ফাংশনে গাইব। সেইহানে আমি মিউজিক বোর্ডের নাগালের বাইরে।"[২৫]

একজন প্রকৃত শিল্পীকে প্রতিষ্ঠান কখনই তার চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে শম্পা ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য:

> "রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনের বেড়াজালে বন্দি রবীন্দ্র সংগীতকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। প্রতিষ্ঠানের কাছে তিনি ছিলেন 'হরিজনের' নামান্তর।"[২৬]

'রুদ্ধসংগীত' নাটকে তৃতীয় স্তরে দেখা যায়, গণমাধ্যম এবং শিল্পীর সংগ্রামের লড়াই। কবি জয় গোস্বামীর মতে:

> "এই নাটক কেবল রাজনৈতিক নাটক নয়। এই নাটক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একক চিরকালীন সংগ্রাম-সম্পর্ককে ধারণ করে আছে।"[২৭]

আনন্দবাজার পত্রিকার সন্তোষকুমার ঘোষ পুরস্কার-অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য দেবব্রত বিশ্বাসকে বলেন। তিনি আরও বলেন, বছরে দুটি করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্প-সাহিত্য-প্রবন্ধের অঙ্গনে সর্বোৎকৃষ্ট দুটিকে বেঁছে নেওয়া হয়। বিজয়ীকে টাকা দেওয়া হয়। দেবব্রত বিশ্বাস বলেন—

> "হ, এটা তো তাহলি বানিজ্যিক ব্যাপার। তা আমারে কত দিবেন। গান গাইবার জন্যি?"[২৮]

সন্তোষ কুমার ভেবেছিলেন, দেবব্রত তাঁদের প্রতিষ্ঠানে গান গাইবেন, সংগীত শিল্পীর আবার মূল্য কী। তাছাড়া তাঁদের প্রতিষ্ঠানে গান করবেন এতেই তো তার নাম সম্প্রচারিত হবে। দেবব্রত বিশ্বাসের রাজি না হওয়া সন্তোষ কুমার মেনে নিতে পারেননি। তিনি পরিকল্পনা করেন, তাঁদের সংবাদ মাধ্যমে দেবব্রত বিশ্বাসের নামে মিথ্যা প্রচার করবেন। দেবব্রত বিশ্বাসের নামে সুর ও স্বর বিকৃত করার যে অভিযোগ আছে তা আরো রঙ মাখিয়ে প্রচার করবেন। যদিও তিনি দেবব্রত বিশ্বাসের গানের একজন ভক্ত, তবুও দেবব্রত বিশ্বাস যেহেতু তাঁর প্রতিষ্ঠানকে অপমান করেছেন, তা তিনি কোনোভাবেই সহ্য করতে পারবেন না। শোভন গুপ্তের মতে:

> "একদিকে ক্ষমতা ধীরে ধীরে এক জাল ছড়াচ্ছে, অন্যদিকে একজন মানুষ, দেবব্রত বিশ্বাস এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁর মার্জিনালিটির সাধনার পথে। সবরকম ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠান এসে তাঁর গানের ডানা ছেঁটে দিতে চাইছে। রবীন্দ্র গান গাওয়া তাঁর কাছে তো গায়ক হইয়ে ওঠবার জন্য নয়, এমন এক সাধনা যা সমস্ত মুরুব্বিয়ানার বিরুদ্ধে তর্জনিসংকেত করে।"[২৯]

যাই হোক, 'রুদ্ধসংগীত' নাটকে প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে রাজনীতি, সময়, শাসকদলের স্বরূপ এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিল্পীর লড়াই।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, ব্রাত্য। গদ্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১৯৩।
২. গোস্বামী, জয়। ব্রাত্য: বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৩৮।
৩. বসু, ব্রাত্য। গদ্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৩৯৫।
৪. বসু, ব্রাত্য। কথাবার্তা সংগ্রহ। দীপ প্রকাশন, ২০২৫, কলকাতা, পৃ. ৮৮২।
৫. বসু, ব্রাত্য। গদ্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ২০১।
৬. গোস্বামী, জয়। ব্রাত্য: বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৮১-১১৩।
৭. বসু, ব্রাত্য। বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ২৪৯।
৮. বসু, ব্রাত্য। নাটক সমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩০২।
৯. তদেব, পৃ. ৩১৫।
১০. তদেব, পৃ. ৩০২।

১১. তদেব, পৃ. ৩০৮।
১২. বসু, ব্রাত্য। বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ১৯৬।
১৩. বসু, ব্রাত্য। গদ্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৩৯৬।
১৪. তদেব,পৃ. ৩৯৫।
১৫. বসু, ব্রাত্য। নাটক সমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩১২।
১৬. বসু, ব্রাত্য। গদ্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬।
১৭. গোস্বামী, জয়। ব্রাত্য: বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৪০।
১৮. বসু, ব্রাত্য। নাটক সমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩১৫।
১৯. রক্ষিত, মলয়। সংস্কৃতির অসুখ- বিসুখ। কারিগর, ২০২৫, কলকাতা, পৃ. ৭৮।
২০. গোস্বামী, জয়। ব্রাত্য: বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৮৯।
২১. বসু, ব্রাত্য। নাটক সমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩১৪।
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু। অস্তিত্ব অনুভূতি অবিনির্মাণ: ব্রাত্য বসুর নাটক। দীপ প্রকাশন, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১২৫।
২৩. বসু, ব্রাত্য। বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ২৪৮।
২৪. বসু, ব্রাত্য। নাটকসমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩২০।
২৫. তদেব, পৃ. ৩১৯।
২৬. ভট্টাচার্য, শম্পা। ব্রাত্য বসুর নাটক থেকে নাট্যে। দীপ প্রকাশন, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৭৬।
২৭. গোস্বামী, জয়। ব্রাত্য: বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৪২।
২৮. বসু, ব্রাত্য। নাটক সমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩৩১।
২৯. গুপ্ত, শোভন। ব্রাত্য। দীপ প্রকাশন, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৫০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গুপ্ত, শোভন। ব্রাত্য। দীপ প্রকাশন, ২০১৩, কলকাতা।
২. গোস্বামী, জয়। ব্রাত্য: বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ। কারিগর, ২০২২, কলকাতা।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু। অস্তিত্ব অনুভূতি অবিনির্মাণ: ব্রাত্য বসুর নাটক। দীপ প্রকাশন, ২০১৭, কলকাতা।
৪. বসু, ব্রাত্য। কথাবার্তা সংগ্রহ। দীপ প্রকাশন, ২০২৫, কলকাতা।
৫. বসু, ব্রাত্য। গদ্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯, কলকাতা।
৬. বসু, ব্রাত্য। নাটকসমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা।
৭. বসু, ব্রাত্য। বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি। কারিগর, ২০২২, কলকাতা।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 458- 466
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.228

ঔপনিবেশিক ও পরবর্তী ঔপনিবেশিক যুগে পুরুলিয়ার ইতিহাসে কুষ্ঠ ব্যাধি ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা: প্রসঙ্গ দ্য লেপ্রসি মিশন হাসপাতাল

স্বাগতা রায়, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 29.10.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The district of Purulia is located on the western part of West Bengal and is a part of the Chotanagpur plateau. Most of its inhabitants belong to the tribal community. The district was known as **"Manbhum"** during the colonial period. During the colonial rule, Bengal was suffering from endemic diseases like malaria, smallpox, cholera, etc. In this case, Purulia was not an exception. Apart from these dreadful diseases, another was leprosy, which has had a significant impact on the body and health of tribal communities. To cope with this situation, the Leprosy Mission Hospital served as a pivotal institution in the medical and humanitarian history of Bengal as well as eastern India. This hospital was founded in the year 1888 as an initiative by the Gossner Evangelical Lutheran Mission. This paper is an initiative to discuss how the hospital evolved and impacted the medical history of a regional district, Purulia, historically characterized by poverty and ecological challenges. The research article will also emphasize the hospital's role in public and rural health care during the colonial and post-colonial periods, respectively.

Keywords: medical history, Purulia; leprosy, missionary, medicine, rehabilitation, rural health

পুরুলিয়ার চিকিৎসা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার জন্য এই অঞ্চলটির পরিবেশগত ও ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা, জনসংখ্যার বণ্টন এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামো– এই চারটি বিষয়কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। বঙ্গদেশের পশ্চিম প্রান্তের জেলা পুরুলিয়া প্রাচীনকাল থেকেই ছোটনাগপুর মালভূমির একটি অংশ এবং এর পাশাপাশি উপজাতি অধ্যুষিত উচ্চভূমি ও গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যবর্তী একটি সীমান্ত অঞ্চল হিসাবেই পরিচিতি লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, সীমানা বরাবর অবস্থিত হওয়ার দরুন তথাকথিত জেলাটির জলবায়ু একদিকে যেমন শুষ্ক অন্যদিকে তেমনি লোহিত ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার আধিক্যের ফলে উন্নতমানের কৃষিকাজের অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই দুই ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য বারংবার খরা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টির নেপথ্যে যেমন অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল তেমনি বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির উদ্ভবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এরই ফলস্বরূপ ব্রিটিশ শাসনকালে ম্যালেরিয়া, কলেরা, গুটিবসন্তের মতন অসুখ মহামারির আকার ধারণ করেছিল। এইসকল মারনব্যাধির পাশাপাশি যে অপর রোগটি এই জেলার জনস্বাস্থ্যকে সর্বাধিক ব্যতিব্যস্ত ও প্রভাবিত করেছিল সেটি ছিল কুষ্ঠ বা Leprosy। ইংরেজী 'Leprosy' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে গ্রীক শব্দ 'lepra' থেকে, যার অর্থ 'scaly'। এই রোগটি এমন একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি যার কারণে কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বক

এবং স্নায়ু বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এইকারণেই ব্রিটিশ ও পরবর্তী ব্রিটিশ যুগে এই রোগটি বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তথাকথিত দুই সরকার কুষ্ঠ নামক রোগটি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে উদ্যোগী হয়েছিল এবং বর্তমান ক্ষমতায় আসীন সরকারও সেই প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে।[১]

উনিশ শতকে তদানিন্তন ঔপনিবেশিক বাংলায় চিকিৎসা পরিকাঠামো সেইরূপ উন্নত ছিল না। তদুপরি, সেই তথাকথিত চিকিৎসা ছিল প্রধানত শহর কেন্দ্রীক এবং এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল ইউরোপীয় উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মীদের রোগ-ব্যাধি নিরাময়। গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেনীর জনগণের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে ইংরেজ প্রশাসনের কোনরূপ উদ্যোগ ছিলনা। আবার, পুরুলিয়ার অধিবাসীগন যাদের অধিকাংশই ছিল প্রান্তিক গোষ্ঠীর, নিম্ন বর্ণের কৃষক এবং অরণ্যবাসী, তারা রোগ নিরাময় হেতু দেশীয় ঔষধ এবং লোকাচারের ওপরেই অধিক নির্ভরশীল ছিল। এই দেশীয় পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল ভেষজবিদ্যা, আচার-অনুষ্ঠান, শুদ্ধিকরণ যার মাধ্যমে মানবসমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সাধিত সমন্বয় প্রতিফলিত হয়েছিল। যদিও, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজদের দৃষ্টিতে আদিম এই অরণ্যবাসীদের চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল 'কুসংস্কারের প্রতিভূ' ও 'অবৈজ্ঞানিক'। এই পরিপ্রেক্ষিতেই, বনজঙ্গল পরিবেষ্টিত এই অঞ্চলটিকে মিশনারি[২] চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল।[৩]

মিশনারিদের রোগ নিরাময় পদ্ধতির সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, যেখানে ব্রিটিশ সরকার পরিচালিত চিকিৎসা সেবার ভিত্তি ছিল আমলাতান্ত্রিক ও আড়ম্বরপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই মিশনারি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিগুলি শুধুমাত্র আরোগ্য নিকেতন হিসাবেই দায়িত্ব পালন করত না, সেইসঙ্গে শিক্ষা প্রদান, ধর্মান্তকরণ, সমাজসংস্কারমূলক কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। পুরুলিয়ার ন্যায় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই নতুন প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতির আগমন ঘটেছিল '**Gossner Evangelical Lutheran Mission**'– এর উদ্যোগে, যেটি ১৮৪০– এর দশক থেকেই ছোটনাগপুর অঞ্চলে নিজেদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। এই মিশনারিদের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যাদির মাধ্যমে জাতি ও ধর্মের উর্ধ্বে গিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে মানব প্রেমের বাণী প্রসারিত করা।[৪]

এই মূল্যবোধের ভিত্তিতেই বাংলায় মিশনারি কর্তৃক পরিচালিত নব আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল আর এই আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে পুরুলিয়াতে গড়ে উঠেছিল '**দ্য লেপ্রসি মিশন হাসপাতাল**'– মানব প্রীতি, সহানুভূতি, মমতা ও সামাজিক সামান্যিকরণের একটি মূর্ত প্রতীক। এই মিশনারি হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৮০– এর দশকে এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রেভারেন্ড হাইনরিখ (হেনরি) উফম্যান। তিনি ছিলেন আদতে জার্মান ও Gossner Mission– এর কর্মকাণ্ডের এর সঙ্গে জড়িত। এই প্রসঙ্গে জানা যায় যে, এই কুষ্ঠ নিরাময় কেন্দ্রটি প্রথমদিকে একটি ছোট অ্যাসাইলাম হিসেবেই গড়ে উঠেছিল, যেটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পরিবার-পরিজন ও সমাজ দ্বারা বিতাড়িত কুষ্ঠ আক্রান্তদের চিকিৎসা প্রদান করা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি পূর্ব ভারতের একটি অন্যতম কুষ্ঠ নিরাময় আরোগ্য নিকেতন হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং এটিই ছিল বাংলার সর্বপ্রথম কুষ্ঠ হাসপাতাল যার পরিসেবায় সহানুভূতিহীন ও আড়ম্বরপূর্ণ ঔপনিবেশিক চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে স্থান পেয়েছিল যত্নশীল ও বৈজ্ঞানিক আরোগ্য ব্যবস্থা।[৫]

---

[১] *Our new doctors have no clue about leprosy: Experts skeptical of India's target to eliminate the disease by 2027*, The Guardian, September 30, 2024, URL: https://www.theguardian.in.

[২] Arnold, David. (1993). *Colonizing the body: State medicine and epidemic disease in nineteenth-century India,* University of California Press, Barkley, pp. 167–69.

[৩] Harrison, Mark (1994). *Public health in British India: Anglo-Indian preventive medicine, 1859–1914* edited by Charles Webster and Charles Rosenberg, Cambridge University Press, USA, pp. 243–247.

[৪] Chatterjee, P. (1996). *"History of medical missionary work in Bengal"*, Punthi Pustak, Kolkata, pp. 87 – 89.

[৫] Coupland, H. (1911). *"Bengal District Gazette – Manbhum"*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta.

সুতরাং, এই বিষয়টি সহজেই বোধগম্য হয় যে, এই তথাকথিত কুষ্ঠ নিরাময় হাসপাতালটির ইতিহাস অনুকম্পা ভিত্তিক সেবা ও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কেই প্রতিফলিত করেছিল। এর মাধ্যমে জানা যায় যে, পুরুলিয়ার মতন একটি প্রান্তিক জেলা কীভাবে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রন ও রোগীদের পুনর্বাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে আঞ্চলিক ও জাতীয় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা- উভয়কেই প্রভাবিত করেছিল।[৬] এর পাশাপাশি এই মিশনারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা কুষ্ঠ রোগের সামাজিক দিকটিও গুরুত্ব সহকারে বিচার করেছিলেন।[৭]

পুরুলিয়া জেলার কুষ্ঠ চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিস্থিতিঃ প্রাক মিশনারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা পর্ব:

পুরুলিয়া তথা মানভূম জেলার চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল এই অঞ্চলটির পরিবেশগত অবস্থান এবং সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর অভাব। ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের ফলে এখানকার অধিবাসীগণদের প্রায় সকলেই অপুষ্টির শিকার হতেন যা তাদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে হ্রাস করেছিল। সেইকারণে, বেশিরভাগ সময় তারা অতি সহজেই কুষ্ঠ, সংক্রামক জ্বরের মতন ব্যাধির কবলে পড়তেন। অথচ, প্রচলিত আধুনিক ঔষধ অপেক্ষা নিজেদের গ্রামীণ উপাচার ও ভেষজ বিদ্যার ওপরেই সাধারণ মানুষের আস্থা ছিল; এই ভেষজ চিকিৎসার অন্যতম ছিল চালমুগরা বীজের (বৈজ্ঞানিক নাম Hydonocarpus Pentandrus)তেল যা কুষ্ঠ রোগের প্রতিকারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতিও অর্জন করেছিল।[৮]

১৯০১ সালের আদমশুমারী অনুজায়ী, মানভূম জেলায় প্রতি ১০,০০০ জনে আনুমানিক ১৯[৯] জন করে কুষ্ঠ রোগীর সন্ধান পাওয়া যেত (পুরুষ ১৯, নারী ১২) যা ছিল বাংলার অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় অনেকটাই বেশী। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন ছিল যে তৎকালীন স্থাপিত কয়েকটি ক্ষুদ্র আকারের ডিসপেনসারি এই ব্যাধির মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল না। গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে, "the district possesses but a few dispensaries, and diseases of the skin, particularly those of a leprous nature, are prevalent among the poor classes."[১০]

---

[৬] Rogers, L and Muir, E (1976). "*Leprosy: Clinical, Pathological and Immunological aspects*", William Wilkins, London, p.248.

Feenstra, P (2003). "*Leprosy Control through primary healthcare*", Leprosy Review, 73(2), pp. 111-22, *URL: https: www.researchegate.net*.

[৭] Porter, R (1997). "*The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present*", W.W. Norton & Company, New York, p.234.

[৮] Arnold, David. (1993). *Colonizing the body: State medicine and epidemic disease in nineteenth-century India,* University of California Press, Barkley, pp. 167.

[৯] *General Report of the Census of India, 1901.*

Report of International Leprosy Association on *Purulia (India), URL: https://* https://leprosyhistory.org.

[১০] Coupland, H. (1911). "*Bengal District Gazette – Manbhum*", Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta.

বছর	জেলার মোট জনসংখ্যা	কুষ্ঠ আক্রান্তদের পরিমাপক হার ৩০/১০,০০০	আনুমানিক রোগীর সংখ্যা (জন)
১৮৮১[১১]	১,০৫৮,২২৮	৩০/১০,০০০[১২]	৩,১৭৫
১৮৯১[১৩]	১,১৯৩,৩২৮	৩০/১০,০০০	৩,৫৮০
১৯০১[১৪]	১,৩০১,৩৬৪	৩০/১০,০০০	৩,৯০৪

মানভূম জেলার তিন দশকের কুষ্ঠ আক্রান্তদের পরিসংখ্যান (১৮৮১ থেকে ১৯০১)

*নিম্নলিখিত গাণিতিক সূত্রটি অনুসৃত হয়েছে:

- আনুমানিক কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা= (জেলার মোট জনসংখ্যা) / (১০,০০০) * (আক্রান্ত রোগী/জন প্রতি ১০,০০০)

'দ্য লেপ্রসি মিশন অ্যাসাইলাম' প্রতিষ্ঠা (১৮৮৮ থেকে ১৯৪৭):

পুরুলিয়া কুষ্ঠ আরোগ্য নিকেতনটি প্রতিষ্ঠার প্রাণপুরুষ ছিলেন রেভারেণ্ড উফম্যান, একজন জার্মান মিশনারি; যার উদ্দেশ্য ছিল পরিবার ও সামজিক দিক থেকে বিতাড়িত কুষ্ঠ ব্যাধি আক্রান্তদের আশ্রয় দেওয়া ও চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের আরোগ্য প্রদান করা। ১৮৮০- এর দশকের শেষের দিকে অ্যাসাইলামটিকে দুটি মাটির তৈরি ঘর এবং সাথে আরও কিছু খরের ঝুপড়ি নির্মাণ করে পূর্ববর্তী স্থান থেকে (উফম্যানের একটি ক্ষুদ্র খড়ের ঝুপড়ি) থেকে এই নবনির্মিত বাড়িটিতে স্থানান্তর করা হয়েছিল রোগী- রোগিণীদের আরও ভাল চিকিৎসা পরিসেবা দেওয়ার কারণে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই আশ্রয়স্থলটিও অপর্যাপ্ত হয়ে ওঠে।[১৫]

এই সমস্যা সমাধান কল্পে পূর্বের তুলনায় আরও অধিক পরিমাণ স্থান জুড়ে (প্রায় ৫০ একর) ভাটবন্ধ অঞ্চলে একটি নতুন নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল যার নেপথ্যে কারণ ছিল আক্রান্তদের পৃথক নারী ও পুরুষ ওয়ার্ডে ভর্তি রাখা এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো-বায়ু চলালচল করতে পারে সেটি গুরুত্ব দেওয়া।[১৬] ১৯০৫ সাল নাগাদ, এই অ্যাসাইলামটিতে প্রায় ১০০ জনের বেশী রোগী চিকিৎসা লাভ করেছিল; যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধ সরবরাহ, বিশেজ্ঞদের দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থপনার জন্য অতি দ্রুত মানভূমের ইতিহাসে এটি একটি মাইলফলক সৃষ্টি করেছিল যার মূল কাণ্ডারি ছিল একটি ব্রিটিশ সংস্থা 'দ্য লেপ্রসি মিশন', বিভিন্ন কার্যাদি

---

[১১] "*Report on the census of British India*", 1881, URL: https://www.ruralindiaonline.org.

[১২] Coupland, H. (1911). "*Bengal District Gazette – Manbhum*", Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, p. 103, retrieved from Internet Archive, URL: https://www.internetarchive.org

Das, Apalak (2020). "*Seeking the 'Truth' from 'Enumerating' Numbers: Leprosy in Census and Public Health Reports of Colonial Bengal: 1890s–1940s*". *Indian Historical Review*, Vol. 47, Issue. 2, Sage Publication, pp. 223–246, URL: https://journals.sagepub.com.

[১৩] "*District Census Handbook, Purulia*", 1891, Census of India.

[১৪] Gait, E.A (1902). "*The Lower Province of Bengal*", Part I, Government of Bengal, Kolkata, retrieved from Internet Archive, URL: https://www.internetarchive.org.

[১৫] Kakar, Sanjiv (1996). "*Leprosy in British India, 1860 – 1940: Colonial Politics and Missionary Medicine*", *Medical History*, Vol.40, Issue.2, The Cambridge University Press, pp.215 – 230.

"*History of Purulia Leprosy Home and Hospital*", International Leprosy Association, URL: https://www.leprosyhistory.org.

[১৬] "*History of Purulia Leprosy Home and Hospital*", International Leprosy Association, URL: https://www.leprosyhistory.org.

সুসংহতভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য এই সংস্থাটি পর্যাপ্ত অনুদান প্রদান করত।[১৭] ১৯১০ সালে এই স্থানটি বাংলার অন্যতম একটি প্রসিদ্ধ কুষ্ঠ রোগ নির্মূল কেন্দ্রের স্থান অর্জন করেছিল।[১৮]

নারীদের ভূমিকা:

আরোগ্য নিকেতনটিতে তৎকালীন নারীদের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে মনোযোগের দাবি রাখে। কারণ সেইসকল কুষ্ঠ রোগিণী যারা কিনা নিজেদের আপনজন দ্বারা বিতাড়িত হতেন, তাদের জন্য একটি নিরাপত্তার স্থান ছিল এক কেন্দ্রটি; অ্যাসাইলামটির নার্স বা সেবিকাগণদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রিটেন ও মাদ্রাজের মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রশিক্ষিত। এই সেবিকারা কিছু স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন শুরু করেছিলেন, যার ফলে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল। এই কেন্দ্রটির আরও একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, আরোগ্য প্রাপ্ত রোগিণীদের এখানে সেবিকা হিসাবে নিজুক্ত করা হয়ে থাকত। এই নতুন ব্যবস্থাটি পরবর্তীকালে অন্যান্য বহু মিশনারি হাসপাতালেও অনুসৃত হয়েছিল।

Decline of the Number of Leprosy Sufferers in Bengal (Manbhum), 1881–1901

ক্ষতিগ্রস্ত/প্রভাবিত অঞ্চলের নাম	পুরুষ[১৯]			নারী		
ক্রমিক নং ১ – ৯	**১৯০১**	**১৮৯১**	**১৮৮১**	**১৯০১**	**১৮৯১**	**১৮৮১**
১. হাজারিবাগ	১৫	২০	২৬	৯	১৩	১৫
২. রাঁচি	৩৫	৩৭	_____	১৩	____	____
৩. পালামৌ	২৩	_____	৪০	১৮	২০	২৬
৪. মানভূম	১৮৬	১০৭	১৬০	১২০	১৩৯	৮৭
৫. সিংভূম	৪৭	৪৮	৫২	৩২	২৪	৪৪
৬. সাঁওতাল পরগণা	১২২	৫৭	৬৯	৫০	২৫	৩২
৭. আঙুল	৭৭	৭৩	১৬৩	৩৯	৩৮	৭৮
৯. ডিট্টো ছোট নাগপুর	৪০	২৬	৯৬	২৫	১০	১২
মোট সংখ্যা	৬৩৪	৩৮৭	৭০৬	৩৩৯	৩০৯	৩৪৭

পরিসংখ্যান মাপক: আক্রান্ত রোগী জন প্রতি ১০০,০০০

ঔপনিবেশিক থেকে ঔপনিবেশিকত্তোর যুগঃ ‘অ্যাসাইলাম থেকে ‘হাসপাতাল’– এর পদমর্যাদা প্রাপ্তি:

১৯৪৭ সাল ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর মিশনারি হাসপাতালসমূহ নবগঠিত জনস্বাস্থ্য নীতিগুলির ভিত্তিতে নিজেদের কার্যক্রমগুলিকে পুনর্গঠন করতে শুরু করেছিল। তদানিন্তন সরকারের কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, যা প্রাথমিক রোগীদের পৃথকীকরণ নীতির ওপর নির্ভরশীল ছিল, তার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সম্প্রদায়ভিত্তিক আক্রান্তদের সনাক্তকরণ কার্যক্রম ও বহির্বিভাগীয় সেবা বা ‘outpatient department’। এই নব সরকারী নীতির

[17] *“History of Purulia Leprosy Home and Hospital”*, International Leprosy Association, URL: https://www.leprosyhistory.org.

[18] “Annual *Health* Report of the Bengal”, Public Health Department, Government of Bengal, 1915, Calcutta, p.203.

[19] *Census of India, Bengal*, Vol.6, Part I, 1901, p.295. Das, Apalak, *“Seeking the Truths from Enumerating Numbers: Leprosy in Census and Public Health Reports of Colonial Bengal, 1890s – 1940s”*, Indian Historical Review, vol.2, Issue. 47, Sage Publication, p. 232, December, 2020, DOI: 10.1177/0376983620968008, URL: https://www.researchgate.net

প্রেক্ষিতে ১৯৫৫ সালে পুরুলিয়ার কুষ্ঠ আরোগ্য নিকেতনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্য লেপ্রসি মিশন ট্রাস্টের অধীনে 'অ্যাসাইলাম' থেকে 'হাসপাতাল'– এর পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছিল। এর দরুন প্রতিষ্ঠানটিতে বেশ কিছু নতুন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া শুরু হয়েছিল, অপারেশন থিয়েটার নির্মাণ করা হয়েছিল এবং একটি সার্জারি ইউনিটও চালু করা হয়েছিল।[২০]

ব্র্যান্ড রিকনস্ট্রাকটিভ শল্যচিকিৎসা:

১৯৫০– এর দশকে দক্ষিণ ভারতের ভেলরে রিকনস্ট্রাকটিভ শল্যচিকিৎসার জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন 'ডা. পল ব্র্যান্ড'। এরফলে বিশ্বব্যাপী তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল এবং এই অস্ত্রপচার পদ্ধতি পরিচিত হয়েছিল 'ব্র্যান্ড শল্যচিকিৎসা' হিসাবে। পুরুলিয়ার এই হাসপাতালটিতেও ডা. ব্র্যান্ডের পদ্ধতি অনুসরণ করে শল্যচিকিৎসকদের অস্ত্রপচারের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছিল।[২১]

ফিজিওথেরাপি এবং বিকলঙ্গতা প্রতিরোধ ব্যবস্থা:

শল্যচিকিৎসার পাশাপাশি হাসপাতালটিতে ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা এবং কৃত্তিম ও ব্যবহারপযোগী জুতো বা পাদুকা তৈরির একটি বিশেষ কর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা কুষ্ঠরোগীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে বিবেচ্য।[২২]

সামাজিক সমন্বয়:

১৯৭০– এর দশকে এই তথাকথিত হাসপাতালটি পুরুলিয়া ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক পরিচালনা করতে শুরু করেছিল। এই প্রচেষ্টার ফলে কুষ্ঠ রোগীদের প্রাথমিক স্তরেই সনাক্তকরণ, চিকিৎসা এবং পরবর্তীতে রোগীদের স্বাভাবিক জীবনস্রোতে ফিরে আসতেও সহায়ক হয়েছিল।

পুরুলিয়ার চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে হাসপাতালটির গুরুত্ব:

পুরুলিয়ার চিকিৎসাব্যবস্থার বিকাশের ধারায় 'TLM' ছিল প্রথম স্থায়ী bio-medical প্রতিষ্ঠান, যা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হয়ে চলেছে। ১৯৬০ সালে এই জেলাটিতে একটি জেনারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে হাজার হাজার সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীর কুষ্ঠ সহ অন্যান্য প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুদায়িত্ব ছিল এই তথাকথিত 'TLM' হাসপাতালটির ওপর, যেটির অন্যতম অবদান হল,

(ক) কুষ্ঠের কারণে হওয়া বিভিন্ন প্রকার ক্ষত নিরাময় এবং ত্বকের রোগের বিভিন্ন বিষয়ে নার্সদের এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(খ) ১৯৮০– এর দশক থেকে জাতীয় কুষ্ঠ শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে একযোগে এই ব্যাধিটিকে প্রতিরোধে সহায়তা করা।

(গ) মহামারী সংক্রান্ত নথিপত্র রক্ষানবেক্ষণের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন পরিকল্পনায় সহায়তা করা ইত্যাদি।

কুষ্ঠ ব্যাধিটির সামাজিক দিকঃ ছুঁৎমার্গ, পুনর্বাসন ও মানবিকতা:

কুষ্ঠ– এই ব্যাধিটি দীর্ঘদিন যাবৎ নানাপ্রকার পুরানো ধ্যানধারণার ভারে জর্জরিত। উপরন্তু এই রোগটিকে একটি সামাজিক কলঙ্ক হিসাবেও বিবেচনা করা হত এবং বর্তমানেও বহু জেলা ও স্থানে এই রোগটিকে এইরুপ দৃষ্টিভঙ্গিতে

---

[২০] *"Purulia Hospital"*, Leprosy Mission India (TLM), retrieved from leprosymission.in, URL: https://www.leprosymission.in.

[২১] Muir. E and Roger. L (1976). *"Leprosy: Clinical, Pathological and Immunological aspects"*, William and Wilkins, London, p.249.

[২২] Feenstra, P (2003). *"Leprosy Control through primary healthcare"*, Leprosy Review, 73(2), pp. 111-22, URL: https://www.researchgate.net.

বিচার করা হয়ে থাকে। সেই কারণেই, ১৯৮০- এর দশকে এই ব্যাধিটি প্রতিকারের জন্য বহুমুখী চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত থাকার পরেও, পুরুলিয়ার মতন জেলার আক্রান্তরা বৈষম্যের শিকার হতেন। এইকারণেই এই হাসপাতালের অধীনস্থ 'স্নেহলয় হোম' দীর্ঘদিন ধরে একটি আবাসিক কেন্দ্র হিসাবে সেইসকল মানুষদের জন্য বিশেষ করে নারীদের জন্য নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হিসাবে গুরুত্ব পেয়ে আসছে যারা নিজ পরিবার দ্বারা বিতাড়িত হয়েছেন।[২৩]

সেলাই, কৃষি ও কারুশিল্পে বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে রোগী-রোগিণীদের স্বাবলম্বী করে তুলতেও এই হাসপাতালটি যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই হাসপাতালটি তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানব জীবনে চিকিৎসা ব্যবস্থার গুরুত্বকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করেছিল এইরূপে- 'শুধুমাত্র রোগ নিরাময় নয়, তার পাশাপাশি নিজে স্বাবলম্বী হওয়া ও মর্যাদার সহিত বাঁচা।' এই প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ রয় পটারের উক্তি উল্লেখযোগ্য "The History of Medicine is also the history of compassion", যার মূর্ত প্রতীক পুরুলিয়া কুষ্ঠ মিশন হাসপাতাল।[২৪]

গবেষণা প্রকল্প, শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচার:

১৯৮০ ও ৯০- এর দশকে এই হাসপাতালটি ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার সূচনা করেছিল; নিউরোপ্যাথি, আলসার প্রতিরোধ, drug resistance, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ প্রদান 'World Health Organization' বা সংক্ষেপে 'হু' দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছারাও 'Indian Council of Medical Research (ICMR) এবং কোলকাতার 'School of Tropical Medicine' - এই দুই অন্যতম প্রসিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাসপাতালের মানদণ্ডকে আরও উন্নত করে তোলার প্রয়াস হয়ে চলেছে।[২৫]

সমকালীন প্রতিবন্ধকতা:

২০০৫ সালে কুষ্ঠ নামক ব্যাধিটিকে জাতীয় জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করা হলেও ও তা নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হলেও পুরুলিয়ার মতন প্রান্তিক জেলাটিতে এখনও বার্ষিক নতুন কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এর নেপথ্যে আছে নিম্নলিখিত প্রতিবন্ধকতাগুলি-

(১) কুষ্ঠ রোগটিকে নিয়ে এখনও গ্রামবাংলার মানুষের ছুঁৎমার্গের অবসান ঘটেনি; ফলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিক পর্যায়ের রোগী সনাক্তকরণ সম্ভবপর হয়না।

(২) মূল মিশন অর্থাৎ 'The Leprosy Mission Trust' - এর অনুদান হ্রাসের ফলে বরাদ্দ তহবিলের সীমাবদ্ধতা।

(৩) গ্রামবাংলায় দক্ষ সার্জন ও ফিজিওথেরাপিস্টদের অপ্রতুলতা।

(৪) সরকারী হাসপাতালের অপেক্ষাকৃত উন্নত পরিকাঠামোর সঙ্গে মোকাবিলা।

তবে, এই প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই জারি রেখেই সম্প্রতি হাসপাতালের পক্ষে 'digital patient tracking', 'telemedicine consultation' এবং কুষ্ঠ সম্পর্কে জনসচেতনতা অভিযানের ব্যবাস্থাপনার মাধ্যমে এই ব্যাধটিকে বাংলা সহ ভারতবর্ষ থেকে নির্মূল করার অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।[২৬]

---

[২৩] *"Purulia Hospital"*, Leprosy Mission, Northern Ireland, October, 2025, URL: https://www.tlm-ni.org.

[২৪] Poter, Roy (1997). *"The Greatest Benefit to the Mankind: A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present"*, W.W.Norton and Company, New York, p.234.

[২৫] *"An Update from Purulia Hospital"*, Leprosy Mission, UK, September 18, 2018, URL: https://www.leprosymission.org.uk.

[২৬] "People affected by Leprosy in India: Face stigma reinforced by cruel colonial law", November 10, 2015, URL: *https://www.theguirdian.in*.

উপসংহার:

পুরুলিয়ার লেপ্রসি মিশন হাসপাতাল বাংলার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, যেখানে মানবিকতা ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মেলবন্ধনের এক অনন্য ঐতিহ্য রচিত হয়েছিল। ১৮৮০- এর দশকে উফম্যানের ছোট্ট খড়ের ঘর থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির পথচলা শুরু হয়ে বর্তমানে আধুনিক অস্ত্রপচার সমৃদ্ধ হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হওয়া- এই প্রতিষ্ঠানটির বিবর্তন কুষ্ঠ রোগ চিকিৎসার রূপান্তর এবং সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকাশের বিস্তৃত গতিপথ- উভয়কেই প্রতিফলিত করেছে। এই কেন্দ্রটি বাংলার অনুন্নত জেলাগুলির অন্যতম মানভূম বা পুরুলিয়াতে পেশাদার নার্স, উন্নত অস্ত্রপচার এবং প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে পথ প্রদর্শক, যা জনস্বাস্থ্য পরিষেবার মান নির্ধারণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

চিকিৎসার জগতে বিভিন্ন সাফল্যের বাইরেও এই হাসপাতালটি একটি নীতিগত আরোগ্য ব্যবস্থার প্রতীক হিসাবে স্বনামধন্য, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রান্তিক মানুষগুলিও ততটাই উন্নত ও মানবিক চিকিৎসার যোগ্য দাবি রাখে যতটা শহরকেন্দ্রিক জনগণ। বর্তমানেও, পুরুলিয়ার ন্যায় সীমান্ত জেলাগুলি যখন স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বৈষম্যের শিকার হয়ে চলেছেন, সেই পরিস্থিতিতে এই শতাব্দীপ্রাচীন কুষ্ঠ হাসপাতালটি প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে প্রমাণ করেছে, বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং মানবিক চিন্তাভাবনায় অনুপ্রাণিত সেবাকার্য শুধুমাত্র কোনো একজন ব্যক্তি নয়, বরং সমগ্র সম্প্রদায়কে রূপান্তর করতে সক্ষম।

গ্রন্থপঞ্জি:

প্রাথমিক উৎস:

১. Coupland, H. (1911). *Bengal District Gazette – Manbhum.* Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta.

২. *Annual* Health *Report of the Bengal.* Public Health Department, Government of Bengal, 1915, Calcutta.

৩. *Report on the census of British India*. 1881, URL: https://www.ruralindiaonline.org.

৪. *District Census Handbook, Purulia*. 1891, Census of India.

৫. Gait, E.A (1902). The Lower Province of Bengal, Part I. Government of Bengal, Kolkata, retrieved from Internet Archive, URL: https://www.internetarchive.org.

৬. *Census of India, Benga*l, Vol.6, Part I, 1901.

৭. *General Report of the Census of India, 1901*.

৮. Report of International Leprosy Association on Purulia (India), *URL:* https://www.leprosyhistory.org.

গৌণ উৎস:

গ্রন্থ পরিচয়:

১. Arnold, D. (1993). *Colonizing the body: State medicine and epidemic disease in nineteenth-century India.* University of California Press, Barkley.

২. Harrison, M. (1994). *Public health in British India: Anglo-Indian preventive medicine. 1859–1914* edited by Charles Webster and Charles Rosenberg, Cambridge University Press.

৩. Chatterjee, P. (1996). *History of medical missionary work in Bengal*. Punthi Pustak, Kolkata.

৪. Porter, R (1997). *The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present.* W.W. Norton & Company, New York.

গবেষণামূলক প্রবন্ধ:

১. Rogers, L and Muir, E (1976). *Leprosy: Clinical, Pathological and Immunological aspects*. William Wilkins, London.

২. Feenstra, P (2003). *Leprosy Control through primary healthcare*. Leprosy Review, 73(2), pp. 111-22, URL: *https://www.researchgate.net*.

৩. Das, A. *Seeking the Truths from Enumerating Numbers: Leprosy in Census and Public Health Reports of Colonial Bengal, 1890s – 1940s.* Indian Historical Review, vol.2, Issue. 47, Sage Publication, p. 232, December, 2020, DOI: 10.1177/0376983620968008, URL: *https://www.researchgate.net*.

৪. Kakar, S. (1996). *Leprosy in British India, 1860–1940: Colonial Politics and Missionary Medicine*", *Medical History*. Vol.40, Issue.2, The Cambridge University Press, pp.215 – 230.

ওয়েবসাইট:

১. *Our new doctors have no clue about leprosy: Experts skeptical of India's target to eliminate the disease by 2027*, The Guardian, September 30, 2024, URL: *https://www.theguardian.in*.

২. "*History of Purulia Leprosy Home and Hospital*", International Leprosy Association, URL: *https://www.leprosyhistory.org*.

৩. "*Purulia Hospital*", Leprosy Mission India (TLM), retrieved from leprosymission.in, URL: *https://www.leprosymission.in*.

৪. "*An Update from Purulia Hospital*", Leprosy Mission, UK, September 18, 2018, URL: https://www.leprosymission.org.uk.

৫. "People affected by Leprosy in India: Face stigma reinforced by cruel colonial law", November 10, 2015, URL: *https://www.theguirdian.in*.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 467- 472
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.229

প্রসঙ্গ ধর্ম: যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংলাপের আলোকে একটি সমীক্ষা

পার্থসারথি অধিকারী, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The great epic *Mahabharata* contains many gems of wisdom, and among them the *Yaksha Yudhiṣṭhira Prashnattorparva* or dialogue is important one. In the *Vana Parva*, the dialogue between *Yaksha*, the God of *Dharma*, and his son *Yudhiṣṭhira* unfolds as a philosophical inquiry into the nature of righteous living and the ultimate purpose of human existence. The Yaksha's numerous questions, broadly aligned with the domains of *Dharma* and *Moksha*, serve as a gateway to understand both ethical conduct and the spiritual destiny of human life. This article will examine the multidimensional nature of *dharma* as reflected in this dialogue.

Keywords: Mahabharata, Yaksha, Yudhiṣṭhira, Yaksha Prashna, Dharma, Moksha

ধর্ম মানবজীবনের এক অন্যতম মৌলিক ও জটিল ধারণা। প্রাচীনকাল থেকেই মানবসভ্যতা ধর্মের অর্থ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ নিয়ে চিন্তিত। বেদ, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, মনুস্মৃতি প্রভৃতিতে ধর্মকে কখনো নৈতিক শৃঙ্খলা, কখনো সামাজিক কর্তব্য, আবার কখনো আত্মোপলব্ধির পথ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এত বহুমাত্রিক ব্যাখ্যার মাঝেও প্রশ্ন থেকে যায়— ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কী? ধর্ম কি কেবল আচারের বিধি, নাকি মানবজীবনের নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষের একটি আন্তরিক প্রয়াস? এই অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতেই যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর পর্বকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গ ধর্ম আলোচিত হবে।

'ধর্ম' শব্দটির নানা ব্যুৎপত্তিগত ও প্রয়োগগত অর্থ রয়েছে; লোকধারক, শ্রেয়, শুভদৃষ্ট, পূণ্য, চতুর্বর্গের এক, আচার, আনুষ্ঠানিকতা, শাস্ত্রবিধি, অনুশাসন, সম্প্রদায় বিশেষের আচার, ন্যায়, বিচার, নীতি, স্বভাব, গুণ, লক্ষণ, উপমা, অভিধেয়বস্তু, যজ্ঞাদি, ঈশ্বর, আত্মা, যম, এমনকি যুধিষ্ঠির প্রমুখ অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই বহুবিধ অর্থবাহী 'ধর্ম' শব্দটি ভারতীয় জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। এমনকি অভারতীয় ঐতিহ্যেও এর প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। এই শব্দের মধ্য দিয়েই ভারতীয়রা যুগ যুগ ধরে তাদের লক্ষ্য, কামনা, আত্মশুদ্ধি, নৈতিক চেতনা এবং বোধকে পরিচালিত করেছে। ব্যক্তি যখন ধর্মের মৌলিকতাকে হারায়, তখন সমাজে কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং কৃত্রিম আচরণবাদের বিস্তার ঘটে। এই বিচ্যুতি যখন চরমে পৌঁছায়, তখনই ইতিহাস দেখেছে— মহামানবেরা আবির্ভূত হয়েছেন। তারা নতুন রূপে ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আচার-বিচারের খোলস ভেঙে ধর্মের মূল আত্মাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, "মানুষই ব্রহ্ম"— এই গভীর সত্যই ধর্মের মূলে নিহিত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃত ভাষায় 'ধর্ম' শব্দটি অনেক গভীর ও বিস্তৃত অর্থ বহন করে। 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে মন্ প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দ নিষ্পন্ন, যার মূল অর্থ হল— ধারণ করা, আশ্রয় দেওয়া বা পালন করা। এই ধারণক্ষমতাই ধর্মের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। ধর্মের বিভিন্ন অর্থের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থই প্রকাশ পেয়েছে।

অতএব, ধর্ম একটি সর্বজনীন ধারণা, যা জড় ও চেতন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক, প্রাকৃতিক ও নৈতিক— সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটাই ভারতীয় দর্শনের ধর্মবোধের মৌলিকতা, যা পাশ্চাত্য 'religion' ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ধর্মের ক্ষেত্রে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল— ধর্মের ক্ষেত্রে দুটি উপাদান থাকে, এই দুটি উপাদানের মধ্যে একটা সম্বন্ধ বর্তমান। এই সম্বন্ধ অযুতসিদ্ধ।

পাশ্চাত্য সমাজে 'religion' শব্দটির অর্থ একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতি, যেখানে আধ্যাত্মিক অনুশাসন প্রধান, কিন্তু তা দর্শন বা বাস্তব আচরণধর্মী কর্তব্যের দিক থেকে সীমিত। 'ধর্ম' শব্দটিকে যখন ইংরেজির 'religion' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করি, তখনই মূলত মূল ভাবের অপচয় ঘটে এবং একটি সংকীর্ণতা জন্ম নেয়। এর ফলেই আমাদের মধ্যে, বিশেষত শিক্ষিত সমাজে, 'ধর্ম' শব্দকে 'ধর্ম নাম' অর্থাৎ হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায়-নির্ভর এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ের সাথে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা জন্ম নেয়।

ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচলিত ও প্রাচীন ধর্মীয় ধারা হল বৈদিক ধর্ম। বৈদিক ধর্মে 'ধর্মের' পরিভাষা হল, বেদ প্রতিপাদিত অনুষ্ঠান বিধিপূর্বক পালন করা। *"বেদপ্রতিপাদ্যঃ প্রয়োজনবদর্থো ধর্ম ইতি"* [১] এটি রুঢ়বাদী ব্যাখ্যা। অর্থাৎ সেই ব্যাখ্যা যা প্রাচীনকাল থেকে ধর্মীয় পরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও গৃহীত হয়েছে। বেদে মানুষের ধ্যেয়ের বিষয় নিশ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। তাই ধ্যেয়ের প্রাপ্তির জন্য ধর্মের এইরূপ পরিভাষা। যার দ্বারা অভ্যুদয় ও নি:শ্রেয়স এর প্রাপ্তি হয় তাই হল ধর্ম। *"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"* [২] যা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভের হেতু তাই ধর্ম। অভ্যুদয়ের অর্থ হল লৌকিক উন্নতি, তথা নি:শ্রেয়স হলো পারমার্থিক উন্নতি। ধর্মের এরূপ ব্যাখ্যা রূঢ়বাদী ব্যাখ্যার মধ্যে অন্তর্গত। কারণ, অভ্যুদয় ও নি:শ্রেয়স এর প্রাপ্তিই হল বৈদিক অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। যা বেদে নির্দেশিত, যা ঋষিগণ উপলব্ধি করেছেন, যা তর্কসম্মত ও শাস্ত্রসম্মত, তা-ই ধর্ম।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে, যাগাদি বৈদিক কৃত্যসমূহই ধর্ম, এবং যারা এই ধর্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত, তারাই প্রকৃত অর্থে ধার্মিক। যাগাদির অনুষ্ঠান শুভ সংস্কার উৎপন্ন করে, আর সেই সংস্কার শুভফল প্রদান করে।

"বিহিতক্রিয়াসাধ্যঃ ধর্ম্মঃ পুংসো গুণোমতঃ।
প্রতিসিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ সগুনোঽধর্ম্ম উচ্যতে।।
ধর্ম্মশ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদ্যসাধং।" [৩]

অর্থাৎ,
যে গুণ বিহিত ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়, তাকেই ধর্ম বলা হয়। আর যে গুণ প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা সাধিত হয়, তা অধর্ম। ধর্ম হল সেই যা শ্রেয়স্কর, অর্থাৎ যা অভ্যুদয় তথা পারমার্থিক ও লৌকিক মঙ্গলের উপায়।

উক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ধর্ম শব্দটি সেই সকল ক্রিয়াকে নির্দেশ করে, যা শাস্ত্রে বিহিত। শাস্ত্রে যেসব কার্যের বিধান আছে— যেমন যাগ, হোম, দান, তপস্যা ইত্যাদি— সেগুলির অনুশীলন করলেই ধর্মের সাধন হয়। আর যেসব কার্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বা প্রতিষেধিত— যেমন হিংসা, চুরি, মিথ্যাচার ইত্যাদি— তাদের অনুশীলন করলে অধর্ম সাধিত হয়।

তবে এই পর্যায়ে একটি আপাত-দৃষ্টিতে বিতর্কযোগ্য বিষয় লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে, যাগাদি কর্মে পশুহিংসা থাকে, ফলে তা অধর্ম। কিন্তু মীমাংসা দর্শন, স্মৃতি ও বৈদিক শাস্ত্রসমূহে বিশদভাবে মীমাংসা করা হয়েছে যে, এখানে হিংসা উদ্দেশ্য নয়, উপায়। যেহেতু যাগাদি কর্ম বেদ দ্বারা বিহিত, তাই তা ধর্ম। বরং উক্ত বিহিত কর্ম না করাটাই অধর্ম।

বৈদিক পরম্পরায় 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ বহুবিধ হলেও, সামাজিক ও আচারগত ক্ষেত্রে তা এক বিশেষ নীতি বা বিধানের প্রতীক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— প্রত্যেক বর্ণের ধর্ম ভিন্ন; তেমনি প্রত্যেক আশ্রমেরও ধর্ম স্বতন্ত্র। যে কর্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে অধর্ম, সেই একই কর্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম ধর্ম হতে পারে। অর্থাৎ, ধর্ম সার্বজনীন একক নিয়ম নয়—বরং ব্যক্তি, কাল, স্থান ও পরিস্থিতি অনুসারে তার রূপ পরিবর্তিত হয়। প্রত্যেক বর্ণাশ্রমের জন্য নির্দিষ্ট কিছু আচরণ

[১] অর্থসংগ্রহ— ১/২
[২] বৈশেষিকসূত্র— ১/১/২
[৩] মীমাংসাসুত্র—১/২

ও বিধি-নিয়ম আছে; সেই সকল বিধির যথাযথ পালনের নামই ধর্ম। আর সেই বিধি লঙ্ঘনই অধর্ম। ধর্মাচরণের ফলস্বরূপ সুখ এবং অধর্মাচরণের ফলস্বরূপ দুঃখের উৎপত্তি ঘটে।

এখন প্রশ্ন হল ধর্ম কি; শাস্ত্রের পৃষ্ঠায় লেখা কিছু বিধি? কোনো দেবতার পাদপদ্মে অর্ঘ্য নিবেদন? না কি আত্মার গভীর থেকে জেগে ওঠা আলো, যা অন্ধকারেও ন্যায়ের পথ চিনে নেয়? যুধিষ্ঠির যখন যক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে, তখন তার হাতে কোনো ধর্মশাস্ত্র ছিল না, ছিল না পুরোহিতের বাণী কিংবা কোনো দেববাণী। ছিল কেবল তাঁর অভিজ্ঞতা, বিবেক আর মনুষ্যত্ব। তিনি ধর্মকে খুঁজেছেন মানুষের ভিতর— বিরাট কোনো তত্ত্বে নয়, হৃদয়ের সংবেদনশীলতায়। তিনি বলেন, 'ধর্ম হল অন্তর্জাত সত্যবোধ; যা দুঃখের মাঝেও করুণা জাগায়, যা সংকটেও ন্যায়ের পথ বেছে নেয়।'

এখন দেখবো যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলি করেছিলেন এবং যুধিষ্ঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন সেই ধর্ম কেমন। আসলে যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংলাপ মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত আরণ্যক উপপর্বের অংশ। এই সংলাপ কেবল পৌরাণিক বা কাহিনি নির্ভর নয়, বরং এটি মানবজীবনের মূল্যবোধ, ধর্মবোধ এবং মানবতাবাদের এক প্রতীকী রূপ। যুধিষ্ঠিরের উত্তরের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে সেই মানবিক বোধ, যেখানে ধর্ম কেবল নিয়ম নয়, বরং মানবতার সচেতন সত্তা।

যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে বহু প্রশ্ন করেছেন, তার মধ্যে একটি হল, *কিং "স্বিদ্ধর্ম্মং সনাতনম্"* [৪] অর্থাৎ, শাশ্বত স্বধর্ম কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "*সনাতনঃ সত্যধর্ম্মো"* [৫] অর্থাৎ, সনাতন ধর্ম হলো সত্য। এরকম উত্তর দেওয়ার কারণ হল 'সত্য' স্থান, কাল, সমাজ, সংস্কৃতি ভেদে অপরিবর্তনীয়। এই শাশ্বত ধর্ম সম্প্রদায়ভিত্তিক কোন পরিচয় বহন করে না; জীবনের যাপনকে একটা মাত্রা দেয়। যে মাত্রা মুক্তির পথ প্রশস্ত করে। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা যায়, মনুসংহিতায় ধর্মের যে দশটি লক্ষণ উল্লেখ আছে, তার মধ্যে সত্য অন্যতম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার জৈন বা বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চব্রত— অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ— এর মধ্যে সত্য অন্যতম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সত্য কেবল মৌখিক সত্য নয়; কায়, মন ও বাক্যে সত্য।

এটি সেই চিরন্তন সত্য— যাকে উপনিষদে ব্রহ্ম, আত্মা, ঋত, সত্য বা সর্বব্যাপী চৈতন্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে, *"সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম"* [৬]— ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত।

যক্ষের আর একটি প্রশ্ন হল, "*কিং স্বিদেকপদং ধর্ম্ম্যং"* [৭] অর্থাৎ, ধর্মকে একটিমাত্র শব্দে প্রকাশ করলে, তা কী হবে? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "*দাক্ষ্যমেকপদং ধর্ম্ম্যং"* [৮] অর্থাৎ ধর্মকে একটিমাত্র শব্দে প্রকাশ করলে, তা হবে দক্ষতা। এখানে দক্ষতা বলতে কর্মক্ষমতা এবং নৈতিকতা উভয়ই। ধর্মের জন্য কর্মক্ষমতাকে নৈতিকভাবে পরিচালিত করা। নীতিসম্মত কর্মক্ষমতাই হল ধর্ম।

শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ধর্ম কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়; ধর্ম তখনই বাস্তবায়িত হয়, যখন মানুষ তার দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করতে সক্ষম হয়। তাই সত্য, অহিংসা, দয়া, ন্যায়— এসব গুণ যতই সুন্দর হোক, যদি জীবনে সেগুলোকে যথার্থভাবে রূপায়ণ করার সামর্থ্য না থাকে, তবে ধর্ম অপূর্ণ থেকে যায়। এই কারণে দক্ষতাকে ধর্মের প্রধান ভিত্তি বলে ধরা হয়েছে। দক্ষতাই ধর্মকে জীবিত করে রাখে। শুধু নীতি জানা বা আদর্শ মানলেই ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না; সেই আদর্শকে কর্মে পরিণত করার যোগ্যতাই ধর্মের প্রকৃত প্রাণ। এই উপলব্ধি মানুষকে বাস্তবজীবনে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে দক্ষতার সঙ্গে চলতে শিক্ষা দেয়।

যক্ষের আর একটি প্রশ্ন হল, "*কশ্চ ধর্ম্মঃ পরো লোকে"* [৯] অর্থাৎ, বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "*আনৃশংস্য পরো ধর্ম্ম"* [১০] অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম হলো দয়া, করুণা এবং অহিংসা। যুধিষ্ঠির এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে,

---

[৪] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্বে, ২৬৭/৫৯, পৃষ্ঠা-২৫৬৫।

[৫] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্বে, ২৬৭/৬০, পৃষ্ঠা-২৫৬৫।

[৬] তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ব্রহ্মানন্দবল্লী— ২.১.১

[৭] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্বে, ২৬৭/৬৩, পৃষ্ঠা-২৫৬৬।

[৮] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্বে, ২৬৭/৬৪, পৃষ্ঠা-২৫৬৬।

[৯] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৬৯, পৃষ্ঠা-২৫৬৮।

[১০] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৭০, পৃষ্ঠা-২৫৬৮।

সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার সবচেয়ে কার্যকর নীতি হল দয়া, করুণা এবং অহিংসা। এটা মনে করা হয় যে, যে রাজা দয়া জানে না, সে রাজা ন্যায় করতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি করুণা জানে না, সে ধর্ম পালন করতে পারে না। আর যে জীবন অন্যকে কষ্ট দেয়, তা কখনো পূণ্যময় হয় না। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা যায়, হিতোপদেশে যে *"আত্মবৎ সর্বভূতেষু"*[১১] — অর্থাৎ সব জীবকে নিজের মতো করে দেখা— যে উচ্চ আদর্শের কথা বলা হয়েছে, আনৃশংস্য তারই ব্যবহারিক রূপ।

যুধিষ্ঠিরের এই উত্তর তাই কেবল নৈতিক নয়; এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। কারণ, ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই হলো চিত্তকে বিশুদ্ধ করা, অহংকে দূর করা, এবং মানবসত্তাকে তার নিজস্ব উজ্জ্বল, শান্ত, চৈতন্যময় রূপে প্রকাশ করা। যদি ধর্ম মনকে কঠোর করে তোলে, যদি তা বিভেদ সৃষ্টি করে, যদি তা রাগ বা হিংসা জন্মায়—তবে সেই ধর্ম ধর্ম নয়, বরং আবরণমাত্র।

আবার যক্ষের আর এক প্রশ্ন হল, *"কশ্চ ধর্ম্মঃ সদাফলঃ"* [১২] অর্থাৎ, কি সেই ধর্ম যা সর্বদা ফল দেয়? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, *"ত্রয়ীধর্ম্মঃ সদাফলঃ"*[১৩] অর্থাৎ, বেদত্রয় দ্বারা নির্ধারিত ধর্ম সর্বদাই ফলপ্রদ। ত্রয়ী বলতে বোঝানো হয়েছে তিনটি বেদ (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, এবং সামবেদ)। যুধিষ্ঠির এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, বেদত্রয়ের দ্বারা প্রণীত ধর্ম সর্বদা সুফল দেয়। এই ধর্মে বিধৃত রয়েছে সৎপথে চলার নীতি, যা মানুষকে মঙ্গলময় জীবনের পথে পরিচালিত করে। বেদত্রয় মানুষকে নৈতিকতা, পরোপকার, সত্য এবং আত্ম-সংযমের শিক্ষা দেয়, যা সর্বদা ফলপ্রসূ। এই ত্রয়ী বেদ প্রসঙ্গে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। যেমন, *"কিমেকং যজ্ঞিয়ং সাম"*[১৪] অর্থাৎ, সামবেদে যজ্ঞের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, *"প্রাণো বৈ যজ্ঞিয়ং সাম"*[১৫] অর্থাৎ, যজ্ঞের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হল প্রাণ। উপনিষদে উক্ত হয়েছে 'ঋকবেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। ঋকবেদ শব্দ স্বরূপ, যজুর্বেদ মন স্বরূপ, সামবেদ প্রাণ স্বরূপ। অর্থাৎ, ঋক্‌বেদের উচ্চারণে ভাষার প্রকাশ, যজুর্বেদের যজ্ঞে মনের নিয়োগ এবং সামবেদের সুরে প্রাণের স্পন্দন— এই ত্রিমুখী ঐক্যেই বেদের সামগ্রিক সত্য প্রকাশিত হয়। যুধিষ্ঠির যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল— যজ্ঞ কেবল দেহগত নয়, এটি প্রাণ, মন ও শব্দের একত্র সাধনা। প্রাণ থেকে শক্তি, মন থেকে সংকল্প, এবং ঋগ্বেদ থেকে দিকনির্দেশ— এই তিনে মিলেই যজ্ঞ পূর্ণ হয়। যখন মানুষ কেবল নিজের জন্য নয়, অন্যের কল্যাণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে, যখন কোনো কাজ শুধুই অর্জনের জন্য নয়, সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে উৎসর্গিত হয়, তখনই সেটি প্রকৃত যজ্ঞ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, যজ্ঞ এখানে নৈতিক শক্তির এক মানবতাবাদী রূপান্তর।

এইভাবে বহু জটিল প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে এই যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংলাপে। এই ক্ষুদ্র পরিসরে যক্ষের সকল প্রশ্ন এবং যুধিষ্ঠিরের উত্তর তুলে ধরা অসম্ভব। তবে, যক্ষের সন্তুষ্টি বাক্য এবং বর প্রদান অংশ এখানে তুলে না ধরলেই নয়। যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়ার পর যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, "*তস্মাত্ত্বমেকং ভ্রাতৃণাং যমিচ্ছসি স জীবতু।।*"[১৬] অর্থাৎ "তোমার ভ্রাতাদের মধ্যে তুমি একজনকে বাঁচাতে পারবে, যাকে তুমি বাঁচাতে চাও, সে-ই জীবিত হয়ে উঠবে।" উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "*শ্যামো য এষ রক্তাক্ষো বৃহচ্ছালঃ ইবোচ্ছ্রিতঃ। ব্যূঢ়োরস্কো মহাবাহুর্নকুলো যক্ষ! জীবতু।।*"[১৭] অর্থাৎ, শ্যাম বর্ণ ব্যক্তি, যার লাল চোখ, যিনি বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় বৃহৎ, যার দৃঢ়-বক্ষ ও শক্তিশালী বাহু, হে যক্ষ! সেই নকুল জীবিত হোক। যুধিষ্ঠিরের এই উত্তরে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন, "*প্রিয়স্তে ভীমসেনোঽয়মর্জ্জুনো বঃ পরায়ণম্। স কস্মান্নকুলং রাজন্! সাপত্নং জীবমিচ্ছসি।।*" [১৮] অর্থাৎ, ভীমসেন

---

[১১] "মাতৃবত্ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবত্; আত্মবত্ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি, স পণ্ডিতঃ।।"— হিতোপদেশ, মিত্রলাভ —১৪ নং শ্লোক।

[১২] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৬৯, পৃষ্ঠা-২৫৬৮।

[১৩] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৭০, পৃষ্ঠা-২৫৬৮।

[১৪] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৪৭, পৃষ্ঠা-২৫৬০।

[১৫] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৪৮ন, পৃষ্ঠা-২৫৬০।

[১৬] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৮৯, পৃষ্ঠা-২৫৭৭।

[১৭] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৯০, পৃষ্ঠা-২৫৭৭।

[১৮] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৯১, পৃষ্ঠা-২৫৭৭।

তোমার প্রীতিভাজন, অর্জুন তোমার অবলম্বন, হে রাজন! তাহলে কেন সৎ-ভাই নকুলকে তুমি বাঁচাতে চাও? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "*ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। তস্মাদ্ধর্ম্মং ন ত্যজামি মা নো ধর্ম্মো হতো বধীৎ।।*"[১৯] অর্থাৎ, ধর্মকে যে ব্যক্তি নষ্ট বা ত্যাগ করে, ধর্মই তাকে ধ্বংস করে। আর যে ব্যক্তি ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্মই তাকে রক্ষা করে। সুতরাং আমি ধর্মকে ত্যাগ করি না; ধর্মকে যদি বিনষ্ট করি, তবে সে আমাকেই ধ্বংস করবে। তিনি আরও বলেন, "*কুন্তী চ যক্ষ মাদ্রী চ ভার্য্যে চৈতে পিতুর্মম। উভে সপুত্রে স্যাতাং বৈ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ।।*"[২০] অর্থাৎ, হে যক্ষ! কুন্তী ও মাদ্রী—এই দুইজনই আমার পিতার পত্নী। তাদের উভয়েরই সন্তান থাকা উচিত—এটাই আমার মত। তিনি আরও বলেন, "*যথা কুন্তী তথা মাদ্রী বিশেষো নাস্তি মে তয়োঃ। মাতৃভ্যাং সমমিচ্ছামি নকুলো যক্ষ জীবতু।।*"[২১] অর্থাৎ, কুন্তী এবং মাদ্রীর মধ্যে আমার কাছে কোনো পার্থক্য নেই। আমি দুই মাতাকেই সমানভাবে দেখতে চাই। অতএব, হে যক্ষ! নকুলই জীবিত হোক। এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যুধিষ্ঠির কঠিন পরিস্থিতিতেও ধর্ম ত্যাগ করেন নি। ধর্ম রক্ষা করাকেই তিনি শ্রেয় বলে মনে করেছেন। এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তিনি ধর্মের প্রকৃত ধারক ও বাহক। তিনি তাঁর নামের প্রকৃত পরিচয় দিয়েছেন।

উপসংহার:

মানুষ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা যা কিছু করে বা অনুভব করে, সেই সমস্ত ক্রিয়াই তার অন্তঃকরণে সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাবই সংস্কার নামে পরিচিত। সংস্কার বা গুণবিশেষ মানবচিত্তে এক প্রকার বীজরূপে স্থিত থাকে, যা পরবর্তীকালে কর্মফল হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই কর্মফলই মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের নির্ধারক।

জগতে যে বৈষম্য, পার্থক্য ও ভিন্নতা আমরা প্রত্যক্ষ করি— যেমন কেউ রাজা, কেউ ভিখারি; কেউ সুখভোগী, কেউ দুঃখক্লিষ্ট— তার অন্তর্নিহিত মূল কারণ একমাত্র ধর্ম ও অধর্ম। মানুষের ভাগ্য বা জীবনের অবস্থা কোনো দৈবসংঘটন নয়, বরং পূর্বকৃত কর্মের প্রতিফলন।

যে যেরূপ ধর্মাচরণ করে, সে সেইরূপ ফল ভোগ করে— এই নীতি চিরন্তন ও অব্যর্থ। ধর্মাচরণের ফল শুভ, শান্তি ও উন্নতির দিকে পরিচালিত করে; আর অধর্মাচরণের ফল দুঃখ, ক্লেশ ও অবনতির দিকে ঠেলে দেয়। ফলে এই জগতে কারো উচ্চ অবস্থান ও কারো নিম্ন অবস্থা আসলে ধর্মের কারণেই নির্ধারিত।

মহাভারতের লোমশ মুনি বলেছেন, *"বর্ধত্যধর্মেণ নরস্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নাজ্জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।।"* [২২] অর্থাৎ মানুষ প্রথমে অধর্মে উন্নতি লাভ করে বলেই মনে হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত অধর্মই তার বিনাশ ঘটায়। তাই অর্থ বা ভোগের আশায় ধর্ম ত্যাগ কখনোই সমীচীন নয়, কারণ ধর্মহীন অর্জন অনিত্য— *"যেঽর্থা ধর্মেণ তে সত্যা যেঽধর্মেণ ধিগস্তু তান্ । ধর্মং বৈ শাশ্বতং লোকে ন জহ্যাদ্ধনকাঙ্ক্ষয়া ॥"* [২৩]

ধর্মের প্রকৃত ধারক সেই, যিনি নিজের স্বার্থবোধকে অতিক্রম করে সমষ্টির মঙ্গলের চিন্তা করেন। কারণ ধর্ম কোনো একরৈখিক পথ নয়— *"বহুদ্বারস্য ধর্মস্য নেহাস্তি নিষ্ফলা ক্রিয়া"* [২৪] — ধর্মের বহু দ্বার, বহু রূপ। অহিংসা, সত্য, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, ক্রোধবর্জন—এসবই ধর্মের লক্ষণ। এইগুলি এক ধরণের নৈতিক গুণাবলি। এগুলি সব যুগেই অপরিহার্য। এই কারণেই প্রতিটি আশ্রমের জন্য পৃথক ধর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে, যাতে জীবনের প্রতিটি স্তরে মানুষ তার আত্মগুণের বিকাশ ঘটাতে পারে।

---

[১৯] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৯২, পৃষ্ঠা-২৫৭৮।

[২০] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৯৩, পৃষ্ঠা-২৫৭৮।

[২১] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৯৪, পৃষ্ঠা-২৫৭৮।

[২২] *মহাভারতম্* (২য় খণ্ড) নীলকণ্ঠী ভাষ্য সহ, পন্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী (সম্পা) বনপর্ব- ৯৪/৪, পৃষ্ঠা-১৫৬।

[২৩] *মহাভারতম্* (৫ম খণ্ড) নীলকণ্ঠী ভাষ্য সহ, পন্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী (সম্পা) শান্তিপর্ব ২৯২/১৯, পৃষ্ঠা-৪৮১।

[২৪] *মহাভারতম্* (৫ম খণ্ড) নীলকণ্ঠী ভাষ্য সহ, পন্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী (সম্পা) শান্তিপর্ব-৩৫২/২, পৃষ্ঠা-৭৪৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

বাংলা গ্রন্থ:

১. সিংহ, কালীপ্রসন্ন (অনুদিত)। (২০১৪), বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত। কলকাতা: প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য তীর্থ।

২. সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ)। (১৪০০), মহাভারত, বনপর্ব। কলকাতা: (খণ্ড ৬-১১), বিশ্ববাণী প্রকাশনী।

৩. বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পাদিত)। মনুসংহিতা (কুল্লুকভট্টটীকা সহিত)। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

৪. সেন, অতুলচন্দ্র, তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ ও ঘোষ, মহেশচন্দ্র (অনুবাদ ও সম্পা.)। ২০২১, উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), কলকাতা: হরফ প্রকাশনী।

৫. বৈশেষিকসূত্র (মহর্ষি কণাদ)। প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (২০০৪), কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

৬. মীমাংসাসূত্র (জৈমিনি)। ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, (২০০৬), কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

৭. মানমেয়োদয় (নারায়ণভট্ট)। শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ (প্রথম খণ্ড), (১৯৯০), কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

৮. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ। ১৪২১ (সপ্তম মুদ্রণ), নীতি, যুক্তি ও ধর্ম: কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি।

৯. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ। ভারতীয় মহাকাব্যে ধর্ম, নীতি ও যুক্তি। ২০২৪ কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী।

১০. ব্রহ্ম, নলিনীকান্ত (সম্পাদিত)। শ্রীমদ্ভগবদগীতা (মধুসূদন সরস্বতী টীকা সহিত)। নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ।

১১. চক্রবর্তী, বিষ্ণুপদ। (১৯৯২), মহাভারত। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

১২. চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ সাংখ্যতীর্থ (রচনা ও সম্পা.)। ২০১৩, রামায়ণ-মহাভারত অবলম্বনে: মহাকাব্য নিবন্ধাবলী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

১৩. মহাভারতম্ (১ম - ৭ম খণ্ড) নীলকণ্ঠী ভাষ্য সহ, পন্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী (সম্পা.), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৯, পুনে: চিত্রশালা প্রেস।

১৪. মুখোপাধ্যায়, গুরুশঙ্কর (অনুবাদক), লৌগাক্ষিভাস্করকৃত অর্থসংগ্রহ: ব্যাখ্যামূলক বাংলা অনুবাদ। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

১৫. চক্রবর্তী, ড. সত্যনারায়ণ (সম্পাদক)। (১৯৯৮), হিতোপদেশ। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ।

ইংরেজি গ্রন্থ:

1. Iyer, K. Balasubramania. 1989. Yaksha Prasna. Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan.
2. Tarkatirtha, Ramendra Chandra. 1974. Mahabharata: Laksa-sloka-Rahasyam. Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay.
3. Rajagopalachari, C. 2024, Mahabharata. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan.
4. Srinivasan, A. V. 2014, Yaksha Prashna: A Fable from the Mahabharata. New Delhi: Vision Books Pvt. Ltd.
5. Swami Sivayogananda. 2024, Yaksha Prashna: Dialogue between Yudhishthira and Lord of Dharma A Life Transforming Guide from Mahabharata. Mumbai Chinmaya Prakasana.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 473- 478
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.232

সত্যজিৎ রায়ের কলমে বহির্জাগতিক প্রাণীর রূপায়ণ: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

সুরজিৎ সাহা, *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 20.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Scientists have not been able to get the clarity of the existence of any life in the universe beyond earth till date. Nonetheless, people many a time demand of witnessing extraterrestrial life on earth. Moreover, a group of people feel that apart from our earth also, life exists in other planets of our solar system. They firmly assert that these extraterrestrial lives seem to have been visiting our planet almost regularly for many years, even though, there is hardly any scientific evidence published till now. However, a posse of science fiction writers frequently have brought life on other planets as a dominant subject of their literary works. Renowned writer Satyajit Ray can be referred in this aspect who most widely brought extraterrestrial life as popular subject in many of his stories. This research article attempts to focus how new ideas and thought about extraterrestrial life have been explored in his stories.

Keywords: Extraterrestrial, Satyajit Ray, Earth, Planet, Scientist, Universe

পৃথিবীর বাইরে মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকরা এখনও কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত জানাতে পারেননি। তবুও অনেকেই পৃথিবীতে বহির্জাগতিক প্রাণীকে দেখার দাবি করে থাকেন। পৃথিবীর একাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন যে, অন্য গ্রহেও জীবের অস্তিত্ব আছে। তাঁরা দাবি করেন যে, বহির্জাগতিক জীবরা পৃথিবীতে বহুবছর পূর্ব থেকেই প্রায় নিয়মিত যাতায়াত করে। তবে এমন ঘটনার কোনও রকম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এই পর্যন্ত প্রকাশে আসেনি। তবে কল্পবিজ্ঞানের রচয়িতারা তাঁদের রচনায় বারে বারে অন্য গ্রহের জীবকে বিষয় হিসেবে নিয়ে এসেছেন। এঁদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ও একজন। তাঁর অনেক গল্পে বহির্জাগতিক প্রাণীর প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে বহির্জাগতিক প্রাণীদের নিয়ে যে সকল নতুন চিন্তা-ভাবনা করেছেন সেই দিকগুলোই নির্বাচিত গল্পের আলোচনা অবলম্বনে আমার এই গবেষণা নিবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সত্যজিৎ রায়ের লেখা 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'-তেই আমরা প্রথম অন্য গ্রহের জীবের সাক্ষাৎ পাই। সেখানে প্রোফেসর শঙ্কু তাঁর নিজের তৈরি রকেটে চেপে মঙ্গলগ্রহে গিয়েছিলেন। মঙ্গলগ্রহে শঙ্কু যে প্রাণীর দেখা পেয়েছেন তারা

> "মানুষও নয়, জন্তুও নয়, মাছও নয় কিন্তু তিনের সঙ্গেই কিছু কিছু মিল আছে। লম্বায় তিন হাতের বেশি নয়, পা আছে, কিন্তু হাতের বদলে মাছের মতো ডানা, বিরাট মাথায় মুখজোড়া দন্তহীন হাঁ, ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সবুজ চোখ, আর সর্বাঙ্গে মাছের মতো আঁশ সকালের রোদে চিকচিক করছে।"[১]

এরা বেশি জোরে ছুটতে পারে না, দৌঁড়াতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খায়। তাদের মুখের ভাষাও শঙ্কু কিছু বুঝতে পারেননি। তারা মুখ দিয়ে বিকট শব্দ করে অনেকটা ঝিঁঝির মতো– "তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি!"[২] এরা পৃথিবীর মানুষকে পছন্দ করে না। ফলে শঙ্কুদের সঙ্গে এদের সংঘাত বেঁধেছিল এবং শঙ্কুরা সেখান থেকে পালিয়ে

যান। এরপর শঙ্কুরা টাফাগ্রহে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং টাফাগ্রহের প্রাণীরা শঙ্কুদের স্বাগত জানিয়েছিল। টাফাগ্রহের প্রাণী সম্পর্কে শঙ্কু জানিয়েছেন–

> "অতিকায় পিঁপড়ে জাতীয় একটা কিছু কল্পনা করতে পারলে এদের চেহারার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। বিরাট মাথা, আর চোখ, কিন্তু সেই অনুপাতে হাত-পা সরু--যেন কোনও কাজেই লাগে না।"[৩]

টাফাগ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীর তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। তাই তাদের কোনও ঘরবাড়ি ছিল না; মাটির ভেতরে গর্তের মধ্যে তারা থাকে। শঙ্কু তাদের মধ্যে কোনও রকম বৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তা প্রত্যক্ষ করেননি।

সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কু সিরিজের 'প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য' গল্পেও আমরা অন্য গ্রহের জীবের উল্লেখ পাই। সাধারণত কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলোতে মানবজাতির ধ্বংসের কারণ দু-ভাবে বর্ণিত হয়। এক, পৃথিবীতে বহির্জাগতিক শক্তি বা অন্য কোনও গ্রহ থেকে তেড়ে আসা বিপদ দ্বারা। দুই, পৃথিবীতেই হঠাৎ করে সেই ধ্বংসের কারণ উৎপত্তি হওয়া থেকে। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য' গল্পে প্রথম বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই গল্পে আমরা দেখি সৌরজগতের একটি ক্ষুদ্রতম গ্রহ অজানা কারণে গিরিডিতে উশ্রী নদীর ধারে এসে পড়েছিল। গ্রহটিকে প্রথম দেখেন প্রোফেসর শঙ্কুর প্রতিবেশী অবিনাশবাবু। তিনি সেটিকে আশ্চর্য গোলক ভেবে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। গোলকটি দেখতে

> "বলের মতোই মসৃণ গোল জিনিসটা--তবে সেটা যে কীসের তৈরি তা বোঝা মুশকিল আর তার রংটা বর্ণনা করা বেশ কঠিন। কিছুটা মেটে, কিছুটা সবুজ, কিছুটা আবার হলদে আর লাল মেশানো একটা পাঁচমিশালি রং বলা যেতে পারে।"[৪]

অবিনাশবাবু গোলকটিকে তাঁর বাড়ির আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই গোলকটির মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখে, সেটাকে প্রোফেসর শঙ্কুর ল্যাবরেটরিতে দিয়ে আসেন। গোলকটি সম্পর্কে অবিনাশবাবু বলেছেন সেটি "কেবল ঘন্টায় ঘন্টায় রং বদলাচ্ছে।"[৫] এরপর প্রোফেসর শঙ্কু সেই গোলকটি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং তিনি বুঝতে পারেন

> "আমাদের পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই বলের রং পরিবর্তনের আশ্চর্য মিল! তফাত কেবল এই যে, পৃথিবীতে যে পরিবর্তন ঘটতে এক বছর লাগছে-- এই বলের সেটা ঘটতে লাগছে এক দিন, অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা। রাত বারোটায় এই বলের চরম শীতের অবস্থা যখন এর সবটাই বরফের আবরণে ঢাকা। তারপর সেটা কমে গিয়ে সূর্যোদয়ের সময় থেকে লাল হলদে সবুজের খেলায় এর বসন্তকাল। সূর্য যতই মাথার উপরে উঠতে থাকে এই বল ততই গ্রীষ্মের দিকে এগোয় আর রঙের বাহারও কমে আসে।"[৬]

শঙ্কু তাঁর আবিষ্কৃত 'মাইক্রোসোনোগ্রাফ' যন্ত্রের সাহায্যে জানতে পারেন এই গোলকটির নাম 'টেরাটম্' এবং সেই গ্রহের প্রতিটি বাসিন্দা হল এক একটি মূর্তিমান ভাইরাস। যাদের মধ্যে পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলার মতো ক্ষমতা রয়েছে। 'টেরাটম্' গ্রহের প্রাণীরা শঙ্কুকে জানিয়েছে

> "সমস্ত পৃথিবীকে তিন মাসের মধ্যে আমরা জনশূন্য করে দিতে পারি। সংক্রামক রোগের জন্য তো আর হাঙ্গামা করতে হয় না। আমাদের একজনের চেষ্টাতেই সমস্ত গিরিডি শহরটা ফাঁকা করে দিতে পারি। আর সকলে মিলে যদি একজোটে লাগি তা হলে...।"[৭]

এই 'টেরাটম্' গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীর জীবকুলের জন্য প্রচন্ড ক্ষতিকারক। তাই গল্পের শেষে দেখা যায় মানব দরদী প্রোফেসর শঙ্কু পৃথিবীর জীবকুলের মঙ্গলের কথা ভেবে টেরাটম্ গ্রহটিকে তার সকল বাসিন্দাসহ ধ্বংস হতে দিয়েছেন।

সত্যজিৎ রায়ের এই গল্পটির মতো একই বিষয় নিয়ে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলেরও একটি গল্প আছে 'The poison Belt'। এই গল্পটির মূখ্য চরিত্র ছিলেন প্রোফেসর চ্যালেঞ্জার। আমরা প্রোফেসর চ্যালেঞ্জারকে শঙ্কুর পূর্বসূরী বলে থাকি। এই গল্পের কাহিনিটি ছিল চ্যালেঞ্জার জানতে পারেন পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের এমন পথ দিয়ে এগোবে যেখানে বায়ুতে বিষ মিশে আছে। এর ফলে জীবকুলের যারা শ্বাসপ্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ করে, তাদের মৃত্যু আসন্ন। এই সঙ্কট থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে বের করেন প্রোফেসর চ্যালেঞ্জার। তিনি দুইজন বন্ধু ও নিজের স্ত্রীর প্রাণ রক্ষার উপায় করেছিলেন। একই রকম বিষয় নিয়ে ফ্রেডহয়েল লিখেছেন 'The Black Cloud'।

সত্যজিতের অন্য গ্রহের জীব নিয়ে লেখা আরও একটি জনপ্রিয় গল্প হল 'প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস রহস্য'। এই গল্পে আমরা দেখি অন্য কোনও গ্রহ থেকে উভচর প্রাণীরা পৃথিবীতে এসেছে উপনিবেশের সন্ধানে। এরা দেখতে অনেকটা মাছের মতো। তবে পুরোপুরি মাছের মতো নয় এই প্রাণীগুলোর চেহারা সম্পর্কে শঙ্কু বলেছেন

> "মাছ বলতে আমরা সাধারণত যে জিনিসটা বুঝি, এটা ঠিক সেরকম নয়। এর কাঁধের দুদিকে ডানার জায়গায় যে দুটো জিনিস আছে, তার সঙ্গে মানুষের হাতের মিল আছে, আর এরা সেগুলো দিয়ে হাতের কাজই করছে। লেজটা দুভাগ হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু ভাগ হয়ে সেটা আর ঠিক লেজ নেই, হয়ে গেছে দুটো পায়ের মতো। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে এদের চোখ মাছের মতো চেয়ে থাকে না, এ চোখে মানুষের মতো পাতা পড়ে।"[৮]

তারা সমুদ্রের একেবারে তলদেশে প্রবেশ করে নিজেদের জন্য একটা আস্তানা করেছিল, তারা ভেবেছিল সেখানেই থাকতে পারবে। কিন্তু জলের নীচে তাদের বেঁচে থাকার জন্য যে সব উপাদানের প্রয়োজন, সেইসব উপযুক্ত পরিমাণে ছিল না। তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ সমুদ্রের উপকূলে উঠে আসে বসবাসের উপযুক্ত স্থান খোঁজার জন্য। কিন্তু ডাঙায় আসার পর তারা মানুষের সংস্পর্শে আসে এবং মানুষকে তাদের শত্রু ভেবে আত্মরক্ষার জন্য কামড়ে আহত করে দেয়। তারপর তারা পুনরায় সমুদ্রে ফিরে আসে এবং তারা অনুভব করে যে পৃথিবী তাদের বসবাসের উপযোগী স্থান নয়। এখানে থাকলে তারা বেশি দিন জীবিত থাকবে না। তাই তারা চলে যাওয়ার মনস্ত করে। কিন্তু চলে যাওয়ার সময়েও আরও এক অন্য বিপদ তাদের সামনে চলে আসে। তারা যে গোলকযানে পৃথিবীতে এসেছিল সেটা সমুদ্রের তলদেশে আটকা পড়ে যায়। গোলকযানটি সমুদ্রের মাটিতে এমন ভাবে আটকে পড়েছিল যে সেটাকে উপরে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু তারা যদি তাদের সেই গোলকযানটিকে সেখান থেকে মুক্ত করতে না পারে তাহলে তাহলে তাদের সকলের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি। শঙ্কু তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন

> "চোখের সামনে একের পর এক মাছ মরে পাক খেতে খেতে মাটিতে পড়ছে-এ দৃশ্য আমি আর দেখতে পারছিলাম না।"[৯]

শঙ্কুর ভিনগ্রহের প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি জাগে এবং তাদের সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেন। শঙ্কুরা তাঁদের জাহাজ দিয়ে সেই গোলকযানটিকে জোরে ধাক্কা মারে, সেই ধাক্কার জোরে গোলকটি আলগা হয়ে মুক্ত হয়ে যায়। তারপর তারা সেখান থেকে চলে যায় অন্য কোথাও বাসস্থানের খোঁজে। এখানে শঙ্কুর গ্রহান্তরের প্রাণীদের দুর্দশা দেখে মন খারাপ হওয়া এবং তাদের সহযোগিতা করার বিষয়টি তাঁর চরিত্রের উদার মানবিকতার রূপটিকেই প্রকাশ করেছে।

Erich Von Daniken তাঁর 'Chariots of the Gods?' গ্রন্থে অন্য গ্রহের জীব সম্পর্কে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন, ঈশ্বর কী গ্রহান্তরের মানুষ? এরূপ মনে হওয়ার কারণ হল, জনশ্রুতি মতে মিশরের পিরামিড, ইস্টার আইল্যাণ্ডের পেল্লায় মূর্তি, পেরুর ন্যাজকো মরুভূমিতে মাইলের পর মাইল জুড়ে জ্যামিতিক রেখা আর নক্সা ইত্যাদি নানা রকম অতিমানবীয় সৃষ্টি নাকি গ্রহান্তরের প্রাণীরা পৃথিবীতে এসে করেছেন। সুইস দার্শনিক তথা গবেষক Daniken-র মতে হাজার হাজার বছর পূর্বে অন্য গ্রহ থেকে মানুষের চেয়ে অধিক উন্নত কোনও প্রাণী পৃথিবীতে এসেছিল এবং তাদের উন্নত জ্ঞান, বুদ্ধির কিছুটা মানুষকে শিখিয়ে সভ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। Daniken তাঁর এই মতের স্বপক্ষে উল্লেখিত গ্রন্থে কিছু তথ্য পেশ করেছেন। কল্পবিজ্ঞানের এই বিষয়গুলো জ্ঞানান্বেষী সত্যজিৎ রায়কে ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল। এইরকম বিষয় নিয়ে Arthur C. Clarke-র একটি উপন্যাস রয়েছে '2001: A Space odyssey'। এই গ্রন্থে Daniken-র মতো তিনিও গ্রহান্তরের কোনও প্রাণী পৃথিবীর মানুষেকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি কিছুটা অনুমান করেছিলেন। সত্যজিৎ রায় Arthur C. Clarke-র উপন্যাস শুধু পড়তেনই না, এই ঔপন্যাসিকের তিনি গুণমুগ্ধও ছিলেন। উল্লেখীত দুজনের উপন্যাসের অনুপ্রেরণায় সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন 'মহাকাশের দূত'। ইংল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিদ ফ্রানসিস ফীল্ডিং বারো বছর পরিশ্রম করে বেতার তরঙ্গের সাহায্যে 'এপসাইলন ইন্ডি নক্ষত্রপুঞ্জের' একটি গ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং জানতে পেরেছেন এই প্রাণীরা পৃথিবীতে কোথায় এবং কখন আসবে। জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেলম ক্রোলের গাড়ি 'অটোমোটেল'- এ চড়ে অনেক বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁরা পৌঁছান লাইমস্টোনের রুক্ষ স্তূপের পাশে, যেখানে ধাতব পিরামিড আকৃতির মহাকাশযানটি এসে পৌঁছোয়। ফীল্ডিং সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। সংযোগের ভাষা ছিল মৌলিক সংখ্যা "ফর্টি ওয়ান--ফর্টি সেভ্ন—ফিফটি থ্রী--ফিফটি নাইন"[১০] সংযোগ স্থাপনের পর পিরামিড থেকে বেরিয়ে

আসে নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণের নিটোল কণ্ঠস্বর, এরপর তাঁরা জানান "পাঁচ হাজার বছর পরে আবার আমরা তোমাদের গ্রহে এসেছি। তোমরা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।"[১১] তাঁরা আরও জানান- "তোমাদের গ্রহের অস্তিত্ব আমরা জেনেছি পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে।"[১২] এবং এই গ্রহের প্রাণীরাই নাকি পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে চালিত করেছেন যুগ যুগ ধরে। পৃথিবীতে তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান, তাঁরা মহাকাশ থেকে পঁয়ষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখছেন। তাঁরা পৃথিবীতে আসার পূর্বে এখানকার সকল তথ্য সংগ্রহ করে আসেন। তাঁরা এটাও জানিয়েছেন যে, পৃথিবীতে আসার পেছনে তাঁদের কোনও রকম স্বার্থ নেই। কোনও রকম অনিষ্ট করতেও আসেননি বা সাম্রাজ্য বিস্তার করতেও আসেননি। তাঁরা পৃথিবীবাসীর মঙ্গলের জন্য এসেছেন। তাঁরা এটাও বলেছেন যে,

> "আজকের মানুষ বলতে যা বোঝো, সেই মানুষ আমাদেরই সৃষ্টি, সেই মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গরনও আমাদেরই সৃষ্টি। মানুষকে কৃষিকার্য আমরাই শেখাই, যাযাবর মানুষকে ঘর বাঁধতে শেখাই। গণিত, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসাবিজ্ঞান পৃথিবীতে এসবের গোড়াপত্তন আমরাই করেছি, স্থাপত্যের অনেক সূত্র আমরাই দিয়েছি।"[১৩]

এই ক্ষেত্রে Daniken-র প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তাঁরা আরও বলেন যে,

> "মানুষকে আমরা যুদ্ধ শেখাইনি, স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্যবিস্তার শেখাইনি, শ্রেণিভেদ শেখাইনি কুসংস্কার শেখাইনি। এসবই তোমাদের মানুষের সৃষ্টি। আজ যে মানুষ ধ্বংসের পথে চলেছে তার কারণও হল মানুষ নিঃস্বার্থ হতে শেখেনি। যদি শিখত তা হলে মানুষ নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারত। আজ আমরা তোমাদের হাতে যা তুলে দিতে এসেছি, তাঁর সাহায্যে মানবজাতির আয়ু কিছুটা বাড়তে পারে।"[১৪]

পিরামিডের আকৃতির মহাকাশযানের মধ্যে একটা প্রস্তরখন্ড পাওয়া যায়, যার মধ্যে রয়েছে মানবজাতির সঙ্কট এবং সেই সঙ্কট থেকে সমাধানের উপায়। আর আছে পৃথিবীর পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস। মহাকাশযান থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল "সমাধান গুলি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য; এই বস্তুটি যদি কোনও স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়ে, তা হলে-"[১৫] কিন্তু সেইসময় শঙ্কুদের পেছন পেছন লুকিয়ে আসা মার্কিন ধনকুবের শখের প্রত্নতাত্ত্বিক গিদিয়ান মর্গেনস্টাইন মহাকাশযানের ভেতর থেকে প্রস্তরখণ্ডটি নিয়ে সেখান থেকে পালান এবং রাস্তায় গাড়ি এক্সিডেন্টে মারা যান।

এই গল্পে আমরা দেখি মহাকাশের দূত এসে মানুষকে জানিয়েছেন মানবজাতির ধ্বংসের মূল কারণটি হল মানুষের স্বার্থপরতা। মানুষ তার নিজের সমস্যাগুলোকে নিজে সমাধান করতে পারে না, কারণ মানুষের নিঃস্বার্থ ভাবটি নেই। বর্তমান যুগে ক্ষমতা লাভের নেশায় দেশে দেশে যে যুদ্ধ হচ্ছে, তারফলে মানবজাতি নিজেই নিজের ধ্বংসকে ডেকে আনছে। এই গল্পে সত্যজিৎ রায় গ্রহান্তরের জীব দ্বারা বিশ্বমানবতা, উদারতা, স্নেহ, ভালোবাসা ও অহিংসার বাণী পাঠকের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছেন। গল্পের শেষে শঙ্কু বলেছেন-

> "এই অপার্থিব রত্নখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত নীলাভ আলো আমাকে আজীবন অক্লান্ত গবেষণার সাহায্যে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার প্রেরণা যোগায়।"[১৬]

এই পর্যায়ের আরও একটি গল্প 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও.'। এই গল্পেও আমরা দেখেছি মহাকাশ থেকে একটি অচেনা মহাকাশযান পৃথিবীতে এসেছে। পৃথিবীবাসী অবাক হয়ে দেখেছেন যে, একটি অজানা উড়ন্ত বস্তু (ইউ.এফ.ও.) পৃথিবীর প্রাচীন শিল্প নিদর্শনগুলোকে একের পর এক ধ্বংস করে চলেছে। এর ফলে গ্রিক সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'পার্থেনন'-ও ধ্বংস হয়েছে। গুঁড়িয়ে গেছে প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, কম্বোডিয়ার সুবিশাল বৌদ্ধস্তূপ ইত্যাদি। এই ইউ.এফ.ও.-র রহস্য সন্ধানে শঙ্কু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে চিনের তুর্কিস্থানে গেছেন। তাঁরা তাকলা-মাকানের মরুভূমিতে দরজা খোলা অবস্থায় ইউ.এফ.ও.-এর সন্ধান পেয়েছেন এবং সেই মহাকাশযানের ভেতরে প্রবেশ করেছেন। ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছেন এটি আসলে পৃথিবীর নিকটবর্তী নক্ষত্র আলফা সেন্টরির একটা গ্রহ থেকে আসা মহাকাশযান। মহাকাশযানটিকে বিজ্ঞানী কারবোনি আত্মসাৎ করে ধ্বংস লীলা শুরু করেছেন। বিজ্ঞানী কারবোনি উন্মাদ হয়ে গেছে। তাঁর চাতুর্য ও শয়তানিতে গ্রহান্তরের অতি বুদ্ধিমান প্রাণীরাও হার মেনেছে।

অন্য গ্রহের প্রাণীকে নিয়ে লেখা সত্যজিৎ রায়ের একটি অন্যতম গল্প হল 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'। বঙ্কুবাবু কাঁকুরগাছি প্রাইমারি স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক। তিনি প্রচণ্ড শান্ত স্বভাবের মানুষ। কেউ কখনও তাঁকে রাগ করতে দেখেনি। তাঁর নিরীহ স্বভাবের জন্য স্কুলের ছাত্ররাও তাঁর সঙ্গে মজা করে। এমনকী শনি-রবিবারে উকিলের বাড়িতে যে আড্ডার আসর বসে সেখানেও বুড়োরা তাঁকে অপদস্ত করে আনন্দ উপভোগ করে। একদিন সেই আড্ডার আসর থেকে ফেরার সময় বঙ্কুবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে আগত প্রাণী 'অ্যাং'-র সঙ্গে। অ্যাং-এর মহাকাশযানটি পথ ভুলে পঞ্চা ঘোষের বাঁশ বাগানে অবতরণ করেছিল। অ্যাং বঙ্কুবাবুকে বলে "আমি ক্রেনিয়াস গ্রহের 'অ্যাং'। মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী।"[১৭] সে চোদ্দ হাজার ভাষা জানে। সৌরজগতে যত ভাষা আছে সে সব জানে। এমনকি সৌরজগতের বাইরের একত্রিশটি গ্রহের ভাষা তার জানা সেগুলোর পঁচিশটিতে সে গিয়েছে। পূর্বে তারা জানোয়ার খেতো কিন্তু এখন আর খায় না তা ছেড়ে দিয়েছে। নইলে সে বঙ্কুবাবুকেও খেয়ে ফেলত।

বঙ্কুবাবু যদিও ভূগোল পড়ান কিন্তু তাঁর বাংলাদেশের বাইরে বেরোনো হয়ে ওঠেনি। এমনকি কয়েকটি গ্রাম ও শহর ছাড়া তিনি কিছুই দেখেননি। তিনি হিমালয়ের বরফ দেখেননি, দীঘার সমুদ্র দেখেননি, সুন্দরবনের জঙ্গল দেখেননি, এমনকি শিবপুরের বাগানের সেই বটগাছটা পর্যন্ত দেখেননি। কিন্তু এসব দেখার একটা সুপ্ত বাসনা তাঁর মনে ছিল। বিচিত্র শক্তির অধিকারী অ্যাং বঙ্কুবাবুর পৃথিবী ভ্রমণের অপূর্ণ আশা পূরণ করিয়েছে একটি বিচিত্র যন্ত্রের সাহায্যে। অ্যাং তার নিজের গ্রহে ফিরে যাওয়ার পূর্বে বঙ্কুবাবুকে একটা উপদেশ দিয়েছে "তবে তোমার দোষ যে তুমি অতিরিক্ত নিরীহ, তাই তুমি জীবনে উন্নতি করোনি। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা বা নীরবে অপমান সহ্য করা এসব শুধু মানুষ কেন, কোন প্রাণীরই শোভা পায় না।"[১৮] গল্পে আমরা দেখি অন্য গ্রহের প্রাণীর উপদেশ বঙ্কুবাবুর স্বভাবকে পাল্টে দিয়েছে। পরেরদিন উকিল বাড়ির বৈঠকে বৈশাখী ঝড়ের মতো উপস্থিত হন বঙ্কুবাবু। তিনি যেন এক নতুন মানুষে পরিণত হয়েছেন, এখন আর তিনি নিরবে অপমানকে বরদাস্ত করেন না। শান্ত ও নিরীহ স্বাভাবের বঙ্কুবাবুকে হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই যেন গ্রহান্তর থেকে অ্যাং পৃথিবীতে এসেছিল।

'অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু' বহির্জাগতিক প্রাণী নিয়ে লেখা সত্যজিৎ রায়ের আরও একটি জনপ্রিয় গল্প। তর্পণ চৌধুরীর ডাক নাম টিপু। সাড়ে দশ বছরের বালক টিপুর সঙ্গে পরিচয় হয় গ্রহান্তর থেকে আসা জীব গোলাপীবাবুর। গোলাপীবাবু নামটা টিপুই রেখেছে। এরূপ নামকরণের কারণ লোকটির গায়ের রং চন্দনের সঙ্গে গোলাপী মেশালে যেমন হয় ঠিক তেমন। লোকটির কাছ থেকে টিপু জানতে পারে যে, একজনকে চিমটি কাটার কথা ভাববার অপরাধে তাঁকে শাস্তি স্বরূপ পৃথিবীতে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে করা। তিনি যদি টিপুর কোনও দুঃখ দূর করতে পারেন, তাহলে তিনি এই শাস্তি থেকে মুক্তি পাবেন। এরপর গোলাপীবাবু তাঁর অতিপ্রাকৃত শক্তি দিয়ে জানতে পারেন টিপুর আসল দুঃখের কারণ।

গোলাপীবাবু কন গ্রহ থেকে এসেছেন সেটার উল্লেখ গল্পে নেই। তবে তাঁর চেহারার বর্ণনা গল্পে রয়েছে। ভীষণ বেঁটে, দাড়িগোঁফ নেই, তবে দেখতে বাচ্চাও নয়, গলার স্বর গম্ভীর, গায়ের রং গোলাপির সঙ্গে চন্দন মেশালে যেমন হয় ঠিক তেমন, তাঁর নাম মানুষের জিভ দিয়ে উচ্চারণ করা যায় না। গোলাপীবাবুদের গ্রহে বেশি জানার চেষ্টা করলে একটা রোগ হয়। তবে সেই রোগের নাম উচ্চারণ করতে দুটো জিভের প্রয়োজন। টিপু তার একটি জিভ দিয়ে উচ্চারণ করলে শব্দটি হয়েছিল 'জিঞ্জিরিয়া'।

সত্যজিৎ রায়ের এই গল্পের সঙ্গে E. M. Forster-র 'The celestial Omnibus' গ্রন্থের কিছুটা মিল লক্ষ করা যায়। এই গল্পে সত্যজিৎ রায় রূপকথা ও বাস্তবতার মধ্যে একটি সমন্বের কথা বলেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, কীভাবে সমাজের তৈরি করা বাধাগুলো শিশু মনের স্বাভাবিকত্ব ও সৃজনশীলতাকে নষ্ট করে দেয়। বর্তমান সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগিতা ছোট ছোট শিশুরা তাদের শিশুত্ব হাড়িয়ে ফেলছে। বর্তমান সময়ে শিশুদের জন্মের পর থেকেই যেন বাস্তব জীবনে জয়ী হওার প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেওয়া হয়। রূপকথার কল্পনার জগৎ তাদের সেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেবে বলে, সেগুলো বর্জন করাই শ্রেয় বলে ভেবে নেয়। কিন্তু সত্যজিৎ রায় কখনওই এমন ভাবনাকে সমর্থন করতেন না। শিশুদের উপর জ্ঞানের বোঝা চাপানোর পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাই তাঁর গল্পে গোলাপীবাবু বলেছেন ওদের গ্রহে বেশি জানার চেষ্টা করলে একটা রোগ হয়। সত্যজিৎ বোঝাতে চেয়েছেন যে, রূপকথার যে বিষয়গুলোকে মানুষ অবাস্তব-কল্পনা বলে উড়িয়ে দেয়, সেগুলোর মধ্যেও কোনও গভীর অর্থ বা উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই জোর করে শিশুদের উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

উপরে উল্লিখিত আলোচনাতে আমরা দেখলাম সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে যে বহির্জাগতিক প্রাণীদের কল্পনা করেছেন, তাঁরা কেউই মানবকুলের শত্রু নয়। বরং তাঁরা বেশিরভাগই পৃথিবীতে এসেছেন মানুষকে সহযোগিতা করতে। যদিও সত্যজিতের প্রথম পর্যায়ের গল্পে আমরা দুই-একটি মানব বিরোধী বহির্জাগতিক প্রাণীর উল্লেখ পাই, যেমন মঙ্গল গ্রহেরপ্রাণী ও টেরাটম্ গ্রহের প্রাণী। কিন্তু পরবর্তীতে লেখা গল্পগুলোতে আমরা দেখেছি অন্য গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীতে এসেছে মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য। তাঁরা পৃথিবীর সভ্যতা থেকে অনেকটাই উন্নত, অনেক দিক দিয়েই এগিয়ে আছে। এমনকী সত্যজিৎ রায় বহির্জাগতিক প্রাণীকে দিয়ে পৃথিবীর মানুষের কাছে মানবিকতার বাণী প্রচার করেছেন। মানুষকে সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে সৎ হওয়ার বার্তা দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, সত্যজিৎ। ব্যোমযাত্রীর ডায়রি। শঙ্কু সমগ্র। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পঞ্চদশ মুদ্রণ জুন ২০১৭, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পৃ. ১৩।
২. তদেব, পৃ. ১৪।
৩. তদেব, পৃ. ১৯।
৪. রায়, সত্যজিৎ। প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য। পূর্বোল্লিখিত পৃ. ৬৩।
৫. তদেব, পৃ. ৬৪।
৬. তদেব, পৃ. ৭১।
৭. তদেব, পৃ. ৭৩।
৮. রায়, সত্যজিৎ। প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য। পূর্বোল্লিখিত পৃ. ১২৯।
৯. তদেব, পৃ. ১৩১।
১০. রায়, সত্যজিৎ। মহাকাশের দূত। পূর্বোল্লিখিত পৃ. ৪১১।
১১. তদেব, পৃ. ৪১১।
১২. তদেব, পৃ. ৪১১।
১৩. তদেব, পৃ. ৪১১।
১৪. তদেব, পৃ. ৪১২।
১৫. তদেব, পৃ. ৪১২।
১৬. তদেব, পৃ. ৪১২।
১৭. রায়, সত্যজিৎ। বঙ্কুবাবুর বন্ধু। গল্প ১০১। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মে ২০০১, দ্বাদশ মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পৃ. ০৫।
১৮. তদেব, পৃ. ১৮।

নির্দেশনা:

প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য প্রথমে ওয়েবসাইটে (https://uttarsuri.com/uttarsuri) অথবা উপরে দেওয়া Submit your Article এ ক্লিক করলেও হবে) লেখক হিসেবে নিবন্ধন (Registration) করতে হবে। নিবন্ধন করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatic) আপনি লেখা জমা দেওয়ার জন্য পোর্টালে প্রবেশ (Login) করতে পারবেন, প্রবেশ করার পর লেখকের নিজস্ব ড্যাশবোর্ডের বামদিকে Articles এ চাপ দিলে Add New আসবে, তাতে ক্লিক করে প্রবন্ধ জমা করতে হবে। প্রবন্ধ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আপনি ইমেইল/পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করলে পেয়ে যাবেন এবং উত্তরসূরি থেকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইমেইলে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

গবেষণাপত্র রচনায় অনুসৃতব্য পদ্ধতি:

১. শিরোনাম (Title): শিরোনাম যথাযথ এবং স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. সারসংক্ষেপ (Abstract): ইংরেজিতে ৩০০ শব্দের মধ্যে।
৪. সূচক শব্দ (Keywords): ন্যূনতম ৫টি।
৫. মূল আলোচনা: গবেষণাপত্রে ন্যূনতম ২৫০০ শব্দ থাকতে হবে। শব্দ সংখ্যা ২৫০০ এর কম হলে তা রিভিউ করা হবে না।
৬. তথ্যসূত্র (Reference): লেখকের পদবি, লেখকের নাম। গ্রন্থের নাম। প্রকাশনীর নাম, প্রকাশকাল, প্রকাশস্থান, পৃষ্ঠাঙ্ক।
৭. গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি (Bibliography): পৃষ্ঠাঙ্ক ব্যতিরেকে উল্লেখিত পদ্ধতি।

গবেষণাপত্র প্রেরণের নিয়মাবলী:

১. প্রবন্ধ হতে হবে সুচিন্তিত, মৌলিক ও গবেষণাধর্মী। প্রবন্ধে Plagiarism-এর মত ঘটনা ঘটলে তার দায় সম্পূর্ণভাবে লেখকের। পত্রিকা কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। প্রবন্ধ AI ব্যবহার করে লেখা হলে ছাপানোর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।
২. অভ্র কীবোর্ডে, যে কোনো ফন্টে টাইপ করে লেখা পাঠাতে পারেন (জার্নালে বেনসেন ১৩ ফন্ট ব্যবহার করা হয়)। ইংরেজির ক্ষেত্রে Times New Roman 12 ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।
৩. বাক্যে ব্যবহৃত যতিচিহ্নের (দাড়ি, কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়সূচক চিহ্ন ইত্যাদি) আগে কখনোই স্পেস দেওয়া যাবে না। পরে একটি স্পেস দিতে হবে।
৪. গল্প, কবিতা, উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, প্রবন্ধ গ্রন্থ ইত্যাদির নাম 'Single Quote' এর মধ্যে রাখতে হবে।
৫. গদ্য, পদ্য বা যে কোনো টেক্সটের উদ্ধৃতি "Double Quote" এর মধ্যে রাখতে হবে।
৬. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া বাধ্যতামূলক।
৭. আকাদেমি বানান অভিধান (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি) অনুসরণ করে ভালোভাবে প্রুফ দেখে লেখা পাঠাতে হবে। আকাদেমি বানান অভিধান এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহারিক বাংলা বানান অভিধান, পবিত্র সরকার দ্রষ্টব্য।
৮. সম্পাদকগণ প্রয়োজনে সংশোধন বা সামান্য পরিবর্তন করতে পারেন, যদি তিনি তা প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনে করেন।

তথ্যসূত্র যে ভাবে লিখতে হবে:

বই এর ক্ষেত্রে:

১. সেলিম, মুস্তাফা। বাহান্ন তাসের পর। সোনিক অর্কেস্ট্রা, ১৯৭৮, ধর্মনগর, পৃ. ৩।
২. একই গ্রন্থ পর পর হলে লিখতে হবে, তদেব, পৃ. ৫।
৩. দে, তমালশেখর। সেলিম মুস্তাফার কবিতা-জগৎ: সাক্ষাৎকার এবং। নীহারিকা পাবলিশার্স, ২০২২, কথামুখ, পৃ. ৬।
৪. দাশ বিশ্বাস, পীযূষকান্তি, সম্পাদনা। ছবি, পাখি সব করে রব, সংখ্যা ১২৫, মার্চ ২০২৪, পৃ. ৮।

সাহিত্যপত্র:

১. দাস বিশ্বাস, পীযুষকান্তি, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, সংখ্যা ১২০, অক্টোবর ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

৪. নাথ, ঋষিকেশ, সম্পাদনা। শব্দনীল, সংখ্যা ২৫, একুশে মার্চ ২০২৩, পয়েন্টস ইউনিট, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

পত্রিকা:

১. দাস বিশ্বাস, পীযুষকান্তি, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, সংখ্যা ১২০, অক্টোবর ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

২. ——, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, সংখ্যা ১১৪, এপ্রিল ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা। (একই পত্রিকার ক্ষেত্রে)

ওয়েবসাইট:

ভট্টাচার্য, ড. তমালশেখর। "নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম।" আত্মদীপ, www.atmadeep.in/nirbachito-bangla-chotogolpe-poshuprem.html। প্রবেশের তারিখ: ১৮ জুন ২০২৫।

ফুটনোট:

১ ড. তমালশেখর ভট্টাচার্য, "নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম," আত্মদীপ www.atmadeep.in/nirbachito-bangla-chotogolpe-poshuprem.html, প্রবেশের তারিখ: ১৮ জুন ২০২৫।

২ মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, ১৯৭৮, পৃ. ৩।

Plagiarism:

Authors are urged to avoid plagiarism. Any detected instances of plagiarism will be the sole responsibility of the authors.

Review Process

- All the manuscript will be preliminary examined by the Editor-in-Chief and then forwarded to the Reviewers & other Editors of the Journal.
- The papers shall only be published after recommendation of the Reviewers & Associate Editors.
- Information regarding the selection or rejection of articles/papers will be only through Email.
- The journal shall publish the article/papers only after completion of the formalities mentioned in selection letter.
- The journal will also not take the responsibility of returning the rejected articles.

At every stage preceding publication, the editors of the journal shall have the right to make corrections (if needed) in articles/papers to suit the requirement of the journal.

N.B.: Papers will be accepted only when accompanied with abstract (to be written in English only). Submission of papers without abstract (in English) or mere submission of an abstract without the paper would lead to non-acceptance of the same.

Publication Ethics

Publication ethics are the principles and guidelines that govern the conduct of authors, reviewers, editors, and publishers in scholarly publishing. Ensuring ethical practices is crucial for maintaining the integrity and credibility of academic research. Here are some key aspects of publication ethics of our journal:

- **Authorship:** All authors should have made significant contributions to the research and agree to be listed as authors. Misrepresentation of authorship, such as ghost authorship or gift authorship, should be avoided.
- **Originality and Plagiarism:** Authors should ensure that their work is original and properly cited. Plagiarism, including self-plagiarism, is unethical and undermines the integrity of scholarly publishing.

- **Data Integrity:** Authors are responsible for the accuracy and integrity of their research data. Fabrication, falsification, and manipulation of data are serious ethical violations.
- **Conflict of Interest:** Authors should disclose any potential conflicts of interest that could influence their research or its interpretation. These may include financial interests, affiliations, or personal relationships that could bias the work.
- **Peer Review:** Peer review plays a critical role in ensuring the quality and validity of published research. Reviewers should conduct their evaluations objectively and provide constructive feedback.
- **Editorial Independence:** Editors should make decisions based on the merits of the research and without influence from commercial interests, personal biases, or other undue pressures.
- **Publication Ethics Policies:** Journals should have clear and accessible policies on publication ethics, including instructions for authors, ethical guidelines for reviewers and editors, and procedures for handling ethical issues or misconduct.
- **Responsibility of Publishers:** Publishers have a responsibility to support and enforce ethical standards in scholarly publishing. This includes providing resources for editors and reviewers, promoting transparency, and addressing allegations of misconduct.

Publication Charge

The authors should note that there is no submission fee; however, there is a reasonable publication fee for each accepted article to meet the cost of manuscript handling, typesetting, office cum admin expenses, web-hosting charges, up-loading charges, internet expenses, website update and maintenance, electronic archiving and other recurring expenses. The publication fee is obligatory for publication.

- **Indian Authors:** The publication fee for single author per accepted paper is Rs. 1000.00 and Rs. 1200.00 for multiple authors.
- **Foreign Authors:** The publication fee of the accepted paper is $25 for single authored paper and $30 for multiple authored papers
- **Print copy:** Print Copy of the issue can be supplied on payment of Rs. 600.00 per copy. Annual subscription for the print copy is Rs. 3000.00 per Volume (inclusive of postal charges within India) Single print copy can be supplied outside India on payment of 25$ (inclusive international shipping charge) per copy.

ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

Volume-II, Issue-II, November, 2025

Website: https://www.atmadeep.in/

Email: editor@atmadeep.in

NOVEL INSIGHTS

A Peer-Reviewed Quarterly Multidisciplinary Research Journal

E-ISSN: 3048-6572 P-ISSN: 3049-1991

Website: https://www.novelinsights.in

Published by: **UTTARSURI**

ABOUT UTTARSURI

Uttarsuri is a registered society under the Societies Registration Act XXI of 1860, bearing registration number RS/KARIM/258/L/09 OF 2022-23 dated 30.04.2022, located in Karimganj, Assam, India. The society is also registered with NGO Darpan, bearing the unique ID VO/NGO AS/2022/0314757.

Uttarsuri Publication is a branch of the registered society Uttarsuri. It is registered with the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises under registration number UDYAM-AS-18-0012611.

প্রকাশক:

উত্তরসূরি, শ্রীভূমি, অসম, ভারত

ISSN24541508